বির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ১ বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৬

স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ স্বরাজের প্রথম দাবিদার
-পাল' খ্যাত বিপিনচন্দ্র পালের দেড়শত জন্মবর্ষ
উপলক্ষে তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের বিশদ পরিচয়সহ
মাজ ও রাজনীতির ইতিহাসে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল
রণ করিয়ে দেয় প্রসাদরঞ্জন রায়ের গবেষণাসমৃদ্ধ
—'বিস্মৃত জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল'।

গীতাঞ্জলি : কাব্যে এবং দর্শনে আবু সয়ীদ আইয়ুব'
ইয়ুবের দার্শনিক সত্তা এবং কাব্যসমালোচক
ন্দ্বিকতায় আভাসিত প্যারাডক্সের বিশ্লেষণে মনস্ক
জন্য রণজিৎ দাশ আইয়ুব মানস অনুধাবনে
নছেন অন্য একমাত্রা।

ইরাকি কবিতা/অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

হিসাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের সূচনাপর্ব
মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র
ন্দ্রিক তীব্র গণঅসন্তোষের বিস্ফোরণকে।
থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা
ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনি শুরু হচ্ছে
সেনগুপ্তের ধারাবাহিক তথ্যসমৃদ্ধ স্মৃতিচারণ
থের রাঙা ধুলায়'—এবারের পর্ব থেকে।

ষ্টিতে সুন্দর ও মঙ্গলের উপাসক
ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে অমঙ্গলচেতনার
স্থিতি নিয়ে লিখেছেন ইংরেজি সাহিত্যের বর্ষীয়ান
ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

হ-র 'কবির নাম ও সর্বনাম' নিয়ে বিশদ আলোচনা।

বির স্মরণে একটি আলেখ্য।

ট্টাচার্যের ছবির পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীতে প্রতিফলিত
মান্য শিল্পীর অঙ্কন প্রতিভার বিভিন্ন পর্ব নিয়ে
আলোচনা।

With Best Compliments

from :

M. N. DASTUR & COMPANY (P) LTI

CONSULTING ENGINEERS

KOLKATA, MUMBAI, NEW DELHI, CHENNAI,
BHUBANESWAR, BANGALORE

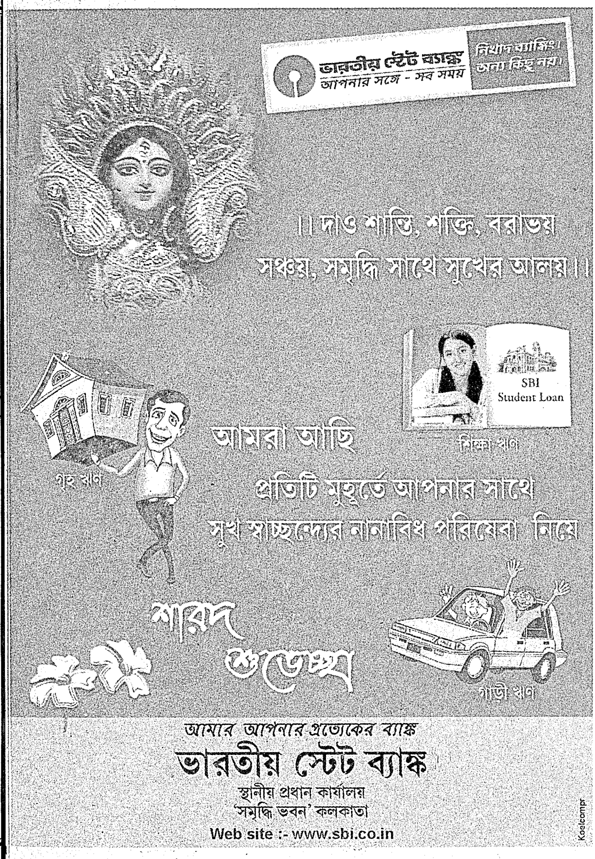
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
আপনার সঙ্গে - সব সময়
নিখাদ ব্যাঙ্কিং। অন্য কিছু নয়।
।। দাও শান্তি, শক্তি, বরাভয়
সঞ্চয়, সমৃদ্ধি সাথে সুখের আলয়।।
SBI
Student Loan
শিক্ষা ঋণ
গৃহ ঋণ
আমরা আছি
প্রতিটি মুহূর্তে আপনার সাথে
সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নানাবিধ পরিষেবা নিয়ে
শারদ শুভেচ্ছা
গাড়ী ঋণ
আমার আপনার প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
স্থানীয় প্রধান কার্যালয়
'সমৃদ্ধি ভবন' কলকাতা
Web site :- www.sbi.co.in
Koelcompr

NEW TOWN OR SANTINIKETAN

THE SAME MARK OF EXCELLENCE IN EVERY HOME

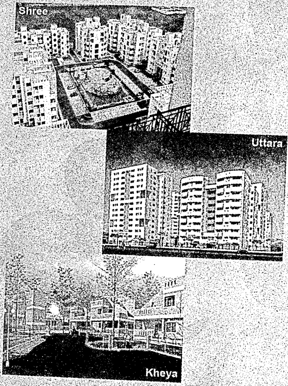

Excellence is writ large on each home that Bengal DCL builds. Be it at the 'Shree', 'Uttara', 'Malancha' Complexes and 'Rabi Rashmi Abasan' at New Town, Kolkata or the 'Kheya Garden Homes' at Santiniketan.

It's because Bengal DCL draws upon the world-class engineering and management resources of the Development Consultants Group - recognized worldwide for its excellence in executing hundreds of projects in India and abroad.

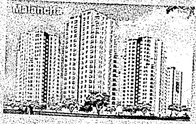

Bengal DCL's commitment to high quality is reflected in the design and construction of every home - conceived for the comfort, safety and privacy of your family. In clean, green and protected surroundings. With every amenity you need for happy and peaceful living.

A few apartments still available at Uttara & Malancha

Bengal DCL Housing Development Co. Ltd.

(A Joint Enterprise of West Bengal Housing Board and DC Properties Ltd.)
DC Building, Block - DG, No. 4 (Second Floor),
Sector II, Salt Lake City, Kolkata - 700 091
Phone : (91) (33) 4000 - 3307
Email : support@bengaldcl.com; Website : www.bengaldcl.com

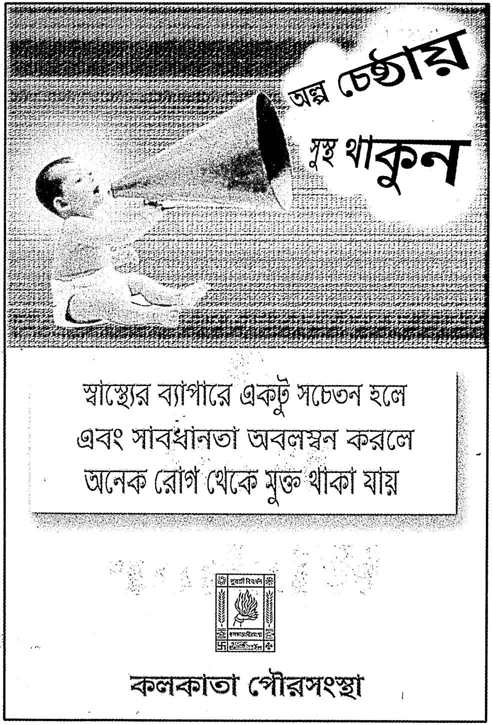
অল্প চেষ্টায়
সুস্থ থাকুন
স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটু সচেতন হলে
এবং সাবধানতা অবলম্বন করলে
অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়
কলকাতা পৌরসংস্থা

With

Best Compliments From

***
**
*

A Well Wisher

অকাদেমি প্রকাশিত ভারতীয় গল্পসম্ভার

রতন মুণ্ডা ও কয়েকটি গল্প (অসমীয়া) ৩৫.০০
লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া
অনুবাদ : বীণা মিশ্র

তামিল গল্প সঞ্চয়ন ১১০.০০
সম্পাদক : অ. চিদাম্বরনাথ
অনুবাদ : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

কাক ও কালাপানি (হিন্দী) ৭০.০০
নির্মল বর্মা
অনুবাদ : মায়া গুপ্তা

কৃশ্ন চন্দরের নির্বাচিত গল্প (উর্দু) ১০০.০০
অনুবাদ : ননী শূর

তেলুগু গল্প সংকলন ৮০.০০
সংকলন ও সম্পাদনা :
স্বামী শিবশংকর শাস্ত্রী
অনুবাদ : সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাচিত কন্নড় ছোটগল্প ১৫০.০০
সম্পাদনা : জি এস আমুর
অনুবাদ : ঈশানী হাজরা

মৈথিলী গল্প সংকলন ৬৫.০০
সম্পাদক : কামাখ্যা দেবী
অনুবাদ : গৌরী সেন

জ্যোৎস্না রাতের ট্রাজেডি (পঞ্জাবী) ১০০.০০
কর্তার সিং দুগ্‌গল
অনুবাদ : অনিন্দ্য সৌরভ

বর্ষার ঝর্না (নেপালী) ৫৫.০০
শিবকুমার রাই
সম্পাদনা : সুনীল দাশ ও সুধীন ঘোষ

চিত্রিত অন্ধকার (ওড়িয়া) ৬৫.০০
বীণাপাণি মহান্তি
অনুবাদ : ভারতী নন্দী

সাম্প্রতিক কাশ্মিরী ছোটগল্প ৬৫.০০
সংকলন : হৃদয় কউল ভারতী
অনুবাদ : পৃথ্বীশ সাহা

কুড়িটি গল্প ১০০.০০
(নবোদয় প্রকল্প)
সাত্যকি হালদার

সাহিত্য অকাদেমি

পূর্বভারতীয় আঞ্চলিক দপ্তর
৪ দেবেন্দ্রলাল খান রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৫
দূরভাষ ২৪১৯ ১৬৮৩/২৪১৯ ১৭০৬, ফ্যাক্স (০৩৩) ২৪১৯ ১৬৮৪

প্রাপ্তিস্থান : রবীন্দ্র সরোবর দপ্তর, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স
ঊষা পাবলিশিং, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি

চলুন বেড়িয়ে আসি

সাগর থেকে পাহাড়ে

বেনফিসের উষ্ণ আতিথ্যে ভ্রমণ হোক মাধুর্যময়

আমাদের টুরিস্ট লজে থাকুন আর আমাদের নিজস্ব বাতানুকুল রেস্তোরাঁয় উপভোগ করুন বেনফিসের লোভনীয় ভোজ

তরঙ্গ — দীঘা পূর্ব মেদিনীপুর	মোহনা — মীনদ্বীপ নয়াচর, পূর্ব মেদিনীপুর	কিনারা — শংকরপুর পূর্ব মেদিনীপুর
মীনাক্ষী — দীঘা পূর্ব মেদিনীপুর	সিরাজবাগ — বহরমপুর মুর্শিদাবাদ	গঙ্গা — ডায়মন্ডহারবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা
সাগরকন্যা — ফ্রেজারগঞ্জ দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ঢেউ — পুরী ওড়িশা	সাগরী — ফ্রেজারগঞ্জ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আরণ্যক — মালবাজার জলপাইগুড়ি	শিলিগুড়ি ট্যুরিস্ট লজ	হলদিয়া এ.সি. রেস্টুরেন্ট হলদিয়া সুপার মার্কেট
অর্কিড — কালিম্পং দার্জিলিং	মহারাজা ট্যুরিস্ট লজ কুচবিহার	হিমালয় — আর এন সিংহ রোড দার্জিলিং
জাহ্নবী কাকদ্বীপ	নির্মীয়মাণ পর্যটক আবাস তারাপীঠ-এ	

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানায়

BENFISH

পি-১৬১/১ (৫ম তল), ভি. আই. পি. রোড, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৭০০ ০৫৪, ফোন নং : ২৩৫৫৪৯৩১
ট্যুরিজম সেন্টার, ৩/২ বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন নং : ৯৮৩১০৩৩১৮১

With Best Compliments From

Cookme®

Spicemakers since 1846

KRISHNA CHANDRA DUTTA (SPICE) PVT LTD

235, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,
KOLKATA-700 007
PHONE : (033) 22598703-8693-8695
FAX: (033) 22598432
MAIL : cookme@vsnl.net
WEB : www.kcdspices.com

WITH BEST COMPLIMENTS :

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M OFFERS
A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND
DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS

Registered Office :
59B, CHOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)
CALCUTTA-700 020
PHONE : 2283 2538
TELE FAX : 22832545

35 Years' Dedicated Service to the Nation

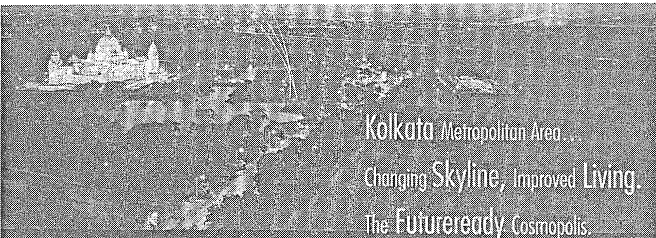

As the new image of our beloved Kolkata Metropolitan Area emerges, we are blueprinting its future with one simple vision... *To provide sustained and improved quality of life through basic urban services in an inclusive manner and create conducive environment for enhanced economic activities by utilising available resources in an efficient, eco-friendly way while conserving heritage.*

Urban infrastructure to facility management...creating world-class residential and commercial establishments via Public-Private-Partnership models...upgrading and maintaining public utility services...mapping the entire area through scientific, state-of-the-art tools...ensuring identification and preservation of heritage... Paving the way for QLI for a futureready, cosmopolis.

DEVELOPMENT PLANS

- Vision 2025 under the aegis of KMPC.
- Sectoral Master Plans under the aegis of KMPC (Master Plan for Water Supply, Master Plan for Sewerage, Drainage & Sanitation and Master Plan for Traffic & Transportation – the Comprehensive Mobility Plan).
- Development Plans under the aegis of KMPC.
- City Development Plan under JN-NURM.

REGULATORY PLANS

LUDCPs–guiding the land uses and development thereon so as to ensure a healthy living environment – enforcement entrusted largely to ULBs.

DEVELOPMENT STRATEGIES

- Spatially balanced urban settlements–KMDA visualizes growth of 15 urban centers and 5 trans-metro centers within KMA.
- Inclusive development with a focus on urban poor.
- Designing interventions in a sustainable manner.
- Provision of treated surface water in replacement of ground water for assured quality and quantity of water.
- Networking of sewerage and drainage facilities, using on-site sanitation where appropriate, and integrated municipal solid waste management – to improve sanitation all round.
- Improving accessibility between metro-core and outlying areas to facilitate dispersal of settlements, providing means of rapid transport (like BRTS & RRTS), and designing improved traffic management solutions (like flyovers, underpasses, traffic signaling etc.).
- Enlisting private sector participation in project implementation and management.

PROGRAMMES/PROJECTS

- GAP (Phase II)–Abatement of pollution of river Hooghly through numerous schemes in towns along the river.
- JN-NURM Sub Mission I–Urban Infrastructure & Governance–assisted by Govt. of India towards up-gradation of core infrastructure and services in the existing Towns – assistance linked to certain reforms at State and municipal level towards improved sustainability.
- JN-NURM Sub Mission II - Basic Services to Urban Poor (BSUP) - targeted interventions in slums for up-gradation of housing and infrastructure facilities. Mapping of various data and information using GIS - easy access by public to data/information through Touch Screen Kiosks in municipal areas - quick retrieval/access to data / information for reeling project plans/micro plans etc. So far, 20 projects sanctioned by Govt. of India under JN-NURM.

PPP (Public Private Partnership) – enlisted private sector participation using different formats of PPP like JV, BOO, BOT etc. – Major PPP projects include: City Centre in Salt Lake, HILAND Park in Baghajatin, Kolkata Logistics International City along Kona Expressway, Stadium Based Commercial Complex along RB Connector in Radanga, Office / Residential Complex in East Kolkata, Water Supply & Sewerage Systems at Sector V in Salt Lake, Multi-Storeyed Car Park in Salt Lake, Office Complex in Salt Lake, IT Logistics Centre in Salt Lake etc.

KOLKATA METROPOLITAN DEVELOPMENT AUTHORITY
www.kmdaonline.org

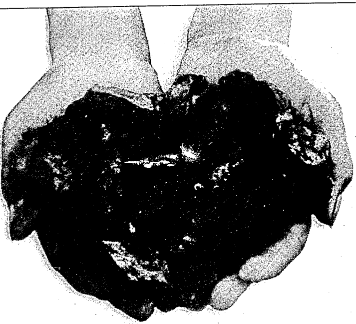

EMTA GROUP of Companies,
a multi-business conglomerate
and having core competence
in captive coal mining
for the thermal power stations
across the country

EMTA

THE POWER BEHIND POWER

EMTA Group of Companies

Kolkata: 801, Central Plaza, 2/6, Sarat Bose Road, Kolkata 700 020, Ph : 033 2485 8510/ 2485 8559, Fax : 033 2485 8513, e-mail : emta@cal2.vsnl.net.in
Delhi: Ganga Plaza, 2nd Floor, 18/13 W. E. A. Karol Bagh, New Delhi 110 005, Ph : 011 2875 3142
Bangalore: 301 Regency Enclave, 4 Magrath Road, Bangalore 560 025

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ১

বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৬

প্রবন্ধ

❖ বিস্মৃত জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল — প্রসাদরঞ্জন রায় ১৩
❖ নাস্তিকের গীতাঞ্জলি : কাব্যে এবং দর্শনে আবু সয়ীদ আইয়ুব — রণজিৎ দাশ ৩০

কবিতা ৩৯-৪৬

❖ একগুচ্ছ ইরাকি কবিতা — অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

❖ ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ৪৭

ছোটগল্প

❖ উদো-বুধো কথা — বিপ্লব বিশ্বাস ৫৯

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

❖ বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অমঙ্গলচেতনা — ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৬৩
❖ কথাবার্তা — অনিন্দ্য রুদ্র ৬৬
❖ মৃত্যুর ভিতর দিয়ে — মেঘ মুখোপাধ্যায় ৬৭
❖ না-বলা কথা — মঞ্জু মৈত্র ৭৪

গ্রন্থসমালোচনা ৮২-৯১

❖ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
❖ আমজাদ হোসেন ❖ আবদুর রাউফ

চিত্রসমালোচনা

❖ বিকাশ ভট্টাচার্যের পূর্বাপর আত্মযাপনের চিত্রমালা — মধুময় পাল ৯২

স্মরণে

❖ হাবিব তনবির — কুন্তল মুখোপাধ্যায় ৯৫

সম্পাদক : আবদুর রাউফ

শিল্পপরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদনা সহকারী : মেঘ মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী
শঙ্খ ঘোষ
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
রণেন আয়ন দত্ত
তুষার তালুকদার

মূল্য : ২০ ডাকে : ৩০

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ক্রান্তি প্রেস ৩৭ রিপন স্ট্রিট,
কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে ক্রান্তি প্রেস ● ৩৭ রিপন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬

দূরভাষ ২২১৫-১৮৩৪

Producers of Quality Tea

With tea estates located in the premium growing areas of Assam, B&A teas have earned a reputation in India and abroad for its quality. Our teas will continue to be one of the finest and most sought after in India and abroad.

B & A LIMITED

Kolkata Office

113 Park Street
Kolkata – 700 016.
Phone No. 2217-6815
2245-7389

Regd. Office

Mahatma Gandhi Road
Jorhat – 785 001.
Phone No. (0376) 2304673
(0376) 2304267

বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ১ চতুরঙ্গ বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৬

বিস্মৃত জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল

প্রসাদরঞ্জন রায়

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যাঁরা স্বরাজের দাবি উদাত্ত কণ্ঠে তুলেছেন বারবার, সেই 'লাল-বাল-পাল'এর অন্যতম বিপিনচন্দ্র পাল। বাংলায় স্বদেশি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি। কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষাবিদ, লেখক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্মপ্রচারক, সাংবাদিক, সম্পাদক—তাঁর পরিচয় বহুবিধ। অথচ সাম্প্রতিক আমলে তাঁকে যেন আমরা ভুলতে বসেছি! গত বছর (২০০৮) ছিল তাঁর এবং জগদীশচন্দ্র বসুর সার্দ্ধশতবর্ষ পূর্তির বছর। জগদীশচন্দ্রের ১৫০ বছর উপলক্ষে সারা দেশে ও বিদেশে অনেকগুলি অনুষ্ঠান হলেও বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতিতে একটিও তেমনভাবে হয়েছে বলে শুনিনি। এই প্রবন্ধটি তাঁর স্মৃতির প্রতি সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য।

বিপিনচন্দ্র পাল জন্মসূত্রে কলকাতার মানুষ নন, যদিও তাঁর কর্মজীবনের অনেকগুলি বছর কেটেছে এই শহরে। সিপাহি বিদ্রোহের এক বছর বাদে তাঁর জন্ম, ৭ই নভেম্বর, ১৮৫৮। তখন এ দেশে কোম্পানির শাসন শেষ হয়ে সবে মহারানির শাসন চালু হয়েছে। তাঁর জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলা) পৈল (মতান্তরে পৈলি) গ্রামে। তাঁদের কোনও এক পূর্বপুরুষ নাকি বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থেকে এসে এখানে বসবাস আরম্ভ করেন, তবে ২৫ পুরুষ তাঁরা সে গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বিপিনচন্দ্রের পিতা রামচন্দ্র পাল সেখানকার সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁর তখন দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন বলে জোর করেই স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ দেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী নারায়ণী ছিলেন বিপিনচন্দ্রের মা। এই বিমাতাই ছোটবেলায় বিপিনচন্দ্রের দেখাশুনো করতেন, তবে মাত্র দু'বছর বয়সে তিনি এই স্নেহময়ী বিমাতাকে হারান।

তাঁর পিতা রামচন্দ্র সে যুগের নিরিখে শিক্ষিত ও উদারচেতা ছিলেন, তিনি ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮৫৮ সালে তিনি ঢাকা সদর-আলা অর্থাৎ সাব-জজ আদালতে পেশকার ছিলেন। শীঘ্রই ঢাকা থেকে বাখরগঞ্জ জেলার কোটেরহাটে তিনি মুনসেফ নিযুক্ত হন। এখানে তাঁরা তিন-চার বছর ছিলেন—সে স্মৃতি বিপিনচন্দ্রের মনে উজ্জ্বল ছিল। জায়গাটি সুন্দরবনের কাছে, খালে কুমিরের উপদ্রব ছিল, বাঘের ডাকও শোনা যেত। এখানে স্কুল ছিল না, তবে প্রথাগতভাবে তাঁর হাতেখড়ি হয়। তাঁর শিক্ষারম্ভ বাবার কাছে—সংস্কৃত শ্লোক শুনে শুনে মুখস্থ করতেন আর 'শিশুবোধ' বই অনুসরণ করতেন। এই সময়ের আরেকটি স্মৃতি তাঁর

'চূড়াকরণ' যাকে তিনি বলেছেন 'কান ফোঁড়ানো' এবং তাঁদের সমাজে এই প্রথাটি বহুল প্রচলিত ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে কিন্তু কোটেরহাটের মুনসেফি আদালত উঠে যায় ও তাঁরা আবার ফিরে যান পৈল গ্রামে। তাঁদের গ্রামে কিছু সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবার থাকলেও বেশ কিছু নিম্ন বর্ণের তেলি, যুগি ইত্যাদি এবং কিছু মুসলমান পরিবারও বাস করত। এদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে তিনি খেলতেন। নিজেই লিখেছেন যে তিনি খুব সুবোধ বালক ছিলেন না, প্রায়ই অবাধ্যতা ও দুর্ব্যবহারে মারধোর খেতে হত। বছরখানেক বাদে তাঁর বাবা আবার ফেঁচুগঞ্জে নিযুক্ত হন। ফেঁচুগঞ্জ ছিল অসম ও পূর্ববঙ্গের যোগাযোগকারী একটি বড় স্টেশন ও নদীর ঘাট। তাঁর মা-বোন সেখানে না গেলেও কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্রকে যেতে হয়েছিল। তবে সেখানেও মাত্র মাস ছয়েক কাটিয়ে রামচন্দ্র ১৮৬৬ সালে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে শ্রীহট্ট শহরে ওকালতি করার সিদ্ধান্ত নেন ও সেখানেই সপরিবারে বাস আরম্ভ করেন।

ছোট্ট পাহাড়ি শহর শ্রীহট্টে বিপিনচন্দ্রের প্রথাগত শিক্ষা আরম্ভ হয়। তখন শ্রীহট্টে দুটি মাত্র মিশনারি পাদরিদের স্কুল ছিল। বাড়ির কাছে নয়া সড়ক স্কুলে পাঠ্যারম্ভ করলেও পরে চলে যান শেখঘাট স্কুলে। আবার পাদরিদের সঙ্গে হিন্দু ভদ্রলোকদের মতানৈক্য হলে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু সেটিও বেশিদিন চলেনি। শেষ পর্যন্ত শ্রীহট্টে সরকারি স্কুল খোলা হলে সেখানেই ভর্তি হন। এই স্কুলজীবনের প্রভাব তাঁর ওপরে সুদূরপ্রসারী। স্কুলে তাঁর সহপাঠী ছিলেন সীতানাথ দত্ত (তত্ত্বভূষণ) ও সুন্দরীমোহন দাশ, দু'জনেই খুব ভাল ছাত্র এবং তখনই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু বিপিনচন্দ্রের নিজের ভাষায় : 'I was not drawn towards this Brahmo Samaj, but rather took up a somewhat unfriendly attitude towards it' যদিও নিজেই লিখেছেন : 'We had lost our faith completely in it (Hinduism)'।

১৮৭৩ সালে সুন্দরীমোহন এন্ট্রাস পাশ করে উচ্চশিক্ষার্থে কলকাতায় যান, কিন্তু বিপিনচন্দ্রের বয়স ১৬ হয়নি বলে তিনি পরীক্ষা দিতে পারেননি। এই সময়ে সুন্দরীমোহনের পিতৃবিয়োগ হলে তিনি সনাতন হিন্দুমতে আদ্যশ্রাদ্ধ না করে ব্রাহ্ম মতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। এতে শহরে বেশ শোরগোল হয় ও বিপিনচন্দ্রও কিছুটা প্রভাবিত হন। আবার এই সময়েই তাঁর সাহিত্যচর্চায় হাতেখড়ি—*ঢাকা প্রকাশ, হিন্দু হিতৈষিণী* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয়ই প্রকাশিত হয়। তিনি নিজে লিখেছেন '১৮ বৎসরের পূর্বে যে কবিতা লেখে না, সে মানুষ নয়। ১৮ বৎসরের পরে যে কবিতা লেখে, সে হয় পাগল না হয় কবি। আমি এই দুইয়ের একটাও বোধহয় নই।' এই সাহিত্যপ্রীতি কিন্তু তাঁকে আজীবন উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তাঁর নিজের মতে এই সাহিত্যচর্চার জন্যই সুন্দরীমোহনের সঙ্গে তাঁর সখ্য হয়, যা আজীবন স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৭৪ সালে ওই স্কুল থেকে তৃতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন বিপিনচন্দ্র।

ওই বছরেই শ্রীহট্ট জেলাকে পূর্ববঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অসমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে খুব খারাপ ফল হলেও অসম শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বলে তিনি ১০ টাকার একটি বৃত্তি পান। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সুযোগও পান। তখন শ্রীহট্ট থেকে কলকাতা যাতায়াত খুব সহজ ছিল না। শ্রীহট্ট থেকে স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা হয়ে ট্রেন ধরতে হত, দিন সাতেক সময় লাগত। সুন্দরীমোহনের সঙ্গে কলকাতায় এসে উঠলেন ১৫ নং নিমু খানসামা লেনে 'সিলেট মেস'-এ। এখানেই থাকতেন সুন্দরীমোহন ও তাঁর আর এক সহপাঠী তারাকিশোর চৌধুরী। 'সিলেট মেস' ও কলকাতার উন্মুক্ত জীবনের প্রভাব তাঁর ওপরে অনেকখানি। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'শ্রীহট্টে থাকিতেই হিন্দুয়ানীর বন্ধন আলগা হইয়া যাইতেছিল, কলিকাতায় আসিয়া তাহা একেবারে খসিয়া পড়িল। শ্রীহট্টে লুকাইয়া হিন্দুর অখাদ্য খাইতাম, কলিকাতায় আসিয়া প্রকাশ্যভাবে খাদ্যাখাদ্যের বিচার পরিহার করিলাম। কিন্তু আমাদের ছাত্রাবাসের কেহ কেহ হিন্দুয়ানী ছাড়িতে রাজি ছিলেন না। বোধ হয় তাঁদের অভিভাবকেরাও এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সর্বদা সাবধান ও শাসন করিতে চেষ্টা করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের এই ছাত্রাবাসে দুইটা দল গড়িয়া উঠিল। একদল কোন প্রকারের বন্ধন স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না; আর একদল সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যে কোন অনাচার করিতে সাহস পাইতেন না। শ্রীহট্টে মুসলমানের পাউরুটী বিস্কুট লুকাইয়া খাইতাম। এখানে যাঁরা হিন্দুয়ানীর আবরণ রাখিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন তাঁরাও মিশ্রিগঞ্জের পাঁউরুটি ছাড়িয়া বামুনের পাউরুটী খাইতে পারিতেন না।'

পাউরুটি-বিস্কুট থেকে নিষিদ্ধ মুরগির মাংস, মুসলমান পাচকের খানা এবং পরিশেষে উইলসনের হোটেলে 'ইংরাজী খানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়'—এ সবই ছিল সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ।

সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজের একটা চিত্র তাঁর লেখা থেকে বেশ পাওয়া যায়। তখন সবে কলেজের বাড়ি তৈরি হয়েছে : 'আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে যাই তখনও কিন্তু তাহার এখনকার উত্তর অংশ তৈয়ারী হয় নাই। পূর্বদিকের অংশও এখনকার আয়তন লাভ করে নাই। চারিদিকে রেলিং ওঠে নাই। উত্তরদিকে একটা একতলা বাড়ি ছিল। সেখানে রসায়নের ক্লাস বসিত।' সাটক্লিফ সাহেব

ছিলেন অধ্যক্ষ—তিনি গণিতের অধ্যাপক আর এ বিষয়টিতে বিপিনচন্দ্রের বরাবরের দুর্বলতা। সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন নীলমণি তর্কালঙ্কার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। আর ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন বেলেট সাহেব ও 'ফার্স্ট বুক'-খ্যাত প্যারীচরণ সরকার। তাঁর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র, যদিও ১৮৭৫ সালেই তাঁর মৃত্যু হয়। সম্ভবত তাঁর প্রভাবেই মদ্যপান-নিবারণী সভার কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন বিপিনচন্দ্র। তবে কলেজের পড়াশোনার চাইতে তাঁর আকর্ষণ বেশি ছিল বইপত্র, পত্রপত্রিকা আর নাট্যমঞ্চে। নিজেই লিখেছেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে আমার মন ছিল না', বরং হ্যারিসন রোডের মোড়ে যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্যানিং লাইব্রেরি'-তে প্রায় সারাদিন কাটাতেন আর নানারকম বই পড়তেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ এ পরীক্ষা পাশ করতে পারেননি। প্রথম বছর (১৮৭৬) পানবসন্তে আক্রান্ত হয়ে পরীক্ষা দিতে পারেননি, পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে গণিতে ফেল, আবার তৃতীয় বছরে পরীক্ষায় বসেও অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা শেষ করতে পারেননি। ততদিনে পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেছে, ফলে ১৮৭৮ সালে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়া গেল'।

কলকাতার ছাত্রজীবনটি নানা কারণে অত্যন্ত ঘটনাবহুল ছিল। এর মধ্যে তিনি হারান তাঁর অতি প্রিয় বোন আর মাকে। তিনি লিখেছেন 'আমার মায়ের লোকান্তর-প্রাপ্তি প্রকৃতপক্ষে ঘর ও পরিবারের সঙ্গে আমার হৃদয় ও জীবনের বন্ধন-রজ্জু অপসারিত করিয়াছিল।' ধীরে ধীরে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ হচ্ছিলেন, যদিও তা একদিনে হয়নি। সুন্দরীমোহন দাশ তখন তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং শ্রীহট্টে থাকতেই তিনি ব্রাহ্ম চিন্তাধারায় আবিষ্ট হয়েছিলেন। শিবনাথ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন :

> 'কলিকাতায় আসিয়া তিনি নিয়মিতরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাতে যাইতে আরম্ভ করেন। প্রতি রবিবার সন্ধ্যাকালে সুন্দরীমোহন যখন ব্রহ্মমন্দিরে যাইতেন, আমি তখন তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্লেশ পাইতাম। কিছুদিন পরে কেবল তাঁহার সঙ্গে রবিবার সন্ধ্যাকাল কাটাইবার জন্য আমিও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া উপাসনা করিতাম না, কেবল নির্বিবাদে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতাম বা ঘুমাইতাম। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল।'

সুন্দরীমোহন তাঁকে বোঝান যে এ দেশের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী কেশবচন্দ্র এবং তার ফলে

> 'এখন হইতে যদিও আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে যাইয়া আর ঘুমাইতাম না, মন দিয়া কেশবচন্দ্রের উপাসনা ও উপদেশাদি শুনিতে লাগিলাম, তথাপি ইহার ফলেই যে আমি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম এমন কথা বলিতে পারি না। ধর্মশিক্ষার জন্য নহে, কিন্তু বাংলাভাষা শিখিবার লোভেই আমি প্রথমে কেশবচন্দ্রের উপদেশাদি শুনিতে আরম্ভ করি। তাঁহার উপদেশ এবং বক্তৃতায় আমার ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদের যে কোন বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছিল, এমন মনে পড়ে না। ফলতঃ তখনও আমার কোন গভীর ধর্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই। যেখানে জিজ্ঞাসা জাগে না, সেখানে কোন নূতন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি তখনও ব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধানে যাই নাই।'

কিন্তু কেশবচন্দ্র ছিলেন অনেক দূরের মানুষ, তিনি খুব কাছে পেয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীকে এবং তাঁর কাছেই ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেন সম্ভবত ১৮৭৭সালে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন :

> 'ব্রাহ্মসমাজ এই বিদ্রোহকে অবলম্বন করিয়াই—একদিকে যেমন ইংরাজী শিক্ষা আমাদের প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতেছিল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে এই নবীন আদর্শে আমাদের ধর্ম ও সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্ম সমাজ একটা পূর্ণতর সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের সন্ধানে যাইয়া ধর্ম ও সমাজ সংস্কার-ব্রতে ব্রতী হইলেন। সকল মানুষ সমান, —কেন? ব্রাহ্মসমাজ এই প্রশ্ন তুলিলেন। সকল মানুষ তো বাস্তবিক সমান নহে। কেহ সবল, কেহ দুর্বল, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্বোধ—এ সকল বৈষম্য জন্মগত। তবে মানুষের সাম্য কোথায়? ব্রাহ্মসমাজ বলিলেন, মানুষের সাম্য তাহার নিজের বিশিষ্ট শক্তি-সাধ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সকল মানুষ সমান, কেন না সকল মানুষ একই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর সকল মানুষের পিতা, মানুষ পরস্পরের ভ্রাতা। ঈশ্বরের সার্বজনীন পিতৃত্ব এবং ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মানুষের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব—ইহাই ব্রাহ্মসমাজের মূল শিক্ষা হইল। এই সত্য বা সিদ্ধান্তের উপরেই ব্রাহ্মসমাজ এক নূতন স্বাধীনতার আদর্শে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বর যখন সকলের পিতা, নরনারী সকলে যখন তাঁহারই সন্তান, তখন নরনারীর সমান অধিকার। পরিবারে স্বামী এবং স্ত্রী সমান, পুরুষ বলিয়া স্ত্রীর উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না। পুরুষ যেমন আপনার বিচারবুদ্ধিকে মার্জিত করিবে শিক্ষা দ্বারা, স্ত্রীলোক তেমন সেই শিক্ষালাভের সম্পূর্ণ অধিকারী। পুরুষ যেমন আপনার মনোমত স্ত্রী গ্রহণ করিয়া দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হইবে, স্ত্রীলোকও সেইরূপ আপনার মনোমত পুরুষকে পতিরূপে বরণ করিয়া তাহার সহধর্মিণী হইবে। পরিবারে পুত্রের যে স্থান ও অধিকার কন্যারও সেই স্থান এবং অধিকার থাকিবে। এইরূপে সমাজে জন্মগত বা জাতিগত কোন অধিকার গ্রাহ্য হইবে না। জাতিভেদ থাকিবে না, —আহারাদি সম্বন্ধে নহে, বিবাহাদি সম্বন্ধেও নহে। ইহাই নবযুগের বাংলার স্বাধীনতার প্রথম সাধনা ছিল।'

এই দীক্ষার ফল হিসাবে তাঁকে আত্মত্যাগও করতে হয়েছে। নিজেই লিখেছেন :

> 'এই দীক্ষা লইয়া আমার জীবনে একরূপ যুগান্তর উপস্থিত হইল। ইহার পূর্বে আমি হিন্দুসমাজের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সকল

সম্বন্ধ কাটিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হই নাই। ব্রহ্ম-মন্দিরে যাইতাম বটে, আমাদের ছাত্রাবাসেও মাঝে মাঝে ব্রহ্মোপাসনা হইত, তাহাতেও সামিল হইতাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেবের আদেশমত মাতাঠাকুরাণীর বার্ষিক শ্রাদ্ধাদিও করিতাম। কলিকাতায় আমাদের অঞ্চলের একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি আসিয়া পৌরোহিত্য করিতেন। কিন্তু ১৮৭৭ ইংরাজীতে এইভাবে মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে রাজী হইলাম না। পুরোহিত আসিয়া অনুরোধ করিলে সে অনুরোধ রাখিলাম না। তিনি বাবাকে সে কথা জানাইলেন। বাবার সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে একটা বিরোধ হইবে এই ভাবিয়া ১৮৭৭-১৮৭৮-এর শীতের ছুটিতে বাড়ী গেলাম না। বাবা পীড়াপীড়ি করিলেন তবুও তাঁহার এই আদেশ পালন করিলাম না। ১৮৭৮-এর গ্রীষ্মের ছুটিও কলিকাতায় কাটাইলাম। বাবা তাহার পূর্ব হইতেই আমায় কলিকাতার খরচের টাকা পাঠান বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু খোলাখুলি আমাকে কিছু লেখেন নাই। ইতিমধ্যে আমি হিন্দু-সমাজে থাকিয়া তাঁহার বংশধারা রক্ষা করিব, এ আশা যখন আর তাঁর রহিল না, তখন তিনি চৌষট্টী বৎসর বয়সে পিণ্ডলোপ পাইবার আশঙ্কায় তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আমার পূর্ব কয়মাসের খরচের টাকা একসঙ্গে পাঠাইয়া আমাকে একখানা সুদীর্ঘ পত্র লেখেন।'

এই চিঠিতে তিনি অভ্যাসমতন 'পরমকল্যাণবরেষু' না লিখে 'প্রাণতুল্যেষু' সম্বোধন করেছিলেন। এ ব্যাপারটি বিপিনচন্দ্রকে কতটা নাড়া দিয়েছিল তা বোঝা যায় তাঁর *প্রাণতুল্যেষু, পিতা-পুত্রে* এবং *ত্যাজ্য পুত্র* এই তিনটি নিবন্ধ পড়লে। অনেক চেষ্টা করেও বিপিনচন্দ্র বাবার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেননি। এই তৃতীয় বিবাহ থেকে রামচন্দ্রের একটি কন্যা সন্তান হয়। অবশ্য মৃত্যুর ঠিক আগে (জানুয়ারি, ১৮৮৬) পিতা-পুত্রে পুনর্মিলন হয় এবং বিপিনচন্দ্রই তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষিত হন।

এরই পাশাপাশি ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর মনে জাতীয়তাবাদের বীজ উপ্ত হয়েছিল। নাটকের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা নিজেই বলেছেন, কিন্তু লঘু নাটক নয়, তাঁর আসল আকর্ষণ ছিল *নীল দর্পণ, শরৎ-সরোজিনী* বা *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী* প্রভৃতি দেশাত্মবোধক নাটকের প্রতি। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের গান, হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের কবিতা তাঁদের উদ্দীপ্ত করল। স্বদেশপ্রেমের জোয়ারে তাঁরা যেন ভেসে গেলেন। এই সময় সুন্দরীমোহন ছাড়াও তিনজন মানুষের প্রভাব পড়েছিল তাঁর জীবনে। প্রথমজন আনন্দমোহন বসু (১৮৪৬-১৯০৬) যিনি ব্যারিস্টার ও কেম্ব্রিজের প্রথম ভারতীয় 'র‍্যাংলার' হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর প্রথম কাজ 'ছাত্রসভা' বা Students' Association গঠন করা। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা অনেকেই এই 'ছাত্রসভা'-য় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। পরে আনন্দমোহন 'ভারত-সভা' বা Indian Association-এর প্রথম সম্পাদক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন। দ্বিতীয়জন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) যিনি আই সি এস পাশ করে এসে শ্রীহট্টে কাজে যোগ দিয়েছিলেন এবং তখন দূর থেকে বিপিনচন্দ্র তাঁকে দেখেন। একটি তুচ্ছ কারণে তাঁর চাকরি যায় এবং তা নিয়ে দেশজুড়ে তুমুল আন্দোলন হয়। বিলেতে আপিল করেও তিনি সুবিচার পাননি। তখন বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপনার দায়িত্ব নেন ও আনন্দমোহন প্রতিষ্ঠিত 'ছাত্রসভা'-য় বিশেষ ভূমিকা নেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য, বিপিনচন্দ্রের মতে 'আমাদের যুগের বাংলার শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবকদিগের চিত্তকে অধিকার করিয়া তাহাদের নায়কত্ব লাভ করেন।' তৃতীয়জন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) তখন ছিলেন হেয়ার স্কুলের হেডপণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী, সমাজ-সংস্কারক ও ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ যুবনেতা, যদিও ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের অনুগামী ও বিরোধীদের মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে তাঁর দেশপ্রেম ছিল গভীর। এই তিনজনের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৮৭৬ সালে গড়ে ওঠে 'ভারত-সভা' বা Indian Association। এটিকে ভারতে প্রথম রাজনৈতিক দল গড়ার প্রয়াস বলা যায়। আনন্দমোহন হলেন এর সম্পাদক, সুরেন্দ্রনাথ সহ-সম্পাদক, শিবনাথ 'চাঁদা আদায়কারী সভ্য'। মনোমোহন ঘোষ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর শুকুল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতারাও এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই 'ভারত-সভা' ইলবার্ট বিল, প্রেস আইন, অস্ত্র আইন, চা-কুলি আন্দোলন প্রভৃতি বহু ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করেন। এর প্রভাব থেকে বিপিনচন্দ্রও মুক্ত ছিলেন না। বিপিনচন্দ্রের নিজের ভাষায় 'এই রাজনৈতিক স্বরাজ-আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজ চালিত ধর্মীয় ও সামাজিক বিদ্রোহের সন্তান'।

এই শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রভাবেই বিপিনচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা এবং রাজনৈতিক দীক্ষা। *প্রবাসী*-তে একটি প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন 'ব্রাহ্মসমাজ যে স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্মসাধনে ও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাকেই রাষ্ট্রীয় শাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেশের শিক্ষিত লোকেরা লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার সাধকেরা এই স্বদেশপ্রেমকে তাঁহাদের ধর্মজীবনের আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া নিজেদের স্বাধীনতার আদর্শকে পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম সমাজের এই স্বাধীনতার সাধকদিগের অগ্রণী হইয়া উঠেন'

(১৯২৬)। অন্যত্র লিখেছেন : 'শিবনাথ শাস্ত্রীই আমাদের স্বাধীনতা ও স্বদেশচর্চার প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার নায়কত্বে আমরা ক'জন মিলিয়া একটা দল গড়িবার চেষ্টা করি। আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম কথা ছিল—স্বায়ত্বশাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।' এই দলকে বিপিনচন্দ্র বলেছেন 'সাধক দল', শিবনাথ বলেছেন 'ঘননিবিষ্ট দল'। শিবনাথ তাঁর *আত্মজীবনী*-তে লিখেছেন : 'এই সময়েই কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া আর এক কার্যের সূত্রপাত করিলেন। তাঁহারা একটি ঘননিবিষ্ট দল সৃষ্টি করার জন্য উদ্যোগী হইলেন। এইরূপ স্থির হইল, তাঁহারা কয়েকটি মূল সত্যকে জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করিবেন এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া একটি ঘননিবিষ্ট দলে বদ্ধ হইবেন।' বিপিনচন্দ্রের ভাষায় এই ব্রতগুলি হল :

'(১) আমরা প্রতিমা-পূজা করিব না এবং প্রচলিত প্রতিমা-পূজার সঙ্গে কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকিব না।
(২) আমরা বাক্যে ও কার্যে জাতিভেদ মানিব না এবং যাহাতে এই কুপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যায় প্রাণপণে চেষ্টা করিব।
(৩) আমরা পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিব এবং প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিব।
(৪) আমরা নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না। কোন বালিকাকে তাহার ষোড়শ বৎসরের পূর্বে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না এবং যে বিবাহে পুরুষের বয়স একুশের এবং বালিকার বয়স ষোড়শ বৎসরের কম, সেরূপ বিবাহে কোন প্রকারে সাহায্য করিব না ও তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিব না।
(৫) আমরা যথাসাধ্য স্ত্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব।
(৬) আমরা নিজেদের এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য, শক্তি ও শৌর্যবৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামচর্চার প্রচার করিব এবং নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুক চালনা অভ্যাস করিব এবং দেশের মধ্যে যাহাতে এ সকল বিদ্যার বহুল প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা করিব।
(৭) আমরা একমাত্র স্বায়ত্বশাসনকেই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি; তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের মুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশীর রাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইনকানুন মানিয়া চলিব; কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গভর্ণমেন্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করিব না।'

১৮৭৭ সালের মাঝামাঝি এই ব্রত গ্রহণ করে তাঁরা স্বদেশি মন্ত্রে দীক্ষিত হন, অবশ্য এই ব্রতগুলির মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে খুব স্পষ্ট। ব্রহ্মোপাসনা করে, হোমকুণ্ড জ্বেলে, অগ্নি প্রদক্ষিণ করে, বুকের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করে ঈশ্বরের নামে শপথ করে এই দলে প্রবেশ করতে হত। প্রথম দিনে শপথ নেন শরৎচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশঙ্কর শুকুল, তারাকিশোর চৌধুরী আর বিপিনচন্দ্র—অর্থাৎ তাঁদের 'সিলেট মেস'-এর বন্ধুগোষ্ঠীর তিনজনই ছিলেন এই দলে। শিবনাথ আচার্যের ভূমিকা পালন করলেও নিজে শপথ নেননি, কারণ তখনও তিনি সরকারি স্কুলে কাজ করেন। মাস ছয়েক বাদে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে শপথ নেন শিবনাথ, তাঁর সঙ্গে ছিলেন গগনচন্দ্র হোম ও উমাপদ রায়। এই ক্ষুদ্র 'ঘননিবিষ্ট দল' যে বিরাট কিছু করতে পেরেছিল তা নয়, কিন্তু বিপিনচন্দ্রের জীবনে এই দীক্ষা বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। অবশ্য কেবল আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথ-শিবনাথই নন, এই সময়ে তাঁর জীবনে প্রভাব ফেলেছিলেন 'হিন্দু মেলা'-র প্রাণপুরুষ নবগোপাল মিত্র যাঁকে ঠাট্টা করে বন্ধুরা বলতেন 'ন্যাশনাল নবগোপাল'। নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চা করতেন সুন্দরীমোহন ও বিপিনচন্দ্র। তাঁর প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'সুরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে পেট্রিয়টিজম্-এ অথবা স্বদেশভক্তিতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্র ন্যাশন্যালাজিম্ বা স্বাজাত্যাভিমানে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সাধারণভাবে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই স্বাধীনতার প্রেরণাকে স্বদেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্র আমাদিগকে নিজেদের সভ্যতা এবং সাধনার গৌরবে গরীয়ান করিয়া সত্য স্বাজাত্যাভিমানের প্রেরণা দিয়াছিলেন।'

বিপিনচন্দ্রের ইংরাজি আত্মজীবনীতে Nabagopal Mitra and the Hindu Mela শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে এবং তাতে রাজা বদনচাঁদের বাগানবাড়িতে 'হিন্দু মেলা'-য় একবার তিনি নিজে কীভাবে মারপিটে জড়িয়ে পড়েন সে কথাও আছে। তাঁর বাংলা আত্মজীবনী *সত্তর বৎসর*—এ *আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী* এবং *নবজাতীয়তার উদ্বোধন—নবগোপাল মিত্র ও হিন্দুমেলা* শীর্ষক তিনটি অধ্যায় আছে। একদিকে সমাজ-জীবনে ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কোচবিহার-বিবাহ নিয়ে 'এক প্রবল ঝড় উঠিল'। এই বিবাহের পর ব্রাহ্ম যুবমণ্ডলী ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে একটি প্রতিবাদ সভা ডাকেন এবং প্রতিবাদের প্রস্তাবটি আনেন সীতানাথ দত্ত, সমর্থন করেন বিপিনচন্দ্র। এরপর যে সাধারণ সভা ব্রাহ্মসমাজে আহুত হয় তাতেও উপস্থিত ছিলেন বিপিনচন্দ্র—তাঁর ভাষায় 'ফলতঃ এই সভাতেই আমি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মমণ্ডলীভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেই'। এই ঝড়ের ফলে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় বিভাজন

আসে এবং আনন্দমোহন, শিবনাথ, শিবচন্দ্র দেব, দুর্গামোহন দাশ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখের নেতৃত্বে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই বিপিনচন্দ্র যোগ দিলেন এই গোষ্ঠীতে। এই বছরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃপক্ষ সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরিবার-পরিত্যক্ত বিপিনচন্দ্রের কাজের প্রয়োজন ছিল এবং তিনি শিক্ষকতার জন্য আবেদন করেন। এফ এ পাস করেননি বলে সে আবেদন গৃহীত হয়নি। তখন ১৮৭৯ সালে তিনি কটকে 'কটক একাডেমি' স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগ দেন। এই তাঁর কর্মজীবনের শুরু। বছরের শেষে কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন কিছুদিন রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারকার্য চালান। পরেও তিনি মাঝে মধ্যে অন্ধ্র অঞ্চলে, পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে ও পূর্ববঙ্গে প্রচারক হিসাবে কাজ করেছেন। আবার ১৮৮০ সালে শ্রীহট্ট যাত্রা করেন এবং সেখানে 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। অবশ্যই এর পিছনে ছিল নবগোপাল মিত্রের প্রেরণা। এ কাজে তাঁর সহায় ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ সেন ও রাজকৃষ্ণ চৌধুরী নামে দুই ব্রাহ্মযুবক। স্কুলের পাশাপাশি বিপিনচন্দ্র তখন শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে ও 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী'-তে নিয়মিত বক্তৃতা দেন এবং *পরিদর্শক* নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। এই প্রথম তাঁর পত্রিকা-সম্পাদনা। এই সময়েই তাঁর পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। গুরুতর অসুস্থ হয়ে বন্ধুদের হাতে বিদ্যালয়টি ছেড়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। চিকিৎসা ও বিশ্রামে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। আচার্য শিবনাথের সুপারিশে তিনি ব্যাঙ্গালোরে মুদালিয়ার হাই ইংলিশ স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন ১৮৮১ সালের অগস্ট মাসে। বছর দেড়েক বাদে আবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনান্তরের ফলে চাকরিতে ইস্তফা দেন। ১৮৮১ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর বিবাহ। পাত্রী নৃত্যকালী ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর আশ্রিতা এক বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা। শিবনাথের উপস্থিতিতে বোম্বাইয়ে 'প্রার্থনা সমাজ'-এ বিবাহ হয়।

ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় কলকাতায় ফিরে তিনি কিছুকাল দুর্গামোহন দাসের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করতেন। তখনই তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শোভনার জন্ম ১৮৮৩ সালে, পরের বছর দ্বিতীয়া কন্যার, তার পরের বছর শিশুপুত্রের (এই সন্তানটি দীর্ঘজীবী হয়নি)। ১৮৮৩ সালে সিদ্ধান্ত হয় যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইংরাজি মুখপত্র হবে Indian Messenger আর Brahmo Public Opinion পত্রিকাটি Bengal Public Opinion নামে প্রকাশিত হবে। পত্রিকাটি চালাতেন দুর্গামোহন দাশ ও তাঁর ভাই ভুবনমোহন দাশ, বিপিনচন্দ্র মাসিক ৭০ টাকা মাইনেতে সহ-সম্পাদক। এই তাঁর প্রথম ইংরাজি পত্রিকা-সম্পাদনা। পত্রিকাটি অবশ্য দু'বছর বাদে সুরেন্দ্রনাথের Bengalee পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আক্রমণাত্মক *প্রচার* ও *নবজীবন* পত্রিকার প্রত্যুত্তরে *আলোচনা* পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। এর পাশাপাশি *বঙ্গবাসী* ও *সঞ্জীবনী* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু লক্ষ করেন যে *বঙ্গবাসী* ক্রমশ উগ্র হিন্দুত্বের সমর্থক হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর প্রত্যুত্তরে *সঞ্জীবনী*-তেও গোঁড়া ব্রাহ্ম মনোভাবের প্রতিফলন হচ্ছে। ইতিমধ্যে ইলবার্ট বিল ও সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস নিয়ে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে, বিপিনচন্দ্রও সেই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এর মধ্যে তাঁর স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ও দুর্গামোহনের বাড়িতে আশ্রয় পান। পিতা রামচন্দ্র পালের আহ্বানে ১৮৮৫ সালের শেষে তিনি সপরিবারে শ্রীহট্ট যান ও এবার পিতা-পুত্রে মিলন হয়। নৃত্যকালী কলেরা রোগাক্রান্ত হলে তাঁর পিতা নিজে সেবা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন, কিন্তু নিজে সেই কালরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন তাঁর জমিদারি পরিচালনা করেন, কিন্তু তা ছিল ঋণজালে আবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত জমিদারি বিক্রি করে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় বোনের দায়-দায়িত্ব চুকিয়ে পিতৃঋণ শোধ করে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। এর মধ্যে হবিগঞ্জ হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের জন্য নির্বাচিত হলেও মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে নিয়োগটি হয়নি। প্রতিবাদে বিপিনচন্দ্র নিজে একটি স্কুল চালান, কিন্তু ৫০০০ টাকা খরচ করেও তা এক বছরের বেশি চলেনি।

১৮৮৬ সালে আবার কলকাতায় ফিরে এলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য আর কিছুটা লেখালেখির কাজ ছাড়া তাঁর হাতে তেমন কাজ ছিল না। ওই বছরই কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এবং প্রতিনিধিরূপে বিপিনচন্দ্র তাতে যোগ দেন। এই তাঁর সর্বভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে প্রথম পদার্পণ ও সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে পরিচয়। পরপর কয়েকটি কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর যোগ দেবার সুযোগ হয়েছিল ও ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তৃতা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর ও কয়েকজনের চেষ্টায় প্রতি অধিবেশনের আগে বিষয়-নির্বাচনী সমিতির ব্যবস্থা হয়। এরই মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর সুপারিশে লাহোরে Tribune পত্রিকার সহ-সম্পাদক রূপে যোগ দেন। এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন সর্দার দয়াল সিংহ মাজিথিয়া ও

সম্পাদক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। শীতলাকান্ত ছুটিতে গেলে বিপিনচন্দ্রের লেখার গুণে Tribune খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় তিনি লাহোর ব্রাহ্মসমাজের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন ও পাঞ্জাবে নানান জায়গায় বক্তৃতা করেন। কিন্তু শীতলাকান্ত ফিরে এসেই বিপিনচন্দ্রকে প্রশাসনিক কাজের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান, ফলে পদত্যাগ করে ফিরে যান বিপিনচন্দ্র (১৮৮৮)।

এ বছর কলকাতায় ফেরার পরই তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নিরঞ্জনের জন্ম হয়। তারপর ১৮৯০ সালে বন্ধু ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাশের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তাঁর স্ত্রী নৃত্যকালী মাত্র ২৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। এই চরম দুঃখের দিনে তিনি র‍্যাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসনের Essays আর In Memoriam পড়ে সান্ত্বনা পান। এই সময়েই তিনি গভীরভাবে উপনিষদ ও গীতা অধ্যয়ন করেন। শিশুপুত্র কন্যাদের নিয়ে তিনি খুবই বিব্রত হয়ে পড়েন, তবে এর দেড় বছর বাদে তিনি আবার বিবাহ করেন। ভুবনমোহিনী দেবীর সঙ্গে এই বিবাহ ৪০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ভুবনমোহিনী দেবীই তাঁর কনিষ্ঠা তিন কন্যা ও দুই পুত্রের মা এবং জ্যেষ্ঠা দুই কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও তিনি মাতৃস্নেহে মানুষ করেছিলেন। ১৮৯০ সালের অগস্ট মাসে তিনি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির (অর্থাৎ বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরি) গ্রন্থাগারিক ও সচিব মনোনীত হন। এ কাজটি তাঁর খুবই পছন্দের ছিল। কিন্তু কয়েকজন সদস্যের খবরদারিতে বিরক্ত হয়ে ইস্তফা দেন। তার পরও কলকাতা পৌরসভায় কিছুদিন কাজ করেন, তার পর আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুরো সময়ের কর্মী। *আশা* (১৮৯২) ও *কৌমুদী* (১৮৯৪) নামে দুটি পাক্ষিক পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সদস্যদের কাছে তুলে ধরতে চান, কিন্তু তাতেও বেশ ভুল বোঝাবুঝি হয়। যখন তাঁর মনের অবস্থা অত্যন্ত বিচলিত, তখন তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নেন এবং এতে মানসিক শান্তি ফিরে পান। বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বৈষ্ণব ভক্তিমার্গে ফিরে গেছেন। বিপিনচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন 'এর মধ্যে (বৈষ্ণববাদ) এমন কিছুই নেই যা আমার দীর্ঘ জীবনের ব্রাহ্ম বিশ্বাসের বিরোধী। বিজয়কৃষ্ণ কখনও আমার বিশ্বাস অথবা বিবেককে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে বলেননি। তিনি কখনও অতিপ্রাকৃত শক্তির কর্তৃত্ব দাবি করেননি। ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শে আমার যে বিশ্বাস আছে তা তিনি কখনও পরিত্যাগ করতে বলেননি।' মনে রাখা দরকার, এর পরেও বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি রূপে বিলেত ও আমেরিকায় প্রচার করেন, মাদ্রাজ ও অন্ধ্রে প্রচারকরূপে কাজ করেন (১৯০১/০২) এবং ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের আচার্যরূপে কাজ করেন (১৯০২-০৪)।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক মঞ্চেও তাঁর ভূমিকা ছিল ক্রমবর্ধমান। ১৮৯১-৯২ সালে মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি সংক্রান্ত Age of Consent Bill নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছিল এবং বিপিনচন্দ্র তাতে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেন। এক রাতে তাঁকে লক্ষ করে গুলি ছোঁড়া হয় কিন্তু ভয়ে সরে আসা তাঁর ধর্ম ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৮৯২ সালে Age of Consent Bill পাশ হয়। সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং ১৮৮৯, ১৮৯৬, ১৮৯৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। ১৮৮৯ সালে এক বক্তৃতায় বলেন 'The War cry of modern India is representative government'। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবি এই প্রথম।

১৮৯৮ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে Unitarian Association-এর বৃত্তিতে দু'বছরের জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। এই বৃত্তিতে তাঁর অক্সফোর্ডের 'নিউ ম্যাঞ্চেস্টার কলেজ'-এ পাঠগ্রহণ করার কথা। সেখানে অধ্যক্ষ ছিলেন ডা. ড্রামন্ড, আর উপাধ্যক্ষ ডা. কার্পেন্টার। পাঠগ্রহণ করার বাইরে তিনি সারা ব্রিটেন ঘুরে ব্রাহ্মসমাজ, একেশ্বরবাদ ও মাদকতা নিবারণের ওপর বক্তৃতা দেন। তখন তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশ মাদকতা নিবারণী সভার সভাপতি ডব্লু এম কেইন-এর যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়। বছরের শেষে তিনি বৃত্তি ত্যাগ করে মাদকতা নিবারণ ও ভারতের জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন। আনন্দমোহন বসুও তখন বিলেতে যান এবং তাঁরা যৌথভাবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করেন। দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হলে বিপিনচন্দ্র বক্তৃতায় ব্রিটিশ নীতির বিরোধিতা করেন। লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হলে তাঁর উদ্দেশে Times পত্রিকায় দুটি খোলা চিঠি লেখেন। তা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে তিনি মার্কিন মাদকতা নিবারণী সংস্থার আমন্ত্রণে পাঁচ মাসের জন্য আমেরিকা সফরে যান। সেখানে যুগপৎ গণতন্ত্রের খোলা হাওয়া আর বর্ণবিদ্বেষজনিত অত্যাচার নিজের চোখে দেখেন। নানান জায়গায় বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ম্যাকিনলের সঙ্গেও তিনি আলোচনার সুযোগ পান। তাঁর একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের ভাষায় :

> 'My first acquaintance here was a gentleman who had been an inmate of this hotel for many years. As soon as I arrived, the manager of the hotel asked me if I would like to go to my room first or meet a

gentleman who had been waiting to see me from the time my steamer was signalled. Naturally, knowing that he must have left his business for three or four hours with this object, I asked the manager to immediately take me to him. He was waiting in the reading room of the hotel. As soon as I entered he got up and putting forward both his hands gave me a most cordial greeting, saying: "You come from a great country; Sir; you are a representative of a great nation, who are destined to be the teachers of the world." This enthusiastic greeting almost took my breath away. ...(but)..he openly condemned propaganda, saying that my place was not in America but in my own country, where I must work for the emancipation of my people to qualify them for discharging their mission as teachers of the modern world. He told me that with a view to discharge this great mission, we people of India, must be able to "look civilised humanity horizontally into the face". The expression struck me as original. He explained himself by adding that the world would not receive its lessons, however true or lofty these might be, from a slave. Our first duty therefore was to work for the liberation of our country from the British Yoke. Untill we have achieved this, we had no business in America.'

এ কথায় বিপিনচন্দ্র অত্যন্ত প্রভাবিত হন।

১৯০১ সালে দেশে ফিরে তিনি New India নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আরম্ভ করেন। এর ঘোষিত লক্ষ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদ ও জাতীয়তাবাদ। পত্রিকাটি ৬ বছর চলে, চিত্তরঞ্জন ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে একজন। এর প্রথম সংখ্যায় বিপিনচন্দ্র লেখেন :

'This New India is neither Hindu, though the Hindu unquestionably forms the original stock and staple of it; not Mahomedan, though they have made very material contribution to it; nor even British, though they are politically the masters of it now—but it is made up of the varied and variable materials supplied in successive stages of its evolution, by the three great world civilizations, which the three great sections the present Indian community represent.'

এর বিভিন্ন সংখ্যায় দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সমস্যা নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিন্তু তখনও তিনি ছিলেন নরমপন্থী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপরে তাঁর বিশ্বাস তখনও টলে যায়নি, তাই লিখলেন :

'Nor is the realisation of our highest national destiny, necessarily, in any way, inconsistent with the realisation of the highest ideals of the Empire, of which we form so large and so vital a part. Though so far, in many respects, kept out of our legitimate heritage, we too, Sir, are children of the British Empire, and are therefore loyal to its highest and purest interests'

Composite Patriotism প্রভৃতি জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ সম্পর্কে নানা তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করেছিলেন এই পত্রিকায়। ১৯০৭ সালে এই সব নিবন্ধের সংকলন করে The New Spirit নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর প্রথম রাজনৈতিক তত্ত্বের বই। এর ভূমিকায় তিনি বলেন (মার্চ ৪, ১৯০৭) :

'This new National Movement in India is essentially a Spiritual Movement. To regard it as either a mere economic or political movement is to misunderstand it altogether.

The Philosophy that stands behind it is the Philosophy of the absolute, the Philosophy of Brahman, as applied to the interpretations of man's social and civic life. It looks upon man as the Spirit of God incarnate, and views social and civic institutions as instruments and vehicles for the progressive revelation and realisation of God in and through man.'

কিন্তু ততদিনে নরমপন্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ পালটে যায় এবং তার পিছনে ছিল বঙ্গভঙ্গের মতন একটি ঘটনা। লর্ড কার্জনের বেশ কিছু ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই জাতীয়তাবাদীদের আঘাত করেছিল। এবার ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর রিজলে সাহেবের চিঠিতে বঙ্গভঙ্গের খসড়া প্রস্তাব দেওয়া হয়। কারণ অবশ্যই দেখানো হয়েছিল প্রশাসনিক সুবিধা, কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের ধারণা ছিল কারণটি রাজনৈতিক, কেননা 'Bengal united is a power; Bengal divided will pull several different ways'। এতে যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হল, জন-অসন্তোষ ফেটে পড়ল বাংলায়, পরে তা ছড়িয়ে গেল সারা দেশে। আন্দোলনের গোড়াতে নেতৃত্ব ছিল Surrender Not বলে পরিচিত সুরেন্দ্রনাথের হাতে, তিনি Bengalee পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'We object to the proposed dismemberment of Bengal and we are sure that the whole country will rise as a man to protest against it'

কিন্তু ক্রমশ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হয়ে দাঁড়ালেন বিপিনচন্দ্র। ১৯০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রাহ্মসমাজের এক সভায় তিনি বলেন :

'The conflict of opinions and ideals between the governing body and the governed, and the clash of interests between the members of the ruling race and the children of the soil, which were hardly pronounced then (i.e. 25 years ago), have become most serious and acute today'

New India পত্রিকার ভাষা শাণিত করে তিনি ঘোষণা করেন (ডিসেম্বর ২১, ১৯০৪) :

'The belief that England will of her own free will help Indians out of their long-established Civil servitude and establish those free institutions of Government which she herself values so much was once cherished, but all hope has now been abandoned.

'What India really wants is a reform in the existing constitution of the State, so that the Indians will govern themselves as other nations do, follow the bend of their own national genius, work out their own political destiny, and take up their own legitimate place, as an ancient and civilised people among the nations of the world.'

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই সময়েই চরমপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্ব এসে পড়ে 'লাল-বাল-পাল'— 'লোকমান্য' নামে পরিচিত বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০), 'পঞ্জাব কেশরী' লালা লাজপৎ রায় (১৮৬৫-১৯২৮) এবং বিপিনচন্দ্র পালের হাতে। তিনজনের বয়সও কাছাকাছি এবং তাঁদের ঐক্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। বজ্রমন্দ্র স্বরে তিলক ঘোষণা করেন :

'Good government is no substitute for self-government'

লাজপৎ রায়ের বিখ্যাত উক্তি :

'A subject people has no soul, just as a slave can have none...A man without a soul is a mere animal. A nation without a soul is only a herd of dumb driven cattle.'

বিপিনচন্দ্র তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে বললেন :

'Either no real self-government for us, or no real overlordship for them'।

১৯০৩ ও ১৯০৪ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হয়, কিন্তু তার কোনও প্রভাবই পড়েনি সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর। যত বঙ্গভঙ্গের দিন এগিয়ে আসে, তত রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে থাকে। সারা বাংলায় ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ২০০০টিরও বেশি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভা অনুষ্ঠিত হয়, বিপিনচন্দ্র সারা রাজ্যে এমনকী সারা দেশে ঘুরে বক্তৃতা দেন। ১৯০৫ সালের ৭ই অগস্ট টাউন হলে এই ঐতিহাসিক সভা আহ্বান করেন সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ। সে সভায় রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হন, ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত হয় এবং 'বয়কট'-কে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়। বিপিনচন্দ্র ছিলেন এই 'বয়কট' আন্দোলনের পুরোধা এবং 'পূর্ণস্বরাজ' দাবিরও প্রথম প্রবক্তা। আর একটি কথা আমরা প্রায় ভুলেই গেছি যে তাঁরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' বা National Council of Education, যে বীজ থেকে পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সুন্দরীমোহনের সঙ্গে National Medical College প্রতিষ্ঠার পিছনেও ছিলেন তিনি। যে-ছাত্ররা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিল তাদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য সমাবেশে বলেন :

'তোমরা মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা করেছ এবার পরীক্ষা দেবে না। আবার দ্বিধা করিতেছ কেন? আজ আবার তাদের মত জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমরা যখন প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তখন কোন্ নেতার হুকুমে করেছিলে? সেদিন গোলদীঘীতে যখন নিজেরা বলেছিলে, 'আমরা গোলামখানা ছাড়বো', তখন কার কথা শুনে বলেছিলে? ...আজ যদি এই 'রাজার মাঠে' দাঁড়িয়ে তোমরা দৃঢ় ভাবে বল 'আমরা এখানে দাঁড়ালাম, ওখানে আর যাব না, যেখানে To let লেখা হয়েছিল, সেখানে আর আমরা যাব না', দৃঢ়ভাবে একথা যদি তোমরা বলতে পার, তবে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হবেই হবে। অন্য পন্থা নাই। তোমাদের সঙ্কল্প দৃঢ় থাকে ত তোমাদের গরজেই হবে, তোমাদের স্বার্থত্যাগে হবে, তোমাদের স্বদেশ প্রীতিতে হবে, তোমাদের আত্ম-সম্মান জ্ঞানে হবে। যদি না হয় তবে জেনো তোমাদের স্বার্থপরতায় তোমাদের স্বদেশ প্রেমের ক্ষীণতায়, তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য হবে না।'

পান্তির মাঠে, পটলডাঙায় মল্লিকবাড়িতে, কলেজ স্কোয়ারে নানান সভায় বলেছেন বয়কট আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, আবার ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে এক বক্তৃতায় তাঁর অনুগামীদের বলেন :

'You cannot get any redress, my boys, but you will get a kick in return. I am surely for agitation—a big agitation—to foster the movement, but I am against sending any representation to Government. There is a simple truth in the affair. The English are a nation of shop-keepers. Wherever and whenever there is any difference about commerce, there is a war. Take, for instance, China and Burma. So in our case we are waging a war against the English because we are moving the Swadeshi agitation, which is an open outburst of commercial difference. The repressive measures of Government would thus be natural.'

ইতিমধ্যে অরন্ধন, রাখি উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে স্বদেশি আন্দোলন চালু থাকলেও বঙ্গভঙ্গ রূপায়িত হয়ে গিয়েছিল। তখন নরমপন্থীদের মুখপত্র অনেকগুলি পত্রিকা থাকলেও চরমপন্থীদের ছিল মাত্র একটি, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের *সন্ধ্যা* (১৯০৪)। *সন্ধ্যা* পত্রিকায় লেখা হয় 'ভিক্ষাবৃত্তি শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে...আমরা আর ফিরিঙ্গীর দাক্ষিণ্য চেয়ে মিথ্যা দম্ভ প্রকাশ করব না'। তখন বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* (নব পর্যায়) পত্রিকায় সম্পাদকীয় কাজকর্ম দেখেন। ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে এই পত্রিকায় তাঁর ১৮টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, সব কটিই স্বদেশি আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য

১৩১২ সনের আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের *রাজা ও প্রজা, বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা* ও *বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা* নিবন্ধগুলি। এর মধ্যে প্রথম প্রবন্ধটিতে বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন, 'এই সকল কারণে এখন আর প্রাচীন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে চলিবে না। ...ইংরেজের অনুকম্পার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে এখন আত্মশক্তি জাগ্রত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। ...মুক্তির অন্য কোন পথ নাই।'

এর সঙ্গে *সন্ধ্যা* পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যের মিল লক্ষণীয়। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন পুলিশি অত্যাচারে ভেঙে যায়। দেশ জুড়ে এর প্রতিবাদ হয় ও শেষ পর্যন্ত পূর্ব বঙ্গ ও অসমের ছোটলাট স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলার পদত্যাগ করেন। ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে নরমপন্থী-চরমপন্থী বিভেদ বহু কষ্টে আটকানো হয়। চরমপন্থীদের মুখপত্র হিসাবে বিপিনচন্দ্র নিজের উদ্যোগে মাত্র ৫০০ টাকা পুঁজি নিয়ে *Bande Mataram* পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন (অগস্ট ৬, ১৯০৬)। তাঁর অনুরোধে সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব নেন অরবিন্দ ঘোষ, অন্যান্য সহকারীদের মধ্যে ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। রাজা সুবোধ মল্লিকের সহায়তায় তাঁর ১২ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রাসাদোপম বাড়ির পিছনে একটি ছোট বাড়ি থেকে পত্রিকার কাজ চলত। এবার বিপিনচন্দ্রের লেখায় আলাদা ধার দেখা গেল :

> 'Our eyes have turned away from the Government house, from the House of Parliament, from Simla and Calcutta, and our faces have turned now to the starving, the naked, the patient and long-suffering 300 millions of our people, and in it, we see a new potency...and in the toiling, starving and naked populations of India, we find possibilities, potentials, germs that have given rise to the New Movement'

এখানে তিনি গণতন্ত্রের ভিত্তি বিস্তার করার যে কথা লিখেছেন, তা আরও স্পষ্ট করে লেখেন The Shell and the Seed নিবন্ধে (সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯০৬) :

> 'And the main objectives of the present agitation that has been got up all over Bengal is to gather up the forces of real democracy in the country, and organise these into a regularly constituted Party, built upon a thoroughly elective and representative basis. We are making an appeal to the country; we are calling up the masses everywhere, the common shopkeeper and artisan, the Musslman trader and Marwari broker and spwacar, —men who had rarely been invited before, to attend our meetings, and never, perhaps, had been called upon to pronounce their opinions up on important public questions. And who will dare contend, that the voice of a thousand men, are not more authoritative, in matters of this kind, than the often-times prejudiced and interested opinions of half-a-dozen successful lawyers? If the people are uneducated, how will they be educated if they are not allowed or invited to participate in the deliberations of their more educated fellow countrymen? If they are irresponsible, how can a sense of responsibility grow in them unless they are called upon to seriously discharge their public duties? They may commit mistakes, —who has ever attained wisdom except through repeated mistakes and failures? He, indeed, is not the wisest man who never made himself a fool. The basal principle of democracy is trust in the people, and respect for their opinion. "Our responsible" leaders have yet to cultivate these, and as long as they have not done so, they may ignore the voice of the people, but will never command or control their affections or their movements.'

এই পত্রিকাতেই বিপিনচন্দ্র তাঁর স্বাধীনতার চিন্তা স্পষ্ট করে লেখেন :

> 'Our ideal is freedom, which means absence of all foreign control. Our method is passive resistance, which means organized determination to refuse to render any voluntary or honorary service to the government'। আবারও লিখলেন,
>
> 'The time has come when, in the interest of truth and civic advancement and the freedom of our people, our British friends should be distinctly told that while we are thankful for all the kind things they have done for us already, the sacrifices they have made to make our lot easy and their yoke light, we cannot any longer be guided by them in our attempt at political progress and emancipation. Their point of view is not ceasing in any sense to be essentially British; we desire to make it autonomous, absolutely free of British control'

তা সত্ত্বেও এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বিপিনচন্দ্র পদত্যাগ করলে সে পদে আসেন অরবিন্দ। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি অরবিন্দের সহানুভূতি আর অহিংস পথে বিপিনচন্দ্রের অটল আস্থাই এই বিভেদের কারণ। অবশ্য এতে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনও ক্ষতি হয়নি। *বন্দে মাতরম্* এবং অরবিন্দ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন :

> 'The hand of the master was in it from the very beginning. Its bold attitude, its vigorous thinking, its clear ideas, its chaste and powervul diction, its scorching sarcasm and refined witticism, were unsurpassed by any journal in the country, either Indian or Anglo-Indian. ...It was a force in the country which none dared to ignore, however much they might fear or hate it; and Aravinda was the leading spirit, the central figure, in the new journal.'

আর অরবিন্দ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'The youngest in age among those who stand in the forefront of the Nationalist propaganda in India, but in endowment, education, and character, perhaps, superior to them all. Aravinda seems distinctly marked out by Providence to play in the future of his movement a part not given to any of his colleagues and contemporaries. The other leaders of the movement have left their life behind them: Aravinda has his before him. Nationalism is their last love : it is Aravinda's first passion.'

অন্যদিকে অরবিন্দ বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে বলেন, 'the prophet of a great political creed'।

ইংল্যান্ডে লিবারেল পার্টি ক্ষমতায় আসায় ও উদারপন্থী জন মর্লে ভারত সচিব নিযুক্ত হওয়ায় (১৯০৬) নরমপন্থী নেতারা আশান্বিত হন। কিন্তু প্রথমেই জন মর্লে বলেন বঙ্গভঙ্গ একটি 'settled fact' এবং কোনও কারণেই তাকে 'unsettle' করা যাবে না। আদতে নানা বিষয়ে মর্লের সঙ্গে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর মতানৈক্য হলেও তাতে জাতীয়তাবাদীদের কোনও সুবিধা হয়নি। ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের রাস্তা একেবারে আলাদা হয়ে যায়। বিপিনচন্দ্র তখন পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর তখন কটকে একটি বক্তৃতায় বলেন :

'All the provinces under direct British administration should form separate States, it may be according to nationality, with one Central Government like the United States of America. The Native States should also form separate States subject to the same authorities. There should be a President of the Indian Republic, who should exercise functions similar to those exercised by the President of the United States of America.'

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামোর স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন ১৯০৭ সালে। ওই সফরে মাদ্রাজে তিনি The New Movement, The Gospel of Swaraj, Swaraj : Its Ways and and Means, Boycott আর National Education শীর্ষক পাঁচটি বক্তৃতা দেন। হাজার হাজার মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। এ প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী লিখেছেন :

'Babu Bipinchandra Pal burst into full fame in Madras as a preacher of the new political creed. For several days on the sands of the beach, he spoke words hot with emotion and subtly logical, which were wafted by the soft evening breeze to tens of thousands of listeners invading their whole souls and setting them a flame with the fever of wild consuming desire. Oratory had never dreamed of such triumphs in India; the power of the spoken word had never been demonstrated on such a scale.'

সরকারি Sedition Committee Report ১৯১৮ সালে বলে 'An outburst of seditious activities followed upon the visit of Bipin Chandra and resulted in various trials in 1908'। সরকারি দমন-নীতি প্রয়োগ আরম্ভ হয় কঠোর হাতে। লালা লাজপৎ রায়কে ব্রিটিশ সরকার দেশান্তরী করে, সংবাদ পেয়েই বিপিনচন্দ্র তাঁর মাদ্রাজ সফর বাতিল করে কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর সম্বন্ধেও এরকমই কিছু ভাবা হচ্ছিল, কারণ লর্ড মিন্টো এক চিঠিতে বলেন, 'I do not think we should allow Bepin Chandra Pal to stump the country preaching sedition as he has been doing,'

ইতিমধ্যে সরকার Regulation of Meetings Ordinance, 1907, Prevention of Seditious Meetings Act, 1907, Explosive Substances Act, 1908 প্রণয়ন করেন ও Criminal Procedures Act ও Press Act সংশোধন করেন। প্রেস আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হয় *সন্ধ্যা, যুগান্তর* ও *Bande Mataram* পত্রিকার বিরুদ্ধে। সম্পাদক অরবিন্দর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে ডাকা হলে বিপিনচন্দ্র স্পষ্ট বলেন :

'I honestly believe that prosecutions like that of the *Bande Mataram* are calculated to stifle freedom of thought and speech in the country and interfere with the civil advancement of the people. Nor are they likely to promote the interests of the public peace. I have therefore conscientious objections to take any part in such prosecutions, This is why I declined to be sworn in or affirmed as a witness for the prosecution in the *Bande Mataram* case.'

এর ফলে অরবিন্দ বেকসুর খালাস পান কিন্তু আদালত অবমাননার দায়ে বিপিনচন্দ্র কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর কারাবাস সম্পর্কে *Bande Mataram* পত্রিকায় লেখা হয় :

'The country will not suffer by the incarceration of this great orator and writer, this spokesman and prophet of nationalism, nor will Bipin Chandra himself suffer by it. He has risen ten times as high as he was before in the estimation of his countrymen, and he will come out of prison with his power and influence doubled. Nationalism has already become the stronger for his self-immolation, and posterity will judge between him and the petty tribunal which has treated his honourable scruples as a crime'।

সময়টি দেশের জন্য খুব খারাপ ছিল—কারাগারে ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু, তিলককে অন্তরীণ করা এবং যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি গুপ্ত সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি ঘটনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়।

বক্সার জেল থেকে বিপিনচন্দ্র মুক্তি পান—১৯০৮ সালের ৯ই মার্চ। অরবিন্দ লিখলেন :

'Shall we not rather make the occasion one of universal rejoicing all over the country so that all may feel that the pulse of the movement is not slower, that the heart of this people beats as high as before the incarceration of their well-loved apostle and teacher'।

তাঁকে অভ্যর্থনা দেবার জন্য মতিলাল ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, আবদুল রসুল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতিকে নিয়ে সম্বর্ধনা সমিতি গঠিত হয় এবং সম্বর্ধনা সভায় তাঁকে জনগণের দান ৫০০০ টাকা সাম্মানিকী দেওয়া হয়। কলেজ স্কোয়ারে আরেকটি সভায় বিপিনচন্দ্র বলেন :

'Remember this that the struggle in which we are engaged just now, is calculated not only to secure the highest good to our own country or nation, but to further equally the universal ends of the race. We are fighting not for ourselves, not for India alone, nor even for Asia, but for England, Europe and the whole world. The issues of this struggle involve the emancipation of India and the salvation of humanity'

এর পরেই সারা বাংলা জুড়ে বিপ্লবী কার্যকলাপ আরম্ভ হয়ে যায় এবং মুরারিপুকুর বোমা মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখের অনুরোধে বিপিনচন্দ্র আবার কিছুদিনের জন্য সম্পাদকীয় দায়িত্ব নেন Bande Mataram-এর। তখন কিংসফোর্ড হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার পর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে লেখেন :

'Bande Mataram regards the Muzaffarpur bomb outrage as one of the saddest illustrations of evils resulting from the present political condition of the country. In fact it had not hesitated even to run the risk of sounding a timely warning to the bureaucracy that the inevitable result of their repressive policy would be to drive the forces of discontent underground'।

এর পরে Boycott not Antipathy—Isolation not Hatred প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদী অহিংস মতামত সম্পর্কে আরও স্পষ্ট করে বলেন :

'We have preached Boycott, we have advocated National Education, we have induced people to take the *Swadeshi* vow, all this is true; and we do not hesitate to accept our full share of responsibility for the real and rational results of these preachings...
The charge against us is that we have openly preached a gospel of racial hatred and animosity, and have tried to excite the feelings of the people against the Government in this country. We absolutely repudiate the truth of the first and the implications of the second part of this accusation. Ours has never been a message of hatred or antipathy. We have preached isolation from the foreigner it is true; but not hatred of him. We have asked people to avoid, so far as is possible, every association with him, but we have never asked or hinted that they should cultivate any feelings of enmity towards the alien administrators and exploiters of their country'।

১৯০৮ সালের অগস্ট মাসে তিনি শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মার আমন্ত্রণে বছরে ৪৫টি বক্তৃতা দেবার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তিন বছরের জন্য বিলেত যান। এই কৃষ্ণবর্মা India House চালাতেন, যাকে বলা হত 'hotbed of sedition'। তখন ইংল্যান্ডে ম্যাডাম কামা, সাভারকর, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবীরা ছিলেন। এঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলেও তিনি নানান বক্তৃতায় জাতীয়তাবাদ ও অহিংস পথের কথা বলায় তাঁরা খুশি ছিলেন না। India House-এ তিনি Indian Nationalism শীর্ষক তিনটি বক্তৃতা দেন, এতেও ওই একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯০৯ সালে তিনি Svaraj নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল 'The General Philosophy of Nationalism as a necessary element in the evolution of Universal Humanity'। এই পত্রিকায় তিনি Etiology of the Bomb in Bengal নামে একটি প্রবন্ধে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সমর্থন না করেও বলেছিলেন ব্রিটিশ দমন নীতির প্রত্যুত্তরেই এর উদ্ভব। এতে বিপ্লবীরাও খুশি হননি, ব্রিটিশ সরকারও না। ১৯০৯ সালে ইংল্যান্ডে মদনলাল ধিংড়া কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। তিনি Times পত্রিকায় একটি চিঠি লিখে হিংসার মতবাদের তীব্র নিন্দা করেন এবং কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেন। অর্থ সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, Svaraj পত্রিকাও বন্ধ হয়। তখন তিনি প্রবাসী ছাত্রদের জন্য Indian Student নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাও বেশিদিন চলেনি। তীব্র অর্থ কষ্টে পড়ে চিত্তরঞ্জনের সহায়তায় দেশে ফেরেন (১৯১১)। বিপ্লবীরা অখুশি হলেও বিখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক ডব্লু টি স্টেড তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :

'None of the Indian Nationalists who have come to this country of late years have left quite such a good impression upon my mind, for Mr. Pal while never abating in the least the fervour of his Nationalist aspirations, has a width of outlook and a well-balanced impartial judgment which is rare to find in any man, let alone in a nationalist who has suffered imprisonment for his cause.'।

১৯১১ সালের শেষে দেশে ফিরেই তিনি Etiology of the Bomb in Bengal, প্রবন্ধের জন্য কারারুদ্ধ হন, অবশ্য তিনি দায় স্বীকার করায় শাস্তি কিছুটা কম হয়। তখন তিনি বেশ নিঃসঙ্গ ও প্রায় চার বছর তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেননি, লেখালেখি করে কাটিয়েছেন। তাঁর কারাবাসের

অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন *জেলের খাতা* আর ভক্তিমার্গ ও কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে লেখেন Soul of India, আর Shree Krishna। Hindu Review নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি অবশ্য কোনও অর্থেই সঙ্কীর্ণ হিন্দু প্রচারবাদী পত্রিকা ছিল না, এতে জাতীয়তাবাদী বহু প্রবন্ধ প্রকাশ পায় ও তার একটি সংকলন Nationality and Empire নামে প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে তিনি চিত্তরঞ্জনের *বিজয়া* ও *নারায়ণ* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘদিন। সেখানে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কোনও কোনও প্রবন্ধে রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচনা ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। এদিকে তিলক মুক্তি পান, ওদিকে গোখলের মৃত্যুতে নরমপন্থীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তিলক ও অ্যানি বেসান্ট আয়ার্ল্যান্ডের ধাঁচে 'হোম রুল লিগ' প্রতিষ্ঠা করেন। বিপিনচন্দ্রও তাতে যোগ দেন। ১৯১৬ সালের লখনউ কংগ্রেস অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র দাঁড়ান তিলকের পাশে, একটা নরমপন্থী-চরমপন্থী ঐকমত্য হয় এবং ঔপনিবেশিক কাঠামো পরিবর্তন করে ভারতকে স্বশাসিত ডোমিনিয়ন ঘোষণার দাবি জানানো হয়। বাধ্য হয়ে ভারত-সচিব মন্টেগু House of Commons-এ ঘোষণা করেন যে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনের সর্বস্তরে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি আর স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটানোই ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। তার পরেই বিপিনচন্দ্র ভারত-সচিবের কাছে এ বিষয়ে একটি স্মারকলিপি দেন—Memorandum on the Recent Declaration of Policy and the steps that should be taken in pursuance of it। ১৯১৭ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। এ প্রস্তাব আনেন সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁকে সমর্থন করেন তিলক, জিন্না ও বিপিনচন্দ্র। আলোচনা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র বলেন যে এর রূপায়ণে দেরি হলে 'আমরা বিরোধিতা ও বাধা সৃষ্টি করে সরকারের কাজকর্ম অসম্ভব করে তুলব' এবং আন্দোলনের পদ্ধতি হিসাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা বলেন। লক্ষণীয় যে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের দু'বছর আগেই তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা Passive Resistance-এর কথা বলেন। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে তিনি সারা দেশে দায়িত্বশীল সরকার বিষয়ক বক্তৃতা দেন—সেগুলি Responsible Government নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯১৭)। এদিকে ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে পূর্ব প্রতিশ্রুত অবস্থা থেকেও ব্রিটিশ সরকার সরে এসেছেন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকেরই তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। ১৯১৮ সালের ১১ই জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথের সুপারিশ সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন-বিপিনচন্দ্রের বিরোধিতায় প্রতিবেদন গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়নি। ওই বছর বিশেষ বোম্বাই অধিবেশনে প্রতিবেদন গ্রহণের সুপারিশ এলে তিলক-বিপিনচন্দ্র-অ্যানি বেসান্ট তার বিরোধিতা করেন, তবে শেষ পর্যন্ত ঐকমত্যের জন্য তা গৃহীত হয়। কিন্তু শাসন সংস্কার প্রস্তাবটি রূপায়ণের আগেই বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে দমন-পীড়নমূলক রাওলাট বিল গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধী দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেই ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ড (এপ্রিল ১০, ১৯১৯) ও সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে।

১৯১৯ সালের জুলাই মাসে বিলেতে লর্ড মেলবোর্নের পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে কংগ্রেস প্রতিনিধি দল পাঠায়, সে দলে ছিলেন তিলক ও বিপিনচন্দ্র। এ সময়ে বিপিনচন্দ্র নানা জায়গায় আমন্ত্রিত বক্তৃতা দেন, ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টি ও বিভিন্ন শ্রমিক সভার অধিবেশনেও যোগ দেন। 'শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস'-এও তাঁরা আমন্ত্রিত হন। ফিরে এসে তিনি The World Situation and Ourselves (১৯১৯) আর The New Economic Menace to India (১৯২০) এই বই দুটি প্রকাশ করেন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে চিত্তরঞ্জন আবার এই শাসন সংস্কারকে 'inadequate, unsatisfactory and disappointing' আখ্যা দেন, গান্ধীজি 'disappointing' বিশেষণে আপত্তি করলে তুমুল বিতর্ক হয়। ইতিমধ্যে Government of India Act পাস হয়ে গিয়েছিল ও ১৯২০ সালের শেষ দিকে আইন পরিষদগুলির নির্বাচন হবার কথা ছিল। ওই বছরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বিপিনচন্দ্র। তাঁকে সমর্থন করেন চিত্তরঞ্জন, জিন্না, মালব্য প্রমুখ নেতারা। তুমুল বিতর্কের পর বিপিনচন্দ্রের সংশোধনী ৮৮৪-১৮৮৬ ভোটে পরাজিত হয়। আবার নাগপুর অধিবেশনে বিষয়টি আলোচিত হলে বিতর্ক হয়। গান্ধীজির প্রস্তাব ছিল আইনসভা, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের; চিত্তরঞ্জন বলেন 'স্বরাজ অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে কাউন্সিলকে আমি ব্যবহার করতে চাই এবং এই অস্ত্রকে পরিপূর্ণ স্বরাজ অর্জনে প্রয়োগ করতে চাই।' শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষে সমঝোতা হয়ে যায় এবং আইনসভা বর্জনের প্রস্তাবটি বাদ দেওয়া হয়। নিঃসঙ্গ বিপিনচন্দ্র এই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত ছিলেন। নির্বিঘ্নে আইনসভা নির্বাচন হয়ে যায় এবং নরমপন্থী নেতারা অনেকেই সহজে জয়লাভ করেন।

বিপিনচন্দ্র তখন এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত The Democrat নামে একটি সাপ্তাহিক ও মতিলাল নেহরুর The Independent দৈনিক সম্পাদনা করছেন। এই পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন Non-cooperation নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক মতভেদের পর বিপিনচন্দ্র তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী মতিলালকে এক দীর্ঘ চিঠিতে ইস্তফা দেন।

এর পর ১৯২১ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। 'বরিশাল গৌরব' অশ্বিনীকুমার দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও বিপিনচন্দ্র সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। সভাপতির ভাষণে বিপিনচন্দ্র 'স্বরাজ' কথাটির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই গণতান্ত্রিক স্বরাজের পথ। গণতান্ত্রিক স্বরাজের ভিত্তিভূমি হবে ভাষা-ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত প্রদেশসমূহ। জেলাসমূহ হবে প্রাদেশিক যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার অঙ্গ এবং স্বায়ত্তশাসিত গ্রামীণ সমাজগুলি জেলাস্তরে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হবে। এই গ্রামীণ ভিত্তির উপরেই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সৌধ হবে'। এরকম সংজ্ঞা আগে কেউ দেননি, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অসহযোগ নীতির বিরোধিতাও করেন। দ্বিতীয় দিন প্রকাশ্য অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন তাঁর বিরোধিতা করে বলেন : 'But up till now they had not been able to understand the real meaning and significance of Swaraj...And this required 'tapasya' or culture of the soul. ...Let them not, therefore, now add qualifying phrases such as 'democratic', 'autocratic' to their ideal of Swaraj.'

বক্তৃতার শেষে দেশবন্ধু সোজাসুজি বলেন, অসহযোগ-বিরোধীদের উদ্দেশ্যে, 'They must stand alone in the world; they must rely on their own selves and on none else.'

শেষ দিনে তাঁর সমাপ্তি-ভাষণে আবেগ তাড়িত কণ্ঠে বিপিনচন্দ্র বলেন,

> 'You wanted magic. I tried to give you logic. But logic is in bad odour when the popular mind is excited, You wanted Mantram. But I am no Rishi and can not give Mantrams ...I have never tried to lead people in faith blind-folded...I never expected that all of you will agree with everything I said. Such agreement is neither possible nor desirable. ...But I never dreamt that there would be protest against my presentation of Swaraj. This protest coming from one who is the leader of the present movement in Bengal has given me the greatest surprise in my life... Conscience demands this practical protest against a tendency whcih I believe to be fatal to our future.'

কিন্তু একদিন যাঁর বাগ্মিতায় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রভাবিত হতেন, সেদিন তাঁর কথা শুনতে কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। বিপিনচন্দ্র একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। কতটা নিঃসঙ্গ তা পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পালের স্মৃতিচারণে ধরা পড়বে :

> 'বিপিনচন্দ্র বরিশাল থেকে কলকাতায় এলে বড় বড় জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রগুলি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা শুরু করে। ইংরাজি দৈনিক 'লিবার্টি'-র সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র। বরিশাল সম্মেলনের পর এই দৈনিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং তাঁর পরিবর্তে জীতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করা হয়। শুধু রাজনৈতিক জনসভা থেকেই নয়, এমনকি সাহিত্যিক ও ধর্মীয় জনসমাগম থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাঁর পুত্রদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বলা হয় যে নিরঞ্জন পাল ইংল্যাণ্ডে ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন এবং জ্ঞানাঞ্জন পাল বঙ্গপ্রদেশে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেছেন। জনমানসে বিপিনচন্দ্রের দেশপ্রেমিক ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য এ সমস্তই ছিল অবিমিশ্র কুৎসা'।

কংগ্রেস থেকে সরে এসে বিপিনচন্দ্র অন্য কোনও দলে যোগ দেননি। তবে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিজের খাতে বয়ে চলেছিল। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন চৌরিচৌরার ঘটনায় গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এতে দলে ব্যাপক অসন্তোষ হয় এবং চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ কংগ্রেস ছেড়ে 'স্বরাজ্য পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। চিত্তরঞ্জনের বারংবার অনুরোধে সে দলে যোগ দেননি বিপিনচন্দ্র, বরং ১৯২৩ সালের নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীরূপে স্বরাজ্য পার্টির নির্মলচন্দ্র চন্দ্রকে সহজেই পরাস্ত করেন। অবশ্য নির্বাচনে আইন পরিষদে স্বরাজ্য পার্টিই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। তবে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট হয়নি, ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক মৃত্যুর পর বিপিনচন্দ্র লেখেন :

> 'ভারতের কাছে তিনি ছিলেন একজন জাতির প্রতিনিধি। বিশ বছর যাবৎ আমার কাছে তিনি ছিলেন ভ্রাতৃপ্রতিম বা পুত্রপ্রতিম। আমার ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধু এবং জনজীবনে বিশ্বস্ত সঙ্গী। ...গত পাঁচ বছর যাবৎ লোকে আমাকে তাঁর প্রকাশ্য বক্তব্য ও নীতি-সমূহের নির্মম সমালোচক এবং অক্লান্ত বিরোধী বলেই জানে। কিন্তু তারা জানে না, যখন তাঁর বিরুদ্ধে তীব্রতম মন্তব্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি তখন প্রায় আক্ষরিকভাবে আমাকে হৃদয়ের রক্তে আমার লেখনী ডুবিয়ে নিতে হয়েছে'।

১৯২৬ সালের নির্বাচনে তিনি দাঁড়াতে রাজি হননি, কারণ হিসাবে বলেন, 'আমি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছি যে, আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। এর পরেই অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে হয় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অথবা জনস্বার্থের বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয় না'। প্রার্থীর রাজনৈতিক মতাদর্শ বড় কথা নয়, তাঁর পারিবারিক যোগাযোগ পেশাগত বন্ধুত্ব এবং জাতপাতের

মনোভাব নির্বাচকমণ্ডলীতে ভোটাভুটি নিয়ন্ত্রণ করে। তৃতীয়ত নির্বাচকের কাছ থেকে ভোট পাবার জন্য কত পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হবে তার উপর নির্বাচনী সাফল্য নির্ভর করে'। জনজীবনে কথা ও কাজের পার্থক্য আর নীতিবোধের অবক্ষয় দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে লখনউতে সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগদান তাঁর শেষ রাজনৈতিক উপস্থিতি।

রাজনীতি থেকে সরে এলেও সাংবাদিকতা ছেড়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। Liberty পত্রিকা ছাড়ার পর *সংহতি* নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিছুকাল, এ ছাড়া *বঙ্গবাণী, প্রবর্তক, নব্য ভারত* প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন প্রচুর (১৯২১-২৪)। সুরেন্দ্রনাথের The Bengalee পত্রিকা পরিচালনা করেছেন এক বছরের ওপর, সেখানে For My Readers নামে একটি কলম লিখতেন। *সোনার বাংলা* মাসিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আবার জীবনের শেষ দিকে Hindu নামে একটি সাপ্তাহিক সম্পাদনা করেছেন (১৯৩২)। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল Freedom and Fellowship নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের, কিন্তু সে সুযোগ আর পাননি। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির দরজা তাঁর কাছে বন্ধ হয়ে গেলে তিনি নিয়মিত The Stateman ও Englishman পত্রিকায় লিখতেন। এ থেকে তাঁর সামান্য অর্থাগম হত, কিন্তু এজন্যও তাঁকে বহু নিন্দা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে।

রাজনীতির মঞ্চ বন্ধ হয়ে গেলেও সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি কিছুটা স্বীকৃতি পান। ১৯২২ সালে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি ছিলেন প্রধান বক্তা, ঢাকার মানিকগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনে (১৯২৯) তিনি সভাপতিত্ব করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের পরিধি কিন্তু সত্যই বিস্ময়কর। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সাংবাদিক জীবনের ফাঁকে তাঁর লেখা ২২টি বাংলা ও ৩৬টি ইংরাজি বই প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য এর অনেকগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখার সংকলন। ইংরাজিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক লেখার অনেকগুলির আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত Beginning of Freedom Movement in Modern India (১৯৫৪) এবং Swadeshi and Swaraj সংকলন (১৯৫৪)। ভিন্ন স্বাদের ইংরাজি লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য A Brief Account of the Brahmo Samaj (১৯০০), The Soul of India (১৯১১), Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj in India (১৯২৬), Bengal Vaishnavism (১৯৩৩) এবং কেশবচন্দ্র, রামমোহন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখের জীবনী। তুলনায় বাংলায় তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে লেখা কম : *বঙ্গে নারীর নির্বাচনাধিকার* (১৯২১), *আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ* (১৯২২), এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত *রাষ্ট্রনীতি* (১৯৫৬) ও *নবযুগের বাংলা* (১৯৬৪)। শেষোক্ত সংকলনটিতে বাংলার পুনরুজ্জীবনের একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। এর বাইরেও *বঙ্গদর্শন, নারায়ণ, বিজয়া* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু অগ্রন্থিত লেখা ছড়িয়ে আছে। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অনেক নিবন্ধ আছে, তার কিছু কিছু *সাহিত্য ও সাধনা* (১৯৫৯/৬০) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। জীবনীসাহিত্যে বরাবর তাঁর আগ্রহ ছিল—ছোটদের জন্য লিখেছিলেন *সখা-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন* (১৮৮৭)। এছাড়া জীবনীমূলক নিবন্ধ লিখেছেন রামমোহন, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ, তিলক, সিস্টার নিবেদিতা প্রমুখের জীবন নিয়ে। এর কিছু কিছু সংকলিত হয়েছে *চরিত-কথা* (১৯১৬), Character Sketches (১৯৫৭), ও *চরিত-চিত্র* বইতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর আত্মজীবনী। আত্মজীবনী লেখার কৈফিয়ৎ হিসাবে লিখেছেন : '....কোন সমাজের ইতিহাসের সত্য মর্ম বুঝিতে হইলে সেই সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনের কথা জানিয়ে হয়। ইহাই আত্মচরিতের সার্থকতা। এই ভাবে যদি আত্মচরিত লিখিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহা লেখকের আত্মাভিমানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে পারে না। এইভাবেই নিজের জীবনস্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি।'

আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর দুটি আত্মজীবনীই অসম্পূর্ণ। *প্রবাসী* পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত *সত্তর বৎসর* (মাঘ, ১৩৩৩—বৈশাখ, ১৩৩৫) মাত্র ১৮৮০ পর্যন্ত ঘটনাবলির বিবরণ দেয়। তাঁর ইংরাজি আত্মজীবনী Memories of My Life and Times (প্রথম খণ্ড, ১৯৩২; দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৪) কেবল ১৯০০ পর্যন্ত ঘটনাবলির সাক্ষ্য বহন করে। মৃত্যুর মাত্র ১৫ দিন আগে তিনি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় স্বাক্ষর করলেও বইটি আর দেখে যেতে পারেননি। বিশুদ্ধ সাহিত্যের চর্চাও তিনি করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *শোভনা* ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর মূল সুর দেশাত্মবোধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এখানে বেশ স্পষ্ট। অন্য উপন্যাসটি *রাগের পথে* তাঁর পরিণত বয়সের রচনা, *সংহতি* পত্রিকায় ১৯২৪ সালে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁর কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন *সত্য ও মিথ্যা* নামে প্রকাশিত হয় (১৯১৬)। *বিশ্বভারতী পত্রিকা*-য় অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত লিখেছেন, ...'রচনাগুলি বিপিনচন্দ্রের চিন্তা

স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে। 'স্বাতন্ত্র্য' কথাটা আপেক্ষিক। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা প্রবন্ধ জাতীয় রচনার মধ্যে যে ধরনের চিন্তা মুখ্য হয়ে উঠেছে বিপিনচন্দ্র ঠিক তাকে অনুসরণ করেননি। তিনি নিজে একটি চিন্তার ভিত্তি গড়ে নিয়েছিলেন এবং যতদূর মনে হয় বিপিনচন্দ্রের বিশ্লেষণ শক্তির অসাধারণ মৌলিকতা সত্ত্বেও তাঁর মূল প্রেরণা ছিল বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সমাজ কল্যাণমূলক ভাবনারীতিতে। ...আধুনিক বাংলার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর পথনির্দেশকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।' ছোটদের জন্যও তিনি অনেক লিখেছেন—১৮৮৩ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে *সখা* পত্রিকায় ও ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে *মুকুল* পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা বেরিয়েছে। এর মধ্যে জীবনী, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস সবই আছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়লাখনির পটভূমিতে লেখা দীর্ঘ ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস *অজিতকুমার* আর *সখা*-য় প্রকাশিত (জুন, ১৮৮৩) *সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাস* প্রবন্ধটি। শেষোক্তটি বোধহয় কিশোরপাঠ্য পত্রিকায় প্রথম রাজনৈতিক আলোচনা। ১৯ শতকেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ছোটদের কবিতার বই *সচিত্র শিশুগাথা* (১৮৯৫), ও *সচিত্র বাল্য কবিতা* (১৮৯৮) এবং পাঠ্য বই *সুবোধিনী* (১৮৯২)। তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতারও হদিশ পাওয়া গেছে—এতে দেশাত্মবোধক কবিতা, চতুর্দশপদী কবিতা ও বৈষ্ণব ভক্তিমার্গপন্থী কবিতা আছে। এ ছাড়া তাঁর দুটি স্বদেশি গান ও চারটি ব্রহ্মসঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান সত্ত্বেও জীবন-সায়াহ্নে তিনি ছিলেন বন্ধু, অনুরাগী ও সহকর্মীদের দ্বারা পরিত্যক্ত, রাজনৈতিক জীবন ও সাংবাদিকতা থেকে প্রায়-বিচ্ছিন্ন। সঞ্চিত অর্থ ছিল না কোনওদিনই, দারিদ্রের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন মুখ বুজে কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দেননি। শেষ দিকে তিনি দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের ২০শে মে ৭৪ বছর বয়সে তাঁর পণ্ডিতিয়া রোডের বাড়িতে তিনি সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ পরলোকগমন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন স্ত্রী ভুবনমোহিনী, তিন পুত্র—নিরঞ্জন, জ্ঞানাঞ্জন ও প্রেমাঞ্জন এবং পাঁচ কন্যা শোভনা (নন্দী), ইন্দিরা (দে), লীলা (দত্ত), অমিয়া (দেব) ও বীণা (চৌধুরী)। শেষযাত্রায় তাঁর আত্মীয়স্বজন ছাড়া মাত্র ক'জন নিকট বন্ধুই শবানুগমন করেছিলেন। যাঁকে বলা হত 'স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিক' এবং 'বাংলার পুনরুজ্জীবনের মুখপাত্র' তিনি প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে বিশ্রাম পেলেন সেই ঈশ্বরের ক্রোড়ে যাঁর প্রতি তাঁর সমস্ত জীবন নিবেদিত ছিল। The Statesman পত্রিকা এ প্রসঙ্গে Democracy's ingratitude নামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে : 'Democracies are notoriously ungrateful. They use men to the utmost limit for their physical and mental power and discard them and throw them on the scrap heap.'।

প্রকৃত দেশপ্রেমিক রূপে তাঁকে স্মরণে রাখার জন্য তাঁর আত্মজীবনীর ভূমিকার এই ক্ষুদ্র অংশটুকুই যথেষ্ট :

> 'এ জগতে আসিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি ইহা সৌভাগ্যের কথা। আবার যদি এই সংসারে জন্মিতে হয়, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষেই জন্মিতে চাই, সুখ-সমৃদ্ধিশালী অন্য কোন দেশে জন্মিতে চাহি না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা। সর্বোপরি এই বাংলা দেশে এযুগে জন্মিয়াছি ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। মৃত জাতি কি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয় এযুগে এই বাংলা দেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি। এ পরম সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।'

গ্রন্থসূত্র :

১। *History of the Brahmo Samaj*—Sivanath Sastri. Sadharan Brahmo Samaj, 1911-12 (reprint 1933).

২। *আত্মজীবনী*—শিবনাথ শাস্ত্রী। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৯১৮ (শতবার্ষিকী সংস্করণ ১৯৮২)।

৩। *Memories of My LIfe and Times*—Bepin Chandra Pal. Vol. I-1932, Vol. II-1951 (Combined reprint UBS-PD, 2004).

৪। *Swadeshi and Swaraj*—Bepin Chandra Pal. Yugayatri Prakashan, 1954.

৫। *সত্তর বৎসর*—বিপিনচন্দ্র পাল। কলকাতা, ১৯৫১ (পুনর্মুদ্রণ কল্পন, ২০০৫)।

৬। Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj—Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee. Firma—KLM, 1958.

৭। *Studies in Bengal Renaissance*—National Council of Education. 1958

৮। *সাহিত্য ও সাধনা* (দুই খণ্ডে) বিপিনচন্দ্র পাল। কলকাতা, ১৯৫৯-৬০ (পুনর্মুদ্রণ সুপ্রিম, ২০০৮)।

৯। বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব—ভবতোষ দত্ত। *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ, ১৮৮০ শক (১৯৫৮)।

১০। বিপিনচন্দ্র পাল : স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিক—নির্মলকুমার বসু। *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ, ১৮৮০ শক (১৯৫৮)।

১১। *বিপিনচন্দ্র পাল—জীবন, সাহিত্য ও সাধনা*—শিবদাস চক্রবর্তী। কলকাতা, ?

১২। *বিপিনচন্দ্র পাল*—শিবদাস চক্রবর্তী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮১।

১৩। *ছোটদের লেখা*—বিপিনচন্দ্র পাল। পত্রলেখা পাবলিকেশন, ১৯৮৩।

১৪। *বিপিনচন্দ্র পাল*—সরলকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

১৫। The Political Ideas of Bipin Chandra Pal—Madan Gopal Sinha, Commonwealth Publishers, 1989.

১৬। Social and Political Ideas of Bipin Chandra Pal—Amalendu Prasad Mukherjee.?

১৭। History of the Freedom Movement in India (1857-1947)—S N Sen, 1997

১৮। Indian Political Thinkers—N. Jayapalan, Atlantic, 2003

১৯। Bipin Chandra Pal : Political Thinkers of Modern India —V. Grover, Deep and Deep, 1993.

২০। Bipin Chandra Pal : Selected Bibliography—Bijoy Dev, Sanskriti, 2001,

২১। বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—কমল চৌধুরী। দেজ পাব, ২০০৫।

২২। Curzon's Partition of Bengal and Aftermath—Sukharanjan Sengupta, Naya Udyog, 2006

২৩। India's Freedom Movement : Legacy of Bipin Chandra Pal—B.K. Bhattacharya, Deep and Deep, 2007

২৪। Bepin Chandra Pal : A Biography of His Visions and Ideas—V. Grover, Delhi, 1998.

নাস্তিকের গীতাঞ্জলি : কাব্যে এবং দর্শনে আবু সয়ীদ আইয়ুব

রণজিৎ দাশ

আবু সয়ীদ আইয়ুব রচিত অসামান্য গ্রন্থগুলির যে-কোনও একটি পৃষ্ঠা পড়লেই আমার মনে একটি নাছোড়বান্দা প্রশ্ন উঁকি দেয়। প্রশ্নটি এই যে আবু সয়ীদ আইয়ুবকে আমরা কী রূপে দেখব? একজন দার্শনিক রূপে, না একজন কাব্য-সমালোচক রূপে? অর্থাৎ একজন শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক, তাঁর কাব্যানুরাগ-বশত, কাব্য-সমালোচনার কর্মে ব্রতী হয়েছেন এবং কৃতী হয়েছেন, এ-ই কি আইয়ুবের সঠিক পরিচয়? না কি, একজন রসজ্ঞ কাব্য-সমালোচক, তাঁর কাব্য-তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, দর্শনচিন্তার প্রচলিত পরিকাঠামোর বিস্তৃত ব্যবহার করেছেন, এটাই তাঁর সঠিকতর পরিচয়? এই মৌল ধন্দটি আমার মনে আনে একটি দার্শনিক প্যারাডক্স-এর আভাস। সেই প্যারাডক্সটির আলোচনায় আমরা একটু পরে যাব। আপাতত যদি এই ব্যাপারটাকে একটু সহজভাবে দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে, আইয়ুবের লেখক সত্তার মধ্যে তাঁর কাব্য-সমালোচক-সত্তার এবং তাঁর দার্শনিক-সত্তার মিশ্রণ ঘটেছে, এবং সেই মিশ্রণটি একটি বিষম মিশ্রণ। কারণ ভাব এবং যুক্তির মিশ্রণ, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে, সর্বদাই বিষম। এই মিশ্রণের ফলে কাব্য-সমালোচক আইয়ুব অনেকাংশে লাভবান হয়েছেন, কিন্তু দার্শনিক আইয়ুব সর্বাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁর কাব্য-আলোচনার পাতায় পাতায় এই লাভ-ক্ষতির দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। আমি একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিই। 'পথের শেষ কোথায়' গ্রন্থটির নাম-প্রবন্ধে আইয়ুব রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতাটির ব্যাখ্যা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন সেই বিখ্যাত পঙক্তিটির : 'তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর,/এখনই অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।' এই ব্যাখ্যানে আইয়ুব বলেছেন, 'আমার প্রশ্ন হচ্ছে; সারাদিন উড়ে কবি-বিহঙ্গ তো অনেক কিছুই দেখেছে, সে-সব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বিহঙ্গকে অর্থাৎ নিজেকে (কবি) 'অন্ধ' বলছেন কেন? ...'অন্ধ'-এর অর্থ কি তবে এই যে জন্মসূত্রে পাওয়া পশুসুলভ অন্ধ প্রবৃত্তিগুলি মনুষ্য দেহমনকে এখনও আঁকড়ে রেখেছে, আমরা তা ছাড়িয়ে উঠতে পারিনি বেশি দূর? দ্বিতীয়ত, জাগতিক নিয়মকে ন্যায়ের রাজ্য বলা যায় না এখনও। কোনোদিনই বলা যাবে না হয়তো, কারণ নিয়মের রাজ্য (natural order) এবং নীতির রাজ্য (moral order) ভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপার, পরস্পর বিরোধী না হলেও পরস্পর নিরপেক্ষ। বরঞ্চ বলা উচিত যে বিজ্ঞানীদের ঐকান্তিক সাধনার ফলে

নিয়মের রাজ্য যতোই আমাদের চোখের সামনে উদঘাটিত হচ্ছে এবং পূর্ণতর রূপ গ্রহণ করছে, আমরা ততোই নীতির রাজ্যের খণ্ডিত প্রকাশ দেখে ক্লিষ্ট হচ্ছি, হতাশায় ভেঙে পড়ছি। ...উষা থেকে বিকাল পর্যন্ত বিহঙ্গ যে-দিন পেরিয়ে এলো সেটা ছিল জ্ঞানের যুগ। তাঁর স্বাশ্রয়ী (intrinsic) মূল্য এবং বিশুদ্ধ আনন্দময়তা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করছেন না। তবে হতাশ বোধ করছেন জ্ঞানের সঙ্গে সার্বিক কল্যাণের অতি অপূর্ণ অন্বয় দেখে। সমন্বয় পূর্ণ হবে যে উষায় তারই প্রতি চেয়ে আছেন সব ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে। উষা-দিশাহারা আকাশের ঘনীভূত তিমির যেন শ্বাসরোধ করছে কবির।

কিন্তু মানুষের জ্ঞান কোনোদিন পূর্ণ হবে না, পরহিতৈষণাও সীমিতই থাকবে। জড়বুদ্ধি ও স্বার্থপরতা মানবত্বের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষ পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে অতি মন্থর গতিতে উত্থান-পতন-বন্ধুর পথে এগিয়ে চলবে, এর বেশি কিছু আশা করা যায় না। পশুত্ব যেমন মানুষকে নিচের দিকে ঠেলছে বা আটকে রাখছে, দেবত্ব তেমনি উপরের দিকে টানছে।'

'অন্ধ' শব্দটির মর্মোদ্ধারে আইয়ুবের এই উদ্ধৃত ব্যাখ্যার যুক্তি-পরম্পরার দুটি অংশ। প্রথম অংশটি দর্শনভিত্তিক এবং দর্শন-সম্মত, যেখানে আইয়ুব মানুষের 'জন্মসূত্রে পাওয়া পশুসুলভ অন্ধ প্রবৃত্তিগুলি'-র কথা বলেছেন, বলেছেন যে 'নিয়মের রাজ্য (natural order) নীতির রাজ্য (moral order) ভিন্ন পর্যায়ের ব্যাপার, পরস্পর-বিরোধী না হলেও পরস্পর-নিরপেক্ষ' (এটি একটি বিতর্কমূলক দার্শনিক মত, কিন্তু দর্শনচর্চার রীতিসম্মত), এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে ক্রমশই 'নীতির রাজ্যের খণ্ডিত প্রকাশ' দেখে আক্ষেপ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় অংশটি সম্পূর্ণ বিপরীত; এটি একটি দর্শন-বিগর্হিত, অতি-পুরাতন মেটাফিজিক্যাল বাণী, যে বাণীটি, আইয়ুবের ভাষায়, 'মানুষ পশুত্ব থেকে দেবত্বের দিকে অতি মন্থর গতিতে উত্থান-পতন-বন্ধুর পথে এগিয়ে চলবে, এর বেশি কিছু আশা করা যায় না। পশুত্ব যেমন মানুষকে নিচের দিকে ঠেলছে বা আটকে রাখছে, দেবত্ব তেমনি উপরের দিকে টানছে।'

—কী কাণ্ড! দার্শনিক আইয়ুব, দর্শনচর্চার Intellectual rigour-এ পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী আইয়ুব, যদি একবার সচেতনভাবে ভাবতেন যে তাঁরই কলম থেকে 'পশুত্ব নিচের দিকে ঠেলছে, দেবত্ব উপরের দিকে টানছে'—এ জাতীয় দুর্বল, অদার্শনিক ভাষা বেরিয়েছে, তাহলে তিনি নিশ্চিতই সঙ্কোচে শিহরিত হতেন; কিন্তু কাব্য-সমালোচক আইয়ুব এই বাণী এবং এই ভাষা বলে নির্বিবাদে পার হয়ে গেলেন, কারণ কাব্যের জগৎ যুক্তির নয়, ভাবের জগৎ, সেখানে এজাতীয় ভার্টিক্যাল ভাবোক্তির ছড়াছড়ি। কিন্তু এই দুটি নিতান্ত পরস্পর বিরোধী অংশের—দার্শনিক এবং অন্যটি ছদ্ম-দার্শনিক অংশের—সহাবস্থানে কী ঘটল? ঘটল এই যে, এর দ্বারা আইয়ুবের কাব্য-সমালোচনাটি একটি দার্শনিক উচ্চতা এবং মর্যাদা লাভ করল, সাধারণ পাঠকের চোখে দার্শনিক অংশটির দ্বারা ছদ্ম-দার্শনিক অংশটি যেন-বা প্রতিপন্ন হল(!), ফলত কাব্যপ্রেমীর মন 'পশুত্ব-দেবত্ব'-এর গৎ-বাঁধা আশাবাদে আবার অনুরঞ্জিত হল; পরিবর্তে আইয়ুবের প্রকৃত দার্শনিক সত্তা আত্ম-ভ্রষ্ট এবং মলিন হল। এককথায়, কাব্যের পূজায় দর্শনের বলি হল।

(প্রসঙ্গত বলি, আইয়ুব নিজেই বিশ্বের সমালোচনা-সাহিত্যের বহু প্রতিষ্ঠিত উক্তির অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধিতা শাণিত যুক্তিতে উদঘাটন করেছেন। একটি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত, তিনি তাঁর Poetry and Truth গ্রন্থের 'Emotive Theory and I.A Richards' শীর্ষক প্রবন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর সেই জগদ্বিখ্যাত দু'লাইনের কবিতার সংজ্ঞাটিকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন এই বলে, 'Wordsworth's full statement regarding poetry is : 'I have said that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings; it takes its origin from emotion recollected in tranquility.' It is unnecessary to point out that the second part of the statement contradicts the first.' এমনই ক্ষুরধার, অনায়াস, iconoclastic মনন ছিল আইয়ুবের।)

সুতরাং, এই প্রবল দর্শন-প্রেমী আইয়ুবের এক মুগ্ধ ভক্ত হিসাবে, এবং প্রবল দর্শন-বিরোধী বাঙালি জাতির এক অযোগ্য সন্তান হিসাবে, সভয়ে জানাই যে যদিও দর্শনে আমার জ্ঞান অত্যল্প, কিন্তু প্যাশন অত্যধিক। এবং আইয়ুবের প্রতিটি রচনার ছত্রে ছত্রে তাঁর দর্শনের প্রতি তীব্র প্যাশন টের পাই আমি, তাঁর মধ্যে এক গভীর সম্ভাবনাময় দার্শনিকের দেখা পাই এবং এ-ও বুঝতে পারি যে বিশেষ-কিছু রবীন্দ্রকাব্যে এবং রবীন্দ্রগানে তাঁর জীবনভর তন্ময় অনুরাগের কারণও হল সেইসব কাব্যে ও গানে সঞ্চারিত রবীন্দ্রনাথের নিজের দর্শন-জিজ্ঞাসার তীব্র প্যাশন। আমি স্পষ্ট বুঝি যে দর্শনের মাত্রায় এবং মুদ্রায় যাচাই না করে মানবমনের কোনও চিন্তা, কল্পনা এবং অনুভূতিকে আইয়ুব তাঁর চেতনালোকে গ্রহণ করতে অক্ষম; এতটাই সহজাত দার্শনিক কাঠামোয় তৈরি তাঁর মন। এজন্যই, রবীন্দ্রকাব্যের পূজায় আত্মবলিদানকারী দার্শনিক আইয়ুবের প্রতি আমার এত টান। এজন্যই, আমি অত্যন্ত বিষণ্ণবোধ করি, যখন পড়ি দর্শন-বিমুখ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এসে পড়ে এই কড়া

ধাতুর দার্শনিক মানুষটির নিঃসঙ্গতা ও দুর্দশার করুণ বর্ণনা। ‘পথের শেষ কোথায়’ বইটির ‘মুখবন্ধ’-তে তিনি লিখেছেন, ‘আমার বাঙলা শিক্ষায় আবার ছেদ পড়লো প্রেসিডেন্সি কলেজে Physics Honours পড়তে গিয়ে। ...আমি বরাবরই জানতাম যে দর্শনই হবে আমার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিষয়। ...(Physics M.Sc-তে) দুটো পেপার পরীক্ষা দেবার পরই আমাশয়ে প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়ে পরীক্ষাশেষ না করেই দর্শন বিভাগে প্রবেশ করলাম এবং পাশ করেই একটি গবেষণাবৃত্তি পেলাম; বিষয় নির্বাচন করলাম ‘content of Error in Perception and Thought’। বিষয়টি আমার খুবই মনোগ্রাহী ছিলো। কিন্তু আমার প্রথম অধ্যক্ষ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ তাতে কোনোই উৎসাহ দিতে পারতেন না; ...দ্বিতীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য আমার মনের মতন গুরু এবং নিঃসন্দেহে এ-দেশে নবযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, মৌল চিন্তার ক্ষেত্রে অতুলনীয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের Professors Room-এ বসে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্ভব ছিলো না, হলটা ছিল অধ্যাপকদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা। মাসে দু'মাসে তাঁর বাড়িতে যেতাম শ্রীরামপুরে, স্টেশন থেকে দু'মাইল পথ হেঁটে। যখন যেতাম তখন আমি ধন্য হয়ে ফিরতাম। ...এ দেশের দার্শনিক মহলে (আমি) সাড়া জাগাতে পারতাম হয়তো। কিন্তু এ-দেশে সে-রকম দার্শনিক মহল কোথায়? ...দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এ-দেশে সাম্প্রতিক দার্শনিক চিন্তা মুমূর্ষু, অন্তত জরাজীর্ণ।’ দর্শনচর্চার পরিমণ্ডলের অভাবে আইয়ুবের হতাশার এই বর্ণনাটি (যেটি বর্তমান উদ্ধৃতি-তে অতি-সংক্ষেপিত) পড়ে, আমার ইচ্ছা হয় সক্ষোভে আমি আইয়ুবকে বলি যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্য বিশ্বের সেরা মনীষীরা ছিলেন, কিন্তু বাঙালি দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্য তো আপনি ছাড়া কেউ ছিলেন না। কেন আপনি, রবীন্দ্রকাব্যে সম্পূর্ণ মজে না গিয়ে, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে আপনার দর্শন-আলোচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখলেন না? কী করে বাংলার জল-মাটি-কবিতার মোহ-ঘোর আপনার মতো দুর্জয় জ্ঞানান্বেষীকেও শেষপর্যন্ত দর্শনের মানমন্দির থেকে কাব্যের মায়াকাননে সরিয়ে নিয়ে গেল?

সকলেই বোধ করি আশ্চর্য হবেন কাব্যের বিপক্ষে এবং দর্শনের পক্ষে আমার এই আক্ষেপধ্বনি শুনে, কারণ আমি নিজে একজন কবি, এবং কবিদের দর্শনের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকারই কঠোর বিধান। কিন্তু কী করব, দর্শন আমার প্যাশন, এবং আমি মনে করি যে বাংলার কাব্য-উর্বর জল-মাটিতে হাজারে হাজারে বাঙালি কবি জন্মাচ্ছে ঝরে যাচ্ছে (আমিও সেই ক্ষণজীবীদেরই একজন), কিন্তু একজনও বাঙালি দার্শনিক জন্মাচ্ছে না, কিছুতেই না, এটা বাঙালি জাতির মতো একটি আধুনিক, মননশীল এবং সুশিক্ষিত জাতির পক্ষে এক চরম লজ্জার কথা। যে-জাতির মধ্যে নোবেল-জয়ী কবি এবং অর্থনীতিবিদ আছেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক প্রমুখ যশস্বী বিদ্বানেরা আছেন, সেই জাতির মধ্যে একজনও নামোল্লেখযোগ্য মৌলিক দার্শনিক নেই, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা নয় কি? সেজন্যই, যখনই আইয়ুবের লেখা পড়ি, তখনই মন খারাপ হয়ে যায়। কারণ তখনই দেখতে পাই একজন প্রবল সম্ভাবনাময় দার্শনিকের কাব্য-সরোবরে নিমজ্জন। আমি দেখতে পাই, কাব্য-সমালোচক হিসাবে আজ আইয়ুব যে অমর খ্যাতিমান, তার পিছনে—অর্থাৎ তাঁর কাব্য সমালোচনার অপূর্ব গুণবত্তার পিছনে—তাঁর দার্শনিক সত্তার গভীর অবদান। সেকারণেই আজ, দার্শনিক আইয়ুবের প্রতি সম্মান-জ্ঞাপনার্থে, বাঙালি জাতির কাছে আমার দুটি বিনীত প্রস্তাব আছে।

এক, কলেজ-শিক্ষার সকল বিভাগে, প্রথম বর্ষে দর্শন-পাঠ আবশ্যক হোক। একটি মনোজ্ঞ পাঠ্যগ্রন্থে দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃথিবীর প্রধান দর্শন-তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভের জন্য পরিবেশিত হোক। এবং দুই, ফিজিকস অনার্স-এ ভর্তির জন্য যে যোগ্যতামান নির্ধারিত আছে, ফিলজফি অনার্স-এ ভর্তির জন্যও সেই একই যোগ্যতামান নির্ধারিত হোক। অন্যথায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-এর সকল বিভাগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হোক, এবং বর্তমান ব্যবস্থায় দর্শন শিক্ষার নামে বাঙালিদের যে লজ্জাকর অ্যাকাডেমিক প্রহসন চালু আছে, তা চিরতরে বন্ধ হোক।

(২)

এবারে আসি কাব্য-সমালোচক আইয়ুবের কথায়, আধুনিকতার কথায়, এবং আধুনিক কবিতার প্রতি আইয়ুবের গভীর দার্শনিক বীতরাগের কথায়।

এই লেখাটির শুরুতেই আমি বলেছি যে আইয়ুবের দার্শনিক-সত্তা এবং কাব্য-সমালোচক-সত্তার দ্বান্দ্বিকতা আমার মনে একটি প্যারাডক্স-এর আভাস আনে। আমি দেখতে পাই, আইয়ুব যখন দার্শনিক, তখন তিনি সচেতন জড়বাদী; কিন্তু যখন তিনি কাব্য-সমালোচক, তখন তিনি বিনা দ্বিধায় ভাববাদী। এবং যেহেতু তাঁর কাব্য-সমালোচনা ছত্রে ছত্রে দর্শন-ভিত্তিক, সেকারণে তাঁর প্রতিটি লেখায় ভাববাদ-জড়বাদের বিষম বুনোটে আভাসিত তাঁর লেখক-সত্তার এই প্যারাডক্স।

এই প্যারাডক্সটির পূর্ণতম উদ্ভাসিত রূপ আমি দেখতে পাই আইয়ুবের 'গীতাঞ্জলি বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে। আমি দেখতে পাই যে এই প্যারাডক্সটি হল, সংক্ষেপে, একজন নাস্তিক দার্শনিকের আস্তিক কাব্যে গভীর অনুরাগের প্যারাডক্স। নাস্তিক দার্শনিক আইয়ুবের আস্তিক রবীন্দ্রকাব্যে গভীর অনুরাগের প্যারাডক্স। আসুন, আমরা আইয়ুবের নিজের জবানিতেই এই কূটাভাসটির বর্ণনা শুনি। উক্ত প্রবন্ধে আইয়ুব বলেছেন :

'এর (গীতাঞ্জলি-র) অধিকাংশ গান শুনে আমি মুগ্ধ হই, এমন-কি সুর বাদ দিয়ে শুধু কবিতারূপে পাঠ করলেও আমার মন গভীরভাবে সাড়া দেয়। প্রেমের অভিজ্ঞতা আমার নেই এমন কথা বলবো না। কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ক যে-কোনোপ্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বঞ্চিত। শব্দ (authority) প্রমাণ হিসেবে আমার কাছে একেবারে অগ্রাহ্য, শুধু অগ্রাহ্য নয়, অশ্রদ্ধেয়। এবং দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তার পথে-বিপথে যতো এগিয়েছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার ততোই ক্ষীণ হয়েছে; অবশেষে আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে বাল্যকালের পরম আশ্রয়দাতা, পরম কল্যাণময়, অনন্ত শক্তিধর, সকল দুঃখতাপহর কোনো বিশ্ববিধানকর্তাকে তো আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ যে ব্যক্তিস্বরূপ ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে আমার মনের প্রতিটি কক্ষে প্রবল প্রতিরোধ, সেই ঈশ্বরপ্রেমে আদ্যোপান্ত অনুরঞ্জিত কাব্যকে হৃদয়ে স্থান দিতে একটুও বাধে না। কেন বাধে না, এ-প্রশ্ন আমাকে তরুণ বয়স থেকে ভাবিয়েছে।'

এ-কথার একটু পরেই, প্রবন্ধটির মূল আলোচনায় প্রবেশের আগেই, আইয়ুব অকপটে জানিয়ে দিয়েছেন এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াসে তাঁর শেষ কথাটি, '...যে ঈশ্বরকে আমি কায়মনোবাক্যে অলীক বলে জানি, সেই ঈশ্বরভাবে ভরপুর কাব্যে মন কেন সাড়া দেয়? আমি পেশাদারি নিস্তাপ সাহিত্যিক বিচার বা ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কথা বলছি না...আমি বলছি কাব্যের সেই সংরক্ত আবেদনের কথা যাতে সমস্ত মন-প্রাণ মুচড়ে ওঠে। প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইনি সে-দিন। আজও তার উত্তর খুঁজছি। কিছুক্ষণের জন্য পাঠককেও সেই খোঁজার শরিক করে নিতে চাই।'

অর্থাৎ তাঁর নিজের বিচারেই, প্যারাডক্সটি অমীমাংসিত। কেবল ঘুরে-ফিরে এটির মীমাংসা সন্ধানেই তিনি ব্যাপৃত এবং বর্তমান নিবন্ধে তিনি পাঠককেও সেই সন্ধানের শরিক করতে আগ্রহী। আমরা, আধুনিক মানুষেরা, তন্মুহূর্তে তাঁর এই সন্ধানের শরিক হয়ে যাই, কারণ আমরা, আধুনিক মানুষেরা, নিজেদের চোখের পাতা ফেলার আগেই বুঝতে পারি যে এই প্যারাডক্সটি আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই জ্ঞানত-অজ্ঞানত কম-বেশি বিদ্যমান; যে কোনও মহৎ শিল্পের, মহৎ সৌন্দর্যের বা মহৎ ভাবের দ্বারা অভিভূত হলেই আমরা আমাদের মনের অন্তঃস্থলে এই প্যারাডক্সটির অস্তিত্ব টের পাই, এবং কিছুটা যুক্তি দিয়ে এটিকে বুঝতে চাইলে একটা মন-প্রাণ মুচড়ে-ওঠা অনুভূতির ধাক্কায় ঈষৎ বেসামাল হয়ে যাই। আইয়ুবের কৃতিত্ব এই যে তিনি তাঁর দার্শনিক মননের সজাগ স্বচ্ছতায় এই প্যারাডক্সটিকে, নিজের ব্যক্তিজীবনের সাক্ষ্যে, প্রশ্নাকারে, সূত্রবদ্ধ করলেন। একটি অতি-চেনা অথচ অতি-অচেনা স্ববিরোধকে—আধুনিকতার জন্মলগ্ন থেকে উদ্ভুত একটি স্ববিরোধকে কার্পেটের তলায় গুঁজে না রেখে অকপট স্বীকারোক্তিতে উত্থাপন করলেন। আমরা এই প্যারাডক্সটির নাম দিতে পারি 'নাস্তিকের গীতাঞ্জলি' প্যারাডক্স।

আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি, এই প্যারাডক্সটি, ব্যক্তিমানুষের বিশ্বদৃষ্টির ক্ষেত্রে, একটি কেন্দ্রীয় দার্শনিক প্যারাডক্স : নাস্তিকতার এবং আধ্যাত্মিকতার, জড়বাদের এবং ভাববাদের অবিরাম দ্বন্দ্বযুদ্ধে অভিব্যক্ত একটি রণ-ক্লান্ত, মহাকাব্যিক প্যারাডক্স। এবং আমার চোখে আইয়ুব এই পবিত্র দার্শনিক প্যারাডক্সটির এক শুদ্ধতম প্রতিমূর্তি। আলোচ্য প্রবন্ধে আইয়ুব নিজেই, তাঁর অনন্যসাধারণ ভাষায়, তাঁর এই প্যারাডক্সিক্যাল আত্ম-প্রতিকৃতিটির সুস্পষ্ট বর্ণনা করে গেছেন এই বলে :

'স্রষ্টা, বিধাতা এবং ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করা যদিচ আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু আমি কোনো অর্থেই জড়বাদী নই। মানুষের সমগ্র সত্তা শরীরবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ছকে কোনোদিন ধরা দেবে—এ-কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারি না। এমন-কি আমার বিশ্বাস, জড়জগতের একটা চিত্রমাত্র পদার্থবিজ্ঞানে অনুরেখনীয় ও অনুধাবনীয়। অর্থাৎ যদিচ বিজ্ঞান আমার চোখে অতীব শ্রদ্ধেয় ও প্রণিধানযোগ্য, তবু আমি ভুলতে পারি না যে, অনেকান্ত বিশ্বজগতের একটা অন্ত বা দিক-মাত্র বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত, বাকিটা ধরাছোঁয়ার বাইরে, অপার গভীর রহস্যে ঢাকা।' —বস্তুতপক্ষে তাঁর এই বিস্ময়কর ও বলিষ্ঠ আত্ম-ঘোষণা এই প্যারাডক্সটিকে ভাববাদ-জড়বাদের একটি অর্ধনারীশ্বর চোলা ব্রোঞ্জ-মূর্তির শক্তি, সৌন্দর্য এবং উজ্জ্বলতা দিয়েছে। প্রচলিত দর্শনের বিচারে আইয়ুব একজন স্বঘোষিত বুদ্ধিবাদী বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক; সুতরাং তিনি নিশ্চিতই জড়বাদী। কিন্তু তা-সত্ত্বেও তাঁর এই স্ববিরোধী আত্মঘোষণা আসলে প্রচলিত দর্শনের জড়বাদ ও ভাববাদের কক্ষ বিভাজনের (Compartmentalisation) বিরুদ্ধে এক মরিয়া বিদ্রোহ।

যাই হোক, যে-প্যারাডক্সটি আমাদের আলোচ্য, সেটির বিষয়ে আমি আইয়ুব-বিষয়ক অন্য একটি নিবন্ধে, বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। যেহেতু আইয়ুব সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্য এই প্যারাডক্স-ভিত্তিক, সেকারণে বর্তমান নিবন্ধেও পূর্বোক্ত নিবন্ধের কিছু কথার পুনরুক্তি অনিবার্য। এবং যেহেতু এই প্যারাডক্সটি আধুনিকতারই একটি ব্যাসকূট, সুতরাং আধুনিকতা বিষয়েও কিছু কথার পর্যালোচনা প্রয়োজন। এই কথা মূলত তিনটি। প্রথম কথা, আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে আইয়ুবের প্রধান যে-দুটি অভিযোগ, কাব্যভাষার স্বেচ্ছাচারিতা এবং অমঙ্গলবোধের মাত্রাধিক্য—সে দুটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা। কাব্যভাষার স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগটি অনেকটাই আইয়ুবের ব্যক্তিগত পক্ষপাত-নির্ভর, এটি কাব্যভাষার সহজাত প্রতীকধর্মিতা ('খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়'—এই পঙ্‌ক্তি কোনও আধুনিক কবির রচনা নয়), এবং নিত্যনব সৃজন-নিরীক্ষার প্রাথমিক সত্যটির দ্বারা নিষ্পন্ন নয়, সুতরাং এটির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বোদেলেয়ার-র‍্যাঁবো-মালার্মে-ভালেরি-এলিয়ট-রিলকে প্রমুখ আধুনিক মহারথীদের কাব্যভাষার নতুন, বিস্ময়কর সৃজনশীলতার শক্তিকে আইয়ুব ধরতে পারলেন না। কিংবা, 'ধরতে পারলেন না' বলা ধৃষ্টতা (কারণ আইয়ুবের মতো কাব্য-সংবেদী মন ক'জনেরই বা আছে), বলা উচিত, মানতে পারলেন না। এবং তাঁর এই মানতে না পারার প্রকৃত কারণ তাঁর দ্বিতীয় অভিযোগটি, অর্থাৎ আধুনিক কবিতায় অমঙ্গলবোধের মাত্রাধিক্য। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির 'পূর্বভাষ'-এ আইয়ুব বলেছেন, '(আধুনিক কবিতায়) জাগতিক অমঙ্গলবোধ বিষয়ে চেতনার অত্যাধিক্য—আমাকে অধিকতর পীড়িত করে। একজন পাশ্চাত্য সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, এ-যুগের (বোদেলেয়র-পরবর্তী যুগের) সাহিত্যের চারিত্র্য হচ্ছে 'an overwhelming consciousness of evil'; অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্যিকরা চারিদিককার দুঃখ ও পাপ সম্বন্ধে শুধু সচেতন নন, এই অমঙ্গলবোধ তাঁদের চেতনাকে অভিভূত করে রেখেছে। জগৎ ও জীবন বিষয়ে আনন্দ, আগ্রহ, শ্রদ্ধা, বিস্ময় এমনকি কৌতূহল পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গা জুড়েছে বোর্‌ডম, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বিবমিষা।' আধুনিকদের এই অমঙ্গলবোধের সর্বাত্মক বিরুদ্ধতাই ছিল আইয়ুবের সারা জীবনের দার্শনিক obsession এবং এই অমঙ্গলবোধের প্রথম মহাকবি বোদলেয়ার ছিলেন তাঁর সকল কাব্যতাত্ত্বিক আক্রমণের প্রধান প্রতিপক্ষ। এতটাই ছিল এই অমঙ্গলবোধের প্রতি তাঁর বিবমিষা, যে তিনি তাঁর 'Poetry and Truth' গ্রন্থে একটি প্রবন্ধেরই নামকরণ করেছিলেন 'Overwhelming consciousness of evil', এবং সেই প্রবন্ধে তিনি আধুনিকদের বিশ্ব-বিতৃষ্ণার বিপক্ষে বলেছিলেন এই কথা :

'The evolution of life from microbe to man, the evolution of man from *pithecus anthropus* to *homo Neanderthalensis* and from the latter to Buddha, Socrates, Jesus, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Gandhi and Einstein is fact and not fiction. Spontaneous biological evolution might possibly have come to an end, but purposive human evolution has just begun. Human life is a great adventure, threatened by heavy odds, but not utterly without hope or aim.' এখানেও আমরা দেখতে পাব সেই জড়বাদ-ভাববাদের বিষম বুনোট। দেখতে পাব যে আইয়ুবের এই দৃপ্ত বক্তব্যের প্রথম অংশটি—অর্থাৎ প্রথম বাক্যটি—একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক জোরালো দার্শনিক যুক্তি : গুহামানব নিয়ান্ডারথাল থেকে মহামানব আইনস্টাইন—সত্যিই তো ফ্যাক্ট : বিবর্তন-বাহিত এক অনন্ত রহস্যময় ফ্যাক্ট; কোনও কাঁচা কল্পবৈজ্ঞানিক ফিকশন নয়! কিন্তু তারপরেই এই বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি—Purposive human evolution এবং মানবজীবন-এর great adventure-এর অংশটি—নিতান্তই ভাববাদী সদুক্তি। আমি, আইয়ুবের এক মূর্খ কিন্তু ফাজিল ছাত্রের মতন, তাঁকে বলতে পারি যে, 'স্যার, আপনার দুটো কথার পিঠে আমার দুটো কথা। এক, নিয়ান্ডারথাল থেকে আইনস্টাইন মানে মোটামুটি সত্তর হাজার বছরের ইতিহাস। সেই সত্তর হাজার বছরের হিসাব থেকে আপনি মোটে সাতজন মহামানবের নাম খুঁজে পেলেন, তাঁদের মধ্যেও দু'জন—বুদ্ধ এবং যিশু—আবার ধর্মপ্রচারক, যে ধর্মের ধারণায় আপনার ঘোর অনাস্থা। দাভিঞ্চি সমকামী, শেকসপিয়র সম্পর্কেও একই কানাঘুষো, সুতরাং মানুষ হিসাবে দু'জনের কেউই খুব সুবিধের নন। গান্ধী মহান, কিন্তু চরম ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং গোঁড়া। তাহলে আপনার তালিকায় বাকি রইল দুই—সক্রেটিশ এবং আইনস্টাইন—দু'জনেই মানবজ্ঞানের দুটি মহামূর্তি। কিন্তু মাত্র দু'জনের (ধরে নিচ্ছি যে এই দু'জন মানে দু'শো বা দু'হাজার জন) এগজাম্পল দিয়ে কি অন্তত চল্লিশ হাজার বছরের হাজার হাজার কোটি হোমো স্যাপিয়েন্সদের জৈবিক জিঘাংসার এবং নীচতম স্বার্থবুদ্ধির শোষণ-ভিত্তিক সমাজধারা জাস্টিফাই করা যাবে? না কি একথা ভাবতে হবে যে অন্য প্রাণীদের তুলনায় কিছু বেশি-পরিমাণ ঘিলু-বিশিষ্ট মানুষ মূলত একটি ধূর্ত ও ধড়িবাজ প্রজাতি, যারা তাদের

ভাষা, হাত, হাতিয়ার এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে এতাবৎ যা-কিছু হাসিল করেছে তার মূলে রয়েছে হিংসা, হরর, হাহাকার এবং হেডোনিজম? এবং একথা মানতে হবে যে কিছু মুষ্টিমেয় মনীষীদের মহৎ অবদান, শেষ পর্যন্ত, এই প্রজাতির অসৎ আমোদের উপাদানেই পর্যবসিত।

দুই, দোষ নেবেন না স্যার, কিন্তু আপনি যে বললেন spontaneous biological evolution সম্ভবত শেষ হয়ে এসেছে—এই কথা আপনি কোথায় পেলেন, এই অনুমানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী? এবং আপনার 'purposive human evolution' কথাটিতে তো বের্গসঁ-র সেই বহুনিন্দিত 'creative evolution'-এরই সন্দেহজনক গন্ধ। আপনি নিজেই তো আপনার যৌবনকালের একটি সাড়া-জাগানো প্রবন্ধে ('বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি') বের্গসঁ-র এই Intellect বিদ্বেষী এবং intuition ধর্মী দর্শনকে প্রবল বৌদ্ধিক যুক্তির আঘাতে ধরাশায়ী করেছিলেন। এবং ওই যে বললেন, 'Human life is a great adventure' সেটা কার অ্যাডভেঞ্চার, এই অ্যাডভেঞ্চার-এর কর্তা কে? এটি কি ব্যক্তিমানুষের সচেতন ইচ্ছার (conscious will) কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য-অভিমুখী অ্যাডভেঞ্চার (এবং তার প্রজাতিগত অভিযাত্রা), না কি ক্ষুদ্র মনুষ্যজীবনকে ভিত্তি করে নিরাকার বিশ্ব-সত্তার নিরীক্ষামূলক অ্যাডভেঞ্চার? Will of the individual, will of the species, না will of the cosmos?

কিন্তু এখানে এসব কুতর্ক আমি তুলব না। কারণ আগেই বলেছি, আইয়ুবের রচনায় এই জড়বাদ-ভাববাদের বিষম বুনোটটাই আমার কাছে সেই পবিত্র প্যারাডক্স—যেটি একই সঙ্গে মানুষের জ্ঞান-চর্চার অন্তিম দ্বন্দ্ব এবং দিশা।

(এ জাতীয় নিবিড়-পাঠে একটি গুরুতর সমস্যা যেন-বা দৃষ্টিগোচর হয়। সেটি হল কাব্য-সমালোচনার ভাষার সমস্যা। খুব সংক্ষেপে সমস্যাটি এই : কাব্য ভাবলোকের বস্তু, সুতরাং সে তার নিজস্ব প্যাশন-এর ভাষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংসিদ্ধ। কিন্তু কাব্য-সমালোচনার ভাষা বুদ্ধিলোকের বস্তু—রিজন আশ্রিত; ফলে সেই ভাষা প্যাশনকে রিজন-এর মুদ্রায় ব্যাখ্যা-বিচার করার অন্তর্নিহিত ফ্যাসাদে প্রতিপদে বিপদগ্রস্ত। প্রায়শই দেখা যায় যে কাব্য-সমালোচনার ভাষা যতক্ষণ জ্ঞানলোককে সচেতনভাবে পরিহার করে সম্পূর্ণত ভাবলোকে এবং রসলোকে সংযুক্ত থাকে, অর্থাৎ গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করে, ততক্ষণ সেই ভাষা মোটামুটি এই সংকট-মুক্ত; কিন্তু ভাবলোকের আলোচনায় জ্ঞানলোককে টেনে আনা মাত্র বিপত্তি ঘটে। অর্থাৎ ওয়াল্টার পেটার পার পেয়ে যান, কিন্তু ওয়াল্টার বেঞ্জামিন হয়তবা ঠেকে যান। এই প্রসঙ্গটি একটি ভিন্ন প্রবন্ধের দাবি রাখে। আমি সূত্রাকারে এই সমস্যাটিকে এখানে উত্থাপন করলাম মাত্র।)

দ্বিতীয় কথা, আধুনিকতার সংজ্ঞা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আইয়ুবের মতো সংজ্ঞানিষ্ঠ দার্শনিকও তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এর বিস্তৃত পরিসরে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে আধুনিকতাকে আগাগোড়া আক্রমণ করা সত্ত্বেও, কোথাও আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি; বরং এ-কারণে সমালোচিত হয়ে, গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় খুব লঘুসুরে—প্রায় দার্শনিক আইয়ুবের পক্ষে বেমানান সুরে—বলেছেন, 'আধুনিকতার কোনো সংজ্ঞা দিইনি কেন, কোনো-কোনো সমালোচক ভর্ৎসনা করেছেন। সংজ্ঞা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিলো...(কারণ) 'আধুনিকতা'-র ধারণা স্বভাবতই গতিশীল, ধাবমান। সেকালের যৌবনমদমত্ত আধুনিকতা একালে লোলচর্ম, পলিতকেশ; আবার একালের ঝকমকে আধুনিকতা পঁচিশ, পঞ্চাশ কি একশো বছর পরে বেজায় সেকেলে হয়ে যাবে।' তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ দ্বিমত। বস্তুতপক্ষে গোটা গ্রন্থটি জুড়ে যে-আধুনিকতা ও তৎসঞ্জাত অমঙ্গলবোধ আইয়ুবের বিচার্য, সেই আধুনিকতা স্পষ্টতই আমাদের অতি-পরিচিত, রেনেসাঁস-প্রসূত আধুনিকতা—একটি ইতিহাস-নির্দিষ্ট স্থিরসংজ্ঞা-বিশিষ্ট আধুনিকতা—আমরা সকলেই যে-আধুনিকতার গর্বিত সন্তান। এই আধুনিকতা হল পাশ্চাত্য রেনেসাঁস-উদ্ভূত যুক্তিবাদ-জড়বাদ-বিজ্ঞানবাদ-নিরীশ্বরবাদ-মানবতাবাদ সংশ্লেষিত, এক আত্মগর্বী, ব্যক্তিবাদী আধুনিকতা। উক্ত গ্রন্থটিতে এই সংজ্ঞাটির উল্লেখ বিশেষ জরুরি ছিল। যাই হোক, এই বহু-স্তরিক, বহু-যৌগিক আধুনিকতার মূল ভিত্তি কিন্তু একটিই; সেই ভিত্তিটি আমার মতে, নাস্তিকতা। একজন আধুনিক মানুষ মানে একজন নাস্তিক মানুষ। যে-মানুষ নাস্তিক নন, তিনি, শেষ বিচারে, আধুনিক নন। কারণ ডারউইনীয় বিবর্তনবাদের মুষলাঘাতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মৃত্যু থেকেই আধুনিকতার জন্ম (যে কারণে, আমার বিবেচনায়, মানব-ইতিহাসে আধুনিকতার জন্মদিবস ১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর, যে-দিন ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিস' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ঘটল)। এবং এই আধুনিকতার বোধের একটি বড় প্রত্যয় হল বিচ্ছিন্নতাবোধ, 'ব্যক্তি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন'—এই বোধ, এবং সেই বোধের ফলে, নির্বিকার নির্মম বিশ্বের ভিতরে অসহায় ব্যক্তির বেঁচে থাকার বিপন্নতার বোধ, তার সদা-উদ্বিগ্ন চিত্তে অমঙ্গলে বোধ। এখন, একজন মানুষ একই সঙ্গে বিশ্ব থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধে বিশ্বাসী এবং বিশ্ব-স্রষ্টা মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাসী—এটা হয় না। সেজন্যই নাস্তিকতা হল

আধুনিকতার মূল জন্মবীজ, এবং তার অন্তিম পাসওয়ার্ড। সুতরাং আধুনিকতার দর্শন—যা মূলত হাইডেগার থেকে সার্ত্র অব্দি বিভিন্ন দার্শনিক প্রণীত নাস্তিক অস্তিত্ববাদের দর্শন—একথা মনে করে যে যেহেতু জগতে কোনও ঈশ্বর নেই, সেহেতু এই জগতের কোনও বিষয়গত মূল্য (objective values) নেই। এই অচেতন বিশ্বে সচেতন সদা-বিপন্ন ব্যক্তির বেঁচে-থাকা শুধুমাত্র তারই দায়। উৎকণ্ঠাই ব্যক্তির একমাত্র নিয়তি। এই বিশ্ব বিষাদময়। বৃহৎ নাস্তির ভিতর ক্ষুদ্র অস্তি-র বিষণ্ন বিনাশই একমাত্র জগৎসত্য। সেকারণে এই আধুনিকতার দর্শনে বিশ্বাসী মানুষদের মনে, আধুনিক কবি-শিল্পীদের মনে, এমন গভীর নৈরাশ্যবোধ, ডিস্‌এনচান্টমেন্ট অব দ্য ওয়ার্লড—বিশ্ব-বিতৃষ্ণা।

বলাই বাহুল্য যে আইয়ুব এই অস্তিত্ববাদী দর্শনের ঘোর বিরোধী। প্রাচীন দার্শনিকদের মতো তিনিও মনে করেন যে 'বিস্ময়ে দর্শনের সূত্রপাত : কবিতারও শুরু সেইখানে। ...মানুষ যে কেবল জৈবজগতের অধিবাসী নয়, অধ্যাত্মলোকেরও পরিব্রাজক, তারই অভিজ্ঞান রয়েছে এই শাশ্বত বিস্ময়বোধে। বিস্ময়বোধের অবলুপ্তিকে তাই আমি কাব্যের প্রগতি বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিত।' (অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা) আমরা লক্ষ করব যে বিস্ময়বোধের পক্ষে এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের বিপক্ষে আইয়ুবের এই দার্শনিক অবস্থানটি, বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক দর্শনের অন্তর্গত। এবং মজা এই যে বাস্তবতার বিচারে, আধুনিক দর্শনের বিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণাটির তুলনায় ক্লাসিক দর্শনের বিস্ময়বোধের ধারণাটি অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। কারণ, বিশ্বের উপাদানেই ব্যক্তি-প্রাণের সৃষ্টি, এবং বিশ্বের প্রতি মুহূর্তের দানেই সেই ব্যক্তি-প্রাণের পুষ্টি এবং তুষ্টি। সেই বিশ্ব থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন—এই ধারণাটি নিতান্ত অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক, এবং ভ্রান্ত। (এই প্রসঙ্গে, 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই যুগল-উক্তিই আমার কাছে দর্শনচিন্তার দুটি শ্রেষ্ঠ ধ্রুবপদ : ১। 'আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি আমার কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।'

২। 'আমি, কি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে, বিস্ময়ের অন্ত দেখি না।')

আধুনিকতার দর্শনে কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবোধটি প্রায় এক মরমি মাহাত্ম্যে উন্নীত। এই মাহাত্ম্যের বর্ণনায় আধুনিকেরা যে গালভরা দার্শনিক কথাটি ব্যবহার করেন, সেই existential angst বা আস্তিত্বিক উৎকণ্ঠা বস্তুতপক্ষে একটি narcissistic sentiment, জড়বাদী নাস্তিকের একটি ভাববাদী আত্ম-সর্বস্ব অভিমান মাত্র। এই অভিমান, আবারও বলছি, অবাস্তব, স্ববিরোধী এবং অবৈজ্ঞানিক। শুধুমাত্র এই অভিমানটির অবচেতনে, বিশ্ব-মাতার স্নেহলাভের জন্য ব্যক্তি-প্রাণের যে বালকোচিত আবদার, সেই আবদারটুকুই এই অভিমানটির সৌন্দর্য। এবং যে-মুহূর্তে বিশ্ব থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার এই ধারণাটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে নাকচ করা যায়, সেই মুহূর্তে আধুনিকতার 'বিপন্ন বিস্ময়'-এর ধূসর চশমাটি মানুষের চোখ থেকে খসে গিয়ে অপার রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তার বিশুদ্ধ বিস্ময়ের ক্লাসিক মুগ্ধদৃষ্টি ফিরে আসে। অর্থাৎ বিপন্ন বিস্ময় থেকে বিশুদ্ধ বিস্ময়ে ফিরে আসতে মানুষের দরকার শুধুমাত্র একটি স্বচ্ছ শর্ট-কার্ট বিজ্ঞানদৃষ্টির; কোনও অতিলৌকিকতার প্রয়োজন নেই। একারণে, আধুনিকদের 'বিশ্ব-বিতৃষ্ণা'-র দর্শনের বিরুদ্ধে আইয়ুবের দার্শনিক সওয়ালের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমি মুগ্ধ হই যখন এই সওয়ালের পাঞ্চলাইন হিসাবে আইয়ুব বলেন, 'দুঃখ ও পাপের যুগ্ম সত্তাকে ইংরেজিতে evil বলে অভিহিত করা হয়, তারই বাংলা করেছি অমঙ্গল। দর্শনশাস্ত্রে এবং ধর্মশাস্ত্রে প্রবলেম অব ঈভিল এক বহু প্রাচীন এবং আজো পর্যন্ত নাছোড়বান্দা সমস্যা। ইদানীংকালে তা সাহিত্যকেও পেয়ে বসেছে—ঠিক দার্শনিক সমস্যাটি নয়, জগতের মধ্যে অমঙ্গলের একচ্ছত্র আধিপত্য। দুঃখ ও পাপের মাত্রা আধুনিককালে আগের চেয়ে বেড়েছে কি না এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের উপর তার ছায়া যে অতিবৃহৎ আকার ধারণ করেছে তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। প্রতিবিম্ব বিম্বকে আয়তনে এবং বর্ণের কালিমায় বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস।' (অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা)। যুক্তি এবং বাস্তবতার বিচারে আইয়ুবের এই ধুরন্ধর পর্যবেক্ষণ একশোভাগ সঠিক, এবং এটি সকল আধুনিক কবিদের পক্ষে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। (যদিও এখানে আইয়ুবের 'অমঙ্গল'-এর সংজ্ঞাটির সঙ্গে, 'দুঃখ ও পাপের যুগ্ম সত্তাকে'-ই evil বা অমঙ্গল বলার সঙ্গে—আমি কিঞ্চিৎ দ্বিমত। কারণ আমার মতে মানুষের অমঙ্গলবোধ হল, প্রথমত এবং প্রধানত, এক অনির্দেশ্য অশুভের বোধ, এক অতিপ্রাকৃত ভয়ের বোধ। দুঃখ ও পাপের ধারণা দুটি বৌদ্ধিক ধারণা (intellectual concept), কিন্তু অমঙ্গলের ধারণাটি অতিলৌকিক ধারণা supernatural concept)। সুতরাং দুঃখ ও পাপের বোধ অমঙ্গলবোধের বৌদ্ধিক অংশ মাত্র, তার আধিভৌতিক আশংকার সবটা নয়, এই আমার বক্তব্য)। যাই হোক, একথা তো ঠিক যে, আধুনিক সভ্যতার হাত ধরে আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে, হয়ে চলেছে—জৈবিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সকল অর্থেই, সুতরাং এই উন্নতির ব্যস্তানুপাতে

আধুনিক মানুষের মন থেকে তো অমঙ্গলবোধের ধারণা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হওয়ার কথা। যদি তা না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও তার আত্মদর্শনের ভুল ঘটে চলেছে। কোথাও তার মনে অতিপ্রাকৃতের বোধ রয়ে গেছে। তাকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে। এবং যতই তার সুখ বাড়ছে, ততই তার পিঠে ভূতের কিল বাড়ছে। যতই তার মনে বস্তুগত সুখ বাড়ছে, ততই তার মনে ভাবগত শূন্যতা বাড়ছে। —এই আস্তিত্বিক প্যারাডক্স-এর ব্যখ্যা হবে কী প্রকারে? এখানেই, 'আধুনিকতা'-র পূর্ব কথিত রেনেসাঁস-উদ্ভূত সংজ্ঞাটির উল্লেখ জরুরি ছিল। কারণ, সেই সংজ্ঞাটির প্রেক্ষাপটে, আজ আমরা সবাই জানি যে আধুনিক মানুষের মনে এই ভাবগত শূন্যতার সংকট আসলে জড়বাদের এবং ব্যক্তিবাদের সংকট, বিশ্বাসহীনতার সংকট—নাস্তিকতার সংকট; অডেন-এর ভাষায়, এক 'vast spiritual disorder'। পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায়, আধুনিক যুগ এক 'এজ অব ডিসকন্টিনিউটি' (যেহেতু আধুনিক মানুষ তাঁর কাঁধ থেকে অতীতের বোঝা এবং ঐতিহ্যের দায় ঝেড়ে ফেলতে চায়); আধুনিক মন এক 'ডিসইনহেরিটেড মাইন্ড', এবং আধুনিক মানুষদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা 'মেটাফরস অব সাইলেন্স'। —এই সকলই আধুনিকতার ব্যাধি, আইয়ুব যেগুলির উল্লেখ বা বিবেচনা করেননি, করলে আধুনিক কবিরা হয়ত তাঁর কিঞ্চিৎ সমবেদনা উপহার পেতেন, কিন্তু তাতে তাঁর মূল ভর্ৎসনাটির সত্য কিছুমাত্র খারিজ হত না। সেই সত্যটি এই যে আধুনিকতার এক চূড়ান্ত জড়বাদী ব্যক্তিবাদী আস্তিত্বিক অভিমানে আধুনিক কবিদের আত্মজ্ঞান এবং বিশ্বদৃষ্টি প্রায়শই ব্যাহত এবং বিভ্রান্ত হয়েছে। একজন কবির বিশ্বদৃষ্টি, সর্বকালেই, দার্শনিক বিচারে যথাসম্ভব নির্ভুল হওয়া চাই, যে-কারণে একজন কবিকে, নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায়, একজন 'প্রোফাউন্ড ফিলজফার' হতেই হয়। আইয়ুবের সতর্কবাণী আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। দার্শনিক আইয়ুব নিজে এই জড়বাদী আধুনিকতার এবং একইসঙ্গে ভাববাদী আধ্যাত্মিকতার মতবাদ দুটির তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতার বিষয়ে কতদূর সচেতন ছিলেন, এবং এই সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠার উপায় বিষয়ে তাঁর মত কী ছিল, তার একটি সুচিন্তিত ও মূল্যবান বর্ণনা আমরা পাই Communion in Poetry প্রবন্ধে: 'We are unable sincerely to believe in either traditional religions or in scientific materialism which is supposed to have replaced them. The former leaves our intellect rebellious and the latter our emotions perturbed. This was the root of Goethes's objections to transcendentalism and positivism as mere abstractions. Not a reconcilliation of science and religion...but a reformulation of both religious and scientific outlooks is what is urgently needed today. Poets, theologians and phiolosophers have all to participate in this great adventure of the soul...'। বস্তুত এই সুস্থিত বক্তব্যটিই আইয়ুবের আদ্যোপান্ত দার্শনিক দোলাচলের একটি স্পষ্ট ভারসাম্য-বিন্দু। (এখানেও আমরা লক্ষ করব যে যতই তিনি ঈশ্বরভক্তি-বিরোধী হন, শেষ পর্যন্ত তিনি theologian-কে দল থেকে ছাড়লেন না।)

তৃতীয় কথা, অতিরিক্ত অমঙ্গলবোধ-এর অভিযোগ তুলে আধুনিক সাহিত্যকে আক্রমণ করতে গিয়ে আইয়ুবের দ্বারা শ্রেয়োনীতির মুদ্রায় আর্ট-এর বিচার। আইয়ুব নিজেই একটি স্মরণীয় প্রবন্ধে (শ্রেয়োনীতি ও সাহিত্যনীতি) বলেছেন, 'শ্রেয়োনীতির মেজাজকে সাহিত্যনীতিতে টেনে আনলে মর‍্যালিটি এবং আর্ট উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।' কিন্তু বোদেলেয়ার এবং তাঁর অনুগামী আধুনিক কবিদের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সেই দার্শনিক শ্রেয়োনীতির যুক্তিকেই টেনে এনেছেন।

তিনি লক্ষ করেননি যে এই সকল আধুনিক কবিদের কাব্যের মূলেও রয়েছে সেই একই বেদনাবোধ, যে-বেদনাবোধ রবীন্দ্রনাথের বহু অবিস্মরণীয় গানের মূলে; এবং যে-কারণে সেইসব গান তাঁর (আইয়ুবের) বিচারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রয়োজনীয় কথাও বলার যে, কাব্যরচনা, পদ্ধতিগতভাবেই, একটি সম্পূর্ণ ভাববাদী প্রক্রিয়া; এই অর্থে যে, কবি তাঁর মনের একাগ্র ভাব দিয়ে বাস্তবতার ভাবসত্য উপলব্ধি করেন, এবং সেই উপলব্ধিকে একটি যথাযথ, সদ্য নতুন রসোত্তীর্ণ ভাষায় কাব্যরূপ দেন। কবিতার রস মূলত ভাবরস। এই বিচারে, 'আধুনিক কবি' কথাটির মধ্যেই রয়েছে একটি স্ববিরোধ (যেটি আমাদের আলোচ্য প্যারাডক্সটিরই অংশ)—সেটি এই যে 'আধুনিক' বিশেষণটি যদি এই বোঝায় যে কবি তাঁর বিশ্ব-নিরীক্ষায় একজন যুক্তিবাদী জড়বাদী আধুনিক মানুষ, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সেই আধুনিক মানুষটি আর কবি নন। কারণ কবিতা নামক মাধ্যমটির সৃজন প্রক্রিয়ার বাধ্যবাধকতার কারণেই একজন কবি তাঁর কাব্যরচনাকালে সম্পূর্ণত ভাববাদী। এই ব্যাখ্যানুযায়ী, আমরা এতটাই বলতে পারি যে 'আধুনিক কবি' বলে কিছু হয় না। সর্বকালের সকল কবিই ভাববাদী কবি। এই ভাববাদী চারিত্র্যের কারণে কবিতার এবং আর্ট-এর জগৎ মূলত স্পিরিচুয়াল, ঠিক যেভাবে দর্শনের জগৎ মূলত ইনটেলেকচুয়াল। দার্শনিকের অভীষ্ট ট্রুথ; কবির অভীষ্ট :

ভিশন। ট্রুথ বিমূর্ত: যুক্তিময়, গণিতময়। ভিশন মূর্ত; প্রতিমাময়, গানময় এবং যেহেতু আর্ট-এর সৃজন প্রক্রিয়াটি স্পিরিচুয়াল, সেকারণে আর্ট তার ভাবাদর্শের স্বভাবগুণেই শ্রেয়োধর্মী, কোনও বাহ্যিক শ্রেয়োনীতির বিচার আর্ট-এর ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

এত কথার পর একটি ছোট্ট কথায় আমরা বলতে পারি যে আধুনিক কবিতা আইয়ুবের কাপ অব টি ছিল না। তার মোক্ষম প্রমাণ এই যে তাঁর রচনায় অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কোথাও বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রাণপুরুষ জীবনানন্দের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। যতদূর শুনেছি, তিনি এতটাই অপছন্দ করতেন জীবনানন্দের কবিতা।

অথচ আমার চোখে ভাববাদ-জড়বাদের যে পবিত্র প্যারাডক্সটির এক শুদ্ধতম প্রতিমূর্তি আইয়ুব, সেই প্যারাডক্সটিরই এক সার্থকতম উপলব্ধি উৎকীর্ণ রয়েছে এই জীবনানন্দের একটি কবিতায়; 'মাটির নিঃশেষ সত্য দিয়ে গড়া হয়েছিল মানুষের শরীরের ধুলো :/তবুও হৃদয় তার অধিক গভীরভাবে হতে চায় সৎ;' (প্রতীতী, সাতটি তারার তিমির)। 'মাটির নিঃশেষ সত্য'-কে অতিক্রম করে আইয়ুবের হৃদয়ও গভীরতরভাবে সৎ হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিল আজীবন। তাই, নাস্তিক দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও গীতাঞ্জলি-র আস্তিক কাব্যে আজীবন অভিভূত ছিল আইয়ুবের মন। কেন ছিল, তিনি সেই প্রশ্নের কোনও সঠিক উত্তর খুঁজে পাননি। আমরা এই প্রশ্নের কোনও চটজলদি উত্তর খুঁজব না, যতদিন না বিজ্ঞান কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তা তত্ত্বের মতো নানা প্রকার সম্ভাব্য তত্ত্বের সাহায্যে বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে, জড়বাদ এবং ভাববাদের মধ্যে একটি প্রকৃত সংযোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে। ততদিন পর্যন্ত আমরা, নাস্তিক জড়বাদী আধুনিকেরাও, আইয়ুবের মতো, মনে-প্রাণে গীতাঞ্জলি-র কাব্যে অভিভূত হয়ে থাকব। যাতে চোখে ব্যক্তিবাদের ঠুলি-পরা, অবৈজ্ঞানিক, অহং-সর্বস্ব আধুনিকতার দ্বারা আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি ব্যাহত না হয়; যাতে আমরা আইয়ুব-কথিত 'গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সোল'-এ পরম আগ্রহে অংশ নিতে পারি।

দিনের খুঁটিনাটি

ফারুক সালুম (১৯৪৮)

তার প্রথম ফুলটি ফুটিয়ে
নেমে আসছে নিঃসঙ্গ আলো
আমার বাড়ির জানলায়।
একে একে জাগিয়ে দিচ্ছে ঘড়িগুলিকে
চটপট খাইয়ে নিচ্ছে আমাকে সকালবেলাকার খাবার
তারপর চলে যাচ্ছে।

★ ★ ★

ওয়াগনের জানলার ওপর এক ঝলক আলোয়
পড়ে নিই সময়।
সে নিয়ে যাচ্ছে আমার যতকিছু কাজকর্ম
আর পারিবারিক দায়।
কাজেই ভেবে দেখো—
এক ঝলক আলোতেই আমার
দিন শুরু করে দেওয়া ভালো।

মনসুর

হামিদ সয়ীদ (১৯৪১)

যখন তার কথা মনে হয়, দেখতে পাই না তাকে।
যখন তাকে দেখতে পাই, স্মৃতি থেকে চলে যায় সে।
একটি ছেলে আর একটা ছড়ি।
ওটা ছিল কোন্‌টা? ছেলেটিকে আর ছড়িটিকে আমি
আলাদা করে দেখিনি। তারা একই।
আমি ওকে ডাকব যখন ও ফিরে আসবে এই সম্মোহক খেলায়।
একটি ছেলে আর একটা ছড়ি।
যখন স্মৃতি থেকে সরে যায়, আমি বলি
ও একটা সাময়িক ব্যাপার।

মহিমার ডালপালা

খজল আল-মাজিদি (১৯৫১)

খুশি হয়ে, আমি বলছি তোমায় :
নিজেকে নিয়ে এসো আমার কাছে,
সরিয়ে দাও আমার কাছ থেকে দূরে থাকবার মন
এসো কাছে।
চলে গেছে মন, নিভে গেছে সব আলো,
শুকিয়ে গেছে আমার ঠোঁটের আর গালের সব গোলাপ।
হুকুম করো :
যত মেঘ, আসুক সব;
যত রাজদণ্ড, লুটিয়ে পড়ুক তোমার পায়ে।
জ্ঞানের, আর
সর্বোত্তম সব গুণের
হে মহদাশয়—
কেন তোমাকে দেখছি এত দুঃখী, ভাবিত, বিপর্যস্ত?!
মেনে চলো,
আমার জেগে-ওঠা আলোয় মুগ্ধ করো তোমার চোখ,
ভুলে যাও সব ক্ষয়ে-যাওয়া সময়, আর চলে যাও।
ও আমার জাহাজেরা, ছড়িয়ে পড়ো ভালোবাসার সমুদ্রে
তার ঘাটে ঘাটে বুনে দাও আমার মহিমার চিহ্ন
আর শান্ত করো মন।
প্রভু, এসো আমার উন্মাদনার আগুনে,
আঁকড়ে থাকো আমায়
আবেগের কাছে গচ্ছিত রাখো হৃদয়,
হও বিমূঢ়, অলস
আর মেনে নাও...
তোমার মনকে তুলে নিচ্ছে একটা গহ্বর
অনেক উঁচুতে...

লাতাফা কাফে

আলি আল-হিলি (১৯৩১)

ক্লান্ত চড়ুইগুলি ঘুমিয়ে পড়ে সন্ধ্যায়
সারাদিনের কষ্টের কথা ভুলতে চায় তারা...
অসম্ভব এক ভালোবাসায় চুমুক দেবে ভেবে নীড় ছাড়ে তারা
আর শিশিরভেজা ঠোঁটে জ্বলে যায়, ঝরে যায়, কবিতা।

বাব-আল-মুয়াজ্জমকে ঘিরে-রাখা আমাদের কাঠের সাঁকো থেকে
তালবীথির মধ্য দিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে গুনে যাই পদক্ষেপ
আর খুঁজে বেড়াই একটা কোণ...কিচ্‌কিচ্‌-করা, ঢেকে-রাখা,
নিঃশব্দের ঘোর থেকে যেখানে মুক্তি দেয় প্রতিধ্বনি...
আর দেখো, লাতাফা কাফেতে ঝাঁক বেঁধেছে ঝকঝকে মুখগুলি।

আমার অক্ষরগুলি ঘুমিয়ে-পড়া
ক্ষত, প্রতীক্ষা করছে কোনো বিদায়ী হ্রেষার
উজ্জ্বল শপথের জন্য,
আর তারপর জেগে উঠছে, ফিরতে-থাকা কোনো জলচাকা আর
তৃষিত ভরতপাখির শব্দে...
আর ভোরবেলাকার ঘোড়া, ঘর দেখতে পাবার আগে।

আর হাসিমুখে ঘুমোয় শীতল অন্ধকার,
সবায়া-লেনের হাঁটাপথে
জবরদস্ত এক তলোয়ার। উল্লাসের স্বাদ শুষে নিচ্ছে ক্লান্তি;
এক বেগানা সরে যাচ্ছে নিস্তব্ধতায়, গরিমায়।

স্বপ্নগুলি আলোর চোখ ছেড়ে যাবার আগে
ভোরবেলা, অন্ধ, টেনে নেবে তার জিন।
মাতালের জন্য বাকি কেবল খাবার গল্প,
পাপে তলিয়ে যাবার আগে
এক লহমা আমরা লালন করছিলাম ভোরের স্বপ্ন।

মাছ

ফারুক ইউসুফ (১৯৫৫)

আমার রক্ষীরা হলো অন্ধ ঘাস,
উদ্‌ভ্রান্ত ময়ূর,
পচা আপেল খাবার লোভে উৎসুক ঘুঘু,
মেঘের প্রান্তে দিগন্ত থেকে ছড়িয়ে দেওয়া ধুলো।
রক্ষীরা আসে আর যায়
জলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে-যাওয়া তরুশাখার মতো।
আর আমি, একটা মাছের মতো
রক্ষীদের উপ্‌চে-পড়া ছায়ার মাঝখানে ঘুরতে থাকি।

কাচ

হুসেইন মার্দান (১৯২৭)

কাঁপছিল সে,
ভুরু ছিল একটু লীলাচপল,
সুখের আবেশে থরথর করছিল হাত।
‘এসো এসো...মনে রেখেছ এখনও’
স্তুতি ঘুরে আসে
তার মুখ থেকে আমারও মুখে।
ভিতরে ভিতরে জেগে উঠছিল একটা চিৎকার
মঞ্জুর-করা মধুর জন্য।
ক্ষতের ওপর নুন ছড়িয়ে দেবার মতো
আর সুন্দরীদের আঙুলে তুহিন জ্বালিয়ে দেবার মতো
বিস্তর বকবকানি ছিল আমার মুখে।
ঘাড় থেকে সে সরিয়ে নিল তার ওড়না :
ডানা-ছাঁটা কপোত।
তার গালের ওপর দিয়ে একদিন
বয়ে যায়নি বাতাস।
আর্তি কখনো চিরে দেয়নি তার স্তব্ধতা।
গোলাপের মধ্যে ধ্বসে-যাওয়া পরাগে যে অন্তর্লীন আগুন
বললাম তাকে সেই কথা :
খান্‌খান্‌ ভেঙে পড়ল তার ভিতরকার কাচ
আর সে নামিয়ে নিল তার হাত।

বিদায়

আলি জাফর উল্‌-আলাক (১৯৪৫)

কাল,
টের পেলাম সে চলে গেছে।
সকলেই যেমন যায়,
রেখে যায় শুধু বয়োভারে জমাট
একটা হৃৎপিণ্ড, আর একটা কবিতা
খড়ের কাছে যার আদর
        আর আচমকা হয়রানি
        আর নানান ঝঞ্ঝাট,
তার তাঁবুতে, আশ্রয় নেয়
চকোরেরা আর পাথরেরা।

★ ★ ★

এই রাতের পিছনে
ভালোবাসায় আকুল
একজন প্রেমিক।
        তার গান
        পাথর, তার শুকনো বিছানা
        একটা মরুভূমি;
        তার কল্পনা : একটা ধ্বংসস্তূপ
        যেখানে যাওয়া-আসা করে না কোনো নারী,
        কোনো রাখাল।
ধূসর একটা মরুভূমি আমার বিছানা
আমার হাত দুখানা : চাইছে পশম,
আর আমার চেতনার মধ্যে
        গানের ধ্বংসাবশেষ,
        এলোমেলো সব চড়ুই,
        আর নিঃসঙ্গ জল
        নিয়ে যাচ্ছে তাদের দূরে,
আবার ফিরিয়ে আনছে তাদের।
চলে যাচ্ছে দূরে,
তারপর থমকে যাচ্ছে,
তারপর দূরে চলে যাচ্ছে
        আমার বিছানা থেকে।

গ্রীষ্মের জন্য বিরাম

মা'দ আল-জুবুরি (১৯৪৬)

আরো একটা গ্রীষ্ম,
হালকা করে নিচ্ছে আমার স্বপ্নগুলি,
আমার হাসি।
আঠালো, মন্থর গ্রীষ্ম,
আর আমি, স্মৃতির জঙ্গলে জঙ্গলে দৌড়ে
ভাবছি, জড়ানো লতাপাতা পেরিয়ে, খুঁজে পাব
ভুলে-যাওয়া আদলের ঝল্‌মল্‌-করা
একখানা মুখ।

★ ★ ★

এর চেয়ে বেশিকিছু আর?
একটা টিকিট,
একটা পাসপোর্ট,
হিপিদের মতো কোমরে-জড়ানো একটা শার্ট,
একটা ব্যাগ।
এর চেয়ে আর বেশিকিছু,
দুনিয়ার মনোহর শহরগুলির চাবি থাকবে আমার পকেটে
কিংবা খোলা থাকবে আমার দুচোখে
সীমানাহীন আকাশ।
আর অজানা চমৎকার দেশগুলো?
কে তবে থামাল এই নদী?
কেন?
কিন্তু কেন?

★ ★ ★

আমার স্বপ্নগুলিকে হালকা করে-দেওয়া গ্রীষ্ম
বিদায় নিচ্ছে
তবে কি আমি বসে থাকব আরেকটা গ্রীষ্মের জন্য?

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার পরবর্তী ২৪ বছর ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্রে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশের অস্তিত্ব ছিল। দেশবিভাগের আগে এই জায়গাটির নাম ছিল 'পূর্ববাংলা'। পোশাকি নাম কিছু ছিল না—কেননা সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে ওইটিও ছিল 'বাংলা প্রদেশ' এবং বাংলার সামগ্রিক জীবনধারার সঙ্গে ওখানকার জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। ১৯০৫ সাল থেকে পরবর্তী ছ'বছর (১৯১১) ওই জীবনধারায় একটা ধাক্কা লেগেছিল—সেটা বাংলার ইতিহাসে 'লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ' হিসাবে চিহ্নিত ও স্মরণীয় হয়ে আছে। তবে ওই 'বঙ্গভঙ্গের' বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন এবং ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বঙ্গভঙ্গ' প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এবং অনেকটা সামাজিক প্রক্রিয়াও সূচিত হয়েছিল তা অনিবার্যভাবেই পরবর্তী ৩০/৩৫ বছরের ভারতীয় রাজনীতিকে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই সময়কালের মধ্যে বাংলায় একটি আলাদা 'মুসলিম রাজনীতি'র অভ্যুত্থান ঘটেছিল। ইতিহাসে এটাকে আমরা কতটা গুরুত্ব দিয়েছি জানি না—তবে এটা মানতেই হবে যে ওই সময়টাতে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির আধিপত্যের যুগ আরম্ভ হয়েছিল। এই ঘটনা এবং সেইসঙ্গে আরও বহু ঘটনাপ্রবাহের পরিণতিতে ব্রিটিশদের ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে বাংলাপ্রদেশ আবার বিভক্ত হল ১৯৪৭ সালের ১৪/১৫ অগস্টে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত Indian Independence Act মোতাবেক বাংলাপ্রদেশ ভাগ হল 'East Bengal and West Bengal' এই নামে—'East Pakistan' এই নামে নয়। ১৯৪৭-এর জুন মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যখন Indian Independence Act গৃহীত হয়েছিল তখন মূল আইনে এই বয়ান ছিল : 'ভারতীয় ভূখণ্ড ভাগ করে ২টি 'ডোমিনিয়ন' গঠিত হবে যার একটির নাম হবে 'পাকিস্তান' অপরটির 'ভারত' নামই থাকবে।' কিন্তু ওই আইনের তিন নম্বর ধারায় গঠিত Bengal Boundary Commission যখন বাংলাপ্রদেশ ভাগ করেছিল তখন কিন্তু 'পাকিস্তান' শব্দটি কমিশনের দলিলে একটিবারের জন্যও লেখা হয়নি। সব সময়েই বাংলাপ্রদেশের জেলাগুলির অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে East Bengal ও West Bengal কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। বলতে গেলে অনেকটাই যেন লর্ড কার্জনের 'Two Bengal' থিওরি—কার্জনসাহেব বাংলাকে ভাগ (১৯০৫) করলেও যেমন 'Eastern Bengal' ও Bengal নাম রেখেছিলেন ঠিক একই রকমভাবে ১৯৪৭ সালের Bengal Boundary Commission-এর চেয়ারম্যান Sir Cyril Radcliffe সাহেবও উভয় ক্ষেত্রেই যথারীতি 'Bengal' শব্দটি অব্যাহত রেখেছেন। এটা ইতিহাসের কোনও পূর্বাভাষ কি না জানি না।

আমি এই উপক্রমণিকাটি এজন্যই করলাম যে বাংলা ভাগ এবং পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্বের ২৪ বছর পরেও ওই পাকিস্তানি ভূখণ্ডে আবার সেই 'বাংলা' শব্দটি ফিরে এল সঙ্গে 'দেশ' কথাটি যুক্ত করে। এমনকী ১৮ অগস্ট ১৯৪৭, তারিখে অর্থাৎ 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র জন্মানোর চারদিন পরে যখন র‍্যাডক্লিফ কমিশনের তরফে 'দুই বাংলার' নয়া সীমানা নির্ধারণ রিপোর্টটি প্রকাশ করা হল তখন কলকাতার সকল ইংরাজি সংবাদপত্র ওই সংবাদটি প্রকাশের সঙ্গে এরকম হেডলাইনে জানিয়েছিল : 'APPEAL FOR ACCEPTENCE NEW BOUNDARIES Reminder by Primiers of Two BENGALS' এটা সম্ভবত অস্বীকার করা যাবে না যে 'বেঙ্গল' বা 'বাংলা' শব্দটির সঙ্গে ইংলন্ডের ঔপনিবেশিক ইতিহাস আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় রাইটার্স বিল্ডিংসে বাংলা সরকারের শেষ ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র-সচিব (তখন অবশ্য ওই দফতরের Additional Secretaryই দফতরের প্রধান ছিলেন) স্যার পি ডি মার্টিন (Sir P. D Martin, ICS) যুদ্ধকালীন সময় থেকে পরবর্তী সাত-আট বছরের বহু গুপ্ত গোয়েন্দা রিপোর্টসহ অসংখ্য প্রশাসনিক ফাইল ভারতীয় উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। ওই ফাইলগুলি পরবর্তীকালের যেসব

অফিসাররা কৌতূহল কিংবা রেফারেন্সের তাগিদেই হোক দেখেছেন, তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন সেই সময়কার বাংলার প্রশাসনে মুসলিম রাজনৈতিক আধিপত্যের অভ্যুত্থান। সাধারণত ওই ফাইলগুলি Confidential মার্কা নিয়ে স্বরাষ্ট্র দফতরের ডেপুটি-সেক্রেটারি হোম পলিটিক্যাল-এর (Home Political) প্রত্যক্ষ হেপাজতে রাখা হত। আমার খবরের কাগজের রিপোর্টার জীবনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ওই ফাইলগুলি। আমার এই আকর্ষণের কারণ ছিল প্রধানত একটাই। সেটি হল দেশবিভাগ কি বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অনিবার্য পরিণতি ছিল? আমার এই কৌতূহলের প্রধান শরিক বা সমজদার ছিলেন রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যিনি ১৯৬০ সাল থেকে রাইটার্স বিল্ডিংসে একটানা ছ'বছর ডেপুটি-সেক্রেটারি, হোম পলিটিক্যাল (Deputy Secretary, Home Political) ছিলেন। একটা ব্যক্তিগত পরিচয়ের জায়গা তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই ছিল। সেটা বড় কথা নয়। ওই দফতরে ওই সময়ে তিনি এমন একজন অফিসার ছিলেন যিনি এক মুহূর্তে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থাৎ পূর্ব-বাংলার ১৬টি জেলার ভূগোল বলে দিতে পারতেন। পশ্চিমবাংলার স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রশাসনে এমন একটা সময় ছিল বিশেষ করে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সময়কাল পর্যন্ত, যখন পূর্ব-পাকিস্তানে ভারতের ডেপুটি-হাইকমিশনার কে হবেন তা বিধানবাবুর সিদ্ধান্তের ওপর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারির পদটি ১৯৬১/৬২ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসারদের দখলে ছিল এবং ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগের ভারতীয় মাধ্যম ছিলেন পশ্চিমবাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের ডেপুটি-সেক্রেটারি, হোম পলিটিক্যাল—সে পদটিতে দীর্ঘদিন, ১৯৬৬ সালের শেষদিন পর্যন্ত, রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বহাল ছিলেন। জওহরলাল নেহরুর জীবন-সন্ধ্যার একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভুবনেশ্বরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে নেহরু বক্তৃতা করতে করতেই মাইক নিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। বিজু পটনায়ক তাঁকে জাপটে ধরে ফেলেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় ভুবনেশ্বর থেকে দিল্লি রওনা হওয়ার আগেই নেহরু জানতে পারলেন যে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র আবার সাংঘাতিক হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে (কাশ্মীরে হজরত বল মসজিদে রক্ষিত মহম্মদের পবিত্র কেশ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে)। নেহরু একটু সুস্থ হয়ে জানুয়ারির (১৯৬৪) মাঝামাঝি একদিন দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ফোন করে জানতে চাইলেন চট্টগ্রামে নেলি সেনগুপ্ত, ঢাকায় আশালতা সেন, ভবেশ নন্দী, কুমিল্লায় ধীরেন দত্ত, ময়মনসিং-এ মনোরঞ্জন ধর, রাজশাহিতে প্রভাস লাহিড়ীরা কেমন আছেন? প্রফুল্লবাবু নেহরুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই রথীন সেনগুপ্তকে ডেকে পাঠালেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা শেষ করে প্রফুল্লবাবু তাঁর স্বরাষ্ট্র দফতরের ডেপুটি-সেক্রেটারি রথীন সেনগুপ্তকে বললেন যে পূর্ব-পাকিস্তানের ওই সাবেক কংগ্রেস নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কেমন আছেন তা সম্ভব হলে আজকের মধ্যে না হলে অবশ্যই কাল নেহরুকে জানাতে হবে। স্বাভাবিক কূটনৈতিক সূত্র ছাড়াও পশ্চিমবাংলা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি জেলার সঙ্গে যেভাবেই হোক বিভিন্ন যোগসূত্র রক্ষা করত। এই গোপন সূত্রগুলি সম্পর্কে রথীন সেনগুপ্ত সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ওই উদ্বেগের কথা এবং অবশেষে তাঁকে ওই নেতাদের সম্পর্কে সঠিক সংবাদতথ্য জানানোর সংবাদটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। এই খবরটি প্রকাশের পর বিখ্যাত যন্ত্রসংগীতশিল্পী রাধিকামোহন মৈত্র আমাকে একদিন ফোন করলেন। রাধিকাবাবুরা রাজশাহি শহরের লোক। তাঁর বাবা কিছুতেই রাজশাহি ছেড়ে আসবেন না। তিনি মাটি কামড়ে সেখানে পড়ে আছেন। রাধিকাবাবু ফোনে প্রায় কেঁদে ফেললেন বাবার জন্য। আমি পরদিন রথীন সেনগুপ্তকে বললাম যে রাধিকামোহন মৈত্রের বাবার খবর এনে দিতে হবে। আমার কথা শুনে রথীনবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আরে রাধিকা মৈত্রের বাবার গায়ে কে হাত দেবে! রাজশাহি শহরে ওঁর বাবার বিরাট অট্টালিকা। সেই অট্টালিকার একাংশে ওই বুড়ো থাকেন। আর বাকি অংশটির ভাড়াটে জওহরলাল নেহরু অর্থাৎ ভারতের পররাষ্ট্র দফতর—বুঝলেন তো? ওই অট্টালিকার বড় অংশটিতে ভারতের সহকারী হাই-কমিশনারের অফিস (Office of the Assistant High Commissioner for India at Rajsahi, East Pakistan)। সহকারী হাই-কমিশনারের রেসিডেন্সটিও ওই বাড়িতেই। এইবার বুঝে নাও কতবড় বাড়ি? বাড়ির ওপর হামলা হয়েছিল। আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার, বাড়িওলা অর্থাৎ রাধিকামোহন মৈত্রের বুড়ো বাবাকে তাঁর কাছে এনে নিরাপদে রেখে দিয়েছেন।' আমি রাধিকাবাবুকে তাঁর বাবার নিরাপদ আশ্রয়ের কথা জানাতেই তিনি ফোনেই আমাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন। এই একটি ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় যে পাকিস্তানি আমলে পূর্ব বাংলার জেলাগুলির সঙ্গে গোপন যোগসূত্র কেমন ছিল এবং এটা এক বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পরিচালনা করতেন।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকের একটা দিন। রাজ্যের খাদ্য আন্দোলনের রেশ অল্পবিস্তর রয়েছে। গ্রীষ্মের অপরাহ্নের অস্তমুখী সূর্যের বাঁকা ছায়া রাইটার্সের করিডরে পড়তে আরম্ভ করেছে। আমি রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঘরে বসে। এই সময় এক ভদ্রলোক তাঁর ঘরে ঢুকে একটি সিল করা ব্যাগ সেনগুপ্তসাহেবের হাতে দিয়ে তাঁকে সেলাম করলেন। সেলামের ধরন দেখে বুঝলাম পুলিশের লোক। রথীন সেনগুপ্ত ব্যাগটি হাতে নিয়ে মন্তব্য করলেন, 'আজ ঢাকার প্লেন দেরিতে এসেছে বুঝি?' তিনি তাড়াতাড়ি সিল ভেঙে ব্যাগটি খুলতে খুলতে আমাকে বললেন, 'ঢাকা হাইকমিশনের Diplomatic Bag, বুঝলে?' তারপর কতগুলি খাম, বাংলায় ছাপা একটি প্যামপ্লেট-জাতীয় বই তিনি দ্রুত উল্টে পাল্টে দেখে আমার হাতে দিয়ে আমাকে বললেন, 'যা দেখবার দশ মিনিটের মধ্যে সারবে...এই ব্যাগ আবার সিল করে এখুনি দিল্লি পাঠাতে হবে...।' তিনি যেটি আমায় পড়তে দিলেন সেটি ছিল এই উপমহাদেশের ইতিহাস নির্ণায়ক—আর এক নয়া ইতিহাস গড়ার সূচনা। পুস্তিকাটি ছিল শেখ মুজিবর রহমানের লেখা : 'ছয় দফা দাবি—আমাদের বাঁচার দাবি।' অর্থাৎ ওই পুস্তিকাটি হল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য আওয়ামি লিগের ছয় দফা দাবি সম্বলিত বাঙালি মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মহাসনদ। আমাকে বেঁধে-দেওয়া সময়সীমা মানতেই হল। কারণ পুস্তিকাটি Diplomatic Bag-এ দিল্লিতে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দফতরে যাবে। আমি দেখলাম পুস্তিকাটির ইংরাজি বয়ানও সঙ্গে রয়েছে। কারণ ওই পুস্তিকাটি এমনই বিস্ফোরক বিষয় যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তা অবশ্যই দেখতে হবে। পরদিন আমার কাগজ 'যুগান্তর' পত্রিকায় খবরটি exclusive হয়ে মোটামুটি বড় আকারেই প্রকাশিত হল। তবে ওই সংবাদটি ব্যানার হেডলাইন হয়নি বলে আমার যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। কিন্তু মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে কিংবা একটু আগে মিশরের ঐতিহাসিক সংবাদপত্র 'আল্ আহ্‌রাম' পূর্ব-পাকিস্তানের ওই দাবি নিয়ে আন্তর্জাতিক বিস্ফোরণ ঘটাল। 'আল্ আহ্‌রাম' পত্রিকাটিতে শেখ মুজিবর রহমানের ওই ছয় দফা দাবির সবগুলিই ছেপে দিল। প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পি টি আই) এবং রয়টার-এর কায়রোর রিপোর্টাররা ওই দাবিগুলি আদ্যোপান্ত ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে পরিবেশন করল। তখন কলকাতার ইংরাজি বাংলা সব কয়টি দৈনিক পত্রিকা ব্যানার হেডলাইনে শেখ মুজিবর রহমানের ওই দাবিগুলি প্রকাশ করল। সেই সময় রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পরিহাস করে সংবাদপত্র জগতের কয়েকজন দিকপালকে বলেছিলেন সেই প্রবাদ বাক্যটি—'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না!'—অর্থাৎ এপ্রিল মাসের শেষে 'আল্ আহ্‌রাম' কাগজে প্রকাশের অন্তত বারো-তেরো দিন আগে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত ওই সংবাদটির উল্লেখ করেছিলেন। ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমান তাঁর 'ছয় দফা' দাবির ভিত্তিতে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন আরম্ভ করে দিলেন। আন্দোলনের শুরুতেই তিনি গ্রেপ্তার হলেন। শেখসাহেবের সঙ্গে একেবারে বিস্ময়করভাবে গ্রেপ্তার হলেন নোয়াখালি গান্ধী আশ্রমের পরিচালক চারুচন্দ্র চৌধুরী। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় গান্ধীজি যখন নোয়াখালি থেকে চলে আসেন তখন তিনিই আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন চারুবাবুকে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নাম দিয়ে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগ আনলেন। শেখ মুজিবর রহমানের বিচারের জন্য পাকিস্তান সরকার এক সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন করলেন। সেই সময় ১৯৬৬ সালের জুন মাসে 'যুগান্তর' পত্রিকায় আমার এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল :

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আয়ুবের সাজানো ব্যাপার

......'অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্থানের ন্যায্য দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে।......'—এ কথা শেখ মুজিবর রহমানের, যিনি দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার আজ পয়লা নম্বরের আসামী। পূর্ব পাকিস্থানের স্বাধিকারের আন্দোলন আরম্ভের পূর্বে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্থান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর 'আমাদের বাঁচার দাবি' পুস্তিকায় ঐ কথা লিখেছেন। পূর্ব পাকিস্থানের স্বাধিকারের আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার প্রায় আড়াই বছর পর শেখ মুজিবর রহমানের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব রূপ পেয়েছে। শেখ মুজিবরসহ ৩৫ জন পূর্ব পাকিস্থানী দেশদ্রোহিতার অভিযোগে রাওয়ালপিণ্ডির কর্তৃপক্ষের দ্বারা গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সামনে সোপর্দ হয়েছেন।

এই ৩৫ জনের মধ্যে ২ জন "সেন্ট্রাল সার্ভিসেস অব্ পাকিস্থান"-এর (ভারতে আই-এ-এস'এর তুল্য) অফিসার, পাকিস্থানী নৌবাহিনীর কয়েকজন প্রাক্তন ও বর্তমান জুনিয়ার অফিসার আছেন। আর আছেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শ্রীভূপতিভূষণ চৌধুরী। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তাঁরা পূর্ব পাকিস্থানে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় মিলিত হয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন এবং এদের এ কাজে টাকা দিয়ে সহায়তা করেছেন ভারতের ঢাকা হাইকমিশনের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী শ্রী পি এন ওঝা (যিনি জানুয়ারী মাসে ঢাকা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন)। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১৪৪ ধারা জারী করে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশেষ ট্রাইবুনালের সামনে তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলার আসামীদের বিচার আরম্ভ হয়েছে। এই বিচারকে কেন্দ্র করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় বিক্ষোভ আন্দোলনের আশঙ্কাই ১৪৪ ধারা জারীর আসল কারণ।

এবার দেখা যাক 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার উৎস। ১৯৬৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকার 'পাকিস্থান অবজার্ভার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয় যে, চট্টগ্রামে পাক নৌবাহিনীর কয়েকজন প্রাক্তন অফিসার ও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৯শে ডিসেম্বর ঐ পত্রিকাটিতে আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছে যে, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে পাক নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার মিঃ মামুদ আলীসহ আরও কয়েকজন ঢাকা হাইকোর্টে এই মর্মে রিট আবেদন করেছেন যে, জেলে তাঁদের উপর নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হচ্ছে। মিঃ মামুদ আলীর সঙ্গে অপর আসামী মিঃ কামালুদ্দীনের রিট আবেদনের মধ্যে যে অভিযোগ, তা খুবই গুরুতর। (মিঃ কামালুদ্দীন ডুবে যাওয়া লঞ্চ ষ্টীমার ও অন্যান্য জলযান নদী গর্ভ থেকে উদ্ধার করার কোম্পানী চালাচ্ছিলেন)। মিঃ কামালুদ্দীনের অভিযোগ হল ঃ তাঁকে পুলিশের লিখিত একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে বলা হয়। তিনি তা প্রথমে করতে অস্বীকার করলে, তাঁকে পিটিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান করা হয়। তারপর তাঁকে ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে সজ্ঞান করে আবার পিটানো হতে থাকে। পিটানোর ফলে তাঁর দেহে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তাতে নুন ও মরিচ বেটে মাখিয়ে দেওয়া হয়। হাইকোর্ট এই রিট আবেদন বিবেচনা করে জেলে আটক বন্দীদের অবিলম্বে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরনের নির্দেশ দেন। তাঁদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের অভিযোগ ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণিত হলে সরকার তাঁদের কাছ থেকে আদায় করা বিবৃতিগুলি হাইকোর্টে জমা দিতে বাধ্য হন এবং হাইকোর্ট ধৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিবৃতি আদায়ে বিরত থাকার জন্য সরকারের উপর নির্দেশ জারী করেন।

৬ই জানুয়ারীর ইস্তাহার

৩১শে ডিসেম্বর ঢাকার সংবাদ সাপ্তাহিক 'হলিডে' ঐ গ্রেপ্তার এবং হাইকোর্টে রিট আবেদন সংক্রান্ত রিপোর্ট বিশদভাবে প্রকাশ করে। সরকারী তরফ থেকে কোন বিবৃতি কিংবা প্রেসনোট মারফৎ এ বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানান হয় না। এর পর কয়েকদিন ঢাকা ও পূর্ব পাকিস্থানের আরও কয়েকটি শহরে এই মর্মে গুজব রটে যায় যে, পূর্ব পাকিস্থানে বড় রকমের কোন ঘটনা ঘটছে। অবশেষে গত ৬ই জানুয়ারী রাত্রে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এক ইস্তাহার প্রকাশ করে জানায় যে, ভারতের আগরতলায় বসে পূর্ব পাকিস্থানকে পাকিস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক ষড়যন্ত্র তাঁরা আবিষ্কার করেছেন এবং এই ষড়যন্ত্রের সহায়তা করার জন্য ঢাকার ভারতীয় মিশনের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী শ্রী পি এন ওঝাকে ১২ ঘণ্টার নোটিশে পাকিস্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

১৮ই জানুয়ারী অকস্মাৎ শেখ মুজিবর রহমানকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'-এর সঙ্গে জড়িত করে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ফরমান জারী করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে শেখ মুজিবর রহমান কারারুদ্ধ। তাঁর বিরুদ্ধে একটির পর একটি অভিযোগ এনে তাঁর কারাবাসকে বিলম্বিত করা হচ্ছে গত আড়াই বছর থেকে। শেখ মুজিবরকে এই মামলার সঙ্গে জড়িত করা মাত্র পূর্ব পাকিস্থানে প্রকাশ্য বিচারের দাবী উত্থিত হয়।

পাকিস্থানী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ৬ই জানুয়ারীর ইস্তাহার এবং ১৮ই জানুয়ারী শেখ মুজিবর রহমানকে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'-এর সঙ্গে যুক্ত করে দ্বিতীয় ইস্তাহার প্রকাশের পর পাকিস্থানের সংবাদপত্রগুলিতে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির ঝড় বয়ে যায়। পাক্ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ব পাকিস্থানের প্রতিনিধি খাজা শাহাবুদ্দীন, খাঁ আবদুস সবুর, পরলোকগত আলতাফ হোসেন এবং পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের স্পীকার আবদুল জব্বর (পূর্ব পাকিস্থানী) পূর্ব পাকিস্থানের স্বাধিকারের

আন্দোলনের সংগঠক ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত প্রচার অভিযান আরম্ভ করলেন। এই বিষাক্ত প্রচার অভিযানের প্রতিবাদের মুখ্য দায়িত্ব এল ঢাকার সংবাদপত্রগুলির উপর। পাকিস্থান অবর্জাভার, সংবাদ, হলিডে এবং এমন কি আজাদ বাঙ্গালী মুসলমানদের দেশপ্রেমকে এভাবে লাঞ্ছিত ও সন্দেহ না করার জন্য রাওয়ালপিণ্ডিকে পরামর্শ দিল এবং তারা সকলেই প্রায় একই সুরে একথা লিখল যে, পূর্ব পাকিস্থানীদের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনার যে অভিযান চলেছে, তাকে চাপা দেবার জন্য পিণ্ডি এভাবে বিকৃত প্রচার আরম্ভ করেছে। তবে যদি প্রকৃতই শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের তথ্য-প্রমাণ সরকারের হাতে থাকে, তাহলে সরকার প্রকাশ্য বিচারের দ্বারা তা প্রমাণ করুন। আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে তোফাজ্জল হোসেন, আমিনা বেগম, মহম্মদ মৈজুদ্দীন আমেদ, নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্য নেতাদের মধ্যে হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান, আবু হোসেন সরকার পিণ্ডির কুৎসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। প্রতিবাদ এল না শুধু ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি থেকে। পার্টির রুশপন্থী ও চীনপন্থী উভয় গোষ্ঠীই এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করলেন।

"ষড়যন্ত্র মামলার" প্রস্তুতি

ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সম্ভবতঃ তাঁর পীড়ার গুরুত্বের জন্য 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার ব্যাপারটি কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। কিন্তু মে মাসের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্ট আয়ুব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার সরকারী কাজকর্মে হাত দিতে আরম্ভ করলে ষড়যন্ত্র মামলা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ফাইল থেকে বেরিয়ে এল। এ সময় পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভাইস এ্যাডমিরাল মিঃ এ আর খাঁ কয়েকবার ঢাকায় এসে এই মামলা সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে যান। এর কিছুদিন পরেই রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এক অর্ডিন্যান্স জারী করে ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী এভিডেন্স এ্যাক্টের সংশোধন করা হল। পুলিশের নির্যাতন থেকে আসামী ও সাক্ষীকে রক্ষার জন্য হাজতে পুলিশের কাছে প্রদত্ত বিবৃতি আদালত গ্রাহ্য নয়—এভিডেন্স এ্যাক্টের এই ধারা ১৮৭২ সাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'-এর ব্যাপারে ধৃত মিঃ মামুদ আলী ও মিঃ কামালুদ্দীনের ঢাকা হাইকোর্টে রিট আবেদনে বিবৃতি আদায়ে পুলিশী নির্যাতনের যে অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং সে সম্পর্কে হাইকোর্টে যে বিরূপ মন্তব্য করেছে, তার ফলে ষড়যন্ত্র মামলাকে দাঁড় করাবার জন্য ঐ অর্ডিন্যান্স জারী করা হল। পাকিস্থানের উভয় অংশের আইনজীবীরা প্রকাশ্যে এবং বিচারপতিরা ব্যক্তিগতভাবে ঐ অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। শেষে কি ভেবে আয়ুব খাঁ আবার একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে আগেকার অর্ডিন্যান্স প্রত্যহার করে নিলেন।

এ সময় রাওয়ালপিণ্ডিতে জাতীয় পরিষদের এবং ঢাকায় প্রাদেশিক আইন সভার অধিবেশন চলছে। হঠাৎ একদিন জাতীয় পরিষদে সরকারী গোপনীয়তা রক্ষা আইন (সংশোধনী) বিল পেশ করা হল। বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ সরকারী গোপনীয়তা রক্ষা আইনে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের যে বিধান রয়েছে তার পরিবর্তন করে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের স্থলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া। বিল পেশ করা মাত্র পাঞ্জাবের আরিফ ইফ্‌তিকার ও পূর্ব পাকিস্থানের বিরোধী সদস্য মসিউর রহমান, আবদুল কাশেম, এ এস এম সোলায়মান, ইউসুফ আলী ও শাহ আজিজুর রহমান গর্জে উঠলেন। দিন কয়েক জাতীয় পরিষদে তুলকালাম কাণ্ড হল। অধিবেশন কয়েকবার মুলতুবী রাখা হল। আরিফ ইফতিকার বারংবার স্পীকারের বাধাদানের মধ্যে তীব্র ও তিক্ত বক্তৃতায় বললেন, 'সরকারের গোপন তথ্যের কোন গোপনীয়তা নেই।' পূর্ব পাকিস্থানী সদস্যরা বললেন, 'পূর্ব পাকিস্থানের কণ্ঠরোধ করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে।' বিলটির জনমত যাচাই ও সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য তিনটি প্রস্তাব আনা হল। এ ছাড়া আরও তিনটি সংশোধনীও উত্থাপন করা হল। কিন্তু ২৯শে মে জাতীয় পরিষদে মৃত্যুদণ্ড দানের পক্ষে সংশোধনী বিল ১৩৩-২৩ ভোটে পাশ হয়ে গেল। ঠিক একই সময়ে ঢাকায় প্রাদেশিক আইন পরিষদে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার খরচ বহন করার জন্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার বিল পেশ করা হল। প্রাদেশিক আইন সভায় বিরোধী দলের নেতা শ্রীআসাদুজ্জামান মঞ্জুরীর বিরোধিতা করে জানতে চান, 'যখন আমরা শেখ মুজিবরের স্বাস্থ্য ও তিনি কোথায় আছেন জানতে চাই, তখন বলা হয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। সুতরাং কেন্দ্রীয়

সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ের ব্যয়ভার কেন আমরা বহন করব?' অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভোটের জোরে ঐ মঞ্জুরী প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়।

পরবর্তী শুনানী ১৬ই জুলাই

জাতীয় পরিষদে সরকারী গোপনীয়তা রক্ষা আইন বিল পাশ হওয়ার কিছুদিন আগে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার আসামীদের বিচার করার জন্য বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়। ট্রাইবুন্যালের শুনানীর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অফিসারস মেস। ট্রাইবুন্যালের প্রথম বৈঠকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশীট গঠন প্রভৃতি হয়ে গেছে। ট্রাইবুন্যালের পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য হয়েছে ১৬ই জুলাই। তখন থেকেই শুরু হবে মামলার আসল পর্যায়। কিন্তু ট্রাইবুন্যালের প্রথম বৈঠকের সময় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাতে যে উত্তেজনা দেখা গিয়েছে, তাতে সরকারকে ১৪৪ ধারা জারী করতে হয়েছে। কিন্তু মামলার আসল পর্যায় শুরু হলে কি হবে এবং ঢাকার উত্তেজনা কোন্ পথে যাবে কে বলবে?

তবে পূর্ব পাকিস্থানের জনসাধারণের কাছে এ মামলার কোন মূল্য নেই। কারণ বাঙ্গালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাওয়ালপিণ্ডি বা করাচীর দেশদ্রোহিতা কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এই প্রথম নয়। বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্থানের স্বাধিকারের আন্দোলনে অবতীর্ণ হবার সময় আড়াই বছর আগে শেখ মুজিবর রহমান লিখে গেছেন, 'কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এজলাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্থানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমরা বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন্ ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্থানের অন্যতম স্রষ্টা পাকিস্থানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সুরাবর্দিকেও দেশদ্রোহিতা অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্থানের ন্যায্য দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জোরজুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্থানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের জন্য আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু?' (আমাদের বাঁচার দাবী—৬ দফা কর্মসূচী)। "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলার আসামী সংখ্যা ৩৫ জন হলেও এই মামলার আসল লক্ষ্য হাসান শহীদ সুরাবর্দির মানসপুত্র শেখ মুজিবর রহমান। পাকিস্থানের রাজনীতিতে শেখ মুজিবরের অস্তিত্ব প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের কাছে অসহ্য। পাকিস্থানের রাজনীতি থেকে শেখ মুজিবর রহমান অপসৃত হলে রাওয়ালপিণ্ডির স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী মুসলমানদের অভিযান স্তিমিত হয়ে যাবে তাই তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলার শুনানী, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে শেষ সংগ্রামের ডাক নিয়ে এসেছে।

এই লেখাটি আমাকে যথেষ্ট খ্যাতি এনে দিয়েছিল। এটা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতা দেশবিভাগ এবং বিশেষ করে ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাবলি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় বাঙালিদের পূর্ববাংলাকে কেবলমাত্র দাঙ্গা ও হিংসার মানসিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি (বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদার দাবির আন্দোলন), ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ফজলুল হক-সুরাবর্দি-মৌলানা ভাসানি যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব এই উপমহাদেশ থেকে মুসলিম লিগকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। এগুলিকে আবার আমার মনে হয় বেশিরভাগ ভারতীয় বাঙালি তাৎক্ষণিক ঘটনা হিসাবে দেখেছি। ধীরে খুব ধীরে হলেও পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের মনে যে এক নতুন বীজ উপ্ত হচ্ছিল, তা আমরা নজর করে দেখিনি। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় তা একটু নজরে এসেছিল। অর্থাৎ সেই সময়ে ঢাকার রাস্তায় আওয়ামি লিগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য না করার জন্য একটি অবিস্মরণীয় প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছিল। এই মিছিলের দুটি বিশেষত্ব ছিল—এক নম্বর অসংখ্য শিক্ষিত মুসলমান মেয়েদের অংশগ্রহণ ও দুই নম্বরটি হল সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের ওই মিছিলে শামিল হওয়া। 'সেন্ট্রাল সার্ভিসেস অব পাকিস্থান' (ভারতে আই এ এস'দের সমতুল্য) এর অফিসার, সুলেখক ও সাহিত্যানুরাগী

সানাউল হক ওই মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন। এটা ছিল অবশ্যই একটা নতুন দৃশ্য। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের শুরুতেই শেখ মুজিবর রহমান গ্রেপ্তার হওয়ার পর পাকিস্তানের বৃহৎ সংবাদপত্র মালিকদের পুঁজিতে পরিচালিত পত্রিকা 'মর্নিং নিউজ' (Morning News) পূর্ববাংলার মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ধারাবাহিক রচনায় কুৎসা প্রচার আরম্ভ করে দেয়। ওই প্রচারের বিষয়বস্তু ছিল এই—ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষকরে বঙ্গোপসাগরীয় এলাকার প্রদেশগুলিতে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে 'তাদের বেশিরভাগই নিচু জাতির হিন্দুদের থেকে ধর্মান্তরিত এবং ফলত তাদের দেহে হিন্দু শোণিত ধারা প্রবাহিত।' 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় ওই প্রচারমূলক রচনার ৭/৮টি কিস্তি প্রকাশের পর ঢাকা শহরে একদিন লক্ষাধিক লোক মিছিল করে জিন্না অ্যাভিনিউতে অবস্থিত 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার বাড়ি আক্রমণ করল। দুপুর থেকে প্রায় মধ্যরাত অবধি ওই পত্রিকা অবরোধ করে রাখার পর পত্রিকার পরিচালকগোষ্ঠী এই প্রতিশ্রুতি দিল যে বাংলাভাষী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওই প্রচারমূলক লেখা আর বের করা হবে না এবং পত্রিকাটিতে ছাপার অক্ষরে এই ধরনের প্রচারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হবে। এটা সে সময়কার ঢাকার একটি বড় রাজনৈতিক ঘটনা ছিল। এদিকে ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জেনারেল আয়ুব খান সাংঘাতিক হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হল এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের যে হাসপাতালে চিকিৎসা হয়ে থাকে সেখানে কয়েক মাস আয়ুব খানের চিকিৎসা চলল। ১৯৬৮ সালের শেষদিকে জেনারেল আয়ুব খান ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশের প্রেসিডেন্ট হতে চাইলে আয়ুব তৎক্ষণাৎ তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়াকে। পাকিস্তানের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম দেশনায়ক ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালেন। তাঁর এগারো বছরের শাসনকালে পূর্ব-পাকিস্তানে একটি বড় হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা (১৯৬৪) এবং ১৯৬৫ সালে দুই সপ্তাহের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হলেও এটা ইতিহাসগত সত্য যে জেনারেল আয়ুব খানই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে এবং কাশ্মীর নিয়ে একটি মীমাংসায় পৌঁছনোর জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণ ও শেখ আবদুল্লার মাধ্যমে শেষ আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালের ২৭ মে জওহরলাল নেহরুর আকস্মিক মৃত্যু ওই প্রয়াসে ছেদ টেনে দিল। ঠিক ওইদিনই কাশ্মীর মীমাংসায় নেহরুর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে শেখ আবদুল্লা পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফফরাবাদে মীমাংসা সূত্র আলোচনা করছিলেন সেখানকার কাশ্মীরি নেতাদের সঙ্গে। নেহরুর মৃত্যুর খবর পাকিস্তানে পৌঁছলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি মিয়াঁ ইফতিকারউদ্দিনের বিধবা পত্নী বেগম ইফতিকার এবং সীমান্ত গান্ধীর পুত্র খান আবদুল ওয়ালি খান দিল্লি আসতে চাইলে প্রেসিডেন্ট আয়ুব পাকিস্তানের সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদেরও দিল্লি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জেনারেল আয়ুব খান পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক যিনি প্রকাশ্যে রাজাগোপালাচারি, আচার্য কৃপালনি, জয়প্রকাশ নারায়ণের এবং ভারতের প্রথম প্রধান সেনাপতি জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পার প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে হাতে নিয়ে জেনারেল আয়ুব খান সামরিক জীবনে তাঁর এক সময়কার কম্যান্ডিং অফিসার, ভারতের প্রাক্তন সেনানায়ক জেনারেল কারিয়াপ্পাকে পাকিস্তান সফরে আমন্ত্রণ জানালে নেহরু সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল কারিয়াপ্পাকে আয়ুব খানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বলেছিলেন। জেনারেল কারিয়াপ্পা ১৯৫৯ সালের গোড়ায় লাহোর পৌঁছলে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান অবিভক্ত ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সবগুলি পদক তাঁর বুকে প্রথা অনুযায়ী লাগিয়ে লাহোর বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত হন। জেনারেল কারিয়াপ্পা বিমানের শেষ সিঁড়ি থেকে মাটিতে পা রাখামাত্র জেনারেল আয়ুব বার কয়েক তাঁর বুট ঠকাস ঠকাস করে জেনারেল কারিয়াপ্পাকে সামরিক অভিবাদন জানিয়েছিলেন—যেন তখনও তিনি তাঁর ভারতীয় বাহিনীর কম্যান্ডিং অফিসারের অধস্তন সৈন্য। সেদিনকার লাহোর বিমানঘাঁটির এই দৃশ্য ভারতীয়দের, বিশেষকরে ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে চমৎকৃত করেছিল। বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে জেনারেল আয়ুব খানের সময়কাল নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এর দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল (১) Pakistan A Political Study—লিখেছেন কানাডার Mc Gill University-র অধ্যাপক Keith Callard E এবং (২) অন্যটি হল The Ayub Khan Era—লিখেছেন Lawrence Zaring (Syracuse University)। আমার জানা নেই ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাসংস্থা জেনারেল আয়ুব ও পাকিস্তানের রাজনীতির উত্থানপতন নিয়ে কোনও গবেষণা প্রোজেক্ট গঠন করেছেন কি না। অথচ ভারত ও পাকিস্তান ইতিহাসগতভাবে, জাতিগোষ্ঠীগতভাবে (Ethnic relationship), ধর্ম ও সম্প্রদায়গতভাবে একে

অপরের সঙ্গে এক অদৃশ্য ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। এটা কারও কারও পছন্দ না হলেও অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

যা হোক জেনারেল ইয়াহিয়া খান যখন পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন ১৯৬৬ সালের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় গ্রেফতার হওয়া শেখ মুজিবর রহমান ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি। সেখানে সামরিক ট্রাইবুন্যালে তাঁর বিচার চলছে। বিচার চলাকালীন সময়ে জানা গেল যে শেখসাহেব সাংঘাতিক অর্শ রোগে আক্রান্ত। তিনি উঠতে বসতে পারছেন না। মুজিবর তাঁর চিকিৎসার জন্য 'প্যারোলে' মুক্তি চাইলেন। কিন্তু সামরিক ট্রাইবুন্যাল ওই আবেদন খারিজ করে দিলে সারা পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ উত্তাল হয়ে উঠল। তারপর যেটা হয়েছিল তা সম্ভবত এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত নজিরবিহীন ঘটনা। অসুস্থ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তির জন্য লাখ লাখ লোক কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। বিদেশি সাংবাদিকদের মতে ওই জমায়েত ছিল 'over a million' মানুষের। ঢাকার বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা, কুমিল্লার ব্রহ্মপুত্র থেকে হাজার হাজার মাঝি তাঁদের বৈঠা কাঁধে নিয়ে ওই জমায়েতে শামিল হয়েছিলেন। এই দশ লক্ষাধিক মানুষের জমায়েতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে সময়কার ছাত্র লিগ নেতা তোফায়েল আমেদ। বরিশালের ভোলার ওই যুবক তোফায়েল একটা ফতুয়া গায়ে ক্যান্টমেন্টের সামরিক বেষ্টনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'রাওয়ালপিন্ডির ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও বহাল' রাখার ডাক দিয়েছিলেন। সময়টা ছিল ১৯৬৯ সালের জুন-জুলাই। সেদিন ছিল সামরিক ট্রাইবুন্যালের শুনানির দিন। শেষ পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডির নির্দেশে সামরিক ট্রাইবুন্যাল অসুস্থ শেখসাহেবের নিঃশর্ত মুক্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। এবার আরম্ভ হল 'ছয় দফার' ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক লড়াই। 'ছয় দফা দাবির' কোনও দফাতেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের 'স্বাধীনতার' কথা বলা ছিল না। 'ছয় দফার' মূল দাবি ছিল ১৯৫৬ সালে শাহিদ সুরাবর্দি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে দেশকে যে সংবিধান (যেটা 1956 Constitution হিসাবে পরিচিত) দিয়েছিলেন তাকে অবিলম্বে চালু করা এবং ওই সংবিধান মোতাবেক মুসলমান ও হিন্দুর যুক্ত ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে যখন ওই সংবিধান গৃহীত হয়েছিল তখন ঢাকা শহরেই চলেছিল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। ওই সংবিধান গ্রহণের পর সুরাবর্দিসাহেব জাতীয় পরিষদে তাঁর জবাবি ভাষণে বলেন, 'If a single Hindu crosses over to the other side of the border the onus does not lie with him, it lies with the members of the majority Muslims....'। ছয় দফা দাবির ইংরাজি বয়ানে এক জায়গায় শেখ মুজিবর বলেছেন, 'The Federal Government shall only deal with the Defence and the Foreign Affairs matters...' অর্থাৎ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিজেদের হাতে রাখবে। অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থাদি সম্পর্কে শেখসাহেবের যে সব বক্তব্য ছিল ওই 'ছয় দফা' দাবিতে সেখানে কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের সংঘাতের জায়গা বিস্তৃত ছিল বলে আমার মনে হয়েছে। যা হোক ১৯৭০ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবর রহমানকে আলোচনার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে ডেকে পাঠালেন। সেখানে শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্টের ভবনে পৌঁছলে জেনারেল ইয়াহিয়া খান গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবর রহমানকে 'দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী' বলে প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৪ জুন (১৯৭০) শেখ মুজিবর দেশে দ্রুত সাধারণ নির্বাচন করে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে। প্রেসিডেন্ট আওয়ামি লিগ নেতার আবেদন মেনে নিয়ে ১৯৭০-এর ৫ অক্টোবর দেশে সাধারণ নির্বাচনের দিন স্থির করলেন নির্বাচন কমিশনের পরামর্শ মতো। কিন্তু অক্টোবর মাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আঘাত করল। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সারা প্রদেশকে লণ্ডভণ্ড করে দিল। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশ ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে হাজির হয়েছিল। সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটিশ নৌবহর বিমানবাহী রণতরী নিয়ে চট্টগ্রাম ও বরিশালের উপকূলে উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চালিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের দিন পিছিয়ে ৭ ডিসেম্বর (১৯৭০) ধার্য করা হল। জাতীয় পরিষদের ওই নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন সভাগুলির নির্বাচনও ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। সারা পূর্ব-পাকিস্তান উত্তাল হয়ে উঠল নির্বাচনি প্রচারে। ২০ অক্টোবর (১৯৭০) ঢাকার কাছে তেজগাঁওতে এক বিশাল নির্বাচনি জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানিদের লক্ষ করে এক

সাংঘাতিক কথা বললেন : 'আমি বাঙালিকে চাকর বাকরে পরিণত হতে দেব না...।' তাঁর এই উক্তিতে দীর্ঘ হর্ষধ্বনি থামতে পাঁচ মিনিটেরও বেশি সময় লেগেছিল।

২৫ অক্টোবর রাজশাহি জেলার নওগাঁওতে শেখসাহেব ঘোষণা করলেন : 'এই নির্বাচনের ফলাফলই আওয়ামি লিগের স্বায়ত্তশাসনের দাবির 'গণভোট'।' অবশেষে ৭ ডিসেম্বর (১৯৭০) পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামি লিগ ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে ১৬৭টি আসন দখল করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য নির্দিষ্ট ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে আওয়ামি লিগ পরিষদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নয়া নজির (সম্ভবত ৯৯ শতাংশ আসন দখল) স্থাপন করল। পরবর্তীকালে করাচির অন্যতম প্রাচীন ইংরাজি সংবাদপত্র The Morning News-এর (এই পত্রিকাটির দেশবিভাগের সময় পর্যন্ত কলকাতা থেকে একটি সংস্করণ প্রকাশ হত) সহকারি সম্পাদক Anthony Mascarenhas তাঁর বিখ্যাত RAPE OF BANGLADESH গ্রন্থে লিখেছেন যে শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামি লিগ ৭ ডিসেম্বরের ভোটে যাতে কারচুপি করতে না পারে সেজন্য প্রতিটি বুথে একজন সৈন্য, একজন সশস্ত্র প্রাদেশিক পুলিশ, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর একজন, ও সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর একজন করে লোক মোতায়েন ছিল। কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বুথের আধ মাইলের মধ্যে সামরিক বাহিনী আসতে দেয়নি। Anthony Mascarenhas নিজে জাতীয় পরিষদের ওই নির্বাচন রিপোর্ট করতে পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছিলেন। কিন্তু এত বড় বিশ্বরেকর্ড করা ঐতিহাসিক সাফল্যের পরও শেখ মুজিবর রহমান তাঁর দেশের অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না। কেন তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না তা এই উপমহাদেশের গত ৪০ বছরের ইতিহাস বলে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানও ভোটের আগেই গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে জেনে নিয়েছিলেন যে শেখ মুজিবর রহমানই দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। কেবল তাই নয় আমেরিকার বিখ্যাত সংবাদ সাপ্তাহিকী TIME-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা Dunn Cugin-এর সঙ্গে ভোটের আগে এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, '...শেখ মুজিবর রহমানই দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন...।' কিন্তু কেন তা হল না?

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৭ ডিসেম্বরের (১৯৭০) ভোটের পর পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন হল ১৯ ডিসেম্বর। প্রাদেশিক আইনসভার ভোটে মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামি লিগ ২৮৮টি আসনে জিতে পরিষদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে আর একটি বিশ্ব রেকর্ড করল। এই দুটি ভোটের ফলাফল ছিল এরকম :—

AFTER THE GENERAL ELECTIONS

PAKISTAN NATIONAL ASSEMBLY ELECTION RESULTS

Name of Party	No. of Seats Contested	PROVINCE-WISE RESULT						Indirectly Elected Women's seats	Total
		East Pakistan	Punjab	Sind	NWFP	Baluchistan	Tribal Area		
Awami League	162	160	—	—	—	—	—	7	167
Pakistan People's Party	122	—	64	18	1	—	—	5	88
All Pakistan Muslim League (Qaiyum)	132	—	1	1	7	—	—	—	9
Muslim League (Council)	119	—	7	—	—	—	—	—	7
Jamait-ul-Ulema-i-Islam (Hazärvi Group)	93*	—	—	—	6	1	—	—	7
Markazi-Jamait-ul-Ulema-i-Islam (Thanvi Group)	Not known	—	4	3	—	—	—	—	7
National Awami Party (Wali Khan)	61	—	—	—	3	3	—	1	7
Jamait-e-Islami	200	—	1	2	1	—	—	—	4
Muslim League (Convention)	124	—	2	—	—	—	—	—	2
Pakistan Democratic Party	108	1	—	—	—	—	—	—	1
Independents	300	1	3	3	—	—	7	—	14
		162	82	27	18	4	7	13	313

EAST PAKISTAN PROVINCIAL ASSEMBLY ELECTION RESULTS

	General Seats = 300	Indirectly Elected Women's Seats	Total
Awami League	288	10	298
Pakistan Democratic Party	2	—	2
Pakistan People's Party	—	—	—
Muslim League (Council)	—	—	—
Muslim League (Convention)	—	—	—
All Pakistan Muslim League (Qaiyum)	—	—	—
National Awami Party (Wali Khan)	1	—	1
Jamati-i-Islami	1	—	1
Nizam-e-Islami	1	—	1
Jamait-ul-Ulema-i-Islam (Thanvi Group)	—	—	—
Markazi-Ahl-e-Hadis	—	—	—
Jamait-ul-Ulema-i-Islam (Hazarvi Group)	—	—	—
Jamait-ul-Ulema-i-Islam (Noorani Group)	—	—	—
Sind-Karachi-Punjabi-Pathan	—	—	—
Muttahida Mahaz	—	—	—
Baluchistan United Front	—	—	—
Pakhtoon Khawa (NAP)	—	—	—
Independents	7	—	7
Total No. of seats	300	10	310

কিন্তু পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে বাঙালি মুসলমানদের এই নিরঙ্কুশ আধিপত্যের জায়গা দেখে পাকিস্তানিদের ভ্রূকুঞ্চিত হল। বিশেষ করে পাঞ্জাবি মুসলমানদের বাঙালিদের এই আধিপত্য একেবারেই পছন্দ নয়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীতে অফিসার ও জওয়ান মিলিয়ে পাঞ্জাবিদের আধিপত্য ছিল সাংঘাতিক। পাকিস্তানি রাজনীতিতে সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জুলফিকার আলি ভুট্টো পাঞ্জাবি সামরিক অফিসারদের খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি সিন্ধি মুসলমান হয়েও বাঙালি বিরোধিতার এই সুযোগ কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠলেন। পাকিস্তানের প্রথম সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশেষ করে তাসখন্দ (Tashkent) চুক্তির সময় তাঁর পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর বিভিন্ন আচরণে এমন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ওই যুদ্ধ ও ভারতের সঙ্গে খারাপ সম্পর্কের জন্য প্রধানত ভুট্টোই দায়ী। তাসখন্দ চুক্তির ছ'মাসের মধ্যে জেনারেল আয়ুব খান ভুট্টোকে বলতে গেলে মন্ত্রিসভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এমনকী তিনি প্রকাশ্যে ভুট্টোকে গালাগাল দিলেন 'Playboy of Larkana' বলে। অর্থাৎ ভুট্টোর প্রধান উপজীব্য মদ ও মেয়েমানুষ—রাষ্ট্রনীতি নয়। মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়িত হয়ে ভুট্টো গোড়ার দিকে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আঁতাত করার চেষ্টাও করেছিলেন। বাংলার মাস্টার রেখে বাংলা ভাষা শিখছিলেন। কিন্তু শেখসাহেব তাঁকে তেমন আমল দেননি। ফলে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর জুলফিকার আলি ভুট্টোর পক্ষে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রধান পরামর্শদাতা হতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কারণ, যে-গুণাবলির জন্য জেনারেল আয়ুব ভুট্টোকে 'Playboy' আখ্যা দিয়েছিলেন সে সব গুণাবলি ইয়াহিয়া খানের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এই সময় ১৯৭১ সালের গোড়ায় একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের দিল্লি থেকে শ্রীনগরগামী বিমানটি ফেরার পথে কয়েকজন কাশ্মীরি উগ্রপন্থী বিমানটি হাইজ্যাক করে লাহোরে নিয়ে গেল। ভারত সরকার দ্রুত ভারতীয় যাত্রীসহ বিমানটিকে ফেরত দেওয়ার দাবি জানাল পাকিস্তানের কাছে। জুলফিকার আলি ভুট্টো লাহোর বিমানঘাঁটিতে হাজির হয়ে ওই উগ্রপন্থীদের 'অভিনন্দন' জানালেন এবং ভারতীয় বিমানটিতে আগুন ধরিয়ে দিতে উৎসাহ দিলেন। হলও তাই। বিমানটিকে পুড়িয়ে দেওয়া হল এবং ভুট্টো নিজে ওই উগ্রপন্থীদের লাহোর স্টেডিয়ামে নিয়ে গিয়ে 'গণ সংবর্ধনা' দিলেন। ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বিমান চলাচল চুক্তি বাতিল করে দিয়ে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে বিমান যাত্রায় যে বারশো' মাইল ভারতের আকাশ পাকিস্তানকে ব্যবহার করতে হয় তা বাতিল করে দিল। এদিকে ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমান এক জনসভা ডেকে ভারতীয় বিমান ছিনতাই এবং সেটিকে পুড়িয়ে দেওয়ার তীব্র নিন্দা করলেন। ঘটনাপ্রবাহ এক অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলল।

জুলফিকার আলি ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে মাত্র ৮৮টি আসন পেলেও

ওই পার্টিকেই সরকার গড়তে দিতে হবে বলে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে দাবি জানালেন ২০ ডিসেম্বর (১৯৭০)। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে পশ্চিম পাকিস্তানের এক বা একাধিক প্রভাবশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিত্ব কোনও বাঙালি মুসলমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দিতে চায় না। জেনারেল ইয়াহিয়া খান স্বেচ্ছায় কিংবা তাঁর রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার জন্যই হোক ওই গোষ্ঠী ও ব্যক্তি বিশেষের চাপের কাছে নতিস্বীকার করলেন দেশের সংবিধান এবং পরিষদীয় গণতন্ত্রের চিরাচরিত প্রথাকে অগ্রাহ্য করে। ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ শেখসাহেব এক বিবৃতিতে পরিষ্কার জানালেন যে প্রেসিডেন্ট ১৯৫৬ সালের শাহিদ সুরাবর্দির দেওয়া সংবিধানকে ফিরিয়ে এনে সাংবিধানিক ধারা মোতাবেক দেশে নির্বাচন করিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নিজে কয়েকবারই জাতির উদ্দেশে তাঁর বেতার-ভাষণে নির্বাচনে জনগণের রায় অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের রায় মেনে প্রেসিডেন্টকে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতেই হবে। তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে পারস্পরিক মত বিনিময় করতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি কোনও অবস্থাতেই পূর্ব-পাকিস্তানিদের 'ছয় দফা দাবি' এবং নির্বাচনে জনগণের রায় থেকে পিছু হঠতে প্রস্তুত নন। ১৪ জানুয়ারি ১৯৭১, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে আবার এক বেতার ভাষণে 'দ্রুত দেশের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের' ইচ্ছা প্রকাশ করে 'শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য' দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু ভুট্টো কিছুতেই আওয়ামি লিগের প্রধানমন্ত্রিত্ব মানতে রাজি নন বলে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-এ আবার এক বিবৃতি দিলেন। ১৯৭১-এর ১ মার্চ শেখসাহেব জানিয়ে দিলেন যে তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানি নেতাদের কাছ থেকে 'ভাল কথা ও ভাল সুপারিশ' শুনতে প্রস্তুত। কিন্তু তা কখনওই বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নয়। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে বাঙালিদের অর্জিত অধিকার যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে আওয়ামি লিগ প্রদেশব্যাপী 'আইন অমান্য আন্দোলনের' ডাক দেবে। শেখ মুজিবরের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা পূর্ব-পাকিস্তান উত্তাল হয়ে উঠল। প্রদেশের সর্বত্র 'আইন অমান্য' এবং পশ্চিম-পাকিস্তানিদের সঙ্গে কেনাবেচা বন্ধ করে দিল ঢাকার বাঙালিরা। সামরিক বাহিনীর লোকদের সঙ্গে ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে ক্যান্টনমেন্ট এলাকাগুলিতে বাংলাভাষী ও উর্দুভাষীদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। ১০ মার্চ ঢাকার অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। ১১ মার্চ আওয়ামি লিগের সাধারণ-সম্পাদক তাজুদ্দিন আমেদ ঢাকায় এক বিবৃতিতে 'জনগণের এই আন্দোলনের' সঙ্গে 'বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিকে গতিশীল রাখতে' আবেদন জানালেন। এই বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামের পরিবর্তে এই প্রথম 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯ মার্চ ঢাকা থেকে ২২ মাইল দূরে জয়দেবপুর শহরে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলি-গোলার লড়াই চলে। এই ঘটনার ফলে সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু জারি করা হয়। এই প্রথম পূর্ব-পাকিস্তানি সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটল। এই ঘটনায় প্রদেশের সকল শহরে উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলিম লিগ পার্টির অন্যতম নেতা এবং পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মিঁয়া মমতাজ দৌলতানা (Mian Mamtaz Daulatana) ঘটনার গতি দেখে সম্ভবত প্রথম বুঝতে পারলেন যে শেখ মুজিবর রহমানকে সংবিধান মোতাবেক দেশের প্রধানমন্ত্রিত্ব না দিলে পাকিস্তানে ভাঙন অনিবার্য। তিনি লাহোর থেকে সরাসরি ঢাকায় মুজিবর রহমানের সঙ্গে কথা বলে শান্তির আবেদন জানালেন এবং পেশোয়ারে ন্যাশন্যাল আওয়ামি পার্টির নেতা খান আবদুল ওয়ালি খানকে (সীমান্ত গান্ধীর পুত্র) একটি মীমাংসা সূত্রে পৌঁছনোর পথ বের করতে বললেন ২০ মার্চ। আগে ঠিক ছিল যে ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়াতেই নবগঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তা স্থগিত রেখে ঘোষণা করেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ২৫ মার্চ আরম্ভ হবে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরে দেরি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামি লিগের নেতা শেখসাহেবকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নিতে ভুট্টোর বিরোধিতার ফলে অশান্ত পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৯ মার্চ ঢাকায় আসেন। ওইদিনই তিনি শেখসাহেবের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। প্রেসিডেন্টের পর পরই ঢাকায় পৌঁছান ভুট্টো, মিঁয়া মমতাজ দৌলতানা সিন্ধুপ্রদেশের আয়ুব খুরো এবং সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল ওয়ালি খান। ২০ মার্চ ঢাকার খবরের কাগজগুলিতে এরকম সংবাদ বের হয় যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর শেখ মুজিবর তাঁর পার্টি নেতাদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বলেছেন যে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতি এক 'সংকটজনক' অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে মমতাজ দৌলতানা ও খান আবদুল ওয়ালি খান এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। দৌলতানা ও ওয়ালি খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গড়ার অধিকারকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য

প্রেসিডেন্টকে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে দেন। এদিকে ২২ মার্চ ঢাকার রমনায় এক বিশাল জনসভায় মুজিবর রহমান বলেন 'জয় আমাদের হবেই। আমরা ন্যায়ের পথে লড়াই করছি।' ওইদিন রাতে ঢাকায় প্রেসিডেন্টের ভবন থেকে প্রেস নোটে ঘোষণা করা হল যে ২৫ মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন ডাকা হয়েছিল তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হল। দৌলতানা ও আবদুল ওয়ালি খান এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ঢাকায় যখন ওই অবস্থা চলছে তখন ২২ মার্চ সন্ধ্যায় কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে একটি দৃশ্য দেখা গেল। আমি রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। কলকাতার সংবাদ জগৎ ঢাকার খবরের জন্য উৎকণ্ঠিত। এমন সময় দ্রুত একটি পুলিশের গাড়ির পিছনে নাম্বার প্লেটে বাংলা ভাষায় 'ঢাকা ...' লেখা একটা গাড়ি রাইটার্সের পোর্টিকোতে ঢুকল। গাড়ি থেকে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি নামার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোকেরা তাঁকে স্যালুট দিয়ে ভি আই পি লিফটে নিয়ে গেল। আমি ওই দীর্ঘকায় ব্যক্তিটিকে দেখে চিনতে পারলাম। তিনি ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি-হাইকমিশনার কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত। একসময় রিপোর্টার ছিলেন United Press of India নামের একটি নিউজ এজেন্সিতে। আমাকে সে সময় সামান্য চিনতেন। আমি আবার সিঁড়ি বেয়ে রাইটার্সের দোতলায় চলে এলাম। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি-হাইকমিশনার সরাসরি চিফ-সেক্রেটারি নির্মল সেনগুপ্তের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি চিফ-সেক্রেটারির ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছি। কৈলাস সেনগুপ্তকে ঢাকার পরিস্থিতি কিছু জিজ্ঞাসা করতেই হবে। মিনিট পনেরো পরে কৈলাসবাবু বেরিয়ে আসতেই আমি কোনও বাহুল্য না করেই তাঁকে বললাম যে আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। তিনি একটু সময় ভ্রু কুঁচকে আমাকে দেখে বললেন, 'আমিও তোমাকে চিনেছি...তবে নাম ভুলে গিয়েছি।' আমি সময় নষ্ট না করে প্রশ্ন করলাম, 'ঢাকার আলোচনা কি শেখ মুজিবের পক্ষে যাবে কিংবা রক্তক্ষয়ী পরিণতি?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'দ্বিতীয়টা...আর কোনও প্রশ্ন নয় এবং তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়নি বুঝলে...।' এই কথা শেষ হতে না হতেই চিফ সেক্রেটারি বেরিয়ে এসে ডেপুটি-হাইকমিশনারকে নিয়ে দমদম বিমানঘাঁটিতে ছুটলেন। পরে জানতে পেরেছি চিফ সেক্রেটারির দিল্লিগামী বিমানটি প্রায় ৪০ মিনিট দেরি হয়েছিল আকাশে উড়তে। পশ্চিমবাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি-হাইকমিশনারকে দিল্লিগামী বিমানে তুলে দিয়ে এলেন। পরে জানতে পেরেছিলাম দিল্লির পালাম বিমানঘাঁটি থেকে পররাষ্ট্র দফতরের অফিসাররা ডেপুটি-হাইকমিশনার কৈলাস সেনগুপ্তকে সোজা নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাড়িতে। কৈলাসবাবু ঘরে ঢুকেই প্রথম দেখতে পেলেন জেনারেল মানেকশকে। পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দফতরের দুই সেক্রেটারি এবং গোয়েন্দা দফতরের উচ্চপদস্থ অফিসাররাও গম্ভীরমুখে সেখানে উপস্থিত। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার ওই অফিসারদের সামনেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে ঢাকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে বলে তিনি জানান। ২৫ মার্চ নির্দিষ্ট করা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্থগিত করে দেওয়ার মধ্যে সামরিক তৎপরতার আশঙ্কার কথা কৈলাশবাবু ওই বৈঠকে জানিয়েছিলেন। পরদিন ২৩ মার্চ সকালেই দিল্লির বিমান দমদমে নামার আগেই আমি বিমানঘাঁটিতে গেলাম। আমার কেন যেন মনে হয়েছিল ডেপুটি-হাইকমিশনার কৈলাশ সেনগুপ্তকে এখনই ঢাকায় ফিরতে হবে। একটু পরেই চোখে পড়ল পুলিশ প্রহরায় ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনার সেখানে দাঁড়িয়ে। আমার অনুমান ঠিক। দিল্লির বিমান থেকে যে যাত্রীটি প্রথম নেমে এলেন তিনি সেই ডেপুটি-হাইকমিশনার কৈলাশ সেনগুপ্ত। বিমানের সিঁড়ির গোড়ায় আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'কি, রাতে ঘুমতে যাওনি?' হাইকমিশনের গাড়ি এগিয়ে আসতেই তিনি গাড়িতে উঠতে উঠতে আমাকে জানালেন যে সন্ধ্যার আগেই তিনি সীমান্ত পেরিয়ে যশোর হয়ে ঢাকায় পৌঁছতে চান। ওদিকে ২৩ মার্চ ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমান রমনা রেসকোর্স ময়দানে পরিষ্কার ঘোষণা করলেন যে তিনি কখনওই 'ছয় দফা দাবি' থেকে সরে আসবেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিও ছাড়বেন না। কিন্তু পরিস্থিতি যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে 'তোমাদের সৈন্যেরা যদি আমার বাংলাদেশের মানুষের উপর গুলি চালায়—যদি আমাদের মা-বোনেদের গায়ে হাত দেয়, তাহলে এই লড়াই হবে মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম'...। 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' কথাটি তিনি ওই প্রথম উচ্চারণ করলেন। ২৪ মার্চ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকা শহরে বিরাজ করছিল এক অসহনীয় স্তব্ধতা। বিকালে পুরান পল্টনে সেই ঐতিহাসিক সভায় মুজিবের আগের দিনের রমনার ঘোষণা...'আমাদের মুক্তির সংগ্রাম—আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম...।'

ক্রমশ

উদো-বুধো কথা

বিপ্লব বিশ্বাস

ইস্কুল ফেরত উড়ো কথা সব কানে যেতেই চমক লাগল সুবিনয়ের। গোপেন মিস্ত্রির তাজা ছেলেটা নাকি মরে গেল দুম করে। গাড়োয়ান পাড়ার বাঁকমুখে জটলা। নানান রঙঢঙের মানুষসব। বাঁকটা পেরিয়ে পা-বিশেক এগলেই সুবিনয়ের 'আশা-নিলয়'। সেদিকে রাইট টার্ন নেবার আগেই এই কু-সমাচার। 'কী হয়েছিল?'—এমনটি কেউ ছুঁড়ে দিলে তা লুফে নিয়ে আর কেউ ফিরিয়ে দেয়, মেনিঞ্জাইটিস। আবার তাকে তুড়ি মেরে অন্য কেউ হাঁকে, ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া। তাকেও কেয়ারি করে ধানুবাবু পান চিবুতে চিবুতে বিজ্ঞঢঙে ঝেড়ে দেয়, এনকেফ্যালাইটিস। কড়া শব্দটির গা বেয়ে বেরিয়ে আসে তিনশো'র কড়া জর্দাবাস। তুরন্ত মেনে নিয়ে কে যেন বলে ওঠে, এটাই ঠিক। গোপেনদার ঘরের আশপাশে শুয়োর চরে খুব। সুবিনয় তাকিয়ে দেখে, জগা ল্যাংড়া। জমি-বাড়ির দালাল ধানু গোঁসাই-এর সঙ্গতদার। তা সব্বাইকে টেক্কা দিয়ে মোক্ষম পাবড়াটি মেরে দেয় এই ১৩ নং ওয়ার্ডের গোজেটমাসি। সে ঠোঁট উলটে বলে, রাখো তুমাদের সব টিস-ফিস। ছেলেটার তড়কা ছিল। কিরমি বিকার। কী এট্টা ইঞ্জাশন দিতে হত। হাজার দেড়েক দাম। তা গোপেন আর চেয়েচিন্তে যোগাবে কত? তাছাড়া সব্বাই তো আর! গেল ছেলেটা। জুয়ান বেটা! ধড়ফড়িয়ে মলো গো! মা-বাপের যে কী হাল! পেটমোছা একটাই।

এটাওটা বকোয়াশ এড়িয়ে গেজেটমাসির একটা কথা কানে লেগে যায় সুবিনয়ের। তার কাছেও তো এসেছিল গোপেন। সদরগেটে খাড়িয়েছিল হাত পেতে—শ' তিনেক চেয়ে। গোপেন দু'-একবার ইলেকট্রিকের টুকটাক কাজ করেছে সুবিনয়ের বাড়ি। পাড়ারই ছেলে। আজকাল অবশ্য পাড়া বলে একটা ভূগোল থাকলেও মিলমিশের সমাজবাঁধন নেই তেমন। গায়ে গায়ে হলেও তা ওই ফ্ল্যাটবাড়িরই শামিল। তবুও গলে পড়া মাস্টার ভেবেই হয়ত সাহসে ভর করে হাত পেতেছিল গোপেন। অবশ্য ধার চেয়ে। মাসপয়লা মাথায় রেখে দোসরাতে এসেছিল। ও জানত না, নকল দাবি বলে, কখনওই মাস্টারদের মাইনে মাসের দেড় কিংবা দ্বিতীয় প্রহরের আগে হয় না। তা যাহোক, শান্তার ব্যাগ হাতড়ে-হুতড়ে শ'তিনেক না হলেও শ'দুয়েক অন্তত দেওয়া যেত গোপেনকে। কিন্তু দরজা খুলে সুবিনয় যেন গোপেনকে দেখল না, দেখল একটা ভাঙা আয়না। ঘোলাটে আকাশের নীচে গোপেনের অসুস্থ পুত্রসমাচার এতটুকু টলাতে পারল না সুবিনয়কে। খুব কাচুমাচু মুখে টাকাটা চেয়েছিল গোপেন। কথা হয়েছিল এমন : আপনি দিন মাস্টামশাই। দিন দশ পরে একটা ওয়্যারিঙের পেমেন্ট পাব, দিয়ে দেব।—কিন্তু অত টাকা তো এখন নেই গোপেন। আমাদের তো এখনও......।

নেই! হাজার দেড়েক লাগবে। আরও দু'-একজনের কাছে গেলাম। আপনি যদি...মানে ধরেই রেখেছিলাম পাব। শ' দুয়েক পারবেন?

আসলে কি জান? কুড়িয়ে-বাড়িয়ে হয়ত হত। কালই একজনকে দিয়ে দিলাম। পেত।

দিব্যি গড়গড়িয়ে মিথ্যে বলে গেল সুবিনয়। গলা কাঁপল না একটুও। কপালে ফুটে উঠল না স্বেদবিন্দু। অথচ এমনটি উচ্চারণ করতে গলার কথাপথ বুজে আসত আগে। মানুষ ঠেকে শুধু শেখেই না, গিরগিটিও বনে যায় দিব্যি। হতাশ গোপেন বলে, ও তাই। গোপেনের আস্থায় স্বস্তি পায় সুবিনয়। এখনও মানুষ কি মাস্টারদের কথায়...! অথচ সুবিনয় তো গোপেনকে তার অবস্থানে ভাবতে পারছে না। এলোমেলো করে দিচ্ছে সেই শুভ্রবসন শরীরময় লেপটে আসা মানুষটা। একটা আস্ত ঠগ। ঠিক যেমন ট্রেনবাসে গলায় চাবি ঝোলানো ছোঁড়াগুলো। সঙ্গে অকালজরায় সাজানো মা। এ ছবি তো এখন ক্লিশে। এরমধ্যে কি একটিও আসল অনাথ থাকে না! ভাবে সুবিনয়। হয়ত থাকে। কিন্তু নকলের ওপর-চালাকি আসলকে পিষে দিয়েছে যেন। মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাসকে যেমন। গোপেনের পরের কথা উচ্চারণের আগে সুবিনয়ের ভাবনা আরও একটু ছড়িয়ে যায়। হঠাৎই মনে পড়ে ক্লাস সেভেনের দেবেশকে। কী সাংঘাতিক! ক্লাসটিচার সুবিনয় ছাড়বে না, সেও যাবে। দ্বিতীয় পিরিয়ডেই। ক্লাস ছেড়ে এসে হাতের চকগুড়ো মুছতে না মুছতেই জনাতিনেক পাঁজাকোলা করে দেবেশকে এনে শুইয়ে দিল হেডস্যারের ঘরের সামনের বেঞ্চটায়। কী ব্যাপার? পেটে খুব যন্ত্রণা। ব্যালেঢঙে পেট

টিপে কুঁকড়ে যাচ্ছে আর চোখমুখেও তার প্রকাশ বিশ্বাসযোগ্য। সকলেই তো ছুটে এল। রা সরছে না দেবেশের মুখ দিয়ে। শুধুই গোঙানি আর ছটফটানি। সুবিনয়ের হিসাবও যেন মিলছে না। হবে হয়ত সত্যিই! শেষমেষ পাশবাড়ির একজনকে দিয়ে দেবেশকে পাঠিয়ে দিলেন হেডস্যার। স্কুল থেকে বেরবার আগে দেবেশের চোখে একটা খেলা নেচে যেতে দেখল সুবিনয়। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, পশ্চিমপাড়ার ভিডিও হলে একটা-চারটেয় 'চক্ দে ইন্ডিয়া' দেখে স্বাভাবিক বাড়ি গেছে দেবেশ। ওর এমন অভিনয়ে কোলিগদের অনেকেই বেড়ে বাহবা দিলেও সুবিনয় জেনেছে, সম্পর্কের যে মাটিটা ভুসভুস করে দিয়েছে ছেলেটা, তা সহজে পোক্ত হবে না আর। হঠাৎই গোপেন বলে, কিছুই পারবেন না?

কত আর? গোটা তিরিশেক হতে পারে। তা অবশ্য তোমাকে ফেরৎ দিতে হবে না। এখানে একান্ত ব্যক্তিগত তত্ত্ব আছে সুবিনয়ের। তাও সেই ঠেকে গড়া। তা হল, টাকা-পয়সা ধার আর সে দেবে না। কমাতে কমাতে নাগালের মধ্যে যা দেবে, একলপ্তে। তার জন্য না অপেক্ষা, না আফশোস। এ অনেকটা দানের মতো। যা যায় যাক। অল্পের ওপরেই যাক। কেননা, ধার বলে সে যা দেয় তা কখনওই চাইতে পারে না। অথচ ফেরত না পেলে অস্বস্তি হয়। আর অপেক্ষায় বাড়ে টেনশন। বাড়ে শরীর খারাপের বিষব্যথা।

উপরন্তু সেই ডিফেন্স মেকানিজম। নেশা-ফেশা নেই। থাকলে তো কিছু যেতই। তা না হয় এভাবেই...!

এমন গোছাল সব ভাবনা মাথায় রেখেই ও তিরিশ টাকায় ছাড়ান পেতে চেয়েছিল। গোপেনের ফাঁদ থেকে। তাছাড়া সেই যে সেদিনের লোকটা!...

সবে সন্ধে হয়েছে। ওপরের ঘরে টিভির খবরে চোখ ছিল সুবিনয়ের। শান্তা পরের দিনের তরকারি কুটে রাখছিল। ছেলে পিকুল বই হাতে ঘুরে ঘুরে পড়ছিল জীবনবিজ্ঞান। হঠাৎই ডাকঘণ্টায় বার কয়েকের ডিংডং। চেনা হাতের মাপ জানা। এ অচেনা। বিরক্ত সুবিনয় চশমাটা চোখে টাঙিয়ে নীচে নামে। আলোটা না জ্বালিয়েই সদরের ছিটকানি খোলে। বাইরেও একটা আলো-আঁধারি আবছায়া। তার মধ্যেই সটান খাড়িয়ে যেন ভয়ের আকন্দগাছ। ঘাড়ে ঝুলছে চৌকো একটা ব্যাগ। সুবিনয় স্বাভাবিক 'কে'—হাঁকতেই লোকটির গলা বেয়ে বিনয় ঝরে পড়ে। সঙ্গে সেলসম্যান-ই পরিচয়লিপি : আমাকে আপনি ঠিক চিনবেন না মাস্টারমশাই। আমি সরল বিশ্বাস। বাড়ি মানিকনগর। আপনার পুরনো কোলিগ নীলরতন আমার মাসতুতো ভাই। ভেতরে আসতে পারি?

ও, হ্যাঁ আসুন।

স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধের সঙ্গে একটু বিস্ময়ের মাখামাখি। লোকটির আগমনহেতু না জানা অবধি একটু খাপছাড়া ভাব। এভাবেই নিচঘরের সোফায় এসে বসে সে। তার আগে পায়ের সাদা সোয়েডের জুতোটি বাইরে ছেড়ে নেয়। মোজা থেকে শুরু করে জামা-প্যান্ট গোটাটাই সাদা। ঘাড়ব্যাগের স্বাভাবিক কালত্ব থেকে ফুটে উঠছে বাবা-ছাপ খইনির উৎকট বিজ্ঞাপন। ঘরআলোয় সুবিনয়ের সামনে নিজেকে মেলে দেয় ও। তার আগে ঝালিয়ে নেয় সুবিনয়, আপনার বাড়ি মানিকনগর? নীলরতন অর্থাৎ আমাদের নীলু আপনার মাসতুতো ভাই? দু'টি প্রশ্নেরই সহাস্য ও সংক্ষিপ্ত 'হুঁ' উত্তর দিলেও সুবিনয়ের একটু কিন্তু ভাব গজায়। বিশেষ ব্যক্তিগত কারণে স্কুল পালটে শহরে ঘর বাঁধলেও সুবিনয়ের শেকড় পোঁতা আছে সেই মানিকনগরেই। ঘরবাড়ি আছে, মা-বাবা আছে, আছে স্বজন-বান্ধব; আর আছে দীর্ঘচেনা নকশাছক—জায়গার, মানুষজনের। একসময় বলত গঞ্জ, এখন সেমিটাউন। তাহলেও আড়ে-লম্বায় তো বাড়েনি। অথচ এ লোকটিকে ঠিক...! এ বিষয়ে ছুঁড়তে যাওয়া প্রশ্নের ঘ্রাণ শুঁকে নিয়েই সরল বিশ্বাস স্বাভাবিকভাবে বলে, না, আমাকে ঠিক দেখেননি আপনি। আমরা চৌগাছার দেশের বাড়িতেই থাকতাম। এখন বাড়িটা পারঘাটার ওপর বীররাম রুংটার আড়তের পশ্চিমে। লালুমেসোর বাড়িটা তো বাজারের শেষমাথায়? ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের ডানহাতে? এখন অবশ্য পাশেই একটা দাঁতডাক্তারের চেম্বার হয়েছে। হারু মাস্টারের ছেলে বিলটু পাশ করে এসে ওখানেই বসে। বিলটু তো আপনারই ছাত্র ছিল?—কোন বিলটু? হারু দত্তর ছেলে বিল্টন?—হ্যাঁ, ওই।

এমনতরো কথামালা থেকে স্থানসূত্র পোক্ত হয় সুবিনয়ের কাছে। পরিচিতজনসহ স্থানিক ভূগোলেও গোল নেই এতটুকু। অবশ্য সে-মানচিত্রে নতুন কোনও সংযোজন মোটেও অস্বাভাবিক নয়। প্রায় এগারো বছর দেশ ছেড়েছে সে। অবরেসবরে যায় বটে তবে চক্কর মারাটা হয়ে ওঠে না আর। কিন্তু এ লোকটি কি পরে এসেছে? মনপটে ভেসে ওঠা এই সবিস্ময় প্রশ্ন টেনে বাইরে এনে উত্তর দেয় সরল বিশ্বাস : আমাকে না চিনতে পারার অবশ্য আরও দু'টি কারণ আছে।

কী?

আমরা মানিকনগর এসেছি এই ধরুন দশ-এগারো বছর। তাছাড়া আমি ধরুন বছরে ন-দশ মাস বাইরেই থাকি।

ও, বাইরে চাকরি?

না ঠিক চাকরি নয়। ব্যবসা। ইমপোর্ট বিজনেস।

কথা সব চলছে বটে, তার মধ্যেও সুবিনয় লোকটার চোখমুখে এক জাতীয় তাড়াহুড়ো লক্ষ করে। সঙ্গে

অস্থিরভাব। কেননা এরপরেই স্বভাবঢঙে একটু চা-পানের আর্জি পেশ করতেই রে রে করে ওঠে সে। সঙ্গে ঘনঘন ঘড়িতে চোখ। ওর হাতে নেই। ঘরদেয়ালে। এরপরেই সুবিনয়ের প্রশ্নের অপেক্ষা না করে নিজেই গড়গড়িয়ে বলে যায় :

চা-টা এখন থাক মাস্টামশাই। পরে একদিন হবে'খন। আমাকে লাস্ট বাসটা ধরতেই হবে। আসলে কী হয়েছে জানেন? আপনাকে বলতেও খারাপ লাগছে। আবার না বললেও নয়।

আরে বলুন না। অত দ্বিধার কী আছে? দেশের লোক তো নাকি? আবার নীলুর...।

সেই ভরসাতেই তো আপনার কাছে...। আমার একটা বিশ্রী বিপদ ঘটে গেছে মাস্টারমশাই।

বিপদ! কীরকম?

গেছিলাম শিলিগুড়ি।

কেন?

আর বলবেন না। বড় ছেলেটার একটা চাকরি হয়েছে। এম.ই.এস-এ। ওকেই রাখতে বাগডোগরা গেছিলাম।

এ তো বড় খবর। এর আবার বিপদটা কোথায়?

ফেরার পথেই।

তার মানে?

তিস্তা-তোর্সায় ফিরছি। মাঝরাত। সামনেই আজিমগঞ্জ স্টেশন। ট্রেনটি ঢোকার আগেই ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ চেন টেনেছে কি না বোঝার আগেই কামরার জনাতিনেকের মাথায়-ঘাড়ে-পিঠে পড়ে গেল রদ্দা। লুঙ্গি আর কালো গেঞ্জি পরা জনাআটেক হবে। এই দেখুন আমার পিঠে, বলেই লোকটা গায়ের গেঞ্জি তুলে পেছন করে দাঁড়ায়—সুবিনয়ের চোখপথে। পিঠের বাঁ দিকটায় একটা কালো দাগ দেখল বটে ও, তা জন্মদাগ না মারণদাগ, ঠাওর করতে পারল না সুবিনয়ের সরল দৃষ্টি। তবে তাৎক্ষণিক দেখানোর ঢঙে সুবিনয় অস্বস্তিতে বলে, ঠিকাছে, ঠিকাছে।

অর্থাৎ ঘটনার সত্যতা মেনে নিচ্ছে সুবিনয়। ট্রেনের নামধাম, তার সময়-অসময়, অতটা মাথায় না থাকলেও সেখানে গেঁথে যায় দু'টি তথ্য। এক আজিমগঞ্জ, দুই লুঙ্গি আর কালো গেঞ্জি। ডাকাতি-ছিনতাই-রাহাজানিতে এ দুটিই লোকমুখের প্রিয় বিষয়। তাই সে পরের প্রশ্নে চলে যায়, তাপ্পর?

তারপর আর কি। যার যা ছিল, নির্বিবাদে গুছিয়ে দিতে হল সব। আমার কাছে শ'তিনেক টাকা ছিল; গলায় একটা সোনার চেন আর বিয়ের হাতঘড়িটা। টিশট। গেল।

ও, এই ব্যাপার! তারপর?

হাঁটা। বাকি রাতটা স্টেশান। বেঞ্চে কাটিয়ে ভোর ভোর ঘাট পেরলাম। তারপর আবার হাঁটা। পারানির পয়সাটা অবশ্য ছিল।

একথা বলে লোকটা ঘড়ির দিকে তাকায় আবার। উদ্দেশ্য প্রায় পরিষ্কার হলেও সবটা জানতে চায় সুবিনয়। মানে আজকের দিনে হেঁটে কতটা! সবটা কি! জিয়াগঞ্জ টু চাঁদপুর। তা ভেবেই, হেঁটে কদ্দূর এলেন?

এই এ্যাদ্দুর।

তার মানে? পয়সা না থাকলে কি।...

কে আর নেবে বলুন? বাস-লরি-ম্যাটাডোর যাই হোক না কেন, বলতেই তো লজ্জা।

তা অবশ্য ঠিক। তবুও, অ্যাতোটা হেঁটে এলেন!

অগত্যা। আর তাতেই তো বয়ে গেল সারাটা দিন।

সুবিনয় এবার হাঁ করে তাকিয়ে দেখে লোকটিকে। মনে পড়ে ঠাকুরদার কথা। জমিদারি সেরেস্তার কাজে প্রায়ই করতে হত চুয়াডাঙা, মেহেরপুর। দেশবাড়ি থেকে মাইল তিরিশের ধাক্কা। গায়ে গেঞ্জি, কাঁধে জামা আর হাতে ছাতা। পা খালি। বাস নেই, নেই অপেক্ষাও। ছোটতে ঠাকুরদার সঙ্গে বাসপথে দু'-একবার এদিক ওদিক গেলেও সুবিনয়কেও হাঁটিয়ে ছেড়েছে বুড়ো। 'এট্টু পরেই বাস আসবে' বায়না ধরলে উদব্যস্ত ঠাকুরদা দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলত, জুয়ান ছেইলি, হাঁটতে পার না? মটরের লেইগি বইঠিন দ্যাও? চল্। ঠাকুরদা বাসকে বলত মটর্। তো সেদিন আর আজ! ওয়াজেদ আলির ভারতবর্ষ আছে নাকি! সেই হাটি-পা মানুষ! নাকি বিপদে পায়ে তাকৎ বাড়ে! লোকটার তো তবে ধকল গেছে খুব। খিদেও তো! অথচ চোখমুখে তো তেমন! তবুও সুবিনয় একটু চা-টায়ের জন্য আর একবার বলতে গেলে আবার তেড়েফুড়ে নেয় সরল বিশ্বাস, আরে না না। ওসবের দরকার নেই। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার আবার...।

ক'টায়?

সোয়া সাতটায়। আসলে আমার তো জানাশোনা গাড়ি ছিল। মা ভবানী, সত্যসুন্দর, রুমকি। সব বেরিয়ে গেছে। ওরা থাকলে ভাড়াটাড়ার ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সবাইকে তো আর...।

তা তো ঠিকই, কথাটি বলে সুবিনয় ভাবে বাসগুলি তারও চেনা। সেও তো যায়। তবে যা ভেবে পায় না তা হল, অচেনা জায়গায় না হয় মা হল, চেনা জায়গাতেও কি এই বিপদে কোনও বাস নিয়ে যেত না! ভাড়া না হয় গিয়েই দিত। তবুও এ প্রশ্নকে দমিয়ে রেখে সুবিনয় বলে, এখনও সময় আছে। সবে ছটা পঁচিশ। বাস স্ট্যান্ড তো কাছেই। তা আজকের রাতটা থেকে গেলেই তো হয়?

আরে না, না। আজ ফিরতেই হবে। কদিন বাড়িছাড়া। ওদিকে যে সব...।

তা আমার বাড়ি পেলেন কী করে?

পেতে হল। 'ঠ্যালায় পড়ে ঢ্যালায় সেলাম' শুনেছেন তো? নীলু তো আপনার কথায় একেবারে পাঁচমুখ। প্রায়ই বলে। কিন্তু ঠিকানাটা লাগতে পারে কেউই ভাবিনি কোনওদিন। স্কুলের নামটা জানা ছিল। টুকটুক পায়ে সেখানেই যখন গেলাম, আপনি বেরিয়ে গেছেন। আপনার খাস পিওন পদা সবে সদরের তালায় চাবি ঘুরিয়েছে। ওই বলল, মাস্টারমশায়ের বাড়ি আমি তো ঠিক যাইনি। তবে সুনীল স্যারের বাড়ি চিনি। ওই বাড়ির কাছেই। আপনি উখানেই যান। উনি দেখিয়ি দিতি পারবেন অথবা নংটং বলে দেবেন। শহরের ব্যাপার তো, বুইলেন না। এভাবেই আবার সুনীলবাবুর বাড়ি হয়ে আপনারটা পেলাম।

বাব্বাঃ! আপনার হয়রানিও তো কম হয়নি দেখছি!

তা কী আর করা। ভদ্রলোকের ছেলে। যার তার কাছে তো আর...।

তা তো ঠিকই। বলুন, কত হলে আপনার হবে?

গোটা চল্লিশেক। বাস ভাড়াটা হলেই হবে।

চল্লিশ টাকা?

হ্যাঁ, এখন এখান থেকে এক্সপ্রেসে এইরকমই নেয়। আর লাস্ট বাসটা আবার লোকাল নয়। আপনি বোধহয় যাননি অনেকদিন?

আরে না না। আমি তা বলতে চাইনি। বলছি চল্লিশ টাকায় হবে? পথখরচ কিছু?

যথেষ্ট হবে। ওই দিন, আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেব। যেভাবেই হোক।

সে যা হবার হবে। ও নিয়ে ভাববেন না। আপনি বসুন এট্টু।

এভাবে বলে উপরে উঠতেই শান্তা চেপে ধরে। সংক্ষেপে শান্তাকে সব বুঝিয়ে বলে সুবিনয়। শান্তার বিশ্বাসের ভিৎ পোক্ত করতে পরিচয়-পরিচিতির সবখানেই আলো ফেলে সে। বিশেষ করে প্রদীপের ডাকনামে। 'পদা' উচ্চারণ নিমেষেই সন্দেহের পর্দা খানখান করে।

তবুও শান্তা একটু কিন্তু করে মা-সুলভ উদারতা ছড়িয়ে দেয়। বলে, দেখ বাপু, তুমিই বোঝ। দিনকাল যা হচ্ছে! চা-টা তো খেল না কিছুই। তুমি বরং গোটা ষাটেক দিয়ে দাও। রাস্তায় কিছু খেলে খাবে।

সুবিনয়ও এটাই ভাবছিল। বউয়ের সমর্থনে দৃঢ় হল তা।

টাকাটা নিয়ে লোকটা যখন খাড়িয়ে গেল ঘড়িতে তখন সাতটা বাজতে তিন। পায়ে আবার সেই সাদা জুতোটা গলিয়ে বিদায়ের নমস্কার দানের সঙ্গে সঙ্গে দুটি কথা বলল সরল বিশ্বাস। এক, এতটা না দিলেই পারতেন। দুই, যত তাড়াতাড়ি হয় পাঠিয়ে দেব।

রাস্তার পাখির বাসাঘেরা ডুম আলোতে লোকটার চোখে ভিন্নতর ছটা ছিল কি না, তখন বুঝতে পারেনি সুবিনয়। পরে নীলুর সঙ্গে কথা বলে জেনেছে, সরল, নীলুর সাতকুলের কেউ নয়। ঠগটার এটাই ইমপোর্ট বিজনেস। আর বলেছিল, ভাগ্যিস রাতে থাকেনি! থাকলে আরও বড় কিছু...!

এদিকে শান্তা সুবিনয়ের সরল বিশ্বাসকে একচোট ঝুড়ে শুধু এটুকুই বলেছিল, কপাল ভাল ষাটের ওপর দিয়ে গেছে। যেভাবে ওকে নিচঘরে বসিয়ে ওপরে এসেছিলে তাতে বইপত্র না হোক, সাইকেল দুটো তো ছিল! পিকুলেরটা আবার নতুন। কী সব্বোনাশ!

এভাবে বিস্ময়, প্রশ্নচিহ্নের চাপে সুবিনয়ের আজন্মলালিত সরল বিশ্বাস সব ভুসভুসে হয়েছে। আর সব ঠেকে-শেখাদের যেমনটি হয়। বাড়ির সদর আঁটোসাটো করতে হয়েছে আরও। দুপুরচরাদের সেভাবে আর উদোম ডাকে না শান্তা। চেনা-অচেনা সকলেরই মেলে ধরা আয়নাটায় যেন ছোটবড় চিড়ের ভয়াল নকশা।

তবুও টাকা না-নেওয়া গোপেনের ছেলেটার দুঃসংবাদ আজ যেন কিছুতেই স্বস্তি দেয় না সুবিনয়কে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অমঙ্গলচেতনা

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এ যেন আরেক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নন, প্রকৃতির প্রেমে মগ্ন, যাঁকে দেখি বারাকপুরে ঝড়ে ভেঙে পড়া একটি আমগাছের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, 'সলতেখাগী গাছটা ভেঙে গেল! ওযে আমার জীবনের সঙ্গে জড়ানো নানা দিক থেকে। ওরই তলায় সেই ময়নাকাঁটার ঝোপটা, যার সঙ্গে আবাল্য কত মধুর সম্বন্ধ।' (উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কী করব, এই একজন লেখক, যাঁর লেখা পড়তে আরম্ভ করলে থামা যায় না।) 'সলতেখাগীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে গিয়ে জ্বালানী করবে এবার হাজারী কাকা! সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপনার নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি।' ('উর্মিমুখর')

'পথের পাঁচালী'-তেও বিভূতিভূষণ সলতেখাগীর কথা লিখেছেন। আবার সেই বইয়ে ইন্দির ঠাকরুণের কথাও লিখতে তাঁর হাত কাঁপেনি, তাঁর আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা হয়নি। এই অন্য বিভূতিভূষণই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। কিন্তু তাঁর কথা পরে। তার আগে, আমরা বিভূতিভূষণ বলতে যাকে চিনি তাঁর কথাই আরেকটু বলে নিই। 'বেলডাঙার ওপারের বাঁশবনের মাথার ওপর কালবৈশাখীর মেঘের নীল নিবিড় রূপ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কোথা থেকে আবার এক সারি বক সেই সময় নীল মেঘের কোলে উড়ে চলেছে—সে কী অপরূপ রচনা! এদিকে মনে ভয় হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, ঝড় মাথায় মাঠের মধ্যে থাকা ভাল নয়, অথচ যাবো তার সাধ্যি কি! পা কি নাড়তে পারি?' ('উর্মিমুখর')

সেই কালবৈশাখীর মেঘের মতোই ঘনকৃষ্ণ অকল্যাণ যখন নেমে আসে মানুষের জীবনে, তাকে দুর্ভেদ্য তমিস্রায় আচ্ছন্ন করে, সেদিক থেকেও বিভূতিভূষণ চোখ ফেরাতে পারেন না। এক দিকে অপু এবং দুর্গা, আরেক দিকে ইন্দির ঠাকরুণ ও সর্বজয়া, জীবনের রহস্য বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে এই দু'টি মেরুকেই আলিঙ্গন করেছে।

ইন্দির ঠাকরুণের জীবনের শেষ দিনটিতে অমঙ্গলের সেই মূর্তি দেখে আমাদেরও অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় : দুঃখ নয়, সমবেদনা, সহানুভূতি নয়, আক্রোশ, কিংবা ক্ষোভ নয়, একেবারে বিশুদ্ধ ভয়। এ কী মূর্তি মানুষের! নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, কঠোর হৃদয়হীনতা আমাদের জীবনে যেমন তেমনি আমাদের সাহিত্যেও কম নেই। শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'-তে শিশুর মতো সরল ও নিষ্পাপ প্রিয়নাথ, জগতে তার একমাত্র সহায় কন্যা সন্ধ্যার হাত ধরে গ্রামের মোড়ল গোলাপ চাটুয্যের পৈশাচিক লালসার শিকার অসহায় সন্ধ্যার পাশে এসে দাঁড়াল যখন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর সেই বিখ্যাত উক্তটি মনে পড়ে :

Have I not reason to lament/What man has made of man?

কিন্তু একে একেবারে মূর্তিমতী অমঙ্গল, evil, আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল :

'বুড়ি হাসিয়া বলিল,—ও বৌ, ভাল আছিস? এই এলাম এ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এই বয়সে—তাই বলি—

সর্বজয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল,—তুমি এ বাড়ি কী মনে করে?

তার ভাবভঙ্গী ও গলার স্বরে বুড়ীর হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল—এ বাড়ী আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না—সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েছি—ফের কোন মুখে এয়েচ?

বুড়ী কাঠের মত হইয়া গেল। মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল—ও বৌ, অমন করে বলিস নে—একটুখানি ঠাঁই দে আমারে—কোথায় যাব আর শেষ কালডা বল দিকিনি—তবু এই ভিটেটাতে।' বুড়ী জানে না কে দাঁড়িয়ে তার সামনে। ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাসে শয়তান, Satan, হচ্ছে অমঙ্গলের অধিপতি Prince of Darkness, দয়া, মায়ার সে চিরশত্রু। তার যারা উপাসক, Satanism যাদের ধর্ম, তারা তাদের উপাসনা-স্থলে ক্রস চিহ্নটিকে উল্টো করে স্থাপন করে, অর্থাৎ তাদের ধর্ম প্রেমের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সাধারণ দরিদ্র ঘরের এক গৃহবধূ, দুটি সন্তানের পরম স্নেহময়ী জননী, তার মধ্য দিয়ে, ইন্দির ঠাকরুণের আকাশ

বাতাস আচ্ছন্ন করে আত্মপ্রকাশ করল অমঙ্গলের এমন এক রূপ, যা তার অত দুঃখের জীবনেও সে কখনও দেখেনি, যা তার বোধশক্তির অতীত, যা তাকে এমন এক অজ্ঞেয় রহস্যের সামনে নিয়ে এসে হাজির করল, যার বন্ধ দরজায় হাজার করাঘাত করলেও কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। সে জানে এই অভাবের সংসারে সে গলগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয় সে জানে, তার ছোটখাটো আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার অতি নগণ্য সব হৃদয়বৃত্তি, এ-সবের কোনও মূল্য নেই এ সংসারের গৃহিণীর কাছে, তবু সর্বজয়া তো ইন্দির ঠাকরুণের অত আদরের অপু-দুর্গার মা। কিন্তু এ কে! ইন্দির ঠাকরুণ তার দুঃখের জীবনের অন্তিমলগ্নে মনুষ্য নামক জীবের সামগ্রিক অসহায়তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সে দেখে, অমঙ্গলের চূড়ান্ত রূপ, যার পরে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই, অমঙ্গলের সেই ঘনীভূত সত্তা এক সামান্য গ্রাম্য গৃহবধূর মূর্তি ধারণ করেছে। এ সর্বজয়া নয়, এ ঘনীভূত evil।

বিভূতিভূষণ বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, একে বোঝবার চেষ্টা করা বৃথা, এর আবির্ভাব যখন যেখানে ঘটে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমরা শুধু চেয়ে দেখতে পারি। যেমন তাজমহল আমরা শুধু চেয়েই দেখতে পারি, ভাবতে পারি, 'এ কি সম্ভব?' তাজমহল যেমন সুন্দরের এও তেমনই অসুন্দরের, অশুভের এক অবিশ্বাস্য প্রকাশ।

এ কোনও ব্যাখ্যা দেয় না, কোনও কৈফিয়ৎ দেয় না, এ যা এ তাই। যা কল্যাণকর, যা মঙ্গলদায়ক, যা শুভ, এ তার চিরশত্রু। ম্যাকবেথ নাটকের তিন ডাইনির সমবেত সংগীতে এই অমঙ্গলের জীবনদর্শনই ঘোষিত : 'Fair is foul and foul is fair,' কাজেই আমাদের আর্তি, আমাদের মর্মান্তিক বেদনার সামনে এ নিরুত্তর। ম্যাকবেথ নাটকের উল্লেখ করলাম, কিন্তু শেক্সপিয়রের যে-নাটকে এই অমঙ্গল নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করেছে সেটি হল ওথেলো। বিখ্যাত শেক্সপিয়র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক চেম্বারস বলেছেন, বাহ্যত ইয়েগো মনুষ্যাকৃতি হলেও, আসলে সে মূর্তিমান evil, 'The incarnation of the forces of evil, of this devil himself.' তার motiveless malignity'র কথা বলা হয়েছে। ওথেলো ও ডেসডিমোনার রচিত প্রেমের স্বর্গকে বিষিয়ে তোলা, তাদের ধ্বংস করাতেই তার চরিতার্থতা। যে motive-এর কথা ইয়েগো বলেছে সেটা অতি অকিঞ্চিৎকর।

গৌরকিশোর ঘোষের একটি ছোট গল্প আছে 'প্রশ্ন' নামে। উত্তমপুরুষে লেখা কাহিনিটি বলছেন এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের একজন বড় অফিসার। তাঁর কাছে এসেছেন তাঁর এক বেকার বাল্যবন্ধু, অনেক দিন থেকে তার বড়ই দুরবস্থা, বড় অনটন। এসেছে বন্ধুর কাছে কিছু সহায়তা, একটু আনুকূল্যের প্রত্যাশায়, যদি কিছু একটা কাজ জুটিয়ে দেন। সেই বড় কোম্পানির বড় কর্তা নিজেই বলছেন, তিনি তাকে কোনওরকমভাবে এতটুকু সাহায্য করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। এমনকী সেই পথক্লান্ত ক্ষুধার্ত বাল্যবন্ধুকে এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু খাবার আনিয়ে দিতেও তিনি রাজি নন। বললেন, 'এটা কাজের জায়গা, রেস্টোরান্ট নয়।'

এই গল্পটা পড়ে আমি গৌরকিশোরকে বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলাম, একজন বন্ধুর প্রতি কোনও মানুষ যে এ-রকম আচরণ করবে, তার একটা কারণ তো চাই? গৌর কোনও উত্তর দিলেন না, আমি পরে বুঝলাম, জীবন, জীবনের ভাল অথবা মন্দ, কোনও উত্তর দেয় না, সেইটাই জীবনের গল্প। অর্থাৎ জীবনে evil-এর কোনও অজুহাত থাকে না। বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে-উপন্যাসে একাধিকবার এই evil-কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দৃষ্টিপ্রদীপ-এ একটি ছোট্ট ঘটনায় দেখি অমঙ্গলের আরেকটি প্রকাশ যা, মনে হয় যেন, ক্ষণিকের জন্য মানুষের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে অসাড় করে দিল।

'পাড়ার চার-পাঁচজন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যিখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকছে, শিকারের গল্প করচে, বাবাও খুব বকচেন। নিতাই আমাকে বাবার সামনে যেতে বারণ করাতে আমি আর দাদা পেছনেই রইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েছে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই পৌঁছলাম। নিতাই বলল—ওই তো পাড়াগাঁয়ের জলা—চল, বিলের ওপারে নিয়ে যাই—ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাত্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না—গেল শুধু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে, চল্ পালাই—তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেছি—বসে বসে টানছে। চল, ছুটে পালাই।'

বাবা পাগল, ছেলে তাকে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, গ্রামের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বাইরে রেখে গেল, যাতে পাগল বাবা আর বাড়ি ফিরতে না পারে। বাবা বাঁওড়ের ধারে বসে বসে সিগারেট টানতে লাগল। ছেলের বন্ধু বলল, চল, ছুটে পালাই।

অমঙ্গলের শনির দৃষ্টি যেখানে পড়ে স্নেহ, মমতা, পিতা-মাতা-সন্তানের বন্ধন, সমস্ত শিশির বিন্দুর মতো উড়ে যায়। তখন তার জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন, কাকে দোষ দেবেন? সর্বজয়ার দারিদ্রকে? জিতুর বাবার ব্যর্থ জীবনকে? এসব তো সংসারে আছেই, কিন্তু অমঙ্গলের যে ভয়ঙ্কর মুখ এ-সবের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে দেখা দেয় এই দারিদ্র, এই ব্যর্থ জীবনের মধ্যে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নেই। এ-সব

উপলক্ষ মাত্র, Evil-এর আবির্ভাব মানুষের জীবনে তার পরেও একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যই থেকে যায়।

'তিরোলের বালা' নামক ছোটগল্পে বিভূতিভূষণ অমঙ্গলকে তার সব রকম আনুষঙ্গিকতা থেকে বার করে নিয়ে এসে একেবারে একটি অনন্যনিরপেক্ষ বাস্তবতা হিসাবে উপস্থিত করেছেন।

'চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ধপধপে ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, ঠোঁটের দুটি প্রান্ত উপরদিকে কেমন একটু বাঁকানো, তাতে মুখশ্রী আরও কি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

সে আর তার দাদা যাচ্ছে তিরোলে, পাগলাকালীর বালা মেয়েটিকে পরানো হবে বলে। 'চুপ করে আছে এখন প্রায় দু মাস, কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে।'

যে-গ্রামে তারা গিয়ে উঠল, সেখানে একটি গৃহস্থের বাড়িতে একটি ঘরে তারা ভাইবোন আশ্রয় নিল, পাশের ঘরে এ কাহিনির কথক।

পরদিন সকালে সে ভাইবোনের উঠতে দেরি দেখে তাদের জানালা দিয়ে দেখল, 'ঘরে এত রক্ত কেন? পূর্ণিমার দাদা চৌকির ওপরকার বিছানায় উপুড় হয়ে কেমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে, বিছানা রক্তে ভাসছে, মেঝেতে রক্ত গড়িয়ে পড়ে মেঝে ভাসছে—আর পূর্ণিমা দেওয়ালের ধারে মেঝের ওপর পড়ে আছে, জীবিতা কি মৃতা বুঝতে পারলাম না।'...

'পূর্ণিমার দাদার গলায়, কাঁধে ও হাতে সাংঘাতিক কোপের দাগ, আগের রাত্রে কুটনো কোটার জন্যে একখানা বড় বঁটি গৃহস্থেরা দিয়েছিল, সেখানা রক্তমাখা অবস্থায় বিছানার ওপাশে পড়ে।'

'হতভাগিনী রাত্রে কোন সময়ে এই বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়েছে, নিজের হাতে ভাইকে খুন করে ঘরের মেঝেতে অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। দিব্যি শান্ত নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোচ্ছে... ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখাচ্ছে কি সুন্দর, আরও ছেলেমানুষ, নিষ্পাপ সরলা বালিকার মত।'

বিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু কী করে একটা ঘটনা ঘটল, তার ব্যাখ্যা আর, কেন ঘটল, তার ব্যাখ্যা এক নয়।

আমরা শুধু দেখি কী ঘটে? বিভূতিভূষণ তার লেখায় এই ঘটনার, মানুষের জীবনের এই অমঙ্গলের রূপটাই, রূপশিল্পী হিসাবে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

কথাবার্তা

অনিন্দ্য রুদ্র

এই গল্পটা আমার এক সহকর্মীর কাছে শোনা। একটা ছোট ছেলে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে প্রায়ই মোবাইলে ফোন করে। তার সেই বন্ধু আমাদের সহকর্মীর ছেলে, তার সঙ্গে একটি অভিজাত ইংরাজি স্কুলের এক ক্লাসে পড়ে। ফোনে ছেলেটি এমন সব কথা বলে যা লোকে চট করে কাউকে ফোন করে, বিশেষত মোবাইলে ফোন করে বলে না। যেমন কখনও সে বলে, জানিস আমাদের জানলায় অনেকক্ষণ ধরে একটা কাক বসে আছে, কিংবা একটা গোরু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, কি একটা লোক এইমাত্র রাস্তায় চলতে গিয়ে কলার খোসায় আছাড় খেল। এইসব আর কি।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে কথাগুলো যতই অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হোক একটা শিশুর কাছে তার অন্য একটা মানে আছে। প্রত্যেক শিশুরই নিজস্ব একটা জগৎ থাকে। একটা নতুন মানুষ পৃথিবীতে আসার পর একটু একটু করে তার চারপাশের জগৎটাকে যখন বুঝতে শেখে তখন অনেক কিছুই তার চোখে বিস্ময়ের মনে হয়, আমাদের পুরনো-হওয়া চোখে ততটা লাগে না। তখন প্রত্যেক শিশুই চায় সেই নতুন জানাকে কারুর সঙ্গে ভাগ করে নিতে। এই বাচ্চাটির বাবা একটি দূতাবাসের উঁচুর দিকের কর্মী, মা-ও বিদেশি ব্যাংকের ম্যানেজার। বাবা ও মা নিজেদের কাজে ভীষণই ব্যস্ত, তারপর সামাজিক মেলামেশা এসবও আছে। এখন তো সব অণু-পরিবার, বাড়িতে আর কেউ নেই ফলে ছেলেটাকে একটা বিরাট ফ্ল্যাটে দিনের অনেকটা সময় একা একা কাটাতে হয় তখন সেই নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য সে ফোন করে তার বন্ধুটিকে।

এই ছেলেটির কথা শুনতে শুনতে আমার একটা অন্য কথা মনে পড়ল।

লক্ষ করে দেখবেন মোবাইল ফোন আসার পর আমাদের সবাইয়ের কথা বলা অনেক বেড়ে গেছে। সবাই সবসময় কথা বলে চলেছে। এই যে এত আমরা কথা বলছি তার সবটাই কি খুব দরকারি কথা, প্রয়োজনীয় কথা? এমন কোনও কথা যা এক্ষুনি না জানালেই নয়? আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা তা নয়। আসলে আমরা সবাই কোনও না কোনওভাবে এই ছেলেটির মতোই নিঃসঙ্গ এবং একা। ফলে কোথাও একটা ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাওয়া ভয় আর নিরাপত্তাহীনতা থেকেই হয়ত সবসময় যুক্ত হয়ে থাকতে চাই কারুর না কারুর সঙ্গে, ভুলে থাকতে চাই এমন সব কথা, যা মানুষের একা হলে মনে পড়ে। আর সেইজন্যই এই অনর্গল আর অবিরাম কথা বলে চলা।

আমাদের চারপাশে অনেক মানুষের ভিড়, তবুও এমন কেউ থাকছে না যাকে মনের কথা খুলে বলে হালকা হতে পারি। তাই মোবাইলেই আবিষ্ট হয়ে থাকা।

কমিউনিকেশন কথাটার বাংলা মানে কী হতে পারে? যোগাযোগ? একজনের ভেতরের কথাকে অন্যের কাছে বুঝিয়ে বলা? সত্যি কথা বলুন তো যতদিন যাচ্ছে আমরা আমাদের ভেতরের কতটুকু কথা অন্যকে বলতে পারছি? আগে যত সহজে আপনার দুঃখের কথা, কষ্টের কথা অন্যকে বলতে পারতেন, আজও পারেন? সভ্যতা মানুষকে ভাণ করা শেখাচ্ছে, অকপট হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে প্রত্যেক মুহূর্তে যোগাযোগের জন্য নিত্যনতুন প্রযুক্তি বেরচ্ছে, মানুষ যান্ত্রিকভাবে সর্বক্ষণ যুক্ত হবার সুবিধা পাচ্ছে। অথচ দেখুন নিজের কথাটুকু বুঝিয়ে বলতে পারছে না।

এই জন্যই কি চারদিকে ঝগড়া, কলহ, দ্বন্দ্ব, হিংসা আর রেষারেষি? এত একা একা ঘুরে বেড়ানো একলা মানুষ, ভাঙা বিয়ে, ছেঁড়া সংসার? দৌড়তে দৌড়তে আমরা এমন একটি জায়গায় পৌঁছচ্ছি যেখানে অন্যের মনের কথা বোঝবার, শোনবার বা অনুভব করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি?

যে কথা বলবার নয়, সে কথা আমরা প্রচুর বলছি আবার যা বলবার তা আদৌ বলতে পারছি না—সভ্যতার কি এটা একটা প্যারাডক্স নয়?

মৃত্যুর ভিতর দিয়ে

মেঘ মুখোপাধ্যায়

THOMAS

All my life they have been coming, these feet. All my life
I have waited. Death will come only when I am worthy,
And if I am worthy, there is no danger.
I have therefore only to make perfect my will.

—*Murder in the Cathedrel (Part II)* - T. S. Eliot

মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের কাছে খুব প্রিয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনকে দেখতে আর দেখাতে চান পরিণত প্রজ্ঞাবান কবি-লেখকরা। জীবনের রূপ-অর্থ আর তাৎপর্য অন্বেষণ যদি হয় কাব্য-সাহিত্য-শিল্পের এক মৌলিক আর প্রধান উদ্দেশ্য, তবে, তাকে যেন নিবিড় করে ছোঁয়া যায় মৃত্যুর হাত ধরে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ করেন কবিরা। মৃত্যুকে না জেনে জীবনকে জানা যায় না, জীবনকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবনকে ভিতর-বাহির থেকে বা ভিতর-বাহির মিলিয়ে সম্পূর্ণ করে পেতে চায় মানুষ। দৈনন্দিন জীবনযাপনে ব্যতিব্যস্ত আর পর্যুদস্ত এই পৃথিবীর অগণিত সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে যে সচেতন থাকে বা থাকার অবকাশ পায়—তা নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোজগতের প্রতিনিধি হয়ে সেই সাধনা করে চলেন কবিশিল্পীরা। দার্শনিক আর বিজ্ঞানীরাও করেন অন্যভাবে। জীবনকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যান তাঁরা তাঁদের রচনার ভিতর দিয়ে। শুধু কি রচনার ভিতর দিয়ে? তাঁদের বেঁচে থাকার ধরন আর কর্মধারার মধ্য দিয়েও তো। তবে আর আমরা রবীন্দ্রনাথকে জীবনশিল্পী বলি কেন? স্বামী বিবেকানন্দ বা মহাত্মা গান্ধীর জীবনের খুঁটিনাটি জানতে তাঁদের মৃত্যুর এত বছর পরেও এত মানুষের এত আগ্রহ কেন?

মানুষের ইতিহাসে শিল্পচেতনার স্ফুরণের আদি যুগ থেকেই তার আদিকবিরা মৃত্যু দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যে জীবনের সারাৎসার আহরণ করা যায়, তা উপলব্ধি করেছিলেন। আদিকবি বাল্মীকির মুখ থেকে অকস্মাৎ শ্লোক তথা পৃথিবীর প্রথম কবিতার জন্মের কাহিনিটি আমরা ভুলি কি করে? কবিতার এই জন্মক্ষণের পিছনে ছিল মৃত্যুর ভূমিকা। ব্যাধের শরাঘাতে ক্রৌঞ্চের মৃত্যু। দয়িতকে হারিয়ে শোকবিহ্বলা ক্রৌঞ্চীর আকুল ক্রন্দনে বাল্মীকির অন্তরে যে অভিঘাত, তারই পরিণতি ঘটল কবিতায়। কবিতাটির জন্মের মধ্য দিয়ে শোককে অতিক্রম করে গেলেন কবি। ব্যাধকে ধিক্কারের ভিতর দিয়ে তিনি গাইলেন শাশ্বত জীবনের জয়। মৃত্যুকে লক্ষ করে মৃত্যুকে ছাড়িয়ে যেতে চান কবিরা। ছাড়িয়ে কোথায় যেতে চান? মৃত্যুর কথা বলে, মৃত্যুর উল্লেখ করে, মৃত্যুর ওপরে নিয়ে যেতে চান আমাদের। মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে নয়, না-দেখার ভান করে এড়িয়ে গিয়ে নয়, ভয়ে বা বিরক্তিতে ঘাড় ফিরিয়ে থেকে নয়—যা আছে, আমাদের পাশে পাশেই চলেছে, তাকে মেনে নিয়ে। আমরা যখন হিমালয়ের কোনও পথে চলি, চড়াই উঠতে থাকি কোনও অপূর্ব মনোরম স্থানে পৌঁছব বলে, আমাদের পাশে পাশে যেমন অবিরাম স্রোতোধারায় চলতে থাকে এক নদী—কখনও নিকটে, কখনও কিছুটা দূরে, কখনও অনেকটা নীচ দিয়ে—মন্দাকিনী, অলকানন্দা, ভাগীরথী, ঋষিগঙ্গা, পিণ্ডারগঙ্গা, গোমতী, সরযূ, কোশী এমন কোনও না কোনও নদী—প্রকৃতপক্ষে আমাদের যাত্রাপথ তো তৈরি করে দিয়েছে এই নদীই—আমাদের পায়ের তলায় যে পথ, এই হিমালয় ভ্রমণে পথ বলতে আমরা যা বুঝি তা তো গড়ে উঠেছিল নদীর গতিপথ ধরেই, নদীর পাড়ে পাড়ে একটু উঁচু জায়গায়—পাহাড়ি পথকে যদি জীবন বলা যায়, আমাদের গন্তব্যে পৌঁছনোর উপায়, তবে পার্শ্ববর্তী অপরূপা বিচিত্রগামিনী নদীটি হতে পারে মৃত্যুর উপমা—জীবনমৃত্যু চলেছে পাশাপাশি—অবিচ্ছেদ্য স্রোতোধারায়, অবিরাম। স্রোতস্বিনী মৃত্যুর কোলে কোলে চলেছে জীবনের পথ। দু'পাশে ঘনসবুজ অরণ্যময় পর্বতগাত্রের মধ্য দিয়ে, অঙ্কশায়িনী হয়ে হিমালয়ের নদীর চলার ছন্দের, গতিভঙ্গির আর সবমিলিয়ে তার রূপের যেমন তুলনা নেই, তেমনই সে রহস্যময়ীও। সৌন্দর্যের সঙ্গে ওতপ্রোত রহস্য। মায়া। কঠিন বাস্তব অর্থেও হিমালয়ের

বুকে পথ আর নদীর মতো জীবনমৃত্যুর সম্পর্ক অতি নিবিড়; মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে জীবনের পথ চলা—এর মধ্যে কাব্যের অবকাশ নেই। উপমা নিষ্ঠুর বাস্তবসত্যে পরিণত হয়ে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে।

কাব্য-সাহিত্য রচনার প্রত্যুষকাল থেকেই কবিরা জানতে চেয়েছেন মৃত্যুকে। মৃত্যুর তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছেন। বুঝতে চেয়েছেন জীবনের ব্যঞ্জনাকে উপলব্ধি করার অভিপ্রায়ে। জীবনকে আরও নিবিড় করে পাওয়ার জন্য, আস্বাদন করার জন্য। তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত ছড়ানো রয়েছে বেদে-উপনিষদে-রামায়ণে-মহাভারতে-বাইবেলে-কোরানে আর নানা জাতির নানা ভাষার লোককথায়, পুরাণে। উপনিষদ পড়ে আমরা জানতে পারি যে নচিকেতা সশরীরে যমলোকে পৌঁছে মৃত্যুদেবতার মুখোমুখি হয়ে মর্ত আর স্বর্গে লভ্য সমস্ত সুখভোগের বরপ্রাপ্তির প্রলোভন হেলায় সরিয়ে দিয়ে আত্মতত্ত্ব তথা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান পেতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুদেবতার সঙ্গে বালক নচিকেতার কথোপকথনের অনেকটা অংশ জুড়ে পরমব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা থাকলেও আধুনিক দৃষ্টিতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জীবনের স্বরূপ জানা আর মৃত্যুকে অতিক্রম করার সূত্র অনুসন্ধানই হল নচিকেতার অপার কৌতূহলের মূল। বালকটি মৃত্যুদেবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত-বিবশ না হয়ে দৃঢ়সংকল্প আর সংযতবুদ্ধিতে সত্যকে জানার চেষ্টা করেছিল। এই যে পিতার আকস্মিক আজ্ঞায় সশরীরে এক সত্যসন্ধ আর জ্ঞানান্বেষী কিশোরের মৃত্যুলোকে পদার্পণ করে মৃত্যুদেবতার সঙ্গে কথাবার্তায় মেতে ওঠা—সত্যকে জানার একাগ্রতা দিয়ে মৃত্যুদেবতার মন জয় করে ফেলা—কঠোপনিষদে কথিত এই কাহিনি কাকে না রোমাঞ্চিত করে?

মহাভারত পড়ে শেষে মনে হয়, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বিনাশের ভিতর দিয়ে জীবনকে দেখার এক মহাঅভিজ্ঞতা। কত মৃত্যু! কত রকমের মৃত্যু! আর তার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে এই মহাকাব্য—দৈর্ঘে-প্রস্থে বিশাল-বিপুল এক মহানদী। গ্রিক আর শেক্সপিয়রের ট্র্যাজিডি পড়েও অনেক কথার মধ্যে এই কথা মনে জেগে ওঠে। মহাকবিদের কি অভিপ্রায় ছিল মৃত্যুর অভিঘাতে কাব্য বা নাটককে মন্থিত করে জীবনের রহস্য উদঘাটন? রত্ন-আহরণ! মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনকে চিনে নেওয়া, মৃত্যুর কষ্টিপাথরে জীবনের মূল্য পরখ করে নেওয়া। নিখিলেশের মৃত্যু না-হলে যেন ঘরে বাইরে সম্পূর্ণ হচ্ছিল না। এরকম চরিত্রবলের এক নায়ককে বাঁচিয়ে রেখে উপন্যাসটি যেন যথার্থ পরিণতিতে পৌঁছতে পারত না। আনন্দের আর সুন্দরের কবি তাঁর জীবনে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পেরিয়ে এসেছেন বহুবার; মৃত্যুকে নিজের জীবনে দেখেছেন ঘনিষ্ঠভাবে; তাঁর অতি প্রিয়জনদের অকালে ছিনিয়ে নিয়েছিল মৃত্যুর করাল চঞ্চু। কোনও কবির ব্যক্তিজীবনে মুহুর্মুহু মৃত্যুর হানাদারি, এক এক প্রিয়জনকে অন্ধকারের জগতে তুলে নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বুঝি আর কোথাও নেই যেমনটি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের বেলায়। উপনিষদ থেকে কবি পেয়েছিলেন ঠিকই মৃত্যুশোক জয় করার মন্ত্র, মৃত্যুর কাছে অভিভূত হয়ে না পড়ে, সন্তপ্ত হৃদয়কে উদ্‌বোধিত করার শক্তি, কর্মস্রোতে আর উদ্যমে অবিচল থাকার প্রেরণা কিন্তু কাব্য পড়ে, বেদ-উপনিষদ অধ্যয়ন করে তাঁকে মৃত্যুকে জানতে হয়নি। আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় দিনগোনা পুত্রকন্যাদের শিয়রে বসে, তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সম্মুখে দণ্ডায়মান মৃত্যুকে; পরমাত্মীয়ের মৃত্যুশয্যায় বসে শীতল হয়ে আসা ললাটে হাত রেখে নিজের রক্তস্রোতে তিনি টের পেয়েছিলেন মৃত্যুর উপস্থিতি, মৃত্যুর অস্তিত্ব। তাছাড়া বাল্যকালে দেখেছিলেন মায়ের মৃত্যু, প্রথম যৌবনে কাদম্বরী দেবীর আর মধ্য যৌবনে স্ত্রীর মৃত্যু। ব্যক্তিজীবনের এইসব মৃত্যুঅভিজ্ঞতা কবির সাহিত্যে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তা নিয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা লিখেছেন, আলোচনা করেছেন। তাই সে নিয়ে আমার মতো অর্বাচীনের বেশি কথা কী? তবুও বলি, নৈর্ব্যক্তিকভাবে মৃত্যুকে দেখার একটা বিরল দৃষ্টি—অন্তর্দৃষ্টি—অর্জন করতে হয় কবি-সাহিত্যিকদের—রবীন্দ্রনাথে দেখতে পাই এই অর্জনের পরাকাষ্ঠা। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা, আরও নিখুঁত করে বলার চেষ্টা করলে অকালমৃত্যুর অভিঘাত, প্রিয়জনের সঙ্গে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত চিরবিচ্ছেদের বেদনা রবীন্দ্রনাথের জীবনচেতনা নির্মাণে এক বড় উপাদান হয়ে উঠেছিল। মৃত্যু এসেছিল তাঁর কাছে 'সত্তা দিয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতা' হিসাবে, 'সে কেবল কানে শোনা' তত্ত্ব হিসাবে নয়। (উদ্ধৃতির শব্দগুলি অন্য এক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষ, আমি মৃত্যুর প্রসঙ্গে এখানে প্রয়োগ করলাম।) প্রত্যেক কবি বা ঔপন্যাসিককেই মৃত্যুকে এভাবে 'সত্তা দিয়ে পাওয়া'-র অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে যেমন করেছিলেন দস্তোয়েভস্কি। 'সত্তা দিয়ে' তিনি পেয়েছিলেন মৃত্যুকে। যদিও রবীন্দ্রনাথের থেকে ভিন্ন রূপে সে 'পাওয়া'। আর তার পরের কাজ নৈর্ব্যক্তিকভাবে তাকে গ্রহণ করা, চৈতন্যের অঙ্গীভূত করা আর আপন সৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া। এই উপলব্ধি না হলে, জীবনকে ধ্রুবতারা জ্ঞান না করলে তো এমন করে গাওয়া যায় না—

দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখতাপ, কত শোকদহন
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান॥

খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃতভবন দ্বার—
শ্রান্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, এ পথের হবে অবসান॥

কিংবা

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্রতারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে॥

মৃত্যুকে অনিবার্য জেনেই মৃত্যু সম্বন্ধে উদাসীন থাকা মানুষের ধর্ম। কিংবা এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক যে যা-অবশ্যম্ভাবী, যা-অনিবার্য পরিণাম, তার সম্বন্ধে বেশি করে সচেতন থাকা বা সচেতনতা বজায় রাখার প্রয়োজন কি! একজন কিশোর বা যুবা সহজাতভাবেই মৃত্যু সম্বন্ধে উদাসীন, যদি না সে কোনও মারণব্যধিতে আক্রান্ত হয়। অল্প বয়সে কালান্তক ব্যধির প্রকোপ আর আসন্ন মৃত্যু যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মে বিচ্যুতি ঘটাতে সক্ষম। মৃত্যু তখন আর তার কাছে কল্পনাবিলাস থাকে না, মৃত্যু তখন তাকে দিনে দিনে দণ্ডেপলে ময়ালের মতো গ্রাস করছে, ক্ষুধার্ত অন্ধকার বিবরে টেনে টেনে পুরে নিচ্ছে। কিন্তু ভানু সিংহ ঠাকুরের কোমল মৃত্যুপদাবলী আমাদের তরুণ কবির কল্পনাবিলাস বলেই মনে হয়, যদিও মৃত্যুর এক মনোগ্রাহী চিত্ররূপ রচনায় তিনি সমর্থ—

মরণ রে,
তুহুঁ মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজূট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যামসমান।

এই কবিতাটিতেই মৃত্যুর প্রতি উদাসীন না থাকার, মৃত্যুকে উপেক্ষা না করার কবিদের যে-দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে চাইছি, তার একটি বিশেষ উচ্চারণ পেয়ে যাই—

তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও
মরণ, তু আও রে আও।
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি, ...

যদিও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনের দিকে সাগ্রহে তাকানোর রূপটি এই কবিতায় তেমন করে ফুটে ওঠেনি, যা শতদলের মতো পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছিল অনেক পরের এই গানটিতে, যে-গান শুনে আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি অনন্তকাল—

অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক
তখন আমি ছিলেন শয়ন পাতি।
বিশ্ব যখন তারার আলোয় দাঁড়ায়ে নির্বাক,
ধরায় তখন তিমির গহন রাতি।
ঘরের লোকে কেঁদে কইল মোরে,
'আঁধারে পথ চিনবে কেমন ক'রে?'
আমি কইনু, 'চলব আমি নিজের আলো ধরে,
হাতে আমার এই-যে আছে বাতি।'
...
হঠাৎ শিরে লাগল আঘাত বনের শাখাজালে,
হঠাৎ হাতে নিবল আমার বাতি।
চেয়ে দেখি পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্ কালে—
চেয়ে দেখি তিমিরগহন রাতি।
কেঁদে বলি মাথা করে নিচু
'শক্তি আমার রইল না আর কিছু!'
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি কখন পিছু পিছু
এসেছে মোর চিরপথের সাথি।

কিছুকাল আগে বছর তিনেকের ব্যবধানে আমার দুই নিকটাত্মীয়—দাদা আর কাকা—চুয়াল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে ভরাযৌবনে যথাক্রমে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া আর এক পথদুর্ঘটনায় অকালে অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে যাওয়ার পর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় একাকী নির্জন ঘরে দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে এই গানটি শুনতে শুনতে আমি চূড়ান্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কখনও উচ্চাঙ্গসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত বা বাউলগান শোনার কালে যে কী অনির্বচনীয় আনন্দ-অনুভূতি হয়—সে পরম অভিজ্ঞতা লাভে আমি ধন্য হয়েছি। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় এ গানটি শোনার অভিজ্ঞতা কখনও ভুলবার নয়। অকালে আমার নিকটাত্মীয় বিয়োগের জমে থাকা বেদনার সঙ্গে এই গানটির কথা আর সুর মিশে গিয়ে এমন এক অভিভব সৃষ্টি করেছিল যা দুর্লভ বলে আমার মনে হয়েছে। এ গানের মধ্য দিয়ে কি আমার আত্মীয়বিয়োগ বেদনার প্রশমন ঘটেছিল? মৃত্যুর ভিতর দিয়ে কি জীবনের অর্থ উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলেন কবি? গানটির কোথাও কিন্তু মৃত্যু, মরণ বা সমার্থক কোনও শব্দ নেই। 'অকারণে অকালে ডাক পড়া', 'আঁধারে পথ চেনা', তিমির গহন রাতি', 'ঘরের লোকের কান্না'—এই উদাহরণগুলি দিয়ে কবি আভাসে মৃত্যুর প্রতিমা গড়েছেন, শেষ পর্যন্ত গানটি মৃত্যুর কাছে পরাভূত না-হওয়ার আর উজ্জীবনের গান হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঔপনিষদিক তত্ত্বজ্ঞান-ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে যে-'মোর চিরপথের সাথি'-র কথাই বলুন না কেন, আমরা সেই আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ না করার শ্রোতা-পাঠকের স্বাধীনতা

নিয়ে বলতে পারি যে কখন পিছু পিছু এসে পৌঁছনো আমাদের এই চিরপথের সাথি এক অম্লান অবিনশ্বর জীবন বা মানুষের অপরাজেয় অমলিন জীবনবোধ ছাড়া আর কিছু নয়, যে-অফুরান জীবনবোধ থেকে পরবর্তী একজন কবি বললেন—

আমি ঝ'রে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে—

জীবনানন্দর অসংখ্য উজ্জ্বল কবিতা মৃত্যুর বোধে স্পন্দিত। প্রখর মৃত্যুবোধ থেকে উঠে এসেছে কবিতাগুলি। মৃত্যু এসে ডেকে নিয়ে যায় মানুষ-মানুষীকে। মৃত্যু এসে আপনজনের মতো কথা বলে:

তারপর একদিন উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে
কহিবে : তোমারে চাই—তোমারেই, নারী;
এইসব সোন-রূপা মশলিন যুবাদের ছাড়ি
চলে যেতে হবে দূর আবিষ্কারে ভেসে। (স্থবির যৌবন)

পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি পড়ে যেতে যেতে মোহাবিষ্ট হতে হয়, বিহ্বল হয়ে যেতে হয়। মৃত্যুর ব্যঞ্জনাময় পৌরাণিক নানা উপমা-রূপক-চিত্রকল্প উঠে আসতে থাকে তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের পর বিস্ময়কর রকম আধুনিক হয়েও—ভাষায়, চিন্তা-চেতনায়, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায়, সমকালের আর সমাজজীবনের প্রখর বোধে—তিনি কত সহজে অতিপ্রচলিত অভ্যাসজাত মৃত্যুর ইঙ্গিতময় শব্দ ব্যবহার করেছেন ভেবে অবাক হতে হয়। আধুনিকতার ধারণায় আটকায়নি—আর এভাবে আধুনিকতার ধারণার প্রসারণ ঘটিয়ে দিয়েছেন। একটি কবিতা শুরু করছেন এই বলে—

কি যেন কখন আমি মৃত্যুর কবর থেকে উঠে আসিলাম
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী
শকুনের মতো কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে উড়িলাম।

পরে বলেছেন—

শুধালাম : 'তোমাদের দেখেছি যে বৈতরণী পারে
সেইখানে ঘুম শুধু-শুধু রাত্রি-মৃত্যুর নদীর পারে, আহা,

আরও বলেছেন—

'কোথায় যেতেছ তুমি? পৃথিবীতে? সেইখানে কে আছে তোমার?
'আমি শুধু নাই, হায়, আর সবই রয়ে গেছে—
সকালে এসেছি আমি নেমে
বৈতরণী : তার জলে; —যারা তবু ভালোবাসে-
ভালোবাসিবার পৃথিবীতে রয়েছে আমার!'

কবিতাটি শেষ করছেন এই ভাষায়—

বৈতরণী-বৈতরণী—শান্তি দেয়-শান্তি-শান্তি-ঘুম-ঘুম-ঘুম
অবিরত তারি দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।

সম্পূর্ণ কবিতাটির নাম দিয়েছেন 'বৈতরণী'। হিন্দু পুরাণ অনুসারে মর্তলোক থেকে মৃত্যুলোকে পৌঁছনোর মাঝে পড়ে এই নদী। বারবার শকুনের কথা, কালো ডানা মেলে তার ওড়ার কথা—শকুনও তো মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত এক মহাকায় পাখি। কিন্তু এমন নিবিড় করে মৃত্যুর কথা বলে, সারা কবিতায় মৃত্যুর আবহ আর শাব্দিক অনুষঙ্গ রচনা করে কবি কি মৃত্যুর উপাসনা করলেন? তাঁর আসল বার্তা তো রয়ে গেল এইসব উচ্চারণে, এইসব অভিলাষে—

শকুনের মতো কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে
উড়িলাম
সাত-দিন সাত-রাত উড়ে গেলে সেই আলো পাওয়া
যায় যদি
পৃথিবীর আলো প্রেম?
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী।
...
আবার চলেছি উড়ে একা-একা শকুনের কালো পাখা
মেলে
পৃথিবীতে তাহাদের দেখিয়াছি—আজো তারা মনে করে
রেখেছে আমারে,
ভালোবাসে; —রক্তমাংসে থাকিতাম তবু যদি-আমার এ
সংসর্গের ভালোবাসা পেলে,
রোজ ভোরে রোজ রাতে আমারে নতুন করে পেলে
তাহারা বাসিত ভালো আরও বেশী-আরও বেশী এই
শুধু আর কিছু নয়—

(প্রসঙ্গত লক্ষ করার বিষয় যে, শুরুতে 'কবর'—এই ইসলামীয় ধারণাটির সঙ্গে পরের চরণেই 'বৈতরণী নদী'—নামের হিন্দু পুরাণের ধারণাটিকে কত অনায়াসে মিলিয়ে দিয়েছেন। মহৎ কবিরা পারেন আপাতঅসঙ্গতকে তাঁদের উচ্চারণে সামঞ্জস্যময় করে তুলতে।)

আশ্চর্য! এই 'বৈতরণী' শব্দটিকেই ফিরে পাই 'শকুন' নামের কবিতায়!

—কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্
মৃত্যুর ওপারে;
যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ-জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ন
লেগুন...

এই কবি তাঁর কবিজীবনের নানা পর্বে নানা স্বরে ঘুরে ফিরে মৃত্যুর কথা বলেছেন। মৃত্যুর চিত্রকল্পে অনুষঙ্গে ভরপুর

তাঁর কবিতাসমগ্র। মৃত্যুর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ বাক্যালাপ করে গিয়েছেন সারা জীবন। গাঢ় স্বরে বলেছেন—

এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে;
(শীতরাত)

মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধরে;
—কাশের রোগীর মত পৃথিবীর শ্বাস,—
যক্ষার রোগীর মত ধুঁকে মরে মানুষের মন!
জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ!
মরণ, —সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে!

মৃত্যুরেও তরে তারা হয়তো ফেলিবে বেসে ভালো!
সব সাধ জেনেছে যে সে-ও চায় এই নিশ্চয়তা।

রাত্রির ফুলের মত—ঘুমন্তের হৃদয়ের মত
অন্তর ঘুমায়ে গেছে, —ঘুমায়েছে মৃত্যুর মতন!

আবার সন্ধ্যার রঙে ভ'রে ওঠে সকল আকাশ,—
মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভ'রে!

মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো, —প্রিয়ার মতন!—
চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকায়েছি মুখ;

মনে রাখতে হবে মৃত্যুআরাধনাময় এই পঙ্‌ক্তিগুলো যে কবিতাটিতে রয়েছে, তার নাম কিন্তু 'জীবন'। নামটি থেকে আমাদের সামনে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো সব স্পষ্ট হয়ে গেল! মৃত্যুকে চুরমার করে তিনি বেঁচে উঠতে চাইছেন। জীবনের প্রতিই তাঁর একান্ত টান, একাগ্র নিষ্ঠা। কিন্তু এরকম করে বললে তা যেন কিছুটা সরলীকরণ হয়ে যায়। একরৈখিক হয়ে দাঁড়ায়। মৃত্যু আর জীবনের ভিতর এক জটিল দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ছিলেন তিনি। নিবিড় জীবনপ্রেমী এই কবি জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চেয়ে, সতেজ সজীব জীবনের অঙ্গনের ধুলোয় লুটোপুটি খেতে খেতে তবুও যেন মৃত্যুর গহ্বরে ঝুঁকে পড়েছিলেন এক আদিম অব্যক্ত ঘোরে। জীবনের প্রতি নিঃসংশয় আস্থায় কোথায় যেন ঘাটতি ছিল। নিশ্চিত প্রতীতি ছিল না। সৌন্দর্য, বাতাস, আকাশ, ঘাস, শিশির, সমুদ্র, নক্ষত্র, রূপকথা, কালো খোঁপা, চাল ধোয়া হাত, মেঠো চাঁদ, সোনালি রোদের রং, মাছরাঙা, গাঙচিল, লক্ষ্মীপেঁচা, সাপমাসি, কুয়াশা, কুমারীর বুকের নিঃশ্বাস—জীবনভরপুর এইসব উল্লেখে, বারংবার কথনে, ফিরে ফিরে বলতে ভালবাসায় স্পন্দমান তাঁর কবিতা, তবুও, এই পৃথিবী আর 'মানুষের দেশ' ভালবেসেও 'পৃথিবীর পথ ছেড়ে' যাওয়ার এক জটিল কামনায় কম্পিত হত তাঁর হৃদয়।

বাদামি-সোনালি-শাদা ফুটফুটে ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল, —
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হয়ে
(পাখিরা)

জীবনের উপমা দিচ্ছেন মৃত্যু দিয়ে! আর মৃত্যুই অতল সত্য। জীবন আর মৃত্যু, মৃত্যু আর জীবন জড়াজড়ি করে আসছে তাঁর মানসলোকে। পাঠকের পক্ষে পৃথক করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কবি আসলে কার কথা বলতে চাইছেন? মৃত্যুর, না জীবনের? মৃত্যুবহুল তাঁর পঙ্‌ক্তিমালা আমাদের বিহ্বল করে দেয়। কিন্তু তাঁর অভীষ্ট যে মৃত্যু নয়, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তিনি আলোকময় উজ্জ্বল জীবনের অঙ্গনে পৌঁছতে চাইছেন দুর্মর আবেগে, দুর্গম পর্বতমালার বুকে অন্ধকার সুড়ঙ্গপথের শেষে যেমন আলোর ঝলকানি, চারপাশে সবুজ আর সবুজ, সুড়ঙ্গের প্রান্তে যেমন অপেক্ষা করে থাকে আলো ঝলমল পথের উল্লাস, উদার নীলাকাশ, যাত্রীদল সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে সেখানেই পৌঁছতে উন্মুখ—জীবনানন্দর কবিতা যেন সেইরকম। তাঁর অন্বিষ্ট এক অফুরান জীবন : বিশ্বাস, ভালবাসা, প্রেম, স্নেহ, আশ্বাস, আশ্রয়। 'কোথাও জীবন আছে,—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে। কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়/খেলার বলের মত তাদের হৃদয়/এই জানিয়াছে;' —তিনি চাইছেন নদীর জল, সাগরের তিতা ফেনা নয়। পাখিরা তা জানে, তিনিও জানতে চান। শীতকে পিছনে ফেলে তিনি বসন্তের আগমনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। মৃত্যুলাঞ্ছিত মৃত্যুবিহুল এই কবির আকাঙ্ক্ষা—

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ-গভীর-গভীর।
(পাখিরা)

মৃত্যুর প্রতি কবির একটি মনোভাব আমরা টের পেয়ে যাই যখন বলেন সমুদ্রপাখিরা—'ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর/ নেমেছিল তারা তারপর,— /মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।' মরে গিয়ে নয়, মরণের গহ্বরে নিজেকে সঁপে দিয়ে নয়, বেঁচে থেকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন—'যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে/অপরাজিতার মতো নীল

হয়ে—আরো নীল—আরো নীল হয়ে/আমি যে দেখিতে চাই;'।

আধুনিক কবির এই জীবনপিপাসা আর মাটির পৃথিবীকে ভালবাসার, অনিঃশেষ টানের গান রবীন্দ্রনাথ গেয়ে উঠেছিলেন এই স্বরে—

ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন
হোথায় ছিল কোন যুগে মোর নিমন্ত্রণ—
আমার লাগল না মন লাগল না,
তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চ'লে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে॥
হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন,
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন—
আমার লাগল রে মন লাগল রে,
তাই এইখানেতেই দিন কাটে এই খেলার ছলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে॥

মানুষের আকাঙ্ক্ষা সমস্ত রকম দুঃখ আর ভয়বর্জিত এক জীবন। অনেকরকম দুঃখ আর ভয়ের মধ্যে প্রধান একটি হল মৃত্যু—মানুষের এই রক্তমাংসের শরীরের বিনাশ। (অন্যতম প্রধান আর একটি হল দারিদ্র, যা অবিচার, নিষ্ঠুর শোষণ আর বঞ্চনার পরিণাম।) পার্থিব বস্তুশরীরের লয়প্রাপ্তি—বয়সের গতিতে স্বাভাবিক পরিণত কাম্য বিনাশ কিংবা নিরাময়হীন রোগেতাপে ক্ষয়ে জীর্ণ হয়ে বা আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অপ্রত্যাশিত ধ্বংস। জ্ঞানীরা তথা কবি-শিল্পীরা তাই মৃত্যুর স্বরূপ বুঝতে চেয়েছেন। কোন আদিকাল থেকে, জীবনমৃত্যুর চেতনার উন্মেষপর্ব থেকে, আজ পর্যন্ত কবি লেখকদের এই চেষ্টার ক্লান্তি নেই। জীবনের পথে হাঁটতে গেলে মৃত্যুর স্বরূপ জানতে হবে। জীবনেরই অংশ মৃত্যু—বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কিছু নয়। জীবনেরই সঙ্গে মিশে আছে সে—আকাশের সঙ্গে মিশে থাকা নীলের মতো, সমুদ্রের সঙ্গে মিশে থাকা তরঙ্গের মতো, পউষের সঙ্গে মিশে থাকা শীতের মতো, রাগসংগীতের সঙ্গে মিশে থাকা তান-মীড়ের মতো। কৃষ্ণপক্ষের মধ্যনিশীথের গ্রামীণ আকাশ ভিন্ন যেমন নক্ষত্রময় পৃথিবীর রূপ খোলে না, তেমনই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না গেলে মৃত্যুকে চিনে নেবার চেষ্টা না করলে যেন জীবনের, এই বেঁচে থাকার বিস্ময়ের রস মেলে না। রবীন্দ্র-জীবনানন্দর পর আমাদের প্রধান আর প্রিয় কবিদের কবিতায় এই প্রসঙ্গটি নিয়ে স্থানান্তরে বিশদ আলোচনা করা যাবে, এখন শুধু লক্ষ করি, শঙ্খ ঘোষ কেমন নিবিড় বিশ্বাসে বলতে পারেন—

বলি যে জাতক বীজে মাটির কেশর মেখে মেখে
এক মরণের থেকে আরেক মরণে যেতে যেতে
আমার আমির থেকে জেগে ওঠে আরো আরো আমি
আমিই শতাব্দী আমি আদিঅন্তহারা মহাদেশ
আমি এই শতাব্দীর শহিদশিখর থেকে বলি
মৃত্যুর ভিতরে আজ কোথাও মৃত্যুর নেই লেশ
দেখো এ মৃত্যুর মধ্যে কোথাও মৃত্যুর নেই লেশ।
(শহিদশিখর/ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার)

'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শুরু হচ্ছে হারু ঘোষের মৃত্যু দিয়ে। বাড়ি ফেরার পথে বজ্রাঘাতে একজনের হঠাৎ মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম জীবনের জটিলতাময় এক উপন্যাসের অন্দরে। জীবনের রহস্য-জট-কঠোর বাস্তব-গূঢ় আকাঙ্ক্ষা-কামনা-প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি-বেদনার উপন্যাস রচনার সূচনা হিসাবে মানিক কেন বেছে নিয়েছিলেন একটি মৃত্যুর ঘটনা? মৃত্যুর মতো সত্য আর বাস্তব আবার একইসঙ্গে রহস্যময় আর কিছু হয় না বলেই কি? নিছক বস্তুবাদীরা বলবেন, যাকে সত্য, যাকে বাস্তব বলা হচ্ছে তা আবার রহস্যময় হয় কীভাবে? মৃত্যু তো মৃত্যুই, এক চিরঅবসান। কিন্তু কবি কথাসাহিত্যিকদের কাছে মৃত্যু তার আপাত অর্থকে ছাড়িয়ে যায় বহুদূর—তবেই না কাব্য-শিল্প সম্ভব। বাস্তবেই যদি সব শেষ হয়ে যায় তবে তো আর শিল্প বলে কিছু হয় না। কাব্য, সংগীত, চিত্র, নৃত্য, চলচ্চিত্র—এসব কলার জন্ম হয় না, মানুষ এসব নিয়ে মাথাও ঘামাত না, হৃদয় দিয়ে উপভোগ আর উপলব্ধি করার চেষ্টা করত না। মৃত্যু নিয়ে কোনও অলৌকিকতা বা পারলৌকিক ভাবনা আমাদের বিবেচ্য নয়। আমরা জানতে চাই, ইন্দির ঠাকরুন আর দুর্গার মৃত্যু কীভাবে 'পথের পাঁচালী'র জীবনপাঁচালি সৃষ্টিতে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণ কীভাবে এই মৃত্যুদুটিকে দেখেছিলেন। কাশীতে হরিহরের মৃত্যুরই-বা কী তাৎপর্য রচনা করেছেন লেখক তাঁর 'অপরাজিত' উপন্যাসে?

আসন্ন মৃত্যুর বা হত্যার মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ কেমন করে তাকে গ্রহণ করে, মোকাবিলাই বা করে কেমনভাবে, কী ঘটে সেই মানুষটির ভিতরে, তার দু'টি আখ্যান—একটি পৌরাণিক তথা মহাকাব্যিক আর অন্যটি আধুনিক, যদিও দুটি আখ্যানেরই মূল রয়েছে দূর অতীতে—আমাদের গভীর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে বহুদিন থেকে। প্রথমটি আছে মহাভারতে : এক কোপন মুনির অভিশাপে রাজা পরীক্ষিতের সর্পদংশনে মৃত্যু; মৃত্যুকে অনিবার্য না-মনে করে, বেঁচে থাকার, আয়ুকে দীর্ঘায়িত করার দুর্মর আবেগে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে মৃত্যুকে নিবারণ করার অদম্য প্রয়াস। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এক শক্তিমান সম্পদবান রাজা এই চেষ্টা করেছিলেন আর শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এই আখ্যানের ভিতর দিয়ে আমরা সাধারণ মানুষরা মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের মনোভাবের একটা চেহারা পেয়ে যাই। হার না মানার, এত সহজে বিনাশকে মেনে না নেওয়ার এক জেদ, এক অঙ্গীকার। নানা দিক থেকেই এই টানটান আখ্যানটিকে দেখা যায়।

দ্বিতীয় আখ্যানটি পাই এলিয়টের 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' নাটকে। মধ্যযুগের ইংলন্ডের এক আর্চবিশপের হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস আর জনশ্রুতি অবলম্বনে এলিয়টের এ-নাটক আমাদের মৃত্যু আর জীবন প্রসঙ্গে অনেক জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেয়। মৃত্যুর প্রতি আর্চবিশপের অবিচল, নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, মৃত্যু আসন্ন জেনেও তাঁর নিরুদ্বেগ-প্রসন্ন মনোভাব, ঠিক যেন পরীক্ষিতের আচরণের বিপরীত। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনেও তিনি উতলা হবার কিছু খুঁজে পাননি। এই স্থৈর্য আর দুর্লভ প্রশান্তি দেখেছি ভীষ্মের মধ্যে। পরীক্ষিতকে বা আর্চবিশপ টমাসকে নন, ব্যাস আর এলিয়ট যেন এই তীব্র হননআখ্যানের মধ্যে তাঁদের পাঠকদের ফেলে দিয়েছেন, অমোঘ মৃত্যুর মুখোমুখি করে দিয়ে আমাদের ভিতরের আলোড়নটা আড়াল থেকে লক্ষ করে চলেছেন।

চতুরঙ্গ দপ্তরে আসা উল্লেখযোগ্য পত্রিকা

এবং পরব—স : বুলবুল আহমেদ/সেপ্টেম্বর '০৯/নাকতলা, কল-৪৭—বিষ্ণু দে-র জন্মশতবর্ষে অরুণকুমার ঘোষ ও সুজিৎ ঘোষের দু'টি নিবন্ধ; এছাড়া মনোযোগ কেড়ে নেয় মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি-কথার পুনর্মুদ্রণ আর বিশ্বজিৎ ঘোষের 'বাংলাদেশের নাটক : আদি-নৃগোষ্ঠী কথা'। ১ম সংখ্যাতেই সিরিয়াস পাঠকের কাছে আদরণীয় এই কাগজ।

স্যাস-২৬ (নাট্যপত্র ২০০৯)—স : সত্য ভাদুড়ি/কল-১১১—বহুরূপী সম্পাদককে লেখা ১৯৭৯-তে শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্রর চিঠিগুলি, শাঁওলি মিত্রর 'আমার সময়, আমার থিয়েটার ও আমি', নাট্যকার হর ভট্টাচার্যর সাক্ষাৎকার ছাড়া এই বার্ষিক সংখ্যার আকর্ষণ কয়েকটি মৌলিক আর অনুবাদ নাটক।

অর্কেস্ট্রা—(শারদীয় ২০০৯)—স : সৈয়দ খালেদ নৌমান/বহরমপুর—কবিতা আর কবিতা নিয়ে লেখা গদ্যের সংকলন। বোদলেয়ার, রজনীকান্ত সেন আর কবিতিকা বিষয়ে নিবন্ধ তিনটি উল্লেখযোগ্য।

কবিতা সীমান্ত—(শারদীয় ২০০৯)—স : দীপেন রায়/কলকাতা-৯/প্রচুর কবিতা ছাড়া কয়েকটি প্রবন্ধ। যেমন মুকুল গুহর 'জেমস জয়েসের ট্রাডিশন এখনও কতটা প্রাসঙ্গিক', 'দায়বদ্ধতায় নির্দায়িকতা'—তরুণ সান্যাল, 'কবি বিষ্ণু দে-র বার্ধক্যচেতনা'—তরুণ মুখোপাধ্যায়।

সুইন হো স্ট্রিট—(২০০৯)/কলকাতা-৭৮—এ সংখ্যার আকর্ষণ সিদ্ধি কবিতার অনুবাদ আর কবিতা নিয়ে আলোচনা। শতবর্ষে বিষ্ণু দে ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে নিয়ে প্রবন্ধ।

কবিকৃতি—১৩—স : সুজিত সরকার/কদমতলা-হাওড়া-১—প্রবীণ-নবীনের কবিতার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার আধুনিক কবিতার অনুবাদগুচ্ছ। গ্রাম আর গান নিয়ে সুধীর চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার। তারাপদ-অমিতাভ-প্রণবেন্দু স্মরণ।

না-বলা কথা

মঞ্জু মৈত্র

বসে আছি বারান্দায় ইজি-চেয়ারে। সামনে সমুদ্র। আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। চারদিকে ভিজে মাটির একটা সোঁদা গন্ধ। মিষ্টি এক হাওয়া বইছে। শরীর শিথিল হয়ে আসছে। মনটা কোথায় উধাও হয়ে গেল। ভাবনায় ডুবে গেলাম। স্মৃতিগুলো মেঘের মতো এক এক করে জমা হতে লাগল। সামনে সমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা পাড়ে এসে আছড়ে পড়ছে। আমার জীবনের ঘটনাগুলো ঢেউয়ের মতোই কখনও সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে আবার কখনও দূরে, কত দূরে সরে যাচ্ছে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কখনও-বা। কখন যে জীবনের মধ্যগগন পার করে এগিয়ে চলেছি সায়াহ্নের দিকে, তা নিজেও জানিনি।

আজকে আমার স্বামী অবসর নিয়েছেন সরকারি চাকরি থেকে। চাকরি জীবনের যে সব সুযোগ সুবিধে এতদিন ধরে পেয়ে এসেছি, সে সব আর থাকবে না। অবশ্য তার জন্য কোনও আক্ষেপ নেই। জীবনে চলার পথে সব কিছুরই তো একটা শেষ আছে, এটাও তেমনই মেনে নিয়েছি বিনা দ্বিধায়। ফিকে হয়ে গেছে পুরনো দিনের অনেক কথাই। তবু অনেক ছবিই ভিড় করে আসে। কতদিনের কত ঘটনা। আমার স্বামীর চাকরি জীবনের শুরু থেকে কত স্মৃতি। সমুদ্রের হাওয়া গায়ে জড়িয়ে স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, প্রশ্ন জাগছে সবটাই কি অতীত? না, তা নয়। আজও যেটা বর্তমান তা হল দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, যা আত্মীয়ের মতো সর্বদা পাশে রয়েছে।

এই বয়সে সংসারের দায়দায়িত্ব কমে এসেছে। নিজের জন্য অনেকটা সময় পাচ্ছি। তাই নিজেকে বিশ্লেষণ করতে বা স্মৃতিরোমন্থন করতে ভালই লাগছে। একটা অন্যরকম আনন্দ খুঁজে পাচ্ছি। অনেক কথাই তো বলার আছে। তবে আজ আমার কথাই বলি। নিজেকে জড়িয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো অনেক কথা—কত না-বলা কথা!

আমি একজন আই. এ. এস. অফিসারের স্ত্রী। সব আই. এ. এস. অফিসারের স্ত্রীদের কথা যে এক হবে তা নয়। আলাদা হতে পারে। অমিল তো থাকবেই। তবে মোটামুটি সবার অভিজ্ঞতায় কিছুটা মিল আছে। সাধারণভাবে সবাই জানেন আমরা অর্থাৎ ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস-এর স্ত্রীরা একটা আলাদা গোষ্ঠী। কিন্তু এই গোষ্ঠীগত ব্যাপারটা তো সব সার্ভিসের মধ্যেই আছে। তবে আমাদের দিকেই যে কেন আঙুল তোলা হয় জানি না। সে যাই হোক।

বাইরে থেকে দেখলে চোখে পড়বে আমাদের জীবনের আলোকিত দিক যা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বা ক্ষমতা ও উঁচু পদের মর্যাদায় ভরা। কিন্তু অনালোকিত যে অংশ তার কথা ক'জন জানে বা জানতে পারে? ভাবি, সব কথা মনে আছে কি?

মনে পড়ে মুসৌরির দিনগুলোর কথা। তখন আমার বিয়ে হয়ে গেছে। খুব কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল। উনি আগে সেনাবাহিনীতে ছিলেন এবং সেখান থেকেই পরীক্ষা দিয়ে এই সার্ভিসে জয়েন করেন। আমি লেখাপড়া শেষ করেছি কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি থেকে, অন্য দিকে উনি মুসৌরিতে ট্রেনিং-এ ব্যস্ত। কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম ওখানে।

মুসৌরি জায়গাটা এমনিতেই খুব সুন্দর। চারদিকে পাহাড়। মাঝে মাঝে পুরনো দিনের সাহেবদের তৈরি বাড়ি। এখন অনেক নতুন বাড়ি, হোটেল এসব হয়েছে। এরই মধ্যে ন্যাশনাল একাডেমি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর ইন্সটিটিউশন বা কলেজ। বিশাল জায়গা জুড়ে। একদিকে হোস্টেল, অন্যদিকে কলেজ। এছাড়া হর্স রাইডিং, খেলার মাঠ, আরও কত কি! এর মধ্যে কী বুদ্ধিদীপ্ত সব ছেলেমেয়েরা! ওরা এখানে এসেছে ট্রেনিং-এ। সকাল সাতটা থেকে ক্লাস শুরু, সন্ধ্যায় শেষ। এরপর যা খুশি করা যায়। নানা ধরনের অ্যাকটিভিটি ছিল এবং তা এই ট্রেনিং-এর অঙ্গ। সব থেকে মজার ছিল হর্স রাইডিংটা। সবারই যে ভাল লাগত তা নয় তবুও করতে হত সবাইকে। যার ফলে যারা অনিচ্ছুক ছিল তারা প্রায়ই ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙাত। এখানে বিভিন্ন নামে হোস্টেল রয়েছে ছাত্রদের থাকার জন্য। আমি আমার শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে অন্যত্র থেকেছি। কর্তা আসা যাওয়া করতেন। যাই হোক, এই জীবন সম্বন্ধে আমার কোনও পূর্বঅভিজ্ঞতা ছিল না। বলতে গেলে কোনও ধারণাই ছিল না। কারণ কোনও আত্মীয় বা পরিচিত কেউ এই

সার্ভিসে ছিলেন না। তাছাড়া শিশুকাল থেকে বড় হয়েছি বিহারের সাঁওতাল পরগণার (এখনকার ঝাড়খণ্ড) মধুপুরে। বাবার কর্মসূত্রে যেতে হত বিহারের নানা জায়গায়। তাই আমরা মধুপুরেই শৈশব কৈশোর কাটিয়েছি। সেই সময় প্রধানত শীতকালে শরীর সারাতে আসত চেঞ্জারবাবুরা বিভিন্ন দেশ থেকে। সেখানকার জল হাওয়া এতই ভাল ছিল যে সত্যি সত্যি সবাই সুস্থ থাকত। যানবাহন বলতে ছিল শুধু 'টাঙা'। বেশ লাগত টাঙায় চড়তে। ঘোড়ার গলায় বাঁধা থাকত ঘুঙুর আর যখন সে চলত ঘুঙুরটা বাজত তালে তালে। বাস বা ট্যাক্সি কিছুই ছিল না। সবাইকে হাঁটতে হত। শৈশব থেকে কৈশোরে পৌঁছেছি কত খোলামেলা পরিবেশের মধ্য থেকে। সেই সময় মানে ১৯৫০ সালে আমরা কো-এডুকেশন স্কুলে পড়েছি। এ ব্যাপারে সেই সময় কারও সঙ্কোচ ছিল না, দ্বিধা ছিল না। মনে পড়ে সেখানে তিনটে স্কুল ছিল। এই তিনটে স্কুলের মধ্যে সরস্বতী পুজোয় কী প্রতিযোগিতাই না হত! মূর্তি কাদের কত বড়, কী রকম সাজানো হয়েছে, কী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে—এইসব নিয়ে। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিন্তু স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই করত। আর সাজানোর জন্য ফুলের টব চুরি করা ছিল রেওয়াজ। অন্ধকার থাকতে ভোরের দিকে, বড় বড় সব বাড়ি থেকে ফুলের টব চুরি। সে কী মজার! পুজোর পর তা ফেরত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতাম। এর মধ্যে কী সারল্য ছিল, কী যে আনন্দ পেতাম তা লিখে বোঝানো যাবে না। যাক, ফিরে আসি আবার আমার আই. এ. এস.-গিন্নি হবার অভিজ্ঞতায়।

আই. এ. এস.-গিন্নি হয়ে ক্রমশ এক অন্য জগতে প্রবেশ করলাম। জানলাম অনেক কিছু। বেশ মনে পড়ে আমার স্বামী মুসৌরি পর্বের পরেও নানা ট্রেনিং সেরে নিজের স্টেটে ফিরে আসে। এরপর পোস্টিং হয় জেলায়। যোগ দেন বীরভূমের সিউড়িতে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। চাকরি জীবনের প্রথম পোস্টিং। সময়টা ছিল ১৯৬৮-৬৯। এখানে একটা কথা বলে রাখি। নিজের রাজ্যে পোস্টিং পাওয়া নির্ভর করে খানিকটা ভাগ্য আর খানিকটা মেরিটের ওপর। যাইহোক, শুরু হল আমার বিবাহিত জীবনের প্রথম অধ্যায়। অর্থাৎ বিয়ের পর প্রথম সংসার করা। মনের মধ্যে তিনরকমের অনুভূতি কাজ করছে—আনন্দ, ভয়, বেদনা। নতুন সংসার পাতার আনন্দ। সব কাজ ঠিক ঠিক গুছিয়ে করতে পারব তো—এই ভয়। আর সবাইকে ছেড়ে একা থাকার বেদনা। সংসার করা মানে তো অনেক কিছু। রান্নাও তো করতে পারতাম না। বিয়ের আগে তো শুধু নাচ, গান, লেখাপড়ার মধ্যে জীবন সীমাবদ্ধ ছিল। দায়িত্ব কিছু ছিল না। বড় হয়েছি একান্নবর্তী পরিবারে।

একবার এক কান্ড হল। প্রয়াত অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় যিনি আমার বড় ভাইয়ের মতো ছিলেন, উনি শ্যুটিং করতে এলেন রামপুরহাটে। খবর পাঠিয়েছেন, আমাদের কাছে আসবেন ও খাবেন দুপুরে। আবার সেদিনই আমার শ্বশুর শাশুড়ি আসছেন কলকাতা থেকে। আমার তো মাথায় বাজ। কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না। তার মধ্যে স্টোভে রান্না। ছুটে যাই প্রতিবেশীর কাছে। উনি এসে আমাকে সাহায্য করে উদ্ধার করেন ওই বিপদ থেকে। সবাই তো মহাখুশি। অনিলদা বললেন, 'তুই যে এত ভাল রান্না করিস, আগে তো জানতুম না? মাসীমাকে গিয়ে বলতে হবেই খুব রাঁধুনি হয়েছে আপনার মেয়ে, চিন্তার আর কিছু নেই।' ছোটবেলায় বাবাকে হারানোর জন্য প্রতিবেশী ছিলাম বলে, অনিলদা ও বৌদি ছিল আমাদের গার্জেন। আমি আর অনিলদার স্ত্রী একই কলেজে লেখাপড়া করেছি। আমাদের সম্পর্কটা ছিল একই বাড়ির মতো।

যাইহোক, সরকারি ছোট বাড়ি, কিন্তু লোকে বলত ছোট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলো। শুনে খুব মজা লাগত। একাকিত্ব থাকা সত্ত্বেও বেশ আনন্দে কেটেছে দিনগুলো। চেনাজানা বা বন্ধু বলতে কেউ ছিল না। প্রথম প্রথম খুব কান্নাকাটি করতাম, মন খারাপ লাগত। ভাবতাম কেন কেউ প্রত্যেক মাসে আসে না, রাগও হত—ক্রমশ সব সয়ে গেল। এঁদেরই চাকরিতে ট্রেনিঙের সময় শেখানো হয় যে কারও সঙ্গে মন খুলে না-মেশা ও সিক্রেসি মেনে চলা। সেটা আমাদের স্ত্রীদেরও মেনে চলতে হত। অর্থাৎ দূরত্ব বজায় রেখে চলা। যে কারণে প্রকৃত অর্থে বাইরের কোনও বন্ধু ছিল না, যার সঙ্গে মনপ্রাণ খুলে গল্প করা যায়। শুধু সার্ভিস অফিসারের স্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করা যেত। যে কারণে স্বাভাবিকভাবে সকলের ধারণা আমরা খুব অহংকারী। আসলে জীবনটা ছিল খুব ছকে-বাঁধা। কিন্তু একটা জিনিস, কখনও কিন্তু কোনও বোরডম আসেনি। সে সময় তো টিভি ছিল না। সময় কাটাব কী করে? কর্তা অফিস চলে গেলে তো কেউ নেই কথা বলার। ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতাম, কখন কর্তা দুপুরে খেতে আসবেন বা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবেন। উনি দুপুরে খেতে আসতেন পিওনের সাইকেলে করে। কারণ তখন তো গাড়ি ছিল না। মানে, সরকারি গাড়ি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ছিল না। সেটা শুধু অফিসের কাজে ব্যবহার করা হত। এই ছিল নিয়ম। কখনও বই পড়তাম বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম, কত ফেরিওয়ালা কত রকমের জিনিস নিয়ে ফেরি করতে যায়। আমার দরকার না থাকলেও তাদের ডাকতাম। জিনিস কিনতাম, গল্প করতাম, জানতে চাইতাম তাদের কথা, গন্ধ পেতাম নিজের শৈশবের ফেলে আসা

দিনগুলোর। কি সরলতা ছিল তাদের জীবনে। আমাদের জীবনও কত সহজ সরল ছিল। সে সময় আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল না। মনে পড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাজার করেছিলাম ১ টাকা ২৫ পয়সার মাছ ও ডিম। অবশ্যই ছোটমাছ ঝুপড়িতে করে খালবিল থেকে আনা। আজকের দিনে ওই সব কথা তো কল্পনা মাত্র।

এবারে আমাদের সারল্যের আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কোয়ার্টারের খানিকটা দূরে ছিল লাশকাটা ঘর। অর্থাৎ মর্গ। একদিন শুনি খুব হই চই। কী ব্যাপার—না জোড়া লাশ এসেছে। এই কথাটার কী মানে বুঝিনি অথচ ভীষণ কৌতূহল জানার। প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা ও আমি বেশ করে ঘোমটা দিয়ে, যাতে কেউ চিনতে না পারে, এইভাবে দেখে এলাম ব্যাপারটা কী। আসলে দু'জন চাষির জমি নিয়ে বিবাদ ও পরিণতিতে খুন। আমার এই লুকিয়ে দেখতে যাওয়ার ঘটনা কিন্তু চাপা থাকল না। কর্তার পিওনের ভাই অকুস্থলে থাকায়, অফিসে গিয়ে এই চটকদার গল্পটা করে ও সেটি আমার স্বামীর কানে যায়। উনি বাড়ি এসে খুব রাগ করলেন। ব্যাপারটা কিছুই না সেভাবে দেখতে গেলে, কিন্তু কত ভেবে বা চিন্তা করে আমাদের চলতে হত জীবনে।

এই সময় আমি প্রথম মা হতে চলেছি। শরীর খুব অসুস্থ থাকার জন্য শহরের সব থেকে অভিজ্ঞ ডাক্তারকে ডাকা হল। উনি শ্রীযুক্ত কালীগতি ব্যানার্জি। শুনেছি উনি ডাক্তার বিধান রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। দেখলাম কী ব্যক্তিত্ব! নাড়ি টিপে বলে দিলেন আমি অন্তঃসত্ত্বা অর্থাৎ মা হতে চলেছি। এবং স্বাভাবিকভাবে সন্তানের জন্ম হবে না—এও বললেন। পরবর্তীকালে তাই হয়েছিল। ছোটবেলায় শুনেছিলাম ঠাকুমার কাছে, বা বইতেও পড়েছি, বহু আগে কবিরাজরা নাড়ি টিপে অব্যর্থভাবে রোগ-নির্ণয় করতেন। আমার জীবনেও যে এ ধরনের অভিজ্ঞতা হবে কখনও কি ভেবেছিলাম?

যাই হোক এরপরে কর্তা এলেন দুর্গাপুরে। এস.-ডি.-ও দুর্গাপুর, বর্ধমান জেলা। অর্থাৎ সাব-ডিভিশনাল অফিসার। সময়টা ছিল ১৯৭০। আমাদের প্রথম সন্তান জন্মেছে সবে। কয়েক মাসের বাচ্চা নিয়ে আমি কলকাতা থেকে দুর্গাপুরে চলে এলাম। সুন্দর বাংলো। চারদিক খোলামেলা। কিছু দূরে দূরে এরকম আরও বাংলো। সেখানে স্টিল প্ল্যান্টের বড় অফিসাররা থাকেন। আমাদের ঠিক পেছনে ছোট কোয়ার্টার, তাতে অন্যান্য অফিসাররা থাকতেন। সে সময় নকশাল আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। রোজই কিছু না কিছু ঘটনা ঘটছে। কী প্রচণ্ড টেনশন। ভয় ও আশঙ্কায় দিন কাটত। দিনের পর দিন বাড়িতে বোমা পড়েছে। হিটলিস্টে যাদের নাম ছিল, তাদের বাড়িতে এসে কলিংবেল বাজিয়ে দরজা খুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে—এসব কোনও গল্পকথা নয়। একেবারে বাস্তব, চোখে দেখা। আমার স্বামী পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে জিপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিনরাত। আমি বাড়িতে একটা ছোট শিশুকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি। শুধু আছে পিওন ও সেন্ট্রি গার্ড। আমাকে তারা পাহারা দেবে কি, নিজেদের বাঁচাতেই ব্যস্ত। বয়সটা কম থাকার জন্য পরিস্থিতির গভীরতা ততটা বুঝতাম না। ভয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত একটা উত্তেজনা ফোনে ফোনে খবর পেতাম সেদিন ক'জন মারা গেছে। এদিকে স্বামী বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা। এই সব সাংঘাতিক দিনগুলোর কথা চিন্তা করলে এখন গায়ে কাঁটা দেয়। ভাবি, কী সাহস ছিল আমাদের! আর স্বামীদের কাছে কর্তব্যটাই ছিল সবার আগে। এমনও হয়েছে উনি পর পর কয়েকদিন বাড়ি ফেরেননি। এই রকম পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে মোকাবিলা করতে পারি যাতে, তার জন্য রিভলবার চালানোও শিখেছিলাম। এই সময়ের আর একটি ঘটনার কথা বলি। সময়টা ছিল শীতকাল। বর্ধমানের কাছে পানাগড়। তারই কাছাকাছি একটি রাশিয়ান প্লেন ভেঙে পড়ে। আমার স্বামী এবং এস.-ডি.-পি.-ও. দু'জনে খবর পাওয়া মাত্র চলে যান ঘটনাস্থলে। ও, এস.-ডি.-পি.-ও. পোস্টটা কী তাই তো বলা হল না। এর মানে হল সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার। সেদিনটা ছিল আমাদের বিয়ের তারিখ—ওই রাশিয়ান প্লেনটা ভেঙে পড়ার দিনটার কথা বলছি। সারারাত রিভলবার হাতে বাচ্চার পাশে বসে আছি। উনি একবার রাত বারোটায় বাড়ি ফিরলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন আবার এক ফ্লাসক কফি নিয়ে। যেতে যেতে বললেন কখন ফিরবেন জানেন না। ওঁকে বলেছিলাম, 'যখনই ফিরবে নাম ধরে ডাকবে, তাহলে বুঝব তুমি এসেছ'। বসে থাকতে থাকতে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল দরজায় কে যেন ঠকঠক আওয়াজ করছে। খানিকক্ষণ বাদে আবার সেই আওয়াজ। এবার হাতে রিভলবারটা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসবার ঘরে এলাম। তারপর চেঁচিয়ে বললাম, 'নাম না বললে দরজা খুলব না, গুলি চালাব' দরজার ওপার থেকে ভয়ার্ত আওয়াজ এল,—'আমি আমি...গুলি চালিয়ো না, দরজা খোলো।' কী কাণ্ড, যদি জিজ্ঞাসা না করে ফট করে গুলি চালিয়ে দিতাম! একে তো সারা রাত ধরে ধকল গিয়েছে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে, তারপর বাড়ি ফিরে দেখেন সেন্ট্রি গার্ডরা বারান্দায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। রাইফেলগুলো পাশে দাঁড় করানো। অথচ এটা ওদের ডিউটি আওয়ার্স। উনি ডোর বেল বাজানো বা নাম ধরে ডাকা এসব করেননি তার কারণ

সেন্ট্রি গার্ডরা সেই আওয়াজে জেগে যেত। না, ওদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে এর জন্য নয়। ডিউটি আওয়ার্সে ঘুমোনোটা যে অন্যায় সেটা বোঝানোর জন্যই ওই ঠকঠক শব্দ।

দুর্গাপুরের অবস্থা বোঝাতে আরও দু'-চার কথা বলা দরকার। এস.-ডি.-ও.-র একটা সরকারি জিপ ছিল। এছাড়া স্টিল প্ল্যান্টের একটা গাড়ি থাকত সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। কারণ ওঁকে তো প্ল্যান্টের কোনও সমস্যা হলেও সমাধান করতে হত। উনি সাধারণত জিপটা নিয়ে ঘোরাফেরা করতেন। চারপাশে আগুন জ্বলছে আর একটার পর একটা খুন হচ্ছে আগেই বলেছি। স্টিলপ্ল্যান্টে স্ট্রাইক করানো হয়েছে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কেউ প্ল্যান্টে যেতে পারছে না। তখন রাষ্ট্রপতির শাসন। কিন্তু দুর্গাপুর ছিল সি পি এম-এর শক্ত ঘাঁটি। এহেন অবস্থায় একদিন দেখলাম আমাদের বাংলোর ঠিক পেছনে খুব হই-চই হচ্ছে, অনেক লোকজন। কী ব্যাপার? কেউ একজন লুকিয়ে প্ল্যান্টে কাজে গিয়েছিল এবং এই খবর জানার পর, সেই বাড়ির জিনিসপত্র সব বার করে মারমুখী জনতা আগুন লাগিয়ে দেয়, হুমকি দেয় বাড়ির লোকেদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। এ দৃশ্য দেখে চুপ করে থাকতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে ফোন করি। কিন্তু লাইন আগেই কেটে দেওয়া হয়েছে। যাতে পুলিশ খবর না পায়। আমি তখন স্টিল প্ল্যান্টের ওয়্যারলেসে নিজের পরিচয় দিয়ে খবর পাঠাই। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এসে পড়ে ও পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। শুধু কি তাই! দিনের পর দিন গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে যানবাহন স্বাভাবিক ভাবে চলতে না পারে। চারদিকের এই পরিবেশের চাপ—ভিতরটা ভীষণ অস্থির অস্থির করছিল। তাই একদিন প্রায় মরিয়া হয়ে আমি আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাই। গাড়িটা অবশ্য স্টিল প্ল্যান্টেরই ছিল। দিনের পর দিন একটি শিশুকে নিয়ে একা থাকা, বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে, বড় অসহায় লাগত। তারপর স্বামী দিনরাত ব্যস্ত। আমাকে ওভাবে আসতে দেখে আমার আত্মীয়া খুব রাগ করলেন। বললেন, 'বললেই তো পারতে আমিই চলে যেতাম। আমি তো আর এস.-ডি.-ও. গিন্নি নই, আমার ভয় ছিল না।' যাই হোক, সন্ধের আগেই ফিরে আসছি নিজের কোয়ার্টারে। হঠাৎ দেখি একদল লোক রাস্তায় আমার গাড়ি আটকে দিল। চেঁচামেচি করতে লাগল ড্রাইভারের পাশের কাঁচের জানলা খোলার জন্য। প্রথমে একটু ভয় পেলেও মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করে নিই কী করব। ড্রাইভারকে বলি, 'তুমি কিছু জান না এরকম একটা ভাব করবে। কার গাড়ি, কে গাড়িতে কিছুই জান না। তোমার সিটের পেছনে আমি ধাক্কা দেব সেটাই হবে আমার ইশারা। তুমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দেবে।' আমি জনতার উদ্দেশে ইশারায় আমার দিকে আসতে বললাম অর্থাৎ গাড়ির পেছনের জানলা একটু ফাঁক করে চেঁচিয়ে বললাম, 'ও তো ভাড়া-করা ড্রাইভার, ও কিছু জানে না। কী জানতে চান আমাকে বলুন'। শুরু হল বাদানুবাদ। অবস্থা বুঝে আমি ড্রাইভারকে ইশারা করতেই দক্ষ ড্রাইভার মুহূর্তে গাড়ি ছেড়ে দিল। পিছনে ইটপাটকেল পড়ছে টের পাচ্ছি। কোনও রকমে বাচ্চাকে কোলে জড়িয়ে বাড়ি এসে পৌঁছলাম। কর্তা তো বাড়ি এসে সব শুনে খুব রাগ করলেন তবে আমার উপস্থিত বুদ্ধির তারিফও করলেন।

দুর্গাপুরের আরও একটি ঘটনা। আমাদের পাশের পরিবারের একটি মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল মেমারিতে, বর্ধমান জেলাতেই। আত্মীয়স্বজন সবাই এসেছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। বাড়ি ভর্তি লোক, বিয়ের লগ্ন উপস্থিত কিন্তু বর বা বরযাত্রীর দেখা নেই। মেয়ের বাবা কাঁদো কাঁদো মুখে এসে আমার কর্তার শরণাপন্ন হলেন। কর্তা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে নিজেই গাড়ি বের করে ছুটলেন বরযাত্রীর খোঁজে। নিজেই ড্রাইভ করছেন কারণ এত রাতে ড্রাইভারের ছুটি হয়ে গেছে। সেদিন সারা দিনই ছিল ঝড়-বৃষ্টি। দুর্যোগ মাথায় করে রাতের অন্ধকারেই কর্তা ছুটে গেলেন কাঁকসা থানায় (বর্ধমানের মধ্যেই পড়ে)। এখন ভাবলে ব্যাপারটা বেশ মজা লাগে—এস.-ডি.-ও চলেছেন বরযাত্রীর খোঁজে, দুর্যোগ মাথায় করে। থানার ও সি সাহেবকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। সব শুনে উনি ফোর্স নিয়ে ছুটলেন বরযাত্রীর খোঁজে। আমার কর্তা তো বাড়ি ফিরলেন এবং মেয়ের বাবাকে আশ্বস্ত করলেন যে বরযাত্রী খুঁজে আনা হবেই। যাই হোক বেশি রাতে থানার ও সি এসকর্ট করে বরযাত্রী নিয়ে বিয়ের আসরে উপস্থিত হলেন। বিয়ে হল, তবে পরের লগ্নে। আমার কর্তা আর কন্যাকর্তা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশ ফোর্সকে আপ্যায়িত আর খাওয়া দাওয়ার তদারকিও করলেন।

এরপর কর্তা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট (এ. ডি. এম.) হিসাবে বর্ধমানে যোগ দিলেন। সময়টা ছিল ১৯৭১। সরকারি ফ্ল্যাট, অবশ্যই ছোট। বাংলো ছিল না আলাদা করে। সরকারি গাড়িটা ছিল শুধু অফিসে আসা যাওয়ার জন্য। ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করাটা প্রায় না করার মতোই। মাইনে বেড়ে এক হাজার টাকা হয়েছে। মনে হল, বাবা বিশাল মাইনে! এবার তাহলে একটা রান্নার লোক রাখা যাক। একে ছোট বাচ্চা তাও আবার উনুনে রান্না করা, এরপর অতিথি তো লেগেই আছে, ভয়ানক অসুবিধা হত। গ্যাস তো তখনও চালু হয়নি। কর্তা বললেন, 'এবারে আমরা বেশ স্টাইল করে থাকব'। সাময়িক খেয়ালে বলে উঠলেন, 'একটা বাবুর্চি রাখলে কেমন হয়?' ব্যাস, যেই মুখ থেকে কথাটা

বের হওয়া অমনই বাবুর্চির খোঁজ শুরু। বাবুর্চি পাওয়াও গেল। সে নাকি কোনও এক নবাবের কাছে রান্না করত। আর জানাল যে সব রকম রান্নায় সে পারদর্শী। বয়স্ক মানুষ। অবসরপ্রাপ্ত বহুদিন, নেহাৎ এ.-ডি.-এম.-সাহেবের বাড়ির কাজ তাই সে না বলতে পারেনি। এদিকে আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না একে দিয়ে কী কাজ হবে? যাইহোক, স্বামীর সখ ও নিজের প্রয়োজনের তাগিদে তাকে রাখলাম। কিন্তু এক মাসের বেশি তাকে রাখা সম্ভব হল না। কারণটা খুলেই বলি। আমাকে বাবুর্চিটি মশালচি মনে করত অর্থাৎ অ্যাসিস্টেন্ট। যেমন পাকা বাবুর্চি কখনও নিজের হাতে মশলা বেটে, তরকারি কুটে বা আটা মেখে রান্না করে না, তারজন্য একজন সহকারী দরকার হয় তেমনই আমি ছিলাম তার সহকারী। চাল ধুয়ে দেওয়া, আটা মাখা ইত্যাদি, মানে যোগানদার। আমি তো একদিন খেপে উঠলাম। অবশ্য নিজেকে সামলে তাকে বুঝিয়ে বললাম আর তাতে সে আমাকে অর্ডার দেওয়া বন্ধ করল। কিন্তু রান্না হতে লাগল কাঁড়ি কাঁড়ি মশলা দিয়ে। লুচি-পরটা করলে যতটা ময়দা ঠিক ততটা ঘি, তেল চলবে না। রান্নার দারুণ প্রশংসা শুরু হল। যে ওই রান্না খাচ্ছে সেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু আমার তো প্রাণ যায় যায়। অত মশলা দেওয়া রান্না খেয়ে শরীর খারাপ হয়ে গেল। শুধু তাই নয় মাসের মাঝখানেই হাতখালি কারণ মাইনের বেশির ভাগটাই চলে যাচ্ছে রান্নার মালমশলা যোগাতে। কর্তা ব্যাপারটা বুঝলেন। অবশেষে তাকে সম্মানের সঙ্গে বিদেয় করা হল। আমার অবস্থা পুনর্মূষিক ভব। অর্থাৎ আবার নিজেকেই হেঁসেলের দায়িত্ব নিতে হল।

১৯৭১। এই সময় বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। সবাই সারাদিন রেডিও-সংবাদ ও খবরের কাগজের সংবাদে ডুবে রয়েছে। এরই মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খবর পাঠালেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার স্বামীকে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়মে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। কারণ কেউ জানে না। শুধু 'ইম্মিডিয়েট রিপোর্ট' এই খবরটাই আছে। খবর পাওয়া মাত্র উনি রওনা হলেন কলকাতায়। কয়েকদিন পর ফিরে এসে জানালেন যে ওঁকে ও অন্যান্য জায়গা থেকে আর কয়েকজন অফিসারকে যোগ দিতে হবে অধুনা বাংলাদেশের যশোর ও খুলনায় সিভিলিয়ানস্-এর লিয়াজোঁ অফিসার হিসাবে। তখন সবে যুদ্ধের সিজ্-ফায়ার হয়েছে। যাইহোক, বাড়ি বন্ধ রেখে শুধু একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হলাম কলকাতায়। কতদিনের জন্য জানি না। আমি বাচ্চাকে নিয়ে কলকাতায় আর উনি বাংলাদেশে যুদ্ধকালীন অবস্থায়, ভাবুন আমার অবস্থাটা! কর্তার বাংলাদেশে থাকার সময় আমার একদিনের জন্য যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ওঁর এক কলিগ বনগাঁয় পোস্টেড ছিলেন। ওই বন্ধুর সঙ্গে চলে যাই। সেই সময় যে কেউ বর্ডার পেরিয়ে যেতে পারত না। অনেক বেশি কড়াকড়ি ছিল। বন্ধু ভদ্রলোক এস.-ডি.-ও ছিলেন। ওঁর সঙ্গে মেডিকেল টিম যাচ্ছিল বলে আমি ওই টিমের একজন হিসাবে সুযোগটা পেয়ে গেলাম। অবশ্য সকালে গিয়ে রাতেই ফিরে আসি। উঃ কী ভয়ঙ্কর নিদারুণ অভিজ্ঞতা বলে বোঝাতে পারব না। বড় বড় বাড়ি, অফিস, বুলেটের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় ট্রেঞ্চ খোঁড়া। কোনও দোকান বাজার কিছু নেই। খুলনায় বিশেষ করে দেখেছি রাস্তায় এদিক সেদিক পড়ে আছে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, শাড়ি, জামা কাপড়, আর একটু তফাতেই মড়ার খুলি ও হাড়। সঙ্গের মেডিকেল অফিসাররা আমাকে চিনিয়েছিলেন কোনটা মহিলার বা কোনটা পুরুষের হাড়, মোটামুটি বয়স কত হতে পারে—এইসব। আমি শুনতে চাইছি না, দেখতে পারছি না, ওয়াক আসছে। উঃ ভয়ঙ্কর! বুক ফেটে যাচ্ছে কান্নায়। এর ওপর কী আকাল! আমি সঙ্গে কিছু চাপাতা, বিস্কুট, কৌটোর দুধ, পাঁউরুটি এসব নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে তো সাগরের এক বিন্দু জলের মতো মনে হল।

কলকাতায় ফিরে আসার পর ঘুমোতে পারিনি ক'দিন। দিনরাত ভেবেছি কেন এই যুদ্ধ? কেন মিলে মিশে থাকবে না মানুষ? আমরা তো ভিন্ন গ্রহের নই। আমরা সবাই তো এই পৃথিবীর সন্তান।

আমার স্বামী বাংলাদেশে থাকবার সময় টেলিগ্রাম পেলেন যে উনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ওয়েলিংটন-এর ডিফেন্স সার্ভিস স্টাফ কলেজে সিভিলিয়ান অফিসার হিসাবে। এই স্টাফ কলেজে আর্মি, এয়ারফোর্স ও নেভি থেকে মেরিট অনুসারে নির্বাচন করা হয় কিছু অফিসারকে। এছাড়া সিভিলিয়ান অফিসারও নেওয়া হয় একজন। একটি স্টেট থেকে এক বছরের জন্য একজন। এই স্টাফ কলেজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকেও যোগ দেয় সামরিক অফিসাররা। আগেই জানিয়েছি আমার স্বামী আই.-এ.-এসে. জয়েন করার আগে কিছুদিন ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছেন শর্ট-সার্ভিস কমিশনে এবং পাকিস্তান ও চায়না যুদ্ধের সময় মিলিটারি সার্ভিসে ছিলেন ওয়ারফ্রন্টে মানে যুদ্ধক্ষেত্রে। যাইহোক, একবছরের কোর্স সুতরাং পরিবার নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। এই পোস্টিংয়ের খবরটা উনি দেরিতে পেয়েছিলেন বাংলাদেশে থাকার জন্য। তাই হাতে খুব কম সময় নিয়ে ফিরে এলাম বর্ধমানে। বর্ধমানের সংসার গুটিয়ে দ্রুত ফিরে গেলাম কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে। সেখান থেকে মাত্র দুটো কাঠের

বাক্স আর একটা সুটকেশ নিয়ে রওনা হলাম নীলগিরির দিকে বিনা রিজার্ভেশনে।

ভেবে দেখুন তো কি ভাবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছি। তাই তো ভাবি কত অল্পের মধ্যে সংসার করেছি। কোনও আলগা চাহিদা ছিল না। অল্পেই সন্তুষ্ট থেকেছি। তবে চোখ ভরে দেখা ও আনন্দ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রচুর। পেয়েওছি। তাই দিয়ে মন ভরে গেছে। আজ সেইসব চলতি ছবি মাঝে মাঝে আসে যায়। আমার অতীত কখনও সখনও আমার 'আজ'-কে প্রশান্তিতে ভরিয়ে তোলে। কর্তা বলেন, 'আমরা তো নানারকম প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজেদের তৈরি করেছি, কিন্তু তোমরা? তোমরা তো সমান তালে আমাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছ।' ভাবি, কথাটা তো ঠিক। দিব্যি তো চালিয়েছি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে।

যাই হোক, ওয়েলিংটন শহরে এসে পৌঁছলাম। শহরটা নীলগিরি পাহাড়ের উপর। ছোট্ট শহর। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর তার মাঝে উপত্যকা। কী অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! তাকিয়ে থাকতাম প্রকৃতির বিশালত্বের দিকে।

'হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে। ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র-মেখলা-পরা তব কটিদেশ
প্রভাত রৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ...

প্রথমে আমরা এখানে এসে আর্মি মেসে উঠি। দু'মাস থাকার পর কোয়ার্টার পাই ও সেখানে উঠে যাই। কোয়ার্টার ছিল একটা পাহাড়ের ওপর। জায়গাটার নাম ছিল 'কুনুর'। এই কোয়ার্টারগুলো ছিল বিদেশি সাহেবদের ছেড়ে যাওয়া বাড়ি। ছ'টা ঘর সব মিলিয়ে। বেশিরভাগই বন্ধ থাকত। কারণ আমাদের প্রয়োজন তো ছিল সীমিত। মাত্র তো আড়াই জন মানুষ আমরা। সপ্তাহে একদিন করে খাবার জল আসত বাড়িতে। অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য অবশ্য সপ্তাহে দু-তিনবার জল দিয়ে যেত এবং সেটা স্টোর করে রাখা হত। পাকা টয়লেটের ব্যবস্থাও ছিল না। চেয়ারের ভেতর প্যান বসানো থাকত এবং সেটা পরিষ্কার করতে হত নিজেদের। জমাদার আসত দিনে মাত্র একবার। বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর সাহেবদের ছেড়ে যাওয়া বাড়িগুলো অফিসারদের দেওয়া হয়েছিল। নতুন বাড়িও ছিল কলেজের আশেপাশে। এই রকম একটা পাহাড়ের ওপর ছিল স্টাফ কলেজ। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অফিসাররা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ এক ধরনের পরীক্ষা দিয়ে আসত এখানে কোর্স করার জন্য। এখানে নির্বাচিত হওয়াটা অত্যন্ত সম্মানজনক ব্যাপার ছিল। এখান থেকে পাশ করার পর কেউ কেউ এখানেই স্টাফ বা ইনস্ট্রাকটর হয়ে যেতেন। কেউ আবার নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে উঁচু পদে যোগ দিতেন। যে-সিভিলিয়ান অফিসার এদের সঙ্গে ট্রেনিং-এ থাকত, যেমন আমার স্বামী, তাকে যে কোনএ একটা উইঙ-এর সঙ্গে কোর্স করতে হত। এখানে এসে সামরিক জীবনের কঠিন শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করেছি। তার সঙ্গে তাদের ট্রেনিং। তারই মধ্যে কত আনন্দ ছিল। প্রথম জীবনে আমার স্বামী যখন আর্মিতে ছিলেন তখন তো আমার বিয়ে হয়নি। তাই আর্মি সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। এখানে এসে পরিচয় হল কত দেশি বিদেশি মানুষের সঙ্গে। পরিচয় হল বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে, নানা ধরনের সংস্কৃতির সঙ্গে। এ যেন এক আন্তর্জাতিক মেলবন্ধন।

এখানে থাকার সময় ভিন্ন ধরনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি। সেদিনটা ছিল অমাবস্যা ও কালীপুজোর রাত। সারাদিন ধরেই মনে পড়ছে কলকাতার কথা, কত আনন্দ, কত বাজি পোড়ানো, আলোর রোশনাই। কিন্তু এখানে সেসব কিছুই নেই। এমনকী কোথাও পুজো পর্যন্ত হচ্ছে না। সারাদিন ধরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এদিন আবার এক বন্ধুর বাচ্চার জন্মদিনের নেমন্তন্ন। আড্ডা মেরে নেমন্তন্ন খেয়ে রাত হয়ে গেল ফিরতে। নিজেদের গাড়ি নেই আর এক বন্ধু জানায় তারা ফেরার সময় আমাদের নামিয়ে দেবে। মনে মনে ভাবলাম যাক বাবা! গাড়িতে বন্ধু ও তার স্ত্রী সামনে বসলেন আর আমরা পেছনে। গাড়িটা ছিল 'সিট্রন'। সমস্ত শহরটাই অন্ধকারে ঢাকা। শুধু রাস্তার লাইটগুলো জ্বলছে। যদিও তা না জ্বলার মতোই। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানো এমনিতেই বেশ ঝুঁকির ব্যাপার। সাবধানে চালাতে হয়। তার ওপর অন্ধকার ও বৃষ্টি। একটা আশঙ্কায় ভুগছিলাম, আর তাই হল। গাড়ি চালক রাস্তা ভুল করে অন্য রাস্তায় চলে গেল। সেটা একটা সরু পায়ে চলা রাস্তা। এইবার যা ঘটল ভাবলেই গা শিউরে ওঠে আজও। গাড়ি ওলটাতে থাকল। একেবারে সামারসল্ট যাকে বলে। ভল্ট খেতে খেতে নীচের দিকে গড়াচ্ছে গাড়ি, আমরা চিৎকার করছি। এমন সময় গাড়িটা কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেল। সে এক মারাত্মক পরিস্থিতি। কোলে মেয়েকে চেপে ধরে মা কালীকে ডাকছি। গাড়িটা ধাক্কা খেল আসলে একটা বুশের সঙ্গে এবং সেখানেই আটকাল। এরপর? সবাই কি শেষ হয়ে যাব একসঙ্গে? পাহাড়ি জায়গায় ঘন ঘাসের মতো একরকম হয়, তা শুধু যে ঘন তা নয় খুব শক্তপোক্ত। তাই ডিগবাজি খাওয়া রুখে দিল সেই ঘনঘাসের স্তর। গাড়ি দাঁড়ালে ওপর থেকে স্থানীয় লোকেদের টর্চ আর লণ্ঠনের আলো এগিয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছি। আমার স্বামী আর্মিতে কম্যান্ডো কোর্স করেছিলেন,

সেটা এখানে বেশ কাজে লাগল। সাহস করে খুঁজে খুঁজে গাড়ির দরজা পেলেন মাথার ওপর। অনেক কায়দা করে দরজা ভেঙে বাইরে বের হলেন। তারপর এক এক করে সবাইকে বের করলেন খুব সাবধানতার সঙ্গে। কারণ বেশি নড়াচাড়া করলেই গাড়ি আবার উলটাতে শুরু করতে পারে। এবার উলটানো মানে সোজা খাদে গিয়ে পড়বে গাড়ি। যাইহোক সবাইকে তো ওঠানো হল। কিন্তু আমি বাদ পড়লাম। কারণ আমার শাড়ির আঁচল আটকে ছিল গাড়ির সিটের নীচে। কর্তা চেঁচিয়ে বললেন, 'শাড়িটা কোনও রকমে খুলে বেরিয়ে এসো।' তাই করলাম, লজ্জার কথা একবারও মাথায় আসেনি। চড়াই উতরাই ভেঙে সবাই ওপরে উঠে এলাম। মানে সেই সরু পায়ে চলা রাস্তায়। মজার কথা হল ওই বিধ্বস্ত অবস্থায় বাড়ি যখন ফিরলাম, তখন আয়া দরজা খুলে আমাদের ওই চেহারা দেখে বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, —'আপ সাবলোক এতনা দারু পিকে আয়া, কুছ কম পি নেহি সকতে? উপর সে বেবি কো ভি লেকে গয়ে?' ও বেচারা কী করে জানবে যে আমরা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে এলাম। ওর কথা শুনে এই পরিস্থিতিতেও আমাদের হাসি পেল। ওকে অবশ্য সব খুলে বলা হল। ও তো শুনে থ! সবাইকে তাড়াতাড়ি গরম কফি করে খাওয়ালো ও প্রতিবেশী অফিসারদের খবর দিয়ে এল। খবর পাওয়া মাত্র দু'জন আর্মি অফিসার তাদের গাড়ি বের করে আমাদের চালক বন্ধু ও তার স্ত্রী এবং আমার স্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। কারণ ওদের চোট-আঘাত বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল। আমার ও মেয়ের আপাত দৃষ্টিতে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বেশি রাতে কর্তা ফিরে এলেন। হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কনুই থেকে হাড় বেরিয়ে গিয়েছিল। গাড়ি চালক ও তার স্ত্রীরও যথেষ্ট চোট লেগেছিল। প্রতিবেশীরা তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এল। পরের দিন সকালে আমার হাত ফুলে ঢোল, নাড়াতে পারছি না। আবার হাসপাতালে যাওয়া ও হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা—এইসব করতে হল। ঘাড়ের কাছে কার্টিলেজ ড্যামেজ হয়েছিল। মেয়ের চোটের ব্যাপারটা জানা যায় ছ'বছর বাদে। হাসপাতালে যাওয়ার সময় দেখেছিলাম গাড়ি ক্রেন দিয়ে তোলা হচ্ছে। প্রচুর ভিড়। আলোচনা হচ্ছে ক'জন মারা গেছে ইত্যাদি।

ওয়েলিংটনে থাকার সময় আরও বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। একবার ঠিক হল কিছু অফিসার ইনস্ট্রাকটার বা স্টাফ মিলে 'মধুমালাই' ফরেস্ট-এ যাব পিকনিক করতে 'পাইকারা ড্যামের' কাছে। ফরেস্টের ভেতর একটা বাংলো ঠিক করা হল, যার সামনে দিয়ে ড্যামের জল নদীর মতো বয়ে চলেছে। আমরা প্রায় তিরিশ-চল্লিশজন ছিলাম। বাংলোটা একটা টিলার ওপরে। খুব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। চারদিকে জঙ্গল। ঠিক করা হল, ছেলেরা রান্না করবে ও মেয়েরা বাচ্চাদের দেখবে, তাস খেলবে, গান করবে, কিন্তু রান্না ঘরে কেউ একবারও উঁকি মারবে না বা ছেলেদের একবারও ডাকবে না। রান্না যাই হোক না কেন ভালমন্দ বিচার না করে খেতে হবে। সঙ্গে রেশন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এমনকী বাসনপত্রও। আমরা তো আনন্দে মশগুল। ছেলেরা বিয়ার খাচ্ছে ও রান্না করছে হই হই করে। হঠাৎ শোনা গেল একদল জংলি কুকুরের প্রবল চিৎকার। ড্যামের দিক থেকে আওয়াজ আসছে। ওই একটানা কুকুরের ডাক শুনে কর্তারা সব বেরিয়ে এল। দেখা গেল একটা 'সাম্বার' মানে হরিণের মতো দেখতে কিন্তু একটা বড় বাছুরের সাইজ, জলে হাবুডুবু খাচ্ছে আর চেষ্টা করে চলেছে পাড়ে উঠতে। কিন্তু কুকুরদের ভয়ে উঠতে পারছে না। সাম্বারটাকে জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে জংলি কুকুরগুলো। জংলি কুকুর শুনেছি খুব হিংস্র হয়। সাম্বার বেচারা কুকুরদের তাড়া খেয়ে জলে পড়ে যায়। আমাদের সঙ্গে যেসব নেভিঅফিসার ছিলেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পারে বাঁধা একটা নৌকো নিয়ে জলে নেমে পড়ল সাম্বারটাকে বাঁচাতে। কিন্তু বিধি বাম। নৌকো দেখে সাম্বার বেচারা আরও ভয় পেয়ে নৌকোটা দিল উলটে। অফিসাররা সাঁতরে সাঁতরে উলটানো নৌকোকে যতবার সোজা করবার চেষ্টা করছে, সাম্বারটা ততবার নৌকোটাকে উলটে দিচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ এই যুদ্ধ চলার পর অফিসাররা নিজেদের বাঁচাতে ও জানোয়ারটাকে জীবন্ত অবস্থায় তুলে আনার জন্য তার মাথায় আঘাত করল। উদ্দেশ্য ছিল সাম্বারটাকে অজ্ঞান করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ওপরে তোলা। রীতিমতো একটা অপারেশন যাকে বলে। সাম্বারটাকে যখন ওপরে তোলা হল দেখা গেল সে মারা গেছে। বেচারা কতক্ষণ নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়েছে জানি না, তারপর মাথায় আঘাত। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে মারা গেল। এদিকে যেহেতু এটা রিজার্ভ ফরেস্ট সেই হেতু এইখানে কোনও জন্তু মারা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কী করা যাবে এই ঘটনার জন্য তো কাউকে দায়ী করা যায় না। এটা একটা দুর্ঘটনা। এই সাম্বারটাকে তো লুকিয়ে ফেলা যাবে না, সুতরাং ফৌজি নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে অফিসাররা এই অঞ্চলে পোস্টেড ফরেস্ট অফিসারদের খবর দিল। ফল কিন্তু উলটো হল। ফরেস্ট অফিসার জানাল যেহেতু এটা রিজার্ভ ফরেস্ট এবং এখানে জন্তুকে মারা হয়েছে তাই এই নেভি অফিসারদের বিরুদ্ধে কেস ফাইল করা হবে। এই নিয়ে চলল বাদানুবাদ। এতক্ষণ আমার স্বামী চুপ করে শুনছিলেন। এবার উঠে এসে নিজের পরিচয় দিলেন, বললেন উনি একজন আই. এ. এস. অফিসার,

ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, নিয়মকানুন ওঁর সবই জানা। নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ওই জন্তুটাকে আঘাত করতে অফিসাররা বাধ্য হয়েছিল। জন্তুটা যে মরে যাবে সেটা কেউ ভাবেনি বা মারার উদ্দেশ্যও ছিল না। অফিসারদের মোটিভ ছিল জল থেকে সাম্বারটাকে জ্যান্ত তুলে এনে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে হ্যান্ডওভার করা। সুতরাং এক্ষেত্রে কেস করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। ফরেস্ট অফিসার যুক্তিগুলো মন দিয়ে শুনে ও মেনে নিলেন। পরে জানা গিয়েছিল সাম্বারটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। এই কথা শোনার পর মনটা বিষাদে ভরে গেল। একটা প্রাণ জন্মানোর আগেই শেষ হয়ে গেল! মা সাম্বারটি নিজেকে ও তার সন্তানকে বাঁচানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কুকুরদের এড়িয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। দুটো প্রাণীই শেষ হয়ে গেল।

এবার ওয়েলিংটনের একটা মজার ঘটনা বলি। এতক্ষণ তো শুধু দুর্ঘটনার কথাই শোনালাম। মাসটা ঠিক কী ছিল মনে নেই, তবে শীতকাল ছিল এটা ঠিক। 'কুইন্স বল কনটেস্ট'। কলেজের ছাত্র যাঁরা ছিলেন তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে এই কনটেস্ট। দেশি বিদেশি সবাই এতে অংশ নিতে পারে। এতে ছিল ক্যাট ওয়াক, নাচ ইত্যাদি। আর ছিল নিজেকে কে কীভাবে প্রেজেন্ট করছে তা দেখা। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর হঠাৎ শুনি আমার নাম অ্যানাউন্স করা হচ্ছে। কী ব্যাপার? ব্যাপারটা হল আমি নাকি ফার্স্ট হয়েছি। আমাকে মঞ্চে ডেকে মাথায় মুকুট পরিয়ে গিফ্‌ট দেওয়া হল। সে এক কাণ্ড! আনন্দে, বিস্ময়ে আমি হতবাক! চারপাশে সবার হাততালি, অভিনন্দনের বন্যা—উঃ কী রোমাঞ্চকর!

এরপর আবার পট পরিবর্তন। আমার কর্তার ওয়েলিংটনের কোর্স শেষ হল। ফিরে এলাম কলকাতায়। উনি যোগ দিলেন ২৪ পরগণার অ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। এখানে অবশ্য বেশি দিন থাকা হয়নি, মাত্র বারো মাস। এরপর চলে আসি কৃষ্ণনগরে, নদীয়া জেলার সদর শহর। উনি এখানে যোগ দিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে। বিশাল বাংলো, মালি, আরদালি, বডিগার্ড ইত্যাদিতে ভরা। মেয়ের বয়স তখন চার বছর। প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে মেয়ে বড় হচ্ছে। আমি মনের সুখে বাগান করছি। কিন্তু প্রতিনিয়ত ভয় ও চিন্তা থাকত। কারণটা বলছি।

কৃষ্ণনগর ছিল বাংলাদেশের বর্ডার অঞ্চল, সেখানে আবার নকশালরা ছিল খুব সক্রিয়। সেই সময় অফিসের গাড়ি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পাওয়া যেত না। তবে এই নিয়ম সবাই মেনে চলতেন না। আমার কর্তা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাই আমাকে বাজারে রিকসা চেপেই যেতে হত। এই সময় আমি সন্তানসম্ভবা। দ্বিতীয় সন্তান হবে। স্বামী ঠিক করলেন জেলার হাসপাতালেই শিশুর জন্ম হবে। কিন্তু ডাক্তার রাজি হলেন না। কারণ প্রথমবারের মতো এবারও আমার কেসটা বেশ জটিল। তাই ডাক্তারের মতে আমাকে স্পেশাল কেয়ার দিতে হবে। হাসপাতালে রেখে সেটা হবে না। অবশেষে একটা মিশনারি নার্সিংহোমে আমাকে ভর্তি করা হল। সবে নতুন তৈরি হয়েছে। যন্ত্রপাতিও কিছুদিন হল এসেছে। বলতে গেলে নতুন যন্ত্রপাতির উদ্বোধন আমাকে দিয়েই হবে। আশঙ্কায় ভুগছি কি জানি কী হয়! যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক চলবে তো? না, শেষ পর্যন্ত কোনও বিভ্রাট হল না। তবে যেদিন আমার দ্বিতীয় সন্তান জন্মাল সেদিন দীর্ঘ সময় জুড়ে লোডশেডিং। তাই জেনারেটরের আলোয় শিশুর জন্ম হল। এমনকী আমার স্বামীও হাসপাতালে আমার পাশে পুরোপুরি ছিলেন না। কিছু ঘটনার জন্য উনি ঘেরাও হয়েছিলেন। জেলায় এটা ছিল প্রায় রোজকার ঘটনা। যাইহোক নার্সিংহোমে এবং বাড়িতে আমাকে সর্বদা সঙ্গ দিয়েছিলেন পুলিশ-সুপারের স্ত্রী। এর জন্য ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। চার্চের বিশপ এসে ছেলেকে আশীর্বাদ করে গেলেন। এই যে ব্যক্তিগত স্পর্শ, এ কোথায় পাব ডিস্ট্রিক্ট ছাড়া?

এখনকার মতো সুযোগ সুবিধে তখন তো ছিল না। সব রকম বিরুদ্ধ পরিস্থিতি কত সহজে মেনে নিয়েছি। এ প্রজন্মের সবাই ভাববে এসব বানানো কথা। কারণ যুগের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাধারাও যে সব পালটে যাচ্ছে। এক এক সময় ভাবি জীবনটা কতরকম ভাবে তৈরি করেছি, ঠিক যেন কুমোরের মাটির জিনিস গড়ার মতো। যেখানে যে পরিস্থিতিতে পড়েছি মানিয়ে নিয়েছি। মনে পড়ে একদিন রাতে খেতে বসেছি। সেদিনটা ছিল বর্ষার রাত। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আর্দালি পিওন এসে ওঁকে চুপি চুপি কিছু বলে গেল। উনি তো কোনওরকমে খাওয়া শেষ করে নীচে চলে গেলেন। নীচে অফিসরুম। সারারাত ওপরে এলেন না। এক সময় টের পেলাম এস.-পি-ও চলে এসেছেন। সারারাত আমার উৎকণ্ঠায় কাটল। সকালে যখন ওপরে এলেন তখন জানলাম একজন ইনফরমার রাতে এসে গোপন খবর জানায়। এই খবরের ভিত্তিতে পরের দিনই শুরু হবে অ্যাকশান। সারারাত ধরে এস.-পি-র সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা চলেছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে জেলাতে ডি. এম. এবং এস.-পি-র রেসিডেন্ট থাকে ওপরে আর অফিস নীচে।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

তত্ত্ব-আকাশে কৃষ্ণগহ্বর

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

একটা বই আত্মপ্রকাশ করল আর বাংলার বৌদ্ধিকচর্চার বোবাজলে সঞ্চারিত হল নতুন কোনও চিন্তাতরঙ্গ, বাংলা প্রকাশনার সাম্প্রতিকে এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। রণজিৎ গুহর 'কবির নাম ও সর্বনাম' সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী বই নিশ্চয়ই। পুরস্কারপ্রাপ্তি অবশ্যই তার হেতু নয়; রণজিৎ গুহর মতো ইতিহাসবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ এক ব্যক্তিত্ব কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে বা সমালোচনা-প্রকরণে নতুন কী দেখাতে চাচ্ছেন এ বইতে, পাঠকের আগ্রহের কারণ বোধকরি সেইখানে। এ বই ইতিহাসের বই নয়, কিন্তু রণজিৎবাবুর অপরাপর রচনার মতোই এ বইয়ের সন্দর্ভও পরোক্ষে ইতিহাসদর্শনস্পৃষ্ট। সাহিত্য মানেই তো মানুষের চেতনার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস! কাব্যের কেন্দ্রস্থ এক 'আমি'-র সঙ্গে তার চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির ডায়ালেকটিকসে বুঝে নিতে হয় সাহিত্যের ইতিহাস-ধর্ম। বিশেষ করে আধুনিকতার অভিমুখ বিচারে এই 'আমি'-ত্বের চেতনা একটি সূচকচিহ্নও বটে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবির 'আমি' কার্যত কেন্দ্রস্থ হতে পারেনি সমূহ প্রাতিষ্ঠানিক চেতনা বা 'আমরা'-র পরাশাসনে। এই 'আমি'-রও রয়েছে আবার নিজস্ব এক বিবর্তন-বৃত্তান্ত। রোমান্টিক 'আমি' আর আধুনিক 'আমি'-র গপ্পো ঠিক একরকম নয়। বিহারীলাল চক্রবর্তী আর জীবনানন্দ দাশের কথকসত্তার প্রভেদ বুঝতে খুব বেশি আয়াস হওয়ার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কালানুক্রমিক কাব্যপরিক্রমায়ও কি ঠিক এক অপরিবর্তনীয় 'আমি'-রই সাক্ষাৎ মেলে শুধু? রণজিৎ গুহ বলতে চান 'ত্রিগীত পর্বে' (গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি)-র গানে এমন এক বহুস্তরীয়, সঞ্চরণক্ষম 'আমি'-র সাক্ষাৎ মেলে যা একাধারে যেমন কবির অন্যান্য পর্যায়ের থেকে স্বতন্ত্র, তেমনই তা অনেক বেশি গাঢ়; বিষণ্ণ কিন্তু আত্মঘন। গীতাঞ্জলি পর্ব বা ত্রিগীত পর্বে কবির 'আমি'-র গাঢ়ত্বের কথা বলেছেন অনেকেই, কিন্তু সে-সব আলোচনাতে রসাবেদনের সাবজেকটিভ নিক্তিই এতকাল প্রধানভাবে গুরুত্ব পেয়ে আসছিল; রণজিৎবাবু সচেষ্ট হয়েছেন যথাসম্ভব কবির জীবন-ইতিহাসের তত্ত্বতালাস করে তাকে একটা তাত্ত্বিক ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে। নৈর্ব্যক্তিকতার ওপরই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নির্ভরতা কায়েম করতে চান। বস্তুত কাব্য জিজ্ঞাসাই তাঁর সন্দর্ভের উপেয়, রবীন্দ্রনাথের 'ত্রিগীত' তার উপায়। কাব্যজিজ্ঞাসার দিক থেকে লেখকের প্রতিপাদনীয় বক্তব্যটি তাঁর অনুসারী হয়ে আগে বুঝে নেওয়া যাক অল্প কথায়।

কবির 'আমি' তাঁর বিশেষ্য-ব্যক্তিসত্তা, না কি সামাজিক বহুস্বরের প্রতিনিধিস্থানীয় এক স্বর; অথবা এসব কিছুরই অন্তঃসার নিয়ে উচ্চারিত দ্বিতীয় কোনও স্বরের অভিব্যক্তি তা—সে জিজ্ঞাসা সভ্যতার আদিশ্লোক থেকে উচ্চারিত হয়ে আসছে। কবি শব্দবাহনে ভাসিয়ে দেন অর্থের পসরা। শব্দ আর অর্থের সম্বন্ধকে আমরা নিত্যসম্বন্ধ বলেই এতকাল জেনে এসেছি। কিন্তু কে জানে, যে-ঘাটে শেষপর্যন্ত শব্দের নৌকো গিয়ে ঠাঁই নেয়, ততক্ষণ শব্দ-অর্থ আর তাদের মালিকানা সম্পর্ক অটুট থাকে কি-না। একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কবি হয়ত চারিয়ে দেন 'বহু'র মধ্যে; তেমনই আবার আত্ম-অভিজ্ঞতার আস্বাদ নেন তিনি অসংখ্য নির্মিত 'না-আমি'-র দর্পণে। সেই আত্ম-সাক্ষ্যৎকারের নিভৃত মুহূর্তে কখনও কখনও বা 'আমি' আড়াল নেয় কিংবা আস্বাদন করে 'অপর' কোনও 'তুমি' বা 'সে'-র মধ্যে। বিশেষ্য-ব্যক্তিসত্তা এমনই করে নিয়ত অসংখ্য সর্বনাম-সত্তায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আমাদের স্কুলপাঠ্য বইতে বিশেষ্য-সর্বনাম নেহাতই ব্যাকরণের দুটো শব্দ; রণজিৎ গুহ আমাদের এ বইতে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, শব্দগুলি নির্জীব ধ্বনি-কঙ্কাল নয়, ওর মধ্যে আছে সত্তাভাব। চিন্তন ও চেতনার জায়মান এক প্রক্রিয়া নিরন্তর ঘটতে থাকে 'নাম' আর 'সর্বনাম'-এ। কীভাবে সম্ভব হয় পারস্পরিক সঞ্চরণের এই প্রক্রিয়া? শব্দের কক্ষান্তরিত অর্থের বোধ-উদবোধনে বিশেষ ভূমিকা থাকে 'উপকার' বা metaphor-এর। 'চর্' ধাতুর মধ্যেই রয়েছে ওই কক্ষান্তরণের ইঙ্গিত। কিন্তু শব্দ আর অর্থের সম্বন্ধের মধ্যেও তো রয়েছে নানা স্তর, নানা তল! তাহলে কাব্যের অন্তর্রসায়নে শুধু দৈশিক বা অনুভূমিক সঞ্চালনই রস-প্রতীতির একমাত্র হেতু হয়ে উঠতে পারে না, তার অন্য একরকম উল্লম্ব বিবর্তনও ঘটে থাকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এত ব্যাকরণের আবাহন করতে হল লেখককে তাঁর সন্দর্ভে? প্রাচ্যের মূলত ভর্তৃহরি এবং

পাশ্চাত্যের হুমবোল্‌ড, চমস্কি প্রমুখ পণ্ডিতের সাক্ষ্য নিয়ে রণজিৎ গুহ আমাদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন 'ভাষা' শুধু মানুষে মানুষে সংযোগই রক্ষা করে না; আমাদের চিন্তাভাবনার মৌলিক সংগঠনটিও বুঝে নেওয়া যায় ভাষার ব্যাকরণে। ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে যদি সেই চিন্তাভাবনাকে তথা চেতনাকে এবং ফলত, সেই চেতনা-নিঃসৃত ভাষ্যকে অনুধাবন করা যায়, তাহলে সাহিত্য-সমালোচনায় নৈর্ব্যক্তিক অনুশীলনের একরকম শুরুয়াৎ হয়। চেতনার কথা আর বিবর্তনের হদিশ থাকে বলে সমালোচনা তখন ইতিহাস-প্রক্রিয়ারও অংশভাক হয়ে পড়ে। কাব্যতত্ত্বকে তখন সহজে জীবন-বাস্তবতায় অনুবাদ করে নেওয়া চলে। সেই মিলবিন্দুতে বইতে কোনও গুপ্ত বিদারণ-রেখা রয়ে গেল কি-না অলক্ষিতে, সে-প্রশ্ন অবশ্য পাঠক তুলতেই পারেন। তার আগে সপ্ত-পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত বইটির সূচি-পরিকল্পনার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে নেওয়া আবশ্যক।

কাব্যের মধ্যে যে 'আমি-তুমি'-র সম্পর্ক; যে-সম্পর্ক-জিজ্ঞাসা কাব্য-তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক, তার ব্যাকরণগত সংস্থিতি (constitution) কীভাবে ক্রিয়াশীল থাকে স্রষ্টা এবং ভোক্তার সৃজন ও আস্বাদনে তার বিশদ আলোচনা রয়েছে মূলত প্রথম পরিচ্ছেদে। বলা যেতে পারে এই পরিচ্ছেদেই লেখক তাঁর স্বীকার্যগুলিকে (postulates) গুছিয়ে নিতে চেয়েছেন। এই সম্বন্ধের নিরীক্ষায় পাশ্চাত্যের 'Existential-Phenomenology'-র তত্ত্বও যোগ করা যায় কি-না যোগ্য পাঠক তা ভেবে দেখতে পারেন। পুনরুচ্চারণ হলেও এতটুকু বোধহয় আমাদের বলে নেওয়া চলে যে আমাদের দেশের প্রাচীন বৈয়াকরণিকেরাও ব্যাকরণ-জিজ্ঞাসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিতে জানতেন সত্তাজিজ্ঞাসাকে। প্রশ্নটিকে নতুনভাবে উত্থাপন করার জন্য লেখক ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থটিকে অবলম্বন করেছেন প্রধানভাবে। ভর্তৃহরি বলতেন, জগতে এমন কোনও জ্ঞান নেই যা শব্দসম্পর্ক ব্যতিরেকে জন্মাতে পারে। কথাটা রণজিৎ গুহর ভাষায় দাঁড়িয়েছে, অস্তিত্বকে ভাবতে হয় সত্তা-ও-ভাষা, ভাষা-ও-উপচার এবং উপচার-ও-সত্তা—এই তিনটি যুগ্ম সম্বন্ধের চক্রাবৃত্তির মধ্যেই।' (পৃ. ৩৮-৩৯)। আদত কথা, 'জ্ঞান' মানেই 'জ্ঞাতা' আর 'জ্ঞেয়' বিষয়ের সম্বন্ধ। 'জ্ঞাতা' মাত্রেই একজন 'আমি' আর 'জ্ঞেয়'-র মধ্যে রয়েছে 'তুমি', 'সে', 'ও', 'ওটা' ইত্যাদি সর্বনামমালা। 'জ্ঞান'-প্রক্রিয়ায় এই দুইয়ের মধ্যে চলাচল ঘটছে নিয়ত, তাতে রূপান্তরতি হয়ে যাচ্ছে সত্তাধর্ম; অন্তত রূপান্তরণের অবকাশ পাচ্ছে সে। রূপান্তরণের প্রধান শক্তি 'উপচার ধর্ম'। উপচারকে মাঝে রেখে সত্তা আর ভাষার কাজ চলছে মানুষের চেতনা-বিশ্বে। ফলে ব্যাকরণ আর সত্তার অভিসংবাদ একটা জায়গায় গিয়ে যে ঐকাত্ম্য হয়ে ওঠে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এরপর লেখক তাঁর প্রথম পরিচ্ছেদের তাত্ত্বিকতার একটি প্রয়োগ-ক্ষেত্র নির্বাচন করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ত্রিগীত পর্ব'-এর বহু আলোচিত 'আমি-তুমি'-র স্বরূপ ও সত্তাসন্ধানে নিবদ্ধ হয়েছেন লেখক এই পরিচ্ছেদসমূহে। যেহেতু, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-পর্বের 'আমি-তুমি' সংক্রান্ত বিতর্ক অনেক পুরনো; সেজন্য এইখানেও লেখককে নৈয়ায়িক-শৃঙ্খলায় 'পূর্বপক্ষ-খণ্ডন' করে নিতে হয় সর্বাগ্রে। আর পূর্বপক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হয় সুকুমার সেন, আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং শঙ্খ ঘোষের গীতাখ্য আলোচনা। লেখকের বিচারে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় বস্তুত প্রথম দু'জনকেই। শেষোক্ত জনের সংগত সশ্রদ্ধ উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রপাঠের প্রাসঙ্গিক পর্যায়ের সমালোচনা বা প্রশস্তি কার্যত এ বইতে অনুপস্থিত। গীতাঞ্জলির পাঠ-ইতিহাসের আলোচনায় পূর্বপক্ষ-হিসাবে লেখকের নির্বাচিত ত্রয়ীর মধ্যে 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস'-কার সুকুমার সেনের নাম থাকার জন্য বিস্ময় প্রকাশ যদি নাও করি, তাহলেও অন্তত প্রমথনাথ বিশীর নাম অমনোনয়নের জন্য কিঞ্চিৎ অনুযোগ নিবেদন না করে পারি না। প্রমথনাথ বিশীর কথাই যে বিশেষ করে মনে হল তার কারণ, রণজিৎবাবু উল্লেখ না করলেও আলোচ্য বইয়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষ দুটি উপ-অধ্যায়ে আলোচিত আকাশ গঙ্গা, রবীন্দ্রকাব্যের সামান্যকথন ও অতিকথন (রণজিৎবাবুর ভাষায় 'দ্রুত আর বিলম্বিত') দোষ প্রসঙ্গে বিশীর 'রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ' ও 'রবীন্দ্র সরণী'র পাঠস্মৃতি পাঠকের মনে সততই ভেসে উঠতে পারে। এসব আশকথা-পাশকথা সরিয়ে রেখে দেখা যাক সুকুমার সেন এবং আবু সয়ীদ আইয়ুব লেখকের বিচারে খণ্ডনীয় 'পূর্বপক্ষ' হিসাবে প্রতীত হলেন কেন?

সুকুমার সেনের ত্রুটি, ব্যক্তিজীবনে 'তিনি সম্পূর্ণই অসাম্প্রদায়িক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি'র মানুষ হলেও রবীন্দ্রনাথের ত্রিগীতকে তিনি 'একরকম ধর্মঘেঁষা ঐতিহ্যে একনিষ্ঠ রাখতে চান।' (পৃ. ৬৫)। লেখকের বিবেচনায়, এর ফলে সুকুমার সেনের পাঠে দেখা যায় একরকমের স্ববিরোধের উপক্রম; যার নিরসনে তিনি [সেন] ভক্তিবাদী মরমিয়া প্রসঙ্গ অবতারণার মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। রণজিৎবাবুর ইঙ্গিত, সুকুমার সেনের সাহিত্য-ইতিহাস, রচনা-রাজনীতিরই সংকট এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে আবু সয়ীদ আইয়ুবের

গীতাখ্য-পাঠসংকটের প্রকৃতি আবার আলাদা রকম। আইয়ুব গীতাখ্য পর্বে যে-'আমি'-কে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁকে ভক্তহৃদয় কবির আত্মসত্তা বলে মেনে নিলেও ভক্তির উদ্দিষ্ট যে সর্বদা ঈশ্বর বা লোকাতীত কোনও সত্তা—এমন মনে করেননি। ফলে, রবীন্দ্রনাথের গীতাখ্যের আলোচনায় 'ভক্তি'র একরকম বর্গীকরণ প্রস্তাব করেছেন তিনি। লোকাতীত শ্রদ্ধা ভক্তি আর লোকায়ত মানবিক ভক্তি, প্রস্তাবিত বর্গের দুই ধারা। নামান্তরে, 'পূজা' আর 'প্রেম'-এর দুই কোঠায় তাঁর পাঠ-ভাবনাটিকে বিন্যস্ত করে নিতে চেয়েছিলেন আইয়ুব। রবীন্দ্র সংগীতে 'পূজা আর প্রেম'-এ মেরুকরণ আদৌ সম্ভব কি-না সে প্রশ্ন নিশ্চয়ই সংগত; কিন্তু আইয়ুবের বিন্যাস-পদ্ধতির প্রতি ততটা নয়, রণজিৎ গুহ অভিযোগ হেনেছেন 'আত্মনিবেদন ও আত্মস্ফুরণের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই কি তাঁর বলার ছিল না? না কি 'গীতাঞ্জলি সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা'-কে বড়ো করে দেখাতে গিয়ে তিনি অন্য সব সমস্যা নিয়ে জিজ্ঞাসারই পথ বন্ধ করে দিয়েছেন' —এই আপশোস আর উষ্মায়। (পৃ. ৭৫)। আইয়ুবের 'বন্ধ করে দেওয়া পথ'-এর আগল ভেঙে 'সুবিচারের স্বার্থে...আইন সংগত নিরপেক্ষতার আদর্শে ব্যক্তিগত মতামত ও প্রবণতাকে যথাসাধ্য সংযত রেখে মীমাংসায় ভারসাম্য' (পৃ. ৭৬) আনার জন্যই যে রণজিৎবাবুর এই গ্রন্থ রচনার মহতী ও উদ্যমী চেষ্টা তা বোঝা যায় অচিরেই। সমালোচনার ক্ষেত্রে কে কার মুখে হাত দিতে পারে—সে প্রশ্ন না হয় অনুচ্চারিতই থাক, তা বলে 'আইনসংগত নিরপেক্ষতা' নামক এক অস্পষ্ট ধারণার স্বার্থে পাঠকের পাঠের 'ব্যক্তিগত সমস্যা'-কে কেন আক্রান্ত হতে হবে তা বোধগম্য হয় না আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানেও। 'ভণিতা' অংশে অথচ, লেখক নিজেই বলেছেন, কবিতার আমি-তুমি-র প্রশ্নে পাঠক নিজেও সেই সনাতন সমস্যার আধুনিক উপাদান। 'যেহেতু সে-অনুভূতি তার [পাঠকের] ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গে ও ব্যঞ্জনায় অনন্য, তাই পুরাতন প্রশ্নটি আবার উজ্জীবিত হয় পাঠকেরই রসগ্রাহিতায়।' (পৃ. ৮)। এই রসগ্রাহিতার বিস্ময়সূচক প্রশ্নই তো তুলেছিলেন আইয়ুব তাঁর 'ব্যক্তিগত সমস্যার' আলোতে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে অনাস্থা সত্ত্বেও, একজন নাস্তিক, কীভাবে রবীন্দ্রনাথের গীতাখ্য-এর গানে আশ্রয় পান—এ জিজ্ঞাসার উত্তরসন্ধান আইয়ুবের সত্তাজিজ্ঞাসারই অংশ। এই আততিময় প্রশ্নের মধ্যেই লগ্ন হতে পারার আত্মতার সঙ্গে লগ্ন হতে না-পারার সংশয়ী নৈর্বক্তিকতার সংকট অভিব্যক্তি পায়। শুধু তো কবির নয়, পাঠপ্রক্রিয়ায় পাঠকেরও গরজ থাকে 'আমি'-র সঙ্গে 'তুমি'-কে মিলিয়ে নেওয়ার, কখনও বা চেষ্টা থাকে তার 'আমি' থেকে উৎক্রান্তির। আইয়ুবের বর্গবিভাজন প্রস্তাবে যদি আপত্তি থাকেও; কিংবা তাঁর এলিয়ট উদ্ধৃত 'বক্তৃতাটি তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনেই শুধু ব্যবহার' যদি করেও থাকেন, তা বলে তাকে 'একচোখো মতামতের ঠুলিপরা সমালোচনা' (পৃ. ৯৫) বলাটা লেখকের দম্ভোক্তি এবং অসহিষ্ণুতা ছাড়া আর কিছু বোঝায় না।

আসলে যে-কোনও তত্ত্ব-উপস্থাপনও রাজনৈতিক কৃত্যের বাইরে নয়। খণ্ডনীয় পূর্বপক্ষের নির্বাচনই বলি আর সুবিধামতো উদ্ধার-চিহ্নের ব্যবহারই বলি—সমালোচনা-রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা চিরদিনই। তার সঙ্গে বিবাদ করা একরকম আত্মপ্রতারণা। সমালোচনায় আমাদের রূঢ় বচনে তেমন আস্থা নেই, নাহলে সুবিধামতো উদ্ধৃতি-উদ্ধারের জন্য রণজিৎবাবুকেও হয়ত একইভাবে অভিযুক্ত করা যেত।

ছন্দ ও সুরের বাইরে ত্রিগীত পর্বের রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা তথা জীবনের নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসের সন্ধানে রণজিৎবাবু রথীন্দ্রনাথকে ১৯১৪ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি উপস্থাপন করেছেন। বহুল পঠিত ওই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তীব্র মানসিক অবসাদের স্বীকারোক্তি করেছিলেন। মানসিক বিষাদ তখন প্রায় শারীরিক উপসর্গে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই স্বীকারোক্তির 'দ্বিতীয় স্বর'-এর সঙ্গে ত্রিগীত-গানের সম্বন্ধপাত করে অতঃপর রণজিৎবাবু একরকম জীবনীমূলক ফলত ইতিহাসগত, সমালোচনা প্রস্তুত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ যে 'রবি-কা'র গানের মধ্যেই তাঁর আত্মজীবনের প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে আছে বলে মনে করতেন, তার তুলনায় রণজিৎ গুহর ভাষ্য গভীর-সঞ্চারী এবং ভাষাতত্ত্বের ভাষায় 'গহন অন্তর্দেশ সংগঠন' (Deep Structure)-স্পর্শী বলে মনে হয়। এরপর সূত্রায়নের প্রয়োজনে লেখক ত্রিগীত-এর গান-মালায় কেন এক আত্মমর্ষকামী (Masochist) সত্তাকে বারবার দেখা যায় তার ব্যাখ্যা করেন ফ্রয়েড প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকদের রচনার বিপুল উল্লেখে। সাময়িক স্নায়ুবৈকল্য কিংবা নিউরালজিয়ার সঙ্গে 'মনের বিকার'-এর একরকম Clinical সম্পর্ক অবশ্যসিদ্ধ। সাহিত্যে তার প্রতিফলনের সম্ভাবনা নতুন কোনও তথ্যও নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন বিচ্ছিন্ন দু'একটি উপাদান আর কিছু থিওরির সাহায্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো অজস্রমনা (myriad minded)-কে ঠিক ছেঁকে নেওয়া যাবে তো? তত্ত্বের আশ্রয়বাক্যেই রয়ে যাবে না তো কোনও ফ্যালাসির ফাঁদ? আশঙ্কা এজন্যই ব্যক্ত করি যেহেতু, এক রবীন্দ্রনাথ যখন গানে নিজেকে একটি বিন্দুতে সংহত করে নেন, আরেক রবীন্দ্রনাথ তখন নানা রকম কর্ম-উদ্দীপনায় সাগ্রহ অংশ নেন। তাছাড়া, গীতাঞ্জলি-পর্বের গানমাত্রই তো নিজেকে গুটিয়ে

নেওয়া নয় সবকিছু থেকে। লেখকের মতে যে 'গীতালি' কাব্যে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথের এই পর্ব থেকে নিষ্ক্রান্তি সূচিত হচ্ছিল ক্রমে, সেই 'গীতালি'-র অনেক আগে ৭ আষাঢ় ১৩১৭ তারিখে লেখা হয়েছিল 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো'-র মতো গান। শুধু গানের সাক্ষ্যেই নয়, 'গীতাঞ্জলি'-র কবিতা-গানগুলি লেখার সমসময়ে 'তপোবন', 'সামঞ্জস্য', ইত্যাদি প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, সে দিকটিও আমাদের নজরে রাখা জরুরি মনে হয়। ১৯১৮-তে যে বিশ্বভারতীর ভাবনায় দেশীয় প্রকরণে বিশ্বকে পরিগ্রহণ করার প্রস্তাব, আমাদের ধারণা, তার সূচনা ওই ১৯১০-এর গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের পাশাপাশি লেখা 'তপোবন' ইত্যাদি প্রবন্ধেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। সুতরাং, ত্রিগীত যতই নিবিড় আমিত্বের কাব্য হোক, অন্যনিরপেক্ষভাবে তার সম্পর্কেও বিষাদ-ব্যাধির সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায় যথেষ্টই। রবীন্দ্রনাথ পড়তে গিয়ে পরম্পরিত তথ্য আর সাহিত্য মিলিয়ে কখনই মনে হয় না যে সামগ্রিক অর্থে, কোনও এক পর্বে কবি সম্পূর্ণ আত্ম-প্রত্যাহার করেছিলেন। নিজের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার যে আর্তি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন নির্মলকুমারী মহলানবিশকে এই পর্বেরই কাছাকাছি এক সময়ে, এবং শেষ পর্বেও যে আর্তিটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে জীবনের শেষ কবিতা পর্যন্ত, তা অন্য শব্দের অনটনে একান্ত রাবীন্দ্রিকসাধনা বলেই উল্লেখ করা যেতে পারে। 'নাম'-কে কক্ষান্তরিত করা এ সাধনার লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। 'নাম' আর 'নামী'-র বিচ্ছেদ নয়, 'নাম'-এর আবরণ উন্মোচন করে তাকে স্ব-ভাব ও স্ব-রূপসভায় বিকশিত করার একরকম তৎপরতা ছিল খ্যাতি-বিড়ম্বিত রবীন্দ্রনাথের। পরিণামী সিদ্ধান্তে যা সদর্থক, আলোক-সম্ভব। রথীন্দ্রনাথকে লেখা কবির চিঠির শেষপর্যন্ত যদি লেখক উদ্ধার করতেন তাহলে হয়ত ঈপ্সিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাঁর বিলম্ব হত কিন্তু তাতে অন্তত ত্রিগীত-বিচারে এমন অব্যাপ্তিহেতুদোষ ঘটত না। 'সংযোজন' অংশে গোটা চিঠিটি রেখে দেওয়া হয়ত লেখকের কুশলতার পরিচায়ক কিন্তু কাঙ্ক্ষিত তত্ত্ব খাড়া করার জন্যই সম্ভবত সন্দর্ভে চিঠিটির শেষাংশ অন্-উদ্ধৃত থেকে গেছে। ও চিঠির শেষ লাইনে আছে 'মৃত্যুর যে গুহার দিকে নেবে যাচ্ছিলুম তার থেকে আবার আলোকে উঠে আসব কোনো সন্দেহ নেই।'

'আবার' কথাটিও এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাময়িকভাবে 'রবি' অনেকবারই মেঘে ঢাকা পড়েছেন। 'জীবনস্মৃতি'-র কোনও কোনও অংশ আর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা তার রাজসাক্ষী। সেই পর্বের রোমান্টিক বেদনাতুর 'আমি'-র সঙ্গে মাত্রাগত বা গুণগত ফারাক যদি থেকেও থাকে 'ত্রিগীত' পর্বের—তবু এই দুইয়ের একরকম সমান্তরালতাও কি নেই? চিত্রকল্প বা প্রতীককে কোনও লেখকের চিন্তার স্বকীয়তার চিহ্ন বলেই মনে করেন রণজিৎবাবু। আমরাও এ প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে সহমত। ওই চিঠিতে উল্লিখিত গুহা-অন্ধকার = দুঃস্বপ্ন, ছাত-আলো = মুক্তি ইত্যাদি বিপরীত যুগ্মকগুলির সঙ্গে 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'প্রভাত সংগীত'-এ উত্তরণকালের চিন্তা-চেতনার মিল খুঁজে পাই সেজন্যই। আলোকে নিষ্ক্রান্তির গরজ কবির কতটাই তা বোঝা যায়, যখন ওই একই প্রত্যয়ী চিঠি তিনি আরও কাউকে কাউকে লেখেন। এন্ডরুজকে লেখা চিঠিতেও (৭ অক্টোবর, ১৯১৪) সেই উৎক্রান্তির প্রত্যয়ই পুনরুচ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় 'বিষাদ ব্যাধি' এজন্যে আমাদের অভিলক্ষে তত প্রাধান্য পায় না, পায় তার থেকে উত্তরণ বা উত্তরণ-প্রয়াসের দীপ্যমানতা যতটা। আর, সেজন্যই 'ত্রিগীত' পর্বের গানকেও নির্বিচারে 'দুঃখের গান' বলে মনে করতে পারি না।

অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ৮ আশ্বিন ১৩৪৩ [১৯৩৬] একটি চিঠিতে দুঃখ কেন স্বরূপত আনন্দময় তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে ভিতরের 'আমি' বা অস্মিতাটিকে নিবিড় করে পাওয়ার বেদনাকেই আনন্দের হেতু বলে নির্দেশ করেছিলেন কবি। আলোচ্য পর্বেও সেই 'আমি'টিকে নানা উপচারে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। সেই সাক্ষাতের সাফল্য আর অসাফল্যে, পেতে চাওয়া আর না-পাওয়ার দ্বান্দ্বিকতায় 'আধুনিক' হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের গান। আইয়ুবের মতো সংশয়ীও ত্যাতে এজন্য আশ্রয় পেতে পারেন। আর 'ভক্তিকাব্য' বলেও যদি কেউ গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' তাতেই বা আপত্তি জানাব কোন অহমিকায়? কেননা, উপচার, ঐতরিকতা আর উৎক্রান্তির যে তত্ত্বভিত্তিতে রণজিৎবাবু তাঁর প্রকল্পটিকে প্রতিষ্ঠা দেন তার মধ্যেই তো স্বীকৃত থাকে শব্দ আর অর্থের অনিরূপণীয় সঞ্চালন-সম্ভাবনার। সম্ভাবনার অফুরন্ত উৎসের নিদর্শন হিসাবেই তিনি 'ত্রিগীত' পর্বকে বেছে নিয়েছেন তো সেইজন্যই!

যথার্থই, রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের গানের মতো এত বহুস্তরিক অর্থ-সঞ্চালন সম্ভাবনার নিদর্শন খুব বেশি নেই। মিতকথনের এক দিব্য কার্পণ্যে আর চিত্রকল্পের স্বয়ংসিদ্ধ ক্ষমতায় নিটোল অশ্রুবিন্দুর মতো রমণীয় ও পবিত্র মনে হয় এর বাণী, ছন্দ, তাল, লয়। কীভাবে তার মধ্যে ঘন হয় এতখানি শমতা, তৈরি হয় বিন্দু-বিন্দু নাট্যমুহূর্ত? সমস্ত সৃষ্টিপ্রয়াসের মধ্যেই সংহত অনিবার্যতা গড়ে ওঠে কী করে এমন? ভাষা-সংগঠনগত নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাতে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে ইতিপূর্বে। আপাত অর্থ আর নিবিড় অর্থে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে তৈরি করেন মায়াবিভ্রম, অথবা ছল-শব্দে

আঁতের কান্না ঢাকেন কবি, তার হদিশ অনেক গানেই পাওয়া যাবে। অনেক গানই প্রকৃতি-প্রেম-পূজা ইত্যাদির বর্গশাসন-ছুট হয়ে মিশে যেতে পারে ঔপচারিক প্রেরণায়। 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' এজন্য 'শারদোৎসব' (১৯০৮)-এর গান হয়েও 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০)-র গান। 'মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে' গানে প্রেম-প্রকৃতি-পূজা লগ্ন হয়ে থাকে তাই। কেননা প্রকৃতি তো রবীন্দ্রনাথের গানে কেবলই উদ্দীপন কিংবা আলম্বন বিভাব নয়, তা প্রসারিত আত্ম-এরই এক বৈশ্বিক চেতনা। এই চেতনার কোন বিন্দুতে কোন অভিজ্ঞতা বা কোন সংস্কার কাজ করছে, অভিজ্ঞতা কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে সৃজনের বয়ানে তা হলফ করে বলা মুশকিল। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মতো স্রষ্টার বিচারে আপাত তথ্য, উপরি তথ্য এবং সেই তথ্যের সমবায়ে গড়ে ওঠা 'চমৎকৃত' তত্ত্ব অধিকাংশ সময়ই ঠিক সাক্ষ্য দেয় না। 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' (১৯৪১) প্রবন্ধে যার জন্য জীবন-উপান্তে খেদ প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একটি গানের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। 'আজ বরষার রূপ হেরি' গানটি (গীতাঞ্জলি-১০০) লেখা হয়েছিল ১১ আষাঢ়, ১৩১৭। প্রকৃতির গান, বর্ষার গান। রবীন্দ্র-জীবনের সাক্ষ্য নিন এবার, দেখবেন এ গান লেখার আগের রাতে আশ্রম-বালক তথা বন্ধুপুত্র সরোজ মারা গেছে। শোকস্তব্ধ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ওই গানের কি কোথাও কোনও যোগ আছে? আপাতভাবে নেই, কিন্তু শেষ লাইনে (নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোহে/ কোন সে ভীষণ জীবন মরণ রাজে।) পৌঁছানোর পর ওই মৃত্যুর সঙ্গে এ গানের একটা অদূরতর সম্পর্ক পাওয়া যায়। যদিও মৃত্যু তখন আর বিশেষের নয়, হয়ে উঠেছে অন্য এক উৎক্রান্ত দর্শন। দুঃখের এই sublimilation; এই মুক্তিচেতনার ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে কী করে আধখানা এক চিঠির সাক্ষ্য আমাদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে? 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই/ বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে'—এই 'বাসনা' আর 'বঞ্চিত হয়ে বাঁচা'-র যুগপৎ আততি আর 'বিরোধাভাস' অলংকারের অব্যর্থ প্রয়োগে সেই আততিকে অভিব্যক্ত করার বিশেষ রবীন্দ্র-প্রকরণটির কথা বিস্মৃত হয়েই বা কীভাবে তাঁর গানের কাছে পৌঁছব! বিশেষ করে, আমরা যারা তাল-লয় ছিন্ন তাঁর গীতসাহিত্য নিয়ে কথা বলতে চাইছি তারা তো নজর করব বিরোধাভাসের ভাষিক-সংগঠনের মধ্যে টানা আর পোড়েনের নকশা কেমন ফুটে ওঠে; কেমন কেন্দ্রাতিগ আর কেন্দ্রাভিগ দুই বলের মধ্যে নেমে আসে শমের ভারসাম্য। রবীন্দ্রনাথের ঔপচারিকী সত্তায় শব্দ আর অর্থের পারস্পরিকতার সংঘটনে বিশেষ গুরুত্ব পায় এই 'বিরোধাভাস' অলংকারের সামর্থ্য। রণজিৎবাবু তাঁর প্রকল্পে ভর্তৃহরিকে পুনর্বাসিত করতে চেয়েছেন কিন্তু বিস্মৃত হয়েছেন 'বিরোধাভাস' অলংকারের কূটাভাস বোঝবার প্রাথমিক শর্ত। ফলে সপ্তম পরিচ্ছেদে সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটিকে সমে নিয়ে আসার চেষ্টা সত্ত্বেও বুদ্ধি আর বোধের মধ্যে মিতালি ঘটতে পারে না। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আর তত্ত্ব-প্রবণতার অতিরেকের জন্যই হয়ত এই বিপর্যয় ঘটে থাকবে। কখনওবা দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর প্রয়াস তাত্ত্বিক-কাঠামোটি প্রসঙ্গেই তর্জনি-সংকেতের কারণ হতে পারে। যেমন 'বলাকা' সম্পর্কে প্রক্ষিপ্ত মন্তব্যটি—কবি 'শরীর-মনের সংকট থেকে মুক্ত হয়ে 'বলাকা'-র শেষে আবার নিজেকে সেই স্বধর্মে খুঁজে পেলেন। কবিতাও ঘরে ফিরে এল।' (পৃ. ১৬০)। 'স্বধর্ম' বলতে যদি স্বভাব-লগ্নতা বোঝায় আর 'ঘরে ফিরে এল' বলতে স্বভাব ধর্মে কবির প্রত্যাবর্তন হয় তাহলে কথাটার অর্থ দাঁড়ায় গোটা গীতাঞ্জলি-পর্বটিই কবির স্বভাব-ভ্রষ্ট এক বিচ্ছিন্ন দেশ, যেমনটা প্রাথমিকভাবে একসময় মনে হয়েছিল প্রমথনাথ বিশীরও। প্রমথনাথ পরে আত্ম-সংশোধন করে নিয়েছিলেন; রণজিৎবাবুর তত্ত্বের ঘোড়া তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবে বলা মুশকিল। সদ্যোদ্ধৃত অংশটি সম্পর্কে নীরব থেকে আমরা শুধু বলতে চাই গীতাঞ্জলি-পর্বের বিশেষত্ব মান্য করেও লেখক যদি পূর্বাপর রবীন্দ্রমানস বিবর্তনের হদিশ নিতেন তাহলে অন্ত্যপর্বে অন্যভাবে কবির 'আমি'-র আরেক রকম উৎক্রম দেখতে পেতেন হয়ত। বলা যায়, সে 'আমি'—অপেক্ষাকৃত 'ব্যক্তিগত আমি'। রণজিৎবাবু বলতে পারেন, সে হল 'আমি'-র আরেক কিসিম—কবির 'নাম' বা বিশেষ্য পদ।

পরিশেষে বলা যায়, চিহ্ন ও চিহ্নায়নের ভাষাতত্ত্বের পাশ্চাত্যকে তার প্রতিকল্প প্রাচ্য-ভাবনার সহযোগে ও সংশ্লেষণে লেখক রবীন্দ্রনাথের 'ত্রিগীত পর্ব'-এর অর্থ তথা সত্তাজিজ্ঞাসার একটি পদ্ধতি খোঁজবার প্রয়াস পেয়েছেন এ বইতে। তাঁর ঈপ্সা রবীন্দ্রচর্চায় কায়েমি আদিকল্প (paradigm) ভাঙুক। সাধু উদ্‌যোগ। কিন্তু পাণ্ডিত্যের বিপুল ভরের জটে সূত্রায়নের যে কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হয়েছে এখানে, সেখান থেকে আলোক-প্রত্যাশী পাঠক দিশা পাবে তো আদৌ?

এই সংশয় সত্ত্বেও বইটির প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ কৃতার্থতাও জ্ঞাপন করি। রবীন্দ্র-আলোচনায় নবীন উদবেদনা সঞ্চারের জন্য রণজিৎ গুহকে সশ্রদ্ধ কুর্নিশ জানাই। এতগুলো প্রতিপ্রশ্ন ও পরিপ্রশ্ন সঞ্চার করতে পারে, এমন বই-ই বা ক'টা মেলে এই তীব্র খরা-মরশুমে!

কবির নাম ও সর্বনাম—রণজিৎ গুহ/তালপাতা, কলকাতা-৮১/১৫০.০০

ডিরোজিও বিষয়ক তথ্যের উৎস ও দলিল

আমজাদ হোসেন

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)-র ভূমিকা ছিল প্রকৃত অর্থে যুগান্তকারী। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা, আচার ও সংস্কারকে যুক্তির প্রয়োগে পুনর্বিচার করার যে প্রক্রিয়া হিন্দু কলেজের ছাত্ররা শুরু করেছিলেন, সেই প্রক্রিয়ার ক্যাটালিস্ট ছিলেন ডিরোজিও। তাঁর ঠাকুরদা মাইকেল ডিরোজিওকে ১৭৮৯ সালের সেন্ট জন'স চার্চের রেকর্ডে একজন 'নেটিভ প্রোটেস্ট্যান্ট' আর ১৭৯৫-এর বেঙ্গল ডাইরেক্টরিতে একজন 'পোর্তুগিজ মার্চেন্ট অ্যান্ড এজেন্ট অব ক্যালকাটা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পোর্তুগিজ পিতা ও ইংরেজ মায়ের সন্তান হেনরি ডিরোজিও দ্বিধাহীনভাবে জন্মভূমি ভারতকেই তাঁর স্বদেশ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর কবিতায় ভারতের লুপ্ত প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক গৌরবকে পুনরুদ্ধার করা (হার্প অব ইন্ডিয়া') এবং এই দুর্ভাগা দেশের জন্য দেশ-বিদেশে সকলের কাছ থেকে মঙ্গল ও শুভেচ্ছা অর্জন করাই তিনি তাঁর জীবনের কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার ('মাই কান্ট্রি! ইন দাই ডে অব গ্লোরি পাস্ট') বলে মনে করতেন।

কিন্তু ডিরোজিও-র প্রিয় ও বিখ্যাত ছাত্ররা এবং সমসাময়িক স্বদেশবাসীরা তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শুধু তাঁর স্মৃতিচারণাই করেছেন; দুটি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও পত্রপত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর অগ্রন্থিত কবিতা ও গদ্যরচনা একত্র করে একটি রচনাসমগ্র প্রকাশের কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তাঁর মৃত্যুর চার দশক বাদে ১৮৭১ সালে বা আরও সাড়ে তিন দশক পরে ১৯০৭ সালে যখন যথাক্রমে আওয়েন আরাটুন ও বি. বি. শাহ তাঁর কাব্য সংকলন প্রকাশ করলেন, তখন ডিরোজিও-র অনেক অগ্রন্থিত রচনাই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। হয়ত চিরতরে হারিয়ে গেছে। ১৯২৩ সালে এফ. বি. ব্র্যাডলি-বার্ট বা ১৯৭২ সালে পি. লাল সম্পাদিত ডিরোজিও-র নির্বাচিত কাব্যসংকলনকে মোটেই প্রতিনিধিত্বমূলক মনে করা যায় না। এরপর ডিরোজিওকে নিয়ে যাত্রাপালা, নাটক ও সিনেমা হয়েছে; কিন্তু ডিরোজিও-র যথাযথ মূল্যায়নের জন্য তাঁর কবিতা, গদ্যরচনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ গবেষকদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম একটি রচনাসমগ্র প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকীর মাত্র সাত বছর আগে ২০০১ সালে, ড. আবীরলাল মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের সম্পাদনায়।

আমাদের আজকের আলোচ্য গ্রন্থটি (Derozio Remembered...Sources and Documents, Vol I, 1830-1947) ২০০১-এর রচনাসমগ্রের মতোই একটি মূল্যবান প্রকাশনা। বিশেষভাবে উল্লেখনীয় যে এই গ্রন্থের সম্পাদক ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ডিরোজিও-র রচনাসমগ্র সম্পাদনাতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে ১৮৩০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে ডিরোজিও-বিষয়ক যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও লেখা সংকলিত হয়েছে। এছাড়াও ডিরোজিও-গবেষণায় প্রাসঙ্গিক নানা প্রতিকৃতি, ফোটোগ্রাফ, ম্যাপ, বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রচ্ছদচিত্র ও কোনও কোনও পৃষ্ঠার ফোটোকপি, ডিরোজিও-র ঠাকুর্দার সই, পিতামাতার বিয়ের সার্টিফিকেট, ডিরোজিও-র ব্যাপটিজম ও শেষকৃত্যের রেকর্ড—এই রকম তথ্য ও দলিল মুদ্রিত হয়েছে। ডিরেজিও-র পিতামহ ও পিতার সই থেকে তাঁরা 'ডি রোজিও' বা 'ডিরোজারিও' এইসব নামে পরিচিত ছিলেন কি না এই বিতর্কেরও নিরসন হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ডিরোজিও-গবেষণার এইসব 'উৎস ও দলিল'-এর সংকলন যে বিপুল পরিশ্রমের ফসল, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আলোচ্য গ্রন্থে ড. জন গ্রান্ট তাঁর লেখায় (পৃ: ৪৪-৪৭) ডিরোজিও-র বালক-বয়সেই কবিপ্রতিভার স্ফুরণের কথা আলোচনা করেছেন। জীবনের শেষের কয়েক বছরে ডিরোজিও যে তেমন উল্লেখযোগ্য কাব্য রচনা করতে পারেননি, তার কারণ হিসাবে তিনি অনুমান করেছেন যে ডিরোজিও ইংল্যান্ডে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি, ইংল্যান্ডের পাহাড়, নদী, বনানী, সবুজ মাঠ কখনও দেখেননি, এমনকী তাঁর নিজের দেশেও তিনি বিস্তৃতভাবে ভ্রমণের সুযোগ পাননি। লেখকের মনে হয়েছে শুধু জঙ্গিরার পাহাড় দেখেই ডিরোজিও যদি তাকে কাব্যে অমর করে রাখতে পারেন, তাহলে ঢাকা, বেনারস, জৌনপুরের ধ্বংসাবশেষ, লখনউ, আগ্রা, দিল্লি, ইলোরা ইত্যাদি জায়গায় যাবার সুযোগ

পেলে তাঁর কল্পনাশক্তি নতুন রসদ পেয়ে নতুন সৃষ্টি করতে পারত।

ডিরোজিও মৃত্যুশয্যায় রেভারেন্ড জেমস হিল নামক পাদ্রির কাছে নিজেকে বিশ্বাসী খ্রিস্টান হিসাবে স্বীকারোক্তি করেছিলেন কি না এই নিয়ে বিতর্ক আছে। ডেভিড ড্রামন্ড ও সি. জে. মন্টেগুর লেখাগুলিতে (পৃ: ৭১-৮০)। এই শেষোক্ত লেখক ছাড়াও টমাস এডওয়ার্ডস ও ই. ডব্লিউ. ম্যাজ রচিত ডিরোজিও-র জীবনচরিতগুলি সংকলিত হয়েছে। ডিরোজিও-র কবিতার প্রথম যুগের সমালোচনার নিদর্শনও আছে (দ্রষ্টব্য, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার', পৃ: ৯৩-৯৪ এবং টমাস ফিলিপ ম্যানুয়েল-এর লেখা, পৃ : ১৩৬-১৩৯)।

এই গ্রন্থের আর একটি মূল্যবান দলিল ১৮৩২ সালের 'দ্য ক্যালকাটা খ্রিস্টিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত 'আ স্কেচ অব দ্য ওরিজিন, রাইজ অ্যান্ড প্রোগ্রেস অব দ্য হিন্দু কলেজ'। এখানে হিন্দু কলেজের অধ্যাপনা থেকে ডিরোজিও-র বরখাস্ত হবার বিবরণ ছাড়াও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের ইতিহাস মূল্যবান তথ্য বলে বিবেচিত হবে। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখাটিতেও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে (পৃ: ১৪০-১৫২)। বস্তুত অনেকগুলি লেখাতেই ডিরোজিও-প্রসঙ্গে উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার ছবি পাওয়া যাচ্ছে, এটি এই গ্রন্থের থেকে বাড়তি পাওনা।

শুধু পরিতাপের বিষয় যে অন্য সব দিক থেকে শোভন এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনায় অজস্র মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০০১ সালে প্রকাশিত ডিরোজিও-র রচনাসমগ্রে ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাটিতেও প্রচুর মুদ্রণপ্রমাদ ও বাক্যগঠনের ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল। সংখ্যায় কম হলেও তাঁর বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকাতেও এই ধরনের ভুল রয়ে গেছে। এই বিপত্তিতে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এফ. বি. ব্র্যাডলি-বার্ট সম্পাদিত ডিরোজিও-র কবিতা সংকলনের ভূমিকাটি (পৃ: ২৪৯-২৭০)। এটা সত্যি যে জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই গ্রন্থের একমাত্র কপিটি খুবই জীর্ণ অবস্থায় আছে—সম্পাদক জানাচ্ছেন, অনেকগুলি শব্দই সঠিকভাবে উদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু সম্পাদক-চিহ্নিত এই শব্দগুলি বাদ দিলেও এই লেখাটিতে নানা ধরনের প্রায় ৬০টি ভুল চোখে পড়েছে। দুটি ক্ষেত্রে (পৃ: ২৫৫ ও পৃ: ২৬০) বাক্যগুলির অনেকটা অংশ বাদ পড়েছে। অন্যত্র কিছু কিছু শব্দ বাদ পড়েছে বা ভুল শব্দ ছাপা হয়েছে, যতিচিহ্নও সঠিকভাবে মুদ্রিত হয়নি। বর্তমান সম্পাদকের মতো পরিশ্রমী গবেষকদের কাছে আর একটু ধৈর্য ও যত্ন প্রত্যাশা করা অন্যায় নয়।

ব্র্যাডলি-বার্টের ভূমিকা ও গ্রন্থ প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলজনক বিষয়ের প্রতি ডিরোজিও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই ভূমিকায় ডিরোজিওর ব্যাপটিজম-এর তারিখ ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে 'August 12th, 1909'। ড. মুখোপাধ্যায় তাঁর সংকলনে এটি সংশোধন করেননি। কিন্তু ব্র্যাডলি-বার্টের ভূমিকায় 'দ্য ফকির অব জঙ্গিরা' কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধরূপে মুদ্রিত 'To India—My Native Land' নামে সুপরিচিত কবিতাটিতে (প্রথম লাইন, 'My country! in thy day of glory past') চারটি ভুল ছিল সেগুলি ড. মুখোপাধ্যায় সংশোধন করেছেন, কিন্তু বিষয়টি তিনি কোনও পাদটীকায় উল্লেখ করেননি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই কবিতার শেষ লাইনটি ব্র্যাডলি-বার্টের ভূমিকায় ও মূল সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে 'My fallen country! one kind wish from thee!' অথচ ডিরোজিও-র কাব্যগ্রন্থের ১৮২৮ সালের প্রথম সংস্করণে ও আওয়েন আরাটুনের ১৮৭১ সালের সংকলনে আছে : 'My fallen country! one kind wish for thee!, 'from thee' নয়। বি. বি. শাহ সম্পাদিত ১৯০৭ সালের সংকলনে এই কবিতাসহ 'দ্য ফকির অব জঙ্গিরা' অন্তর্ভুক্ত হয়নি। মুশকিল হয়েছে যে ব্র্যাডলি-বার্ট-এর এই সংকলনটি একদা বহুল প্রচলিত হয়েছিল বলেই পরবর্তীকালে অধিকাংশ সমালোচক, অনুবাদক ও সংকলক-সম্পাদক তাঁর মুদ্রণই গ্রহণ করেছেন। ডিরোজিও-র 'My fallen country! one kind wish for thee!' এই লাইনের অর্থ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে ভারতের প্রাচীন লুপ্ত গৌরবের গভীরে ডুব দিয়ে তিনি কয়েকটি রত্ন খুঁজে এনে ভারতের বর্তমান দুর্দশায় দেশে বিদেশে সকলের কাছ থেকে তাঁর স্বদেশের জন্য মঙ্গল ও শুভ কামনা অর্জনের সাফল্যকেই তাঁর পরিশ্রমের একমাত্র পুরস্কার বলে গণ্য করবেন। কিন্তু 'for' এর পরিবর্তে 'from thee' হলে অর্থ অন্য রকম হয়। অনেক সমালোচক ব্যাখ্যা করেছেন যে যেহেতু ডিরোজিও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন, তিনি দেখেছিলেন যে এই সম্প্রদায় ইংরেজ ও ভারতীয় সকলের কাছেই ব্রাত্য। সেজন্য ডিরোজিও পরিচিতির সংকটে একটা 'sense of alienation'-এ ভুগতেন। তাই তিনি যেন ভারতের প্রাচীন গৌরবের কিছু রত্ন উদ্ধার করার পুরস্কার স্বরূপ নিজের জন্য স্বদেশের কাছ থেকে শুধু একটা শুভেচ্ছা প্রার্থনা করছেন—'One kind wish from thee!' এইভাবে ডিরোজিও-র চরিত্রকে খানিকটা সেন্টিমেন্টালাইজ করা হচ্ছে, তিনি যেন আত্মগ্লানি থেকে

মুক্তি পাবার জন্য আত্মকরুণার আশ্রয় নিয়েছেন, এইরকম বলা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বিনয় ঘোষের 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' (বাক-সাহিত্য, ১৯৬১) এবং পল্লব সেনগুপ্তর 'ডিরোজিওর কবিতা' (শুকসারী প্রকাশক, ১৯৭০) গ্রন্থেও 'One kind wish from thee!' ছাপা হয়েছে। একই জিনিস দেখা যাচ্ছে K.R. Ramchandran Nair-এর 'Three Anglo-Indian Poets' (Sterling Publishers, ১৯৮৭) নামক আলোচনাগ্রন্থে এবং Eunice de Souza সম্পাদিত 'Early Indian Poetry in English : An Anthology' (OUP, 2005) গ্রন্থে। বাংলায় আধুনিকতার চেতনার উন্মেষক নির্ভীক ডিরোজিও সম্পর্কে এই ধরনের আত্মকরুণাবোধের ধারণাটি দূরীভূত করা আবশ্যক।

Derozio Remembered : Bicentenary Celebration Commemoration Volume. Sources and Documents, Vol I, 1830-1947. Compiled and Edited by Sakti Sadhan Mukhopadhyay/ Kolkata : Derozio Commemoration Committee, 2008/500.00

গভীর মনের পাঠকদের ভাবাবে

আবদুর রাউফ

আলোচ্য গ্রন্থটির নাম 'কিছু লেখা'। এটি ব্যক্তিগত গদ্যের একখানি ক্ষুদ্রায়তন সংকলন। লিখেছেন অনিন্দ্য রুদ্র। তিনি বয়সে তরুণ এবং পেশায় নিরীক্ষক। নিজের পড়াশুনা এবং ভাবনাগুলো নিয়ে লেখালিখি করার তাগিদ তিনি অনুভব করেন এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে। তাঁর নিজের ভাষায়—'আজ আমি এই মুহূর্তে যা ভাবছি তা যদি কোনও অনুভবী মানুষের ভাবনাকে উসকে দিতে পারে তবে এই সামান্য প্রয়াসের শেষ পর্যন্ত কিছু মূল্য থাকবে।' একথা মানতেই হবে, অনুভবী পাঠকের ভাবনাকে উসকে দেয়ার মতো অজস্র উপাদান অনিন্দ্য রুদ্রের এই ব্যক্তিগত গদ্য সংকলনটিতে রয়েছে।

সংকলনের সূচনা হয়েছে যে-লেখাটি দিয়ে তার মধ্যে রয়েছে ভাবনা উসকে দেয়ার উপাদান। 'কফির কাপ' নিয়ে একটা ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে দামি চটকদার কাপে কিংবা অর্ডিনারি কাপে যাতেই কফি পান করা হোক কফির চরিত্রের কোনও হেরফের তাতে ঘটে না। তবুও কফি পানকারীদের ওপর কাপ বেছে নেয়ার চয়েস ছেড়ে দিলে দেখা যায় চটকদার কাপের দিকেই তাদের ঝোঁক। এই ঝোঁকটার প্রসঙ্গ টেনেই জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের বলেছেন, 'চারিদিকে সমস্যার পাহাড় জমে উঠছে। তোমরা চাকরি, অর্থ, সামাজিক সম্মান এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছ—ঐ কফির কাপগুলোর মতোই—অথচ যার জন্য এই সব, সেই জীবনটাই তোমাদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তার চেয়ে বরং সহজ, সরল জীবন কাটাও, দয়ালু হও, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো দেখবে জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে।' (পৃ. ৩)

জীবন সহজতর হয় ক্ষমা চাওয়ার হিম্মত থাকলে। হিম্মত তো বটেই, লেখক যথার্থই বলেছেন—'মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাওয়ার পেছনে এক ধরনের হিম্মত লাগে, মানুষোচিত সাহস'। লেখকের সংশয়—'তা কি আজকাল আমাদের কমে যাচ্ছে?' তা না হলে ক্ষমা চাওয়ার জন্য মোবাইলের মেসেজের আশ্রয় নেওয়া কেন, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের মুখোমুখি না-হওয়ার সুবিধা আছে বলেই কি? অথচ মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'এই দ্বন্দ্বদীর্ণ সময়ে শুধুমাত্র ক্ষমা চেয়ে নেওয়া আর ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে।' (পৃ. ৬)

মানুষের সমস্যার অন্যতম মূল কারণ, তার দ্বৈতসত্তা। মানুষ বাইরে একরকম ভেতরে আর এক রকম। 'এই দুটো লোকের মানসিকতায়, আচরণে যার যত কম তফাৎ—জীবনে সে তত বেশী সুখী।' সুখী হওয়ার অন্যতম আর একটি শর্ত ভাল বন্ধু পাওয়া। এমনিতে বাজারিবন্ধু পাওয়া এখন খুব সহজ। মোবাইলে বন্ধুত্ব, ইন্টারনেটে বন্ধুত্ব, এফ এম রেডিওতে বন্ধুত্ব, খবরের কাগজে ব্যক্তিগত কলমে বন্ধুত্ব—সর্বত্রই এমন বন্ধুত্বের উষ্ণ আমন্ত্রণ। প্রযুক্তি কি বন্ধুত্ব করা কিংবা বন্ধুত্ব পাওয়ার ব্যাপারে মানুষকে খুব কাছাকাছি এনে দিচ্ছে? লেখকের প্রশ্ন—'তাহলে এই যে জানতাম বন্ধু মানে এক জীবনব্যাপী দুর্লভ সাধনা—সেসব কি আর থাকছে

না এখন?' (পৃ. ১৩) সেই 'দুর্লভ সাধনা' সত্যিই এখন আর নেই। আধুনিক মানুষের রুদ্ধশ্বাস অনিকেত ছুটে চলায় বন্ধুত্ব নিয়ে 'দুর্লভ সাধনার' সময় কোথায়? তাই মোবাইল ফোন, চ্যাটিংরুম, টিভি, রেডিও-র ক্ষণিকের বন্ধুত্ব নিয়েই মানুষ খুশি। কিন্তু এতে মানুষ নিঃসঙ্গতার বোধ থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না। কারণ, ক্ষণিকের বন্ধুত্বে তার মন ভরে না।

বন্ধু মনের মতো না হলে কমিউনিকেশনের সমস্যা হয়। প্রসঙ্গক্রমে অসীম রায়ের লেখা 'ক্যাওড়া পার্টি' গল্পটা নতুন করে শুনিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থটির লেখক। 'একটি ছেলে সবে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছে তাকে নিয়েই গল্প। ছেলেটি অন্তর্মুখী, ভাবতে পারে, গভীর মনের ছেলে। অথচ পাড়ার রকে যাদের সঙ্গে সে আড্ডা দেয়—তারা সব অশিক্ষিত এবং অসংস্কৃত—কোন দিক দিয়েই এই ছেলেটির সঙ্গে কোথাও মিল নেই তাদের। প্রকৃতপক্ষে তারা সব 'ক্যাওড়া পার্টি'। আসলে অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলেই ছেলেটি এদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়। যদিও অন্যত্র গিয়েও দেখেছে সে—সব কেরিয়ারিস্ট, আত্মকেন্দ্রিক, উন্নাসিক ছেলে। এই ছেলেগুলো আর যাই হোক তাকে ভালোবাসে, আপদে-বিপদে তার পাশে এসে দাঁড়াবে। অন্য জায়গায় হয়ত তারা সেটুকুও করবে না। ফলে তাকে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হয় এই ক্যাওড়া পার্টির ছেলেদের কাছেই, কেননা তার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।' (পৃ. ১৮) গল্পটির উল্লেখ করে লেখক খুব সংগতভাবেই বলেছেন, 'এই ছেলেটির মধ্যে আমরা অনেকেই নিজেদের ছায়া দেখতে পাই।' তাই তাঁর আক্ষেপ, 'যত দিন যাচ্ছে শিক্ষিত, সংবেদনশীল মানুষদের যাওয়ার জায়গা, কথা বলার মতো মানুষজন দ্রুত কমে আসছে। পৃথিবী কি তবে ক্রমশঃ চতুর স্মার্ট, হৃদয়হীন আর অগভীর মানুষদের জায়গা হয়ে যাচ্ছে?' (পৃ. ১৮)

এই হৃদয়হীনতা এবং অগভীরতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ বাতলেছেন ড. রাধাকৃষ্ণণ তাঁর '*ফেইথ রিনিউড*' বইয়ে। মানুষ যেহেতু আদিতে পশু তাই পাশবিক ইনস্টিঙ্কট—কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ ইত্যাদি রিপুর প্রভাব তার পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু যুক্তির অনুভবে, ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাসে সেগুলো তাকে জয় করতে হবে। অনাসক্ত হতে হবে। তবেই একদিন সে বৃহত্তর কোনও আনন্দের সন্ধান পাবে। (পৃ. ২১) কিন্তু এই 'যুক্তির অনুভব' ব্যাপারটা নিয়েই যত গন্ডগোল। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের কথায়—'যেহেতু মানুষ সবচেয়ে বেশি নিজেকে ভালোবাসে ফলে নিজের ভুল কখনই দেখতে চায় না বা দেখতে পায় না। ফলে যে কোন কাজ, যে কোন অন্যায়ের সপক্ষে সে এমনভাবে যুক্তি সাজায় যাতে তা আর অন্যায় থাকে না ন্যায় হয়ে যায়।' (পৃ. ৩৩) সুবিধাবাদী মানুষদের দ্বারা যুক্তির এই অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও একথা মানতেই হবে 'সৎ যুক্তির চেয়ে বড় কোনও আশ্রয় কোনও সৎ, বিবেকবান, আধুনিক মানুষের কাছে আর কিছু হতে পারে না।' (পৃ. ৩৩)

যুক্তির সৎ প্রয়োগের দ্বারাই মানুষকে সুখী জীবনের অনুসন্ধান করতে হয়। এই অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় সে যদি দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ এবং সর্বোপরি লোভহীন হয়ে উঠতে পারে, তাহলেই মানুষের পক্ষে তার নিজের এবং কাছের মানুষদের সঙ্গে একত্রে সরল সাদাসিধে জীবনযাপন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে এবং সে সুখী হয়। (পৃ. ৩৫) বক্তব্যটাকে আরও সরল করে তুললে দাঁড়ায়, যে যত নিজের লোভকে কমিয়ে রাখতে পারবে, কাছের মানুষেরা তার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করছে না বলে আফশোষ করবে না, সেই তত সুখী হবে। এই লোভ কমিয়ে আনার ব্যাপারে নিজের সঙ্গে কোনওরকম শঠতা করলে চলবে না। গান্ধীজি যেমন তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের ভিতরে শুধু মোটা দাগের নয়, কাম রিপু এবং অন্যান্য রিপুতাড়িত লোভের সূক্ষ্ম চেহারাগুলিকেও অকপটভাবে চিহ্নিত করেছেন, (পৃ. ৪১) আত্মবিশ্লেষণকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া চাই। লোভের স্বরূপ চিহ্নিত হলে তবেই তো তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

লোভহীন মানুষ সুখের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে এনে সমস্ত অস্থিরতা থেকে আপন হৃদয়কে মুক্ত করে নিজের ভিতরে প্রবেশ করে নিজেকে অনুভব করতে পারলে। কথাটা অবশ্য আর কে নারায়ণ একটু ভিন্ন কায়দায় বলেছেন তাঁর '*টাইগার ফর মালগুড়ি*' নামের ছোট উপন্যাসটিতে। কথাটা সহজ করে বোঝার জন্য টেনে আনা হয়েছে ইন্দ্রিয়গুলির বার্ধক্যজনিত অকর্মণ্যতার প্রসঙ্গ। মানুষ যেমন ঘুমোতে যাবার আগে একটার পর একটা ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়, ইন্দ্রিয়গুলির সক্রিয়তা কমে যাওয়া অনেকখানি সেই আলো নেভানোর মতো ব্যাপার। এক্ষেত্রে ঘুমোতে যাওয়ার অর্থ হল নিজের মধ্যে প্রবেশ করে নিজেকে অনুভব করা (পৃ. ৪৪)। এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য গ্রন্থকারের নিজের।

নিজের প্রকৃত রূপ বা আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে অনাসক্ত না হয়ে উপায় নেই। অনাসক্ত মানুষই কেবল বুঝতে পারে জীবন সংশয়াতীতভাবে বিয়োগান্তক। কথাটা অবশ্য বলেছেন রাজশেখর বসু তাঁর '*মহাভারত*' গ্রন্থটির 'মেসেজ' বর্ণনা প্রসঙ্গে। রাজশেখর বসুর মতে রামায়ণ, মহাভারত—'এই দুই গ্রন্থের রচয়িতা নির্লিপ্ত সাক্ষীর ন্যায়

অনাসক্ত সুখ দুঃখ মিলন বিরহ প্রভৃতি জীবন দ্বন্দ্বের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও অনাসক্তি সঞ্চার করা। তাঁরা শ্মশান বৈরাগ্য প্রচার করেননি, বিষয় ভোগও ছাড়তে বলেননি, শুধু এই অলঙ্ঘনীয় জাগতীয় নিয়ম শান্ত চিত্তে মেনে নিতে বলেছেন।' (পৃ. ৪৭)

আলোচ্য বইয়ের লেখক দাবি করেছেন, তাঁর বাবা ছিলেন এমনই একজন মানুষ যিনি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুভয়কে জয় করেছিলেন। তিনি 'অলঙ্ঘনীয় জাগতীয় নিয়ম শান্ত চিত্তে মেনে নিতে' সক্ষম হয়েছিলেন। সক্ষম হতে পারার কারণ, সহৃদয়, সংবেদনশীল ভালমানুষ হয়ে ওঠাকে তিনি জীবনের ব্রত করেছিলেন। 'মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো' বলতে কী বোঝায় তিনি তা বেশ ভাল করেই জানতেন এবং সেইভাবেই জীবনের পথ হাঁটতেন বলে পেয়েছিলেন মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা। লেখকের বাবা ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, মানুষ তৈরির 'টোটাল টিচিং'য়ে তিনি বিশ্বাস করতেন। ছাত্রদের সঙ্গে এমনভাবে মিশতেন যে তারা তাঁকে 'একই সঙ্গে শিক্ষক, দাদা, বন্ধু বা এই সবকটার চেয়েও গভীর কিছু ও বেশি কিছু মনে করত।' (পৃ. ৫৫)

কিন্তু আজকালকার 'কেনাবেচার পড়াশুনায়' এমন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কি সম্ভব? এখন তো 'যিনি পড়াচ্ছেন তিনি বিক্রেতা আর যে পড়ছে সে খদ্দের। এই সম্পর্কে শ্রদ্ধা, ভক্তি, আবেগ, অনুভূতির জায়গা কোথায়?' (পৃ. ৬৫) 'কেনাবেচার এই পড়াশুনোয় ইংলিশ মিডিয়াম একটা ভাল ইউনিক সেলিং প্রোপজিশন—বিশেষতঃ স্কুল স্তরে।' লেখকের আশঙ্কা, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিবেশে এদেশে যার শেকড় নেই এমন যে সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের মগজে ঢুকে যায় তাতে তাদের নিজেদের 'বাবা-মাকে বোকাসোকা, মুখ্যুসুখ্যু লাগবে না তো?' (পৃ. ৬৭) এই সংস্কৃতি মানুষকে একা একা ভাল থাকার, একা একা বড় হওয়ার কথা ভাবায়। লেখকের প্রশ্ন, 'মানুষের সভ্যতার পক্ষে এটা কি একটা উল্টো চাল নয়?' (পৃ. ৭১)

এসব প্রসঙ্গ এলেই একটা প্রশ্ন ওঠে, মানুষের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কী? 'একটা মানুষ জন্মালো, বড় হল, লেখাপড়া, কাজকর্ম শিখল, বিয়ে-থা করল, ছেলেমেয়েও হল, তারপর একদিন টুপ করে মরে গেল।' —এই কি জীবন? মানুষ জীবনের এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে তার নিজের কৃতির সামাজিক স্বীকৃতি এবং সেই পন্থায় সম্মান, প্রতিপত্তি ইত্যাদি চেয়ে। এসবেও তৃপ্ত না হয়ে মানুষ চায় অমরত্ব। মানুষের কীর্তিই সেই অমরত্ব প্রাপ্তির চাবিকাঠি। কিন্তু কাকে বলে প্রকৃত কীর্তি? লেখকের মতে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রকৃত কীর্তিগুলি '...কোথাও একটি ব্যক্তি মানুষ একটি পরিবার বা একটি মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আটকে থাকেনি। মানুষের সভ্যতাকেই একটু এগিয়ে দিয়ে গেছে এবং মানুষকে মানুষ হিসাবে গর্ব করার সুযোগ দিয়ে গেছে।' (পৃ. ৭৫) যেসব মানুষ এভাবে গর্ব করার সুযোগ করে দেন তাঁদের সবার কথা হয়ত ইতিহাসে লেখা থাকে না। কিন্তু তাঁদের পরিচিতির জগতে তাঁরা সত্যিই মানুষকে মানুষ হিসাবে গর্ব করার সুযোগ করে দেন। একেই হয়ত বলে 'দাগ কেটে যাওয়া'। বিবেকানন্দ যেমন বলতেন, মানুষ হয়ে যখন জন্মেছিস একটা দাগ কেটে যা। (পৃ. ৭৬)

এইভাবে মাত্র ৭৬ পৃষ্ঠার পরিসরে লেখক পাঠককে ভাবিয়ে তোলার উপাদান হাজির করেছেন অজস্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি গভীর মনের পাঠকদের হাতের নাগালে পৌঁছে দেয়া খুবই প্রয়োজন। প্রকাশক 'শরৎশশী'-কে সেকাজে আরও উদ্যোগী হতে অনুরোধ করি।

কিছু লেখা—অনিন্দ্য রুদ্র/শরৎশশী, ৭৬/হাওড়া-৪/৫০.০০

বিকাশ ভট্টাচার্যের পূর্বাপর আত্মযাপনের চিত্রমালা

মধুময় পাল

বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি দর পায়, কদর পায় না। কথাটা বলেছিলেন শিল্পী নিজে। হয়ত এই ভাষায় নয়, কিন্তু এটাই বলতে চেয়েছিলেন। সাক্ষাৎকার নিতে হাজির হয়েছিলাম। আগেও বহুবার গিয়েছি। কখনও বিমুখ হতে হয়নি। চারপাশে দাঁড় করানো অন্তঃসত্ত্বা ক্যানভাস, কোনওটি আসন্ন-প্রসবা, কোনওটি নবগর্ভিণী, মাঝখানে বসে অক্লান্ত কথা বলে গেছেন, প্রশ্ন পেরিয়ে, এদিন-সেদিন-সমাজ-রাজনীতি-বন্ধু-বন্ধুতা আরও কত কী। এক কথায় তুমুল আড্ডা, তিনিই বলতেন প্রধানত, শুনতেনও। এই সাক্ষাৎকারটি ছিল ১৯৯৩-এ। তিনি সিনেমা পরিচালনার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনার কাজ নিয়ে বই করার প্রস্তাব দিয়েছে কি কেউ? এত কাজ, নানা সময়ের চিন্তাভাবনা থেকে এত রকম সিরিজ। এবং ব্যক্তিগত জীবনে আক্ষরিক অর্থে ক্ষুধা থেকে সুধার দেশে পৌঁছনোর লড়াই—অন্য কোনও দেশ হলে লেখা হয়ে থাকত। জানি না কেউ ভাবছেন বা ভেবেছেন কি-না।' বিকাশ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'আমার ছবির চাহিদা যথেষ্ট। মানে, বাজার ভালই। কিন্তু আমার ছবি ক'জন বোঝেন তা নিয়ে সন্দেহ আছে। আর্ট ক্রিটিসিজমের কথা বাদ দিন। ওটা তো বাংলায় দাঁড়াতেই পারল না। কিছু মনে করবেন না, ব্যর্থ গল্পলেখকরা আমার ছবি দেখে গল্প ফাঁদেন। আর ব্যর্থ কবিরা কবিতা লেখার চেষ্টা করেন। এসবই বলা হয়, আর্ট ক্রিটিসিজম। তার ওপর ব্যক্তিগত সম্পর্ক-টম্পর্ক তো থাকেই। কিন্তু, আমার ছবি যাঁরা কেনেন, তাঁরাও বোঝেন কি? ওঁরা নামের ওজন বোঝেন, আর কোন সিরিজ কতটা বাজারে খাচ্ছে সে খবর রাখেন। অনেকে ঘরের দেওয়ালে ঝোলান স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে। অন্যরা ধরে রাখেন পরে আরও বেশি দাম পাবেন বলে।'

সোফা থেকে উঠে আলমারি খুললেন তিনি। একটা বই বের করলেন। বললেন, 'ব্যাঙ্গালোর থেকে এটা বেরিয়েছে। আমার কাজ নিয়ে। খেটেখুটে করেছেন। ছবির মগজের ব্যবহার আছে। দেখতে পারেন।'

দেখি। বইটি ইংরাজিতে। Bikash Bhattacharjee, লিখেছেন Marta Jakimowicz-Karle. প্রকাশক, কলা যাত্রা। প্রকাশকাল, ১৯৯১। বইয়ের মুখবন্ধে কলাযাত্রার পক্ষে সারা আব্রাহাম লিখেছেন, 'Selling was and is no problem to Bikash but it is tragic to think that some of the people who write on art and perhaps some of his buyers do not understand the twists and meanings he gives to his paintings, no matter whether they are portraits, landscapes, or complex compositions.' এই কথাটাই তো বললেন বিকাশ ভট্টাচার্য। একে আক্ষেপ বা খেদ বলা উচিত হবে কি? একজন শিল্পী—লেখক, কবি, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর বা অভিনেতা বা অন্য কোনও মাধ্যমে নিবেদিত একজন, তাঁর কাজের বিচার বা justice আশা করেন, সেটা সব সময় প্রশংসা নাও হতে পারে, সেই আশা বার বার শূন্য হাতে ফিরে এলে একটি যন্ত্রণা হয়। আমাদের সময়ের 'sincere, warm ও great painter' সেই যন্ত্রণা পেয়েছেন। ছবির দর দিয়ে যখন ছবির মূল্যমান নিরূপণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়, এবং সেই নিরূপণেও বিকাশ ভট্টাচার্য যখন এক নম্বর, তাঁর ছবির বিক্রি নিয়ে গপ্পোগুজব তৈরি হয়, তখনও শিল্পী যন্ত্রণা পান। আমরা তাঁর ছবির কদর করতে পারিনি।

ইমামি চিজেল আর্ট গ্যালারিতে বিকাশ ভট্টাচার্যের পূর্বাপর প্রদর্শনী (১৭ অগস্ট—৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯) দেখতে দেখতে কথাগুলো মনে পড়ছিল। অসাধারণ প্রদর্শনী। একজন শিল্পীর হয়ে-ওঠার আখ্যানমালা যেন। একজন শিল্পীর বিবর্তনের রূপরেখা যেন। এভাবে বলা সম্ভবত অধিক সঙ্গত, এই পূর্বাপর শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের যাপিত জীবনের চিত্রমালা।

১৯৪০-এ বিকাশের জন্ম। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৬৩-তে। ২৩ বছর তখন বয়স। শিল্পীর ছাত্রাবস্থায় আঁকা—১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩—২২টি ছবি ছিল প্রদর্শনীতে। জল রং, তেল রং, প্যাস্টেল, কালিকলম, লিথোগ্রাফ ইত্যাদি মাধ্যমের। শিল্পীজীবনের সেই ভোরেই বিকাশ বুঝিয়েছেন তাঁর পর্যবেক্ষণের গভীরতা, শারীরগঠন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, প্রতিবেশের অনুপুঙ্খে বিপুল আগ্রহ, এবং দেখিয়েছেন

স্পর্শগ্রাহ্য বাস্তব রেখা ও রঙের সামান্য অন্যচলনে জাদুবাস্তবতার মাত্রা পায়। আর, পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি ঘোষণা করে দিতে পারেন, তিনি এসে গেছেন, নিজস্ব ভূখণ্ড নিয়ে, নিত্য দেখা মানুষজনের অভ্যন্তরীণ পরিচয় নিয়ে। সেই উত্তর কলকাতা, জীর্ণতা আর মলিনতার হাতে সমর্পিত ছবির মতো ঘরবাড়ি, সরু সরু গলি, বিবর্ণ জানালা, বিমর্ষ বারান্দা, ছাদ আর ছাদ, তার ওপর আকাশ আর মেঘের আরেক পৃথিবী। এবং বিকাশের ছবির যে বড় একটা দিক নারী, তার উপলব্ধির বহুকৌণিক উপস্থাপনার পূর্বাভাস লক্ষ করা যায় তাঁর শিক্ষার্থীজীবনের কাজেই।

বিকাশ ভট্টাচার্য প্রয়াত হন ২০০৬-এ। বেঁচে থাকলে ৬৯-এ পা দিতেন। সেই ৬৯ মাথায় রেখে সমসংখ্যক ছবি দিয়ে আয়োজন এই পূর্বাপর প্রদর্শনীর। ১৯৫৯ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সময়ের, দশকভিত্তিক বিন্যাসে। দেখা গেল বিখ্যাত ডলস সিরিজ, বয় সিরিজ, দুর্গা সিরিজের অসামান্য কিছু কাজ, বেশ কিছু সিটিস্কেপ প্রতিকৃতি কম্পোজিশন। আগে দেখার সুযোগ হয়নি, প্রিন্ট দেখেছি, অসাধারণ কাজ, মূল 'ডেথ অফ এ হিরো'র সামনে দাঁড়ানো গেল। কাপড়ে-জড়ানো দড়ি-বাঁধা নিহত বীরের দেহ। তার শরীরের কোনও অংশই দেখা যায় না। দড়ির বাঁধন থেকে নিহতের অবয়বের আভাস মেলে। দেহ বয়ে এনেছে তার প্রিয় অশ্ব। অশ্বের মাথায় স্বর্ণাভ বেষ্টনী। সেই অশ্বের গলা জড়িয়ে আদর করছে এক প্রবল পুরুষশরীর, যার পিঠে ডানা, যার মুখ কঙ্কাল এবং কঙ্কালের দাঁতে প্রীতিময় হাসি। নিহত বীর যেন অশরীরী অবয়ব হয়ে প্রিয় বাহককে আদর করছে। সবুজ-হলুদ মেঘ বা মাটির পটে দাঁড়িয়ে-থাকা আধিলৌকিক এই দৃশ্যের দিকে স্তম্ভিত চেয়ে থাকে ডানা-মেলা কাক। ছবিটি ডলস সিরিজের সামান্য আগেকার। হিংসা, লাঞ্ছনা ও অসহায়তার চিরকালীন প্রতীক হয়ে আছে ডলস-এর ছবিগুলো। এই প্রদর্শনীতে দুটো ছবি ছিল। কুয়াশার অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকা একটি নারী-পুতুলের দু'হাত তুলে নিজেকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা, মাথার ওপর দূর শূন্যে রক্তাভ চাঁদ। অন্য ছবিটি শূন্য ছাদে দড়িতে ঝুলতে থাকা পুতুল। সত্তর দশকের হিংসা-জর্জর সময়ের অভিজ্ঞান। মানুষের বিপন্নতা, অসহায়তা ও বেঁচে থাকার আর্তির শিল্পরূপ। পুতুল নিয়ে কোনও দিন খেলেননি বিকাশ। হঠাৎই একটা পুতুল এসেছিল তাঁর স্টুডিওয়, ভুরু এঁকে দেওয়ার জন্য। পড়ে ছিল অনেকদিন। ভুলেই গিয়েছিলেন। সেই পুতুল ক্রমে প্রতীক হয়ে উঠল। শিল্পী জানিয়েছেন, 'Secretly I coveted her ability to constantly wrap around herself a mantle of peace—she who can never die, because she was never born—enjoying an immortality that made me envious, leaving me full of irrepressible desires. I grew to love her. The doll became an obssession.

বিকাশ ভট্টাচার্যের শিল্পকর্মের ভৌগোলিক ভূমি উত্তর কলকাতা। প্রদর্শনীতে ছিল সেই ভূখণ্ডের নানা শ্রেণি ও গোত্রের ছাদের সমাবেশ। ছাদেরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলে। কোনও বাড়ির ছায়া হাত রাখে পাশের বাড়ির ছাদের গায়ে। কোনও বাড়ির চিলেকোঠার করোগেটেড টিনের চাল স্কুলগামী ঘনকেশ বালিকার আঁচড়ানো মাথার মতো। মাথা-উঁচু কোনও বাড়ির খোলা জানালা তাকিয়ে থাকে দূরের চিলেকোঠার খোলা দরজার দিকে। আশ্চর্য জীবন্ত এই ছাদের সারি। গাছের প্রাণ আছে, প্রমাণ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। ছাদের প্রাণ আছে, দেখিয়েছেন বিকাশ। বিকেলের ছাদে দাঁড়ায় কোনও মেয়ে, বর পেল না বলে গোপন কষ্টে যার মুখে অকাল-বিকেলের ছায়া পড়ে। পলেস্তারা-খসা দুমড়ে-যাওয়া লোহার গেটের একদা-বনেদি বাড়ির সামনে দাঁড়ায় হ্যাভ-নট বালকেরা। তাদের শীর্ণ শরীরে বড় হওয়ার হার-না-মানা অভিপ্রায়। ট্রামরাস্তা জুড়ে মধ্যবয়সি রানির মতো বসে থাকে গোরু। এই অনুপুঙ্খ বিকাশ ভট্টাচার্যের শিল্পচর্চা জুড়ে আছে। ভূখণ্ডটির নাম ভেবেছিলেন তিনি 'তেলিপাড়া লেন'। একটা সিনেমা করার ইচ্ছে ছিল আবাল্য-দেখা এই তেলিপাড়া ও তার বাসিন্দাদের নিয়ে। সিনেমা করা হয়নি, ছবি হয়েছে অজস্র। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবন, সব মিলিয়ে যে আত্মযাপন, তেলিপাড়া লেনে শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত তাঁর যে মানসযাপন, সেটাই ছবি হয়ে উঠেছে জীবনভর। তাঁর দুর্গা বাজার-ভর্তি ব্যাগ হাতে ট্রামলাইন পার হয় অনন্য মহিমায়, পাহাড়-অরণ্যের আদিবাসী যুবতীর মুখে জেগে থাকে তেলিপাড়ার মেয়ের মায়াবি চোখ। উত্তর কলকাতার প্রতি তাঁর আমর্ম ভালবাসার কথা বলেছেন একাধিক সাক্ষাৎকারে। তারই একটিতে শুনতে পাই, 'জীবন বলতে যা বুঝি, তার সমস্ত মুখ ও কোণ, তার সূক্ষ্মতা, জটিলতা, আশা, অবক্ষয় এবং আরও যা কিছু আছে, সব পেয়েছি আমি উত্তর কলকাতার মধ্যে। জীবনের রূপ এত বিস্তৃতভাবে, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আর কোথাও নেই। সার-সার পুরনো বাড়ির দেওয়ালে, কার্নিসে, ছাদে এই বর্ষায় ভেলভেটের মতো শ্যাওলার স্তর থেকে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তে যে আলো ছড়িয়ে পড়ে, যে আলো সেখানকার মানুষজনের মুখের রেখা-ভাঁজগুলো স্পষ্ট করে দেয়, তা কোথায় পাবেন? উত্তর কলকাতার মতো অসাধারণ স্কাইলাইন কোথাও পাবেন না। শেষ হয়ে যাওয়া বনেদি বাঙালি, তার

গৌরবময় অস্তিত্বের ছায়া নিয়ে কিছু বিষণ্ণ বাড়ি, ঐতিহ্যের গুলতানি, এঁদো গলির পঁচা আবর্জনার গন্ধ, এরই মধ্যে স্বপ্ন দেখা তরুণ এবং সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মনুষ্যত্বের অপমানের এই বিশাল সাম্রাজ্য কোথায় পাবেন?'

'সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মনুষ্যত্বের অপমানের' নিকটে যে-শিল্পীকে বসবাস করতে হয়, তাঁর পক্ষে নির্লিপ্ত থাকা কঠিন। আর, নির্লিপ্ত থাকার মানুষ ছিলেন না বিকাশ। সামাজিক ঘটনায় জোরালো ভাবেই রিঅ্যাক্ট করতেন। বিপ্লবী রাজনীতির টানে বহু সৎ যুবকের আত্মদান, রাষ্ট্রশক্তির স্বেচ্ছাচার, রক্তের অকাল বোধন, নারী নির্যাতন ও বধূহত্যা, মাদার টেরিজার মানবতা, পেশাদার রাজনীতিবিদদের হৃদয়হীনতা এ সবই ক্যানভাসে এসেছে সহমর্মিতায়। তাঁর যুক্তি : ১. মানুষ হিসাবে শিল্পী কখনওই সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। ২. স্কুলজীবনের মাস্টারমশাই রাখালবাবু তাঁকে শিখিয়েছিলেন, 'জীবনে এমন কিছু করবি না যা মঙ্গলকর নয়।' এই মূল্যবোধ সমান সক্রিয় ছিল বিকাশের ব্যক্তি ও শিল্পীজীবনে তাই তাঁর ছবিতে পতিতাপল্লির মেয়েরা শরীরী আবেদন নিয়ে দাঁড়ালেও তাদের মনের ক্ষুধাই বেশি নিবিড় হয়ে থাকে। মার্তা কার্লের ভাষায়, 'The ordinary, often vulger fact of prosititutes waiting for customers becomes symbolic of forlorn women's yearning for love.'

বিকাশ ভট্টাচার্যের যাপিত জীবনে মূল্যবোধ, ওঁর ভাষায় 'শুভবোধ'-এর ভূমিকা ছিল প্রবল। এই শুভবোধ তাঁর দায়। বলেছেন, 'আধুনিকতার দায় থেকে অনেকদিন আগেই মুক্তি চেয়ে শুভবোধের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি।' এখানেই বিকাশের দায়বদ্ধতা। এখানেই নিহিত ওঁর ছবির আধুনিকতা, ভারতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা। ডল সিরিজ, বয় সিরিজ, দুর্গা সিরিজের ছবিগুলো এ কথাই বলে।

ইমামি চিজেল আর্ট বাংলার শিল্পানুরাগীদের ভালবাসা পাবেন এই জন্য যে একজন গ্রেট পেইন্টারের অনেক ছবি একসঙ্গে দেখার সুযোগ করে দিলেন, এবং এই জন্যও যে ছবিগুলোতে নতুন করে মগ্ন হওয়ার পরিসর তৈরি করে দিলেন। বাজারের কোলাহল যখন অনেকটাই শান্ত, তখনই তো খোলা মনে ভাবার সময়। 'মিষ্টি মিষ্টি রঙিন ছবি'-তে ঢের দিন হল খুশি থাকা গেছে, এবার 'বাস্তব সার্থক ছবি'র ভেতর ঢোকা যাক, তাতে ঘুম না-হয় একটু কমই হল!

ইমামি চিজেল এই উপলক্ষে বিকাশ ভট্টাচার্যের বেশ ভাল একটা ক্যাটালগও প্রকাশ করেছে, যা সংগ্রহে রাখার মতো।

হাবিব তনবির

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

রায়পুরে এক ধার্মিক পরিবারে ১৯২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হাবিব আহমেদ খান জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনায় মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও হাবিব প্রথাসিদ্ধ পড়াশুনা না করে পারসি থিয়েটার, সংগীত আর নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রতি শৈশব থেকেই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১১ বছর বয়সে শেক্সপিয়রের 'কিং জন' নাটকে প্রিন্স আর্থারের চরিত্রে তাঁর প্রথম অভিনয়, যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনচর্যার শ্বাসবায়ুতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া স্থগিত রেখে তিনি মুম্বাই চলে আসেন। জীবিকানির্বাহের জন্য এই সময় তিনি 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-তে কাজ করেছেন, বিজ্ঞাপনের জন্য চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছেন, এবং এই সময়ই তিনি যোগ দিয়েছেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে, একযোগে বলরাজ সাহনি, দীনা পাঠক, রাজেন্দ্রসিংহ বেদি, ইসমত চুকতাই, মোহন সায়গল প্রভৃতির সঙ্গে নাটকের শিক্ষানবিশি করেছেন। ব্রিটিশ-বিরোধী, শাসক-বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে কারারুদ্ধ হয়েছেন এবং এসবের মধ্যেই নাটকের ভাষা খুঁজেছেন, চেয়েছেন নিজেকে আবিষ্কার করতে। ইতিমধ্যে নিজের নাম থেকে আহমেদ খান পদবিটি বিযুক্ত করে যে-ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন সেই 'তনবির' নামটি সংযুক্ত করেছেন।

এই সময় থেকে শুরু করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত (৮ই জুন ২০০৯) হাবিব তনবির নাটকের স্পেস আর নাটকের ভাষা খুঁজে ফিরেছেন, চেয়েছেন নাটকের রস উপভোগ করতে করতে দর্শক যেন নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। নিরাভরণ মঞ্চে অভিনেতার শরীর ও কণ্ঠস্বরের নানা ব্যাখ্যান যেভাবে হাবিব তাঁর অভিনয় মঞ্চে হাজির করলেন, তা অনেকের কাছেই অদেখা। নাটকে যে স্পেক্টাকেল মঞ্চমায়ার মাধ্যমে তৈরি হয়, সেইরকম কোনও মায়াময় মঞ্চোপকরণ না নিয়েই শুধু শরীর আর তালবাদ্যের সম্মিলনে নাটকে স্পেক্টাকেল তৈরি করে ফেললেন হাবিব। নৃতত্ত্বের ছাত্ররা বিশেষ করে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ছাত্ররা জানে শরীরের তালকে বজায় রেখে শরীরকে বাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকায় কত ধরনের লোকনাট্য আঙ্গিক তৈরি হয়েছে। ভারতে বা বাংলায়ও কিছু কম নেই। কিন্তু ছোট থেকেই তো আমরা দেখছি পাশ্চাত্য থিয়েটারের অনুকরণ, অনেক সময়ই তিন নম্বর পাঁচ নম্বর অনুকরণ। ভাক্তাঙ্গভ, আঁতোয়া, স্তানিসলাভস্কি, ব্রেখট্, গ্রোটোস্কি এঁদের কথা আমরা পরে জেনেছি। স্বাভাবিকতাবাদী, বাস্তববাদী, কিমিতিবাদী, অ্যালিয়েনেশন, এপিক—সমস্ত কিছুই ইংরাজি চর্চাজাত নাট্যশিক্ষায় আয়ত্ত করেছি। কিন্তু জীবনে জীবন যোগ করার সত্যিটাকে অস্বীকার করে গেছি, ইদানীং কম্পিউটারের ভাষা আয়ত্ত করে কাট-কপি-পেস্ট কায়দায় কোনও এক জায়গায় গিয়ে সেখানকার নাট্য-আঙ্গিককে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী যুক্তিশীল স্বার্থমগ্ন মন দিয়ে চুরি করে নিয়ে এসে নাট্যে প্রয়োগ ঘটিয়ে বাহবা পাচ্ছি। হাবিব কিন্তু এই সোজা রাস্তায় হাঁটেননি। রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদের মতো প্রথাগত শিক্ষা, প্রতিষ্ঠার পথ ছেড়ে 'আমার মুক্তি এই আকাশে' গাইতে গাইতে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, খুঁজেছেন আপনাকে প্রকাশের মতো শিল্পের ভাষা। বিজ্ঞাপনের স্ক্রিপ্ট লেখা, রেড়িও-র চাকরি, গণনাট্য সংঘে যোগদান সবকিছুর মধ্যেই নিজেকে আর নিজের নাট্য ভাষা খুঁজতে চেয়েছেন। ১৯৫৫ সালে লন্ডন শহরে গিয়ে 'রাদা'য় (Royal Academy of Dramatic Arts) নাট্যশিক্ষার কোর্সে ভর্তি হলেন। কিন্তু নাট্য-কৌতূহল অল্পেই মিটে গেল। ব্রিস্টলে ওল্ড ভিক্ থিয়েটারে যোগ দিলেন। প্যারিসে এসে কাজ করলেন জিন বিলার কাছে। বার্লিনে এসে ব্রেখটের অনসম্বলের কাজ দেখলেন। এই পর্বে হাবিব কখনও আঙুর খেতে খেতমজুর বা পারি-লন্ডনে দিনমজুরের কাজও করেছেন। আবিষ্কার করলেন শ্রমের ভিত্তিতে শিল্পসৃষ্টির রহস্য। তারপর নিজের ভাবনার প্রয়োগ ঘটানোর জন্য ১৯৫৮ সালে ভারতে ফিরে এলেন। দিল্লিতে এসে মণিকা মিশ্রের কাছ থেকে দায়িত্ব নিলেন, 'হিন্দুস্তানি থিয়েটারের'। এই মণিকাজিই পরবর্তীতে হাবিবের জীবনসঙ্গিনী। ১৩ টাকা সেটের খরচে অভিনীত হল 'সাত

প্যায়সে'। ১৯৫৯ সালে ভোপালে বস্তার আর ছত্তিশগড় কৃষকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল 'নয়া থিয়েটার'। ১৯৫৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল অবধি ৫৬টি নাটক লিখেছেন, প্রযোজনা করেছেন প্রায় সবক'টির। শ্রমের ভাষা, শ্রমেরকালে ব্যবহৃত শরীরী বিভঙ্গিমাকে তিনি খুব সহজেই হাজির করলেন তাঁর নাট্য-ভাষায়। জীবনের চলার পথে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে শিল্প, নাট্য-ভাষায় যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে তাকেই তিনি নিয়ম নিষ্ঠা শৃঙ্খলা দিয়ে হাজির করেছেন তাঁর নাট্য-ভাবনায়। হাবিবের নাটকগুলি মূলত—(ক) গ্রামীণ ও আদিবাসী মানুষদের নিয়ে, (খ) তাদের অধিকার ও জাতপাতের মালিন্যের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হত। ব্যক্তি-অভিনেতার আত্মনিবেদন এবং মানুষের নাট্যশিল্পে শরীরের ব্যবহার—এই ছিল হাবিবের দৃষ্টিভঙ্গি। সাধারণ, খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষের উন্নতির জন্য থিয়েটারকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন হাবিব এবং এইজন্য তিনি 'কমইউনিয়নে' আস্থা রাখতেন। হাবিবের নাট্যে 'Communion with Art and Reality' করার তাগিদেই জনগণের সঙ্গে সংযোগসাধনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ অনুসন্ধানে হাবিব (ক) ক্লাসিক নাটকের মঞ্চায়ন ঘটিয়েছেন—শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' (১৯৫৮), আগা হামরার 'রুস্তম ও সোহরাব' (১৯৬১), বিশাখ দত্ত'র 'মুদ্রারাক্ষস' (১৯৬৮), প্রেমচন্দের 'শতরঞ্জ কে মোহরে' (১৯৬৯), সম্পূর্ণ মহাভারত (১৯৭৩), ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' (১৯৭৪), ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' (২০০২) রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও বিসর্জন অবলম্বনে 'রাজরক্ত' (২০০৬); (খ) বিদেশি নাটক/সাহিত্য আশ্রয়ী—চেকভের 'তাম্বাকুকে নুকসানিয়াৎ' (১৯৫৯), মলিয়েরের 'মীর্জা সোহরাত' (১৯৬১), ব্রেখটের 'দি গুড ওম্যান অফ্ সেটজুয়ান' (১৯৬২), শেক্সপিয়রের 'দি টেমিং অফ্ দি শ্রু' (১৯৬৪), লোরকার 'দি শু-মেকারস প্রডিজিয়াস ওয়াইফ' (১৯৬৫), কারিও গোল্ডয়নি'র 'দি সারভেন্ট অফ্ টু মাস্টারস' (১৯৬৬), অস্কার ওয়াইল্ডের 'লেডি উইন্ডা মেয়ার্স ফ্যান' (১৯৬৭), গোর্কির 'এনিমিস' (১৯৬৮); (গ) শিশুনাটক—কার্তুজ, গাঁধে, চাঁদি কা চামচা, দুধ কা গ্লাস, পরম্পরা, হর মৌসুম কা খেল। এছাড়াও হাবিবের (ঘ) বিখ্যাত প্রযোজনাগুলি হল, 'আগ্রাবাজার' (১৯৫৪ ও ১৯৭০), 'মিট্টি কা গাড়ি' (১৯৫৮), 'সাত প্যায়সে' (১৯৫৯), 'গাঁও কা নাম শ্বশুরাল, মেরা নাম দামাদ' (১৯৭৩), 'চরণদাস চোর' (১৯৭৫); 'বাহাদুর কালারিন' (১৯৭৭), 'লালা শোহরৎ রাই'—(১৯৮১), 'নন্দরাজা বসত্ হ্যায়', (মনোজ মিত্রের 'রাজদর্শন' ১৯৮৩), 'হিরমা কি অমর কহানি' (১৯৮৬), 'মোটেরাম কী সত্যাগ্রহ' (১৯৮৮), 'এক আউর দ্রোণাচার্য' (১৯৮৮), 'পোঙ্গা পণ্ডিত' (২০০৪), 'জিস লাহোর নেহি দেখা ওহ্ জন্মাই নেহি' (২০০২), 'দেখ রহে নায়নে' ইত্যাদি।

হাবিব চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। হিন্দি—'ফুটপাথ' (১৯৫৩) 'রাহি' (১৯৫৩), 'ইয়ে ওহি মঞ্জিল তো নেহি' (১৯৮৭) 'হিরো হিরালাল' (১৯৮৮), 'প্রহার' (১৯৯১), 'মেহেন্দি' (১৯৯৮), 'মঙ্গল পাণ্ডে' (২০০৫), 'ব্ল্যাক হোয়াইট' (২০০৮); ইংরাজি—'স্টেয়িং অন' (১৯৮৯), 'গান্ধী' (১৯৮২), 'ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন' (১৯৮৬), 'বার্নিং সিজন্' (১৯৯৩) ইত্যাদি। বহুমুখী অভিনয় শিল্পের অনুসন্ধানী হাবিব হরিয়ানার লোকআঙ্গিকে 'অচিন চোর', 'পাহিল ফরতা', ওড়িয়া লোকআঙ্গিকে 'উন্মাদ', 'ভারতলীলা', রাজস্থানি লোকআঙ্গিকে 'ঠাকুর বৃশ্চিপাল সিংহ' প্রভৃতি নাটক তৈরি করেছেন। নাট্যচয়নে ও সৃজনে তিনি গ্রামীণ ও আদিবাসী প্রতিভা খুঁজে বার করেছেন। ভারতীয় নাটকে নতুন এক নাট্যভাষার সন্ধানে তাঁর যে আত্মনিবেদন, তাঁর নাট্যে শিল্পের যে অভিঘাত পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে তাতে স্বীকার করতেই হবে হাবিব তনবির ভারতীয় থিয়েটারকে বিশ্বের থিয়েটার-দরবারে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

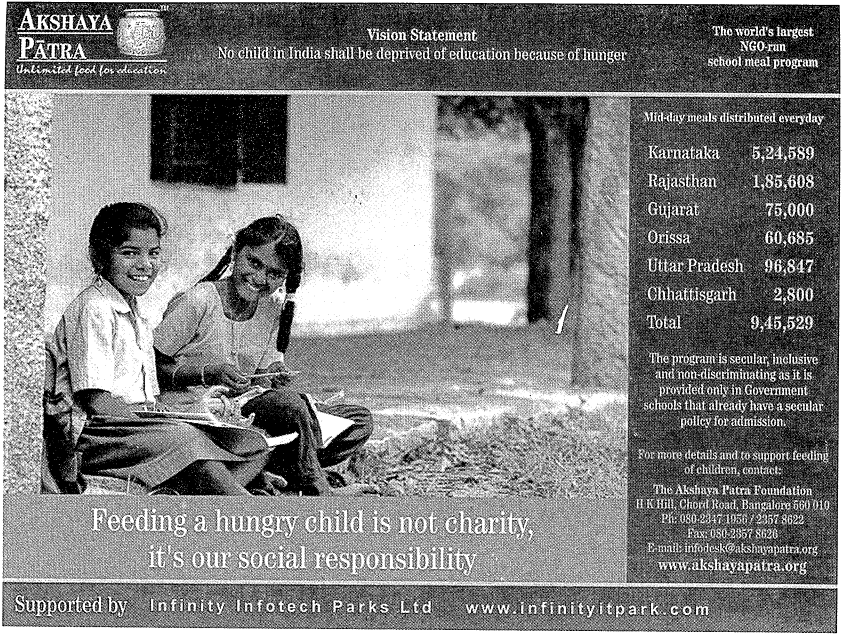
AKSHAYA PĀTRA
Unlimited food for education
Vision Statement
No child in India shall be deprived of education because of hunger
The world's largest NGO-run school meal program
Mid-day meals distributed everyday
Karnataka 5,24,589
Rajasthan 1,85,608
Gujarat 75,000
Orissa 60,685
Uttar Pradesh 96,847
Chhattisgarh 2,800
Total 9,45,529
The program is secular, inclusive and non-discriminating as it is provided only in Government schools that already have a secular policy for admission.
For more details and to support feeding of children, contact:
The Akshaya Patra Foundation
H K Hill, Chord Road, Bangalore 560 010
Ph: 080-2347 1956 / 2357 8622
Fax: 080-2357 8626
E-mail: infodesk@akshayapatra.org
www.akshayapatra.org
Feeding a hungry child is not charity, it's our social responsibility
Supported by Infinity Infotech Parks Ltd www.infinityitpark.com

Registered with the Registrar of Newspaper for India under R.N. No. 5480/57
প্রতি সংখ্যা ২০ টা
ডাকযোগে ৩০ টা

The symbol of trust™
Since 1932

আপনার আস্থা আমাদের গর্ব

৭৭ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা | ৫ কোটি গ্রাহক | ১৪৭ টি পরিষেবা কেন্দ্র | হাজার হাজার স্মার্ট গাইড | ফাইনান্সিয়াল সুপারমার্কেট

৭৭ বছরেরও বেশি দিন ধরে ঘরে ঘরে পিয়ারলেস'কে করে তুলেছি একটি নির্ভরযোগ্য নাম

পিয়ারলেসে আমরা আপনাকে সব থেকে ভালভাবে বুঝি। বুঝি প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া আপনার চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খার কথা। সেই জন্যই আমরা নিয়ে এসেছি আপনার একান্ত নিজস্ব ফাইনান্সিয়াল সুপারমার্কেট, পিয়ারলেস স্মার্ট মানি। প্রথম সারির আন্তর্জাতিক ফাইনান্সিয়াল ব্র্যান্ডগুলির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে আমরা নিবেদন করছি বিভিন্ন প্রোডাক্টের বিস্তৃত সম্ভার – সঞ্চয়, জীবন বিমা, সাধারণ বিমা এবং মিউচুয়াল ফান্ড। পরিষেবায় পিয়ারলেস এবং তার সাবসিডিয়ারি'গুলি।

Peerless™ SMART MONEY

আপনার ফাইনান্সিয়াল সুপারমার্কেট

সঞ্চয় • জীবন বিমা • সাধারণ বিমা • মিউচুয়াল ফান্ড

(Life/General Insurance policies are distributed through Peerless Developers Limited, a wholly owned subsidiary of the Peerless General Finance and Investment Co. Ltd. (PGFI), as the Corporate Agent of Max New York Life Insurance Co. Ltd. and Iffco-Tokio General Insurance Co. Ltd. duly regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority. Peerless Smart Money is a service trade-mark of PGFI. Insurance is a subject matter of solicitation. Mutual Fund investments are subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing.)

The Peerless General Finance & Investment Company Limited, Peerless Bhawan, 3 Esplanade East Kolkata 700 069 Ph: 033 22483247, Website: www.peerless.co.in, sms 'smart' to 575756. Call toll-free helpline 1800 345 1932

Peerless™
Smart Financial Solutions

3050.2009

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ২ কার্তিক-পৌষ ১৪১৬

লিখিত হওয়ার ৩০ বছর পর 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটির গান হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত চমকপ্রদ। সংগীতবিশেষজ্ঞ সুধীর চক্রবর্তীর লেখনীতে সেই বৃত্তান্তের রসসমৃদ্ধ উপস্থাপনা। এই নিবন্ধটি দিয়েই চতুরঙ্গের তরফে সূচিত হল রবীন্দ্রনাথের জন্মের আসন্ন সার্ধশতবর্ষ উদযাপন পর্ব।

বন্দে আলী মিয়ার সঙ্গে প্রবীণ পাঠকদের পরিচয় মূলত কিশোরপাঠ্য কবিতার মাধ্যমে। তা দিয়ে বোঝা যায় না এই কবি কতখানি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য এই কবি তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভার দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছেন আজহারউদ্দীন খানের 'বন্দে আলী মিয়া ও বাংলা সাহিত্য' সন্দর্ভে তারই পরিচয়।

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত সাংবাদিক হিসাবে একাত্তরের অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে অকুস্থলে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন বাংলাদেশের রক্তস্নাত উত্থান। সেই অভিজ্ঞতার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বিবরণ রয়েছে 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়'-এর বর্তমান কিস্তিতে।

সম্প্রতি প্রকাশিত মধুময় পাল সম্পাদিত 'মরিচঝাঁপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস' সংকলনটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদারের তীক্ষ্ণ লেখনীতে ঝলসে উঠেছে বামফ্রন্ট জামানার এক নৃশংস অধ্যায়।

'আদিবাসী সমস্যা বলে কিছু নেই' প্রবীণ সাংবাদিক সুমন্ত সেনের তর্কসাপেক্ষ পর্যবেক্ষণ।

বিমল করের ভিন্নধর্মী গল্পগ্রন্থ 'উপাখ্যানমালা', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'নির্বাচিত রচনা সংকলন', হুমায়ুন কবিরের পুনর্মুদ্রিত উপন্যাস 'নদী ও নারী' এবং শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্রী ভারতে হিন্দু-মুসলমান' নিয়ে বিদগ্ধজনদের আলোচনা।

বাংলা থিয়েটারে দিকপাল অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং নির্দেশকদের দাপটের দিনগুলিতে মৌলিক নাট্যসাহিত্যের তেমন বিকাশ ঘটেনি কেন—এই প্রশ্নে সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ।

With Best Compliments

from :

M. N. DASTUR & COMPANY (P) LTD,

CONSULTING ENGINEERS

KOLKATA, MUMBAI, NEW DELHI, CHENNAI,
BHUBANESWAR, BANGALORE

TEXMACO

Market Leader in Rail Freight Cars

With the best infrastructure
&
State-of-the -Art AAR Approved Steel Foundry

Specialized in
Commodity-Specific, High Payload Freight Cars

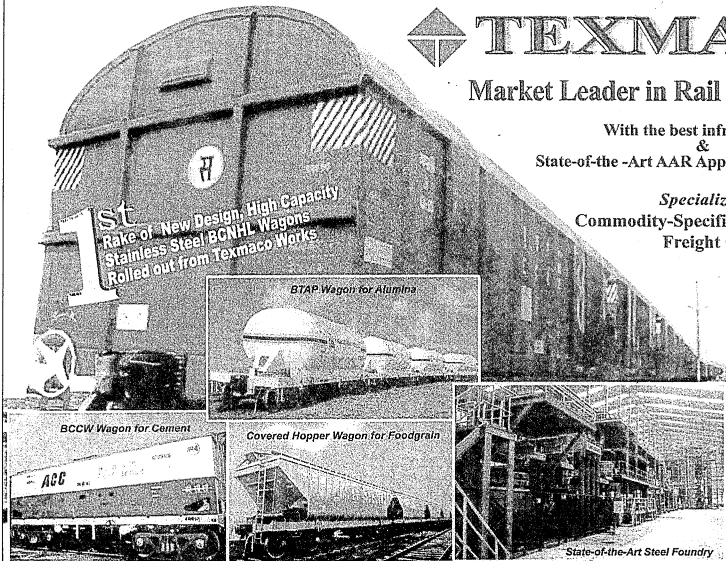

Serving Core Sectors

- Container Flat Wagon
- Alumina Wagon
- Cement Wagon
- Food Grain Hopper Wagon
- Rapid Discharge Coal Hopper Wagon
- Auto Rake (under development)

ISO 9001

• Corp. Off. : Birla Bldg., Kolkata • E-mail : texmail@texmaco.in • Website : www.texmaco.in •

An Industry for Industries

Caps Micrographics

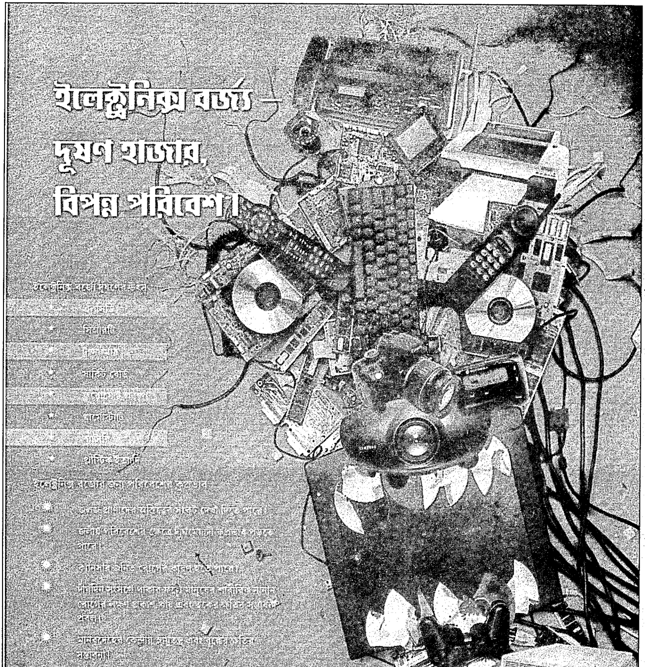
ইলেক্ট্রনিক্স বর্জ্য —
দূষণ হাজার,
বিপন্ন পরিবেশ।
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক এল এ, সেক্টর ৩
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯৮
টোল ফ্রী নম্বর - ১৮০০ ৩৪৫ ৩৩৯০

শতাব্দীর ঐতিহ্য ঘিরে

ভবিষ্যতের অঙ্গীকার

উন্নততর পরিষেবা

সবুজ সুন্দর ঝকঝকে **কলকাতা**

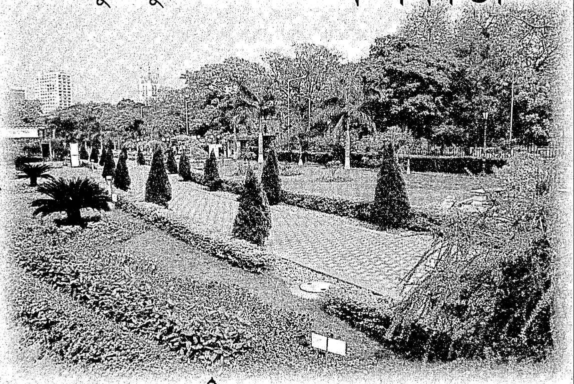

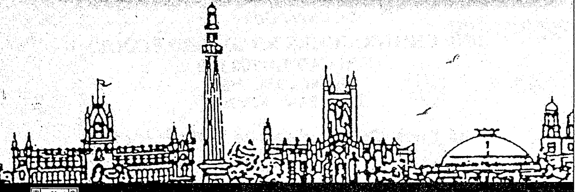

কলকাতা পৌরসংস্থা

WITH BEST COMPLIMENTS

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M OFFERS
A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND
DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS

Registered Office :

59B, CHOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)
CALCUTTA-700 020
PHONE : 2283 2538
TELE FAX : 22832545

35 Years' Dedicated Service to the Nation

বদলে যাচ্ছি আমরা।

বদলাবে আমাদের এই শহর!!

"নাগরিক সনদ" (CITIZENS' CHARTER)

—হাওড়ার নাগরিকবৃন্দের কাছে পৌর নিগমের অঙ্গীকার

সঠিক পুর পরিষেবা প্রদান

সুধী হাওড়াবাসী এই কর্মযজ্ঞে আমরা আপনাদের সাহায্য প্রত্যাশী :

১. নির্দিষ্ট সময়ে কর প্রদান করুন;
২. শহরকে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্ধারিত স্থানে জঞ্জাল ফেলুন;
৩. পানীয় জল অপচয় বন্ধ করুন;
৪. অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করুন;
৫. বে-আইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধে পৌর নিগমকে সহায়তা করুন;

আসুন এক উন্নততর হাওড়া গড়ার লক্ষ্যে আমরা পথচলা শুরু করি...............

মহানাগরিক

হাওড়া

হাওড়া পৌর নিগম

মানুষের স্বার্থে, মানুষের সাথে

With

Best Compliments From

***

**

*

A Well Wisher

Rasoi®

VANASPATI,
REFINED RICEBRAN OIL,
REFINED SOYABEAN OIL,
FREE FLOW IODISED SALT, SAUCES,
PICKLES, CHUTNEY, SOYA CHUNK ETC.

TRUSTED FOR MORE THAN 50 YEARS

QUALITY PRODUCTS FROM

RASOI LIMITED

20, SIR R N MUKHERJEE ROAD
KOLKATA - 700 001

PHONE : 2248-9138/39/0114/0115
FAX : 91-33-2248-3102
E-mail : souren@therasoigroup.com

Poet. Novelist. Artist. Composer. An Indian whose creative genius gained international acclaim. And a valued customer of ours. For over two centuries we have served the country's most notable personalities as well as its ordinary citizens. Making us part of Indian history. And of India's future.

State Bank of India
Local Head Office, "Samriddhi Bhavan"
Kolkata - 700 001

THE BANKER TO EVERY INDIAN
Visit us at www.statebankofindia.com | Call toll free 1800-11-22-11

INTER PUBLICITY/SBI/ENG-01/09-10

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ২
কার্তিক-পৌষ ১৪১৬

প্রবন্ধ

❖ একটি গানের কাহিনি — সুধীর চক্রবর্তী — ১০৭
❖ বন্দে আলী মিয়া ও বাংলা সাহিত্য — আজহারউদ্দীন খান্ — ১১৩

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

❖ ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত — ১২২

কবিতা ১৩৭-১৪৪

❖ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ❖ রেজাউদ্দিন স্টালিন ❖ সুব্রত রুদ্র
❖ কুন্তল মুখোপাধ্যায় ❖ অজিত বাইরী ❖ গোলাম রসুল
❖ অংশুমান কর ❖ যশোধরা রায়চৌধুরী

গ্রন্থসমালোচনামূলক নিবন্ধ

❖ মরিচঝাঁপি : ইতিহাসের মুদ্রণপ্রমাদ — অশ্রুকুমার সিকদার — ১৪৫

ছোটগল্প

❖ অপ্রাকৃতিক — মীনাক্ষী — ১৫২

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

❖ বাংলা থিয়েটারের একটি অধ্যায় :
প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি — সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৫৬
❖ আদিবাসী সমস্যা বলে কিছু নেই — সুমন্ত সেন — ১৬০
❖ এই দেশ এই পরিবেশ — বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় — ১৬১
❖ উপাখ্যানমালা — অনিন্দ্য রুদ্র — ১৬৩
❖ না-বলা কথা — মঞ্জু মৈত্র — ১৬৫

গ্রন্থসমালোচনা ১৭৩-১৮৫

❖ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ❖ প্রসাদরঞ্জন রায়
❖ আমজাদ হোসেন ❖ সত্য ভাদুড়ি ❖ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

স্মরণে

❖ অম্লান দত্ত — আবদুর রাউফ — ১৮৬

চলচ্চিত্রসমালোচনা

❖ পঞ্চদশ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব — মেঘ মুখোপাধ্যায় — ১৮৮
❖ পাঠকের মতামত — ১৯০

সম্পাদক : আবদুর রাউফ

শিল্পপরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদনা সহকারী : মেঘ মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী

শঙ্খ ঘোষ
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
রণেন আয়ন দত্ত
তুষার তালুকদার

মূল্য : ২০
ডাকে : ৪০

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ক্রান্তি প্রেস ৩৭ রিপন স্ট্রিট,
কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে ক্রান্তি প্রেস ● ৩৭ রিপন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬

দূরভাষ
২২১৫-১৮৩৪

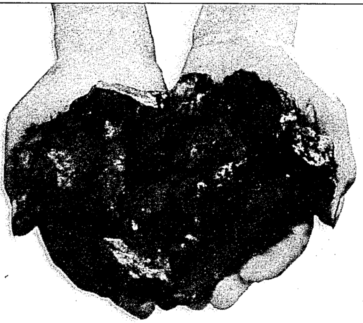

EMTA GROUP of Companies,
a multi-business conglomerate
and having core competence
in captive coal mining
for the thermal power stations
across the country

EMTA

THE POWER BEHIND POWER

EMTA Group of Companies

Kolkata: 801, Central Plaza, 2/6, Sarat Bose Road, Kolkata 700 020, Ph : 033 2485 8510/ 2485 8559, Fax : 033 2485 8513, e-mail : emta@cal2.vsnl.net.ir

Delhi: Ganga Plaza, 2nd Floor, 18/13 W. E. A. Karol Bagh, New Delhi 110 005, Ph : 011 2875 3142

Bangalore: 301 Regency Enclave, 4 Magrath Road, Bangalore 560 025

একটি গানের কাহিনি

সুধীর চক্রবর্তী

১৯০০ সালের ১৮ জুন (বঙ্গাব্দ ৪ আষাঢ় ১৩০৭) রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন, যা নিয়ে এবং যার অনুষঙ্গে রচিত আর একটি গান নিয়ে অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। এখানে সেই বৃত্তান্ত জানানোর জন্যই আমার লেখনী ধারণ। তথ্যের দিকে নজর করলে দেখা যাবে এই কবিতাটি রচনার ঠিক আগে ২০ জ্যৈষ্ঠ শিলাইদহে কবি একই দিনে দু'টি কবিতা লেখেন। ১. 'নীল নবঘনে আষাঢ়-গগনে তিল ঠাঁই আজি নাহি রে' (কবিতার নাম 'আষাঢ়') এবং ২. 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' (কবিতার নাম 'নববর্ষা')। ঘোর গ্রীষ্মে জ্যৈষ্ঠের দাবানলে শিলাইদহে বসে লিখছেন আসন্ন বর্ষার কল্পছবি। তারপরে ১ আষাঢ় 'অবিনয়' নামে যে কবিতাটি লেখেন তার প্রথম পংক্তি হল 'হে নিরুপমা।' এর তিন দিন পরে ৪ আষাঢ় তিনি লিখলেন 'কৃষ্ণকলি', যার সূচনা-উচ্চারণ 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'। কয়েকটি দিনের ব্যবধানে রচিত এই চারটি রচনার দু'টি বিশেষত্ব চোখে পড়ে। প্রথমত, এই চারটি কবিতাই 'ক্ষণিকা' (প্রকাশ ২৬ জুলাই ১৯০০) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এবং চারটি রচনাই পরে সুর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গানে পরিণত করেছেন, কখনও খণ্ডিত ভাবে কখনও অখণ্ড রূপে। গানের চেহারা পরিগ্রহ করবার পরে এরমধ্যে দু'টি গান আবার দেখছি ধুয়ো বা ধ্রুবপদের দিক থেকে স্বতন্ত্র ধরনের। যেমন 'নীল নবঘনে' গানের ধুয়ো তার প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় চরণ 'ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে' এবং 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানের ধুয়ো তার প্রতি স্তবকের (মোট পাঁচটি স্তবক আছে) চতুর্থ চরণ ('কালো? তা সে যতই কালো হোক,/ দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।'), দুটো গানই যেন ব্যালাডের মতো বর্ণনাত্মক—আস্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ রবীন্দ্রসংগীতের সুচিহ্নিত আঙ্গিকের ব্যতিক্রমী।

এখন আমাদের লক্ষ্য কৃষ্ণকলি গানটি। ১৯০০ সালে রচিত এই কবিতা, রচনার ৩০ বছর পর গীতিরূপ পেয়েছে ১৯৩১ সালে। কোনও কাঁটছাট করে নয় (যেমন বাকি তিনটি গানে হয়েছে) পুরো রচনাটিই সুরমণ্ডিত হয়েছে। তার প্রধান কারণ কবিতাটির কাহিনিধর্মিতা এবং একটি মেয়ের ক্রমবিসর্পিত বর্ণনা। তাই কোনও স্তবক বাদ দিলে কাহিনির গঠনে গোলযোগ হতে পারত। এরচেয়ে বিস্তারিত প্রসঙ্গে যাবার আগে গানটি পড়ে নেওয়া যাক প্রথমে, কেননা এই Text-টি খুব আকর্ষণীয়—অন্তত বিশ্লেষণের দিক থেকে। গানের রূপটি এই রকম :

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

পুবে বাতাস হঠাৎ এল ধেয়ে,
ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কি না চেয়ে
আমি জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

এমনি করে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল-বনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার 'পরে দেয়নি তুলে বাস
লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

(এক কলমে মুদ্রণের কারণে কবিতাটির চরণ ভেঙে দু'লাইনে বসাতে হয়েছে। স.চ.)

এ গান বর্ষামুখর গান না হয়ে এখানে আসন্ন বর্ষার ভূমিত্রী কাঁপানো বর্ণন প্রাধান্য পেয়েছে। শান্তিদেব ঘোষের স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছে :

> ১৯৩১ সালে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে ক্ষণিকা-র 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটিতে সুর দিলেন কীর্তন ও নানা রাগিণী মিশিয়ে—বর্তমান লেখককে দিয়েই সেই পরীক্ষা চালালেন। গানের বাঁধা ছন্দকে ভেঙে আবৃত্তির ধরনটিকে বজায় রেখে আমাকে সর্বসমক্ষে প্রথম গাইতে হল। সেখানে প্রশ্নসূচক 'কালো?' কথাটি তিনি অবিকল কথার সুরে রাখলেন, একটুও বদলালেন না।

অন্য সূত্রে জানা যাচ্ছে, যথা সুধীরচন্দ্র করের জবানিতে যে,

> ১৩৩৮ সালে কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে অনুষ্ঠিত 'শাপমোচন' নাটিকার জন্য তাঁর তিনটি কবিতায় সুর বসিয়েছিলেন, তাদেরই মধ্যে একটি 'কৃষ্ণকলি'।

উপলক্ষ যাই হোক, গানটির দিকে তাকালে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের এখন চোখে পড়ে। এতে যে তিনি সুর সন্নিবেশ করেছিলেন এবং লৌকিক কথনের ধাঁচে, তার মূলে লক্ষণীয় যে কবিতার শব্দবিন্যাসে যুক্তাক্ষরের বিরলতা রয়েছে। আরও দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক চরণের শেষে দাঁড়ির ব্যবহার হয়েছে। এক এক চরণে যেন এক একটি স্টেটমেন্ট সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মনে রাখা ভাল যে রবীন্দ্রনাথ নিজে কবুল করেছেন,

> ক্ষণিকায় আমার মনের ভাবগুলিকে এক ঝাঁক বনের পাখীর মত নানা খোপ-খাপের ভিতর থেকে ছেড়ে দিয়েছি, তারা গানও গাচ্ছে এবং উড়চেও। তাদের কণ্ঠে সুর এবং ডানায় লঘুতা দিয়ে দিয়েছি।

এরপরে আর আশ্চর্য কি যে ময়নাপাড়ার মাঠের কালো মেয়েটি তার কালো হরিণ-চোখে বাংলা গানের আধুনিকতার এক চমকপ্রদ উদাহরণ হয়ে ওঠে।

প্রথম থেকে আমার এই লেখাটি তথ্যের ভারে ঠেসে দিয়ে এখন একটু অপরাধবোধ জাগছে। তাই আরেক ভাবে বরং বলি, রবীন্দ্রনাথের গান এখন আর নিছক শোনা বা বিনোদনমুখিনতার বস্তু বলে ভাবার দিন নেই। তাই কোনও কোনও গান রচনার উৎস বৃত্তান্ত বা সেই গান প্রথম শোনার ব্যাপারে প্রথম শ্রোতার স্মৃতিচারণ থেকে অনেক ইঙ্গিত ও

সৃজনের বর্ণচ্ছটা আমাদের চমকিত করে। এমনও দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কোনও এক বিশেষ উপলক্ষে যে-গানটি সুর দিয়ে রচনা করলেন তা শেষ পর্যন্ত সেই উপলক্ষে গাওয়াই হয়ত হল না। আবার বিনা প্ররোচনাতেই বহু পুরনো দিনে লেখা একটা কবিতাকে সদ্যতন কোনও নৃত্যনাট্যে গানের ধাঁচে সুর দিয়ে নবরূপে উপস্থাপন করে দিলেন। 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি রচনা করে, শৈলজারঞ্জনকে শিখিয়ে, শেষমেশ বললেন, 'এ গানটা আমার মৃত্যুর পরে গেও—তার আগে কাউকে শিখিও না।' হলও তাই। ২২ শ্রাবণ তাঁর মৃত্যু সংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার পরে গানটি সেই সন্ধ্যায় শৈলজারঞ্জন দলবল নিয়ে গাইলেন। অনেক কবি তাঁর এপিটাফ লিখে যান যেমন, এ গানটি যেন তেমনই এক বিশেষ অনুভবে সিক্ত রচনা।

'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' কবিতা আকারে তত কিছু আকর্ষণীয় লাগেনি প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রভাবুকদের। এ কবিতাটি সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু কৃষ্ণকলি গানটি বেশ জনপ্রিয় এবং শিল্পীপ্রিয়। সেই কারণে বহু আসরে বড়-মেজো-সেজো শিল্পীরা আসরের শেষে গানটি করেন লক্ষ করেছি। এই গানটি রবীন্দ্র প্রয়াণের পরপরই প্রায় চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি শান্তিদেব ঘোষ এইচ. এম. ভি.-তে রেকর্ড করেন (রেকর্ড নং N 27164)। খেয়াল করলে দেখা যাবে তাঁর গায়নে মেঠো সুরটি বেশ বেজেছে। বলাবাহুল্য কবির অভিপ্রায় অনুযায়ীই তিনি গানটি গেয়েছিলেন, যদিও কবি তখন প্রয়াত। কিন্তু একথা তো তথ্যসম্মত যে রবীন্দ্রনাথ গানটিতে সুর দিয়ে প্রথমে শান্তিদেবের কণ্ঠেই তুলে দিয়েছিলেন। তখন ১৯৩১ সাল, রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭০। দেখা যাচ্ছে রেকর্ডে গানটি শান্তিদেব তালহীনভাবে টানা ঢঙে গেয়েছেন এবং গানের ধুয়ো হিসাবে প্রতি স্তবকের চতুর্থ চরণটি গেয়েছেন। পরবর্তীকালে এই গানটির রেকর্ডিংয়ে এক গুরুতর পরিবর্তন চোখে পড়ে। শান্তিদেবের প্রত্যক্ষ শিষ্যা সুচিত্রা মিত্র এই গানটির ধুয়ো বদলে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেকটি স্তবকের শেষে 'কালো? তা সে যতই কালো হোক/দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ' গাইবার পরে 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' বলে নতুন ধুয়ো বানিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি কী তা জানা যায়নি। 'দক্ষিণী'-র রণো গুহঠাকুরতা আবার রেডিও-রেকর্ডিংয়ে কৃষ্ণকলি গানটি ৫ মাত্রার তালে ঢেলে গেয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও স্বরলিপি বিষয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গে যাঁর কথা মান্য সেই প্রশিক্ষক সুভাষ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারা গেল যে, ৫ মাত্রার তালে গাঁথা কৃষ্ণকলি গানের স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা, যদিও তা 'স্বরবিতান'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাহলে সব মিলিয়ে দেখা গেল, এই বিশেষ গানটি বেশ চমৎকার ও সুখশ্রাব্য হলেও গায়ন পদ্ধতি নিয়ে কিছু বিতর্ক এখনও রয়েছে। কিন্তু 'কালো?' উচ্চারণের ক্ষেত্রে পাঁচ বার পাঁচ রকমের সুরবিহারের (Improvisation) রূপায়ণগত অবকাশ আছে, যা কিনা কথকতার লক্ষণ। শ্রোতাদের মনে পড়বে ঋত্বিক ঘটকের ফিল্মে দেবব্রত বিশ্বাস 'আকাশভরা সূর্যতারা' গানে 'বিস্ময়ে' শব্দটি নানাভাবে গেয়ে আমাদের চমকিত করেছিলেন।

কৃষ্ণকলি কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৪ আষাঢ় এবং এর ক'দিন আগে ২০ জ্যৈষ্ঠ লেখা হয়েছিল 'নববর্ষা' কবিতা, যার সূচনার বাণী হল 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে'। এটিরও যেহেতু গীতিরূপ রয়েছে তাই কৃষ্ণকলি গানের সঙ্গে এ রচনার একটা প্রতিতুলনা টানলে মন্দ হয় না। লক্ষ করছি নববর্ষার বাণীরূপ লেখা হয়েছে তীব্র তপ্ত জ্যৈষ্ঠে অথচ আষাঢ়ের সূচনায় লেখা কৃষ্ণকলিতে রয়েছে সমাসন্ন বর্ষার আভাস। প্রকৃতি পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট নীল নবঘনে গানে যেন উপর্ঝরণ বারিপাতের স্পষ্ট বর্ণনা চোখে পড়বে—যার পটভূমি শান্তিনিকেতন নয়, যেন কোনও এক গ্রাম ও তার কৃষিজীবী জীবন। আকাশ নবঘনে আচ্ছন্ন, ঝরে পড়ছে বিরামহীন বৃষ্টিধারা, আউশ ধানের জমি জলে ডুবুডুবু, খেয়া পারাপার বন্ধ। বইছে তীব্র পুবালি পবন। গানে গাঁথা আছে এক উৎকণ্ঠা—মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি? ধবলী গাইকে গোহালে আনতে হবে কারণ এখনই আঁধার হবে। দিনান্তের এই দিকদিগন্ত ব্যেপে জলবর্ষণের পটে গৃহস্থের (অবশ্যই এক নারীর জবানিতে) উদ্‌বেগ যে ক্ষণ পরে ঘনায়মান অন্ধকারে কেউই আর ঘরে ফিরতে পারবে না। সেইসঙ্গে হঠাৎ বয়ে আসা এক চিন্তা—'রাখাল বালক কী জানি কোথায় সারাদিন আজ খোয়ালে'। গ্রামীণ জীবনের লোকায়তের এই দৈনন্দিনে ওই যে খেয়ালি রাখাল বালক আর তার প্রসঙ্গ যেন পল্লিচিত্রে পূর্ণতা আনল। রবীন্দ্রনাথের গানে এমন আত্মমগ্ন উদাসী রাখাল বালকের বাস্তব বিবেচনাহীন সারাবেলা খেলে কাটানোর বৃত্তান্ত আমরা আগেও পড়েছি—যে নাকি কোন দূরদেশে বটের ছায়ায় আপন আনন্দে খেলা করে তার বাঁশিটাই ফেলে আসে।

নববর্ষণমুখর এমন গ্রামীণ চিত্রলতার পাশে এবারে কৃষ্ণকলি এক নারীর গল্প আমরা শুনতে পারি। যে নাকি কবির মানসলোকে আপন প্রতিষ্ঠা এতটাই অর্জন করেছে যে কবি তাকে একটা নতুন নাম দিয়েছেন : কৃষ্ণকলি। কালো বলে তাকে গাঁয়ের লোকে অপযশ করে কিন্তু কথক বিশেষভাবে আবিষ্কার করেছেন তার দু'টি কালো হরিণ-চোখ। এ তাঁর আপন মনের মাধুরী দিয়ে রচনা। বুঝতে অসুবিধা নেই এই

কৃষ্ণকলিকে এই প্রথম তিনি দেখছেন না। তার সঙ্গে কথকের বেশ বোঝাপড়া আছে—তবে হয়ত কথাবার্তা হয়নি।

গানের সুরে শান্তিদেব ঘোষ কীর্তন ও রাগরাগিণীর মিশ্রণের কথা বলেছেন। সে কথা সত্যি, তবে কীর্তনের মর্মস্পর্শী তার সপ্তকের মিড়ের সঙ্গে কথকতার বাচন ভঙ্গিমা বেশ সনাক্ত করা যায় এবং রাগরাগিণী বলতে বেশিটাই কেদারায় আধারিত, সেই সঙ্গে অন্তত এক জায়গায় লেগেছে মল্লারের টান। তবু মনে হয় গায়নের সারল্যের সঙ্গে এ গানে অঙ্গাঙ্গি হয়ে আছে ব্যালাডের বর্ণনাকুশলতা। কথক প্রথমেই জানিয়ে দেন এক মেঘলা দিনে আসন্ন বারিপতনের পরিবেশে, মাঠে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এই কালো হরিণ নয়না নারীকে। সে বালিকা বা কিশোরী নয় যে তার ইঙ্গিত রয়েছে স্খলিত অবগুণ্ঠনের উল্লেখে এবং 'মাথার 'পরে দেয়নি তুলে বাস' উক্তিতে। এমন ত্রস্ত রমণীর লজ্জা পাবার অবকাশহীন চকিত পদক্ষেপের কারণ সমুদ্গত আষাঢ়ের অনিবার্য বর্ষণের আশঙ্কা। বেপথু হয়ে সে ছুটে এসেছিল ময়নাপাড়ার মাঠে। এই ময়নাপাড়ার মাঠ নামটাও তো কথকের দেওয়া আদ্যন্ত রোমান্টিক—কৃষ্ণকলির মতোই চমকপ্রদ।

গানের মর্মমূলে দৃষ্টি ফেললে দেখা যাবে এ কোনও ঘটমান বর্তমানের বর্ণনা নয়, এ হল এক স্মৃতিযাপিত স্মরণীয়তার চিরকালীন আলেখ্য—অনন্তকালের পরিসরে বাঁধানো এক সাদা কালো চলচ্ছবি। ময়নাপাড়ার মাঠে মেঘের ছায়া সুনিবিড় কাজল কালো পটে চকিত পদক্ষেপের সেই মেয়েকে কথক দেখেছিলেন এক শ্যামছায়াঘন দিনে। কালো মেঘ, কালো প্রান্তর, কালো মেয়ে কিন্তু কথকের মনে থেকে যায় সেই একজোড়া হরিণ-চোখ। আকাশে হঠাৎ মেঘসঞ্চার দেখে ত্রস্তে ছুটে-আসা সেই মেয়ের গুণ্ঠনহীন মুক্তবেণীর দৃশ্য মনে পড়ে। শ্যামল দু'টি গাইয়ের শঙ্কিত ডাক শুনেই তার ছুটে আসা। আকাশের দিকে যুগ্ম ভুরুর দৃষ্টিপাত ও মেঘগর্জনের গাম্ভীর্য ঘনিয়ে তোলে এক আসন্ন দুর্যোগের ছবি। এবারে এসে গেল পুবের বাতাসের ঝাপট—ধানের খেতে চলল তার নাচন। গানের সুরে সেই ঢেউ খেলার এক অপরূপ ধ্বনিবিস্তার আছে। ফসলভরা শ্যামল খেত, সুবিস্তৃত নিসর্গ, একলা সেই মেয়ে আর নির্জন এক দর্শক। দু'জনের দৃষ্টিবিনিময় হয়েছে কি হয়নি তার রহস্যময় অন্তর্বার্তা অনুক্তই থাকে।

এই বর্ণনার পরেই গানটি আশ্চর্যভাবে ছুঁয়ে যায় ক্ষণিকতা থেকে শাশ্বতের প্রসারণে। মল্লারের ধ্বনিমায়ায় গেঁথে কথক শ্রোতাদের জানিয়ে দেন এমনই করে জ্যৈষ্ঠে ঘনায় ঈশান কোণের মেঘ, আষাঢ়ে ধরণীতে তমাল-বনে নেমে আসে কালোকোমল ছায়াস্পর্শ, শ্রাবণ রজনীতে ঘনঘোর বর্ষণ সংগীতে অন্তরে জেগে ওঠে হঠাৎ-খুশি—এই পরম্পরা যেন চিরকালের ,চিরজীবনের। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা থাকে ক্ষণিকতার তুলিতে কালো মেয়ের এণাক্ষী। সেই ছবি কথকের মনে চিরকালের স্বপ্নের মতো চিরঞ্জীব হয়ে থাকে—ময়নাপাড়ার মাঠে সঞ্চরমান লজ্জাহীন অসংকোচ এক কালো মেয়ের দৃষ্টিশোভা। সে-ই কৃষ্ণকলি—তাঁর নিজের ভুবনের নিজস্ব নির্মাণ।

এমন মায়াবি বর্ণনা আর তাতে বুনে দেওয়া লোকায়ত সুরের ছক গানটিকে বেশ স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, যার ফলে ওই সময়কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের অন্য ক'টি গানের থেকে কৃষ্ণকলির গান এত সমাদর পেয়ে এসেছে। কিন্তু এই গান আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ব পেয়েছে আরেক কারণে। তার অভিনবত্ব এটাই যে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সংগীতকার সলিল চৌধুরী কৃষ্ণকলির এক রূপান্তরিত ভাষ্য বা বয়ান আমাদের শুনিয়েছেন তাঁর মর্মস্পর্শী বাণী ও নিরীক্ষারত সুরে, যার নাম 'সেই মেয়ে'। গানটি এক ঐতিহাসিক সৃষ্টি কেননা এখানে যে শুধু কৃষ্ণকলি কন্যার ব্যালাডের নতুন সিকোয়েল তৈরি হয়েছে তাই নয় সেই সঙ্গে কবিগুরুর দেখা গ্রামীণ নারীটির অন্তর্গত জীবনের নতুন বাস্তবতা রচিত হয়েছে। গানটি এখানে টুকরো টুকরো করে শোনা যাক। প্রথমে আছে :

হয়ত তারে দেখেনি কেউ,
কিংবা দেখে ছিল,
ছিন্নশত আঁচল ঢেকে জীর্ণ দেহখানি
ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে
কি জানি কি ঝড়ে,
গেছে বুঝি ঝ'রে
জীবনের তরু থেকে—
তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে
সেই মেয়ে।

রবীন্দ্রনাথের গানে কথক যে-নারীকে দেখেছিল রোমান্টিক চোখে এবং পরিপূর্ণ ফসল খেতের রোমাঞ্চিত মাটিমাখা শ্যামলতায়, এখানে রিয়ালিটির দৃষ্টিকোণে সেই মেয়েকে সলিল চৌধুরী দেখাচ্ছেন ছিন্ন বসনের আবরণে জীর্ণ দেহের ম্লানিমায় ঘিরে। তার হরিণ-চোখে ত্রস্ত পায়ের ছন্দে আজ লেগেছে ক্লান্তি। জীবন-তরু থেকে ঝরে পড়া সেই মেয়ে—প্রতিকূল ঝড়ে উন্মূলিত—আর দিকে দিকে শ্যামল মায়ার বদলে আজ গগনে গগনে রুক্ষ তেজের বহ্নিবর্ষণ। তার মধ্যে অসহায় সেই মেয়ের প্রতিচ্ছবি জেগে উঠল এই নতুন গানে। কিন্তু কেন এতটাই পালটে যাওয়া?

তার কারণ ইত্যবসরে ইংরাজের শোষণে ও পরিকল্পিত দুর্ভিক্ষে-মন্বন্তরে গ্রামবাংলা উজাড় হয়ে গেছে হা-অন্ন আর্তনাদে, দেশত্যাগে, ক্ষুধায় আর অনাহারে। কাজেই পরিবর্তিত সেই দেশে কালে :

দুটি শীর্ণ বাহু তুলে,
ও সে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে;
অন্ন মেগে মেগে ফেরে প্রাসাদ পানে চেয়ে।
কে জানে হায় কোথায় বা ঘর
কি নাম কালো মেয়ের।

নিরন্নতার অভিশাপে গ্রাম্যবাস্তু ত্যাগ করে সেই মেয়ে, সেই স্নেহধন্য কালো মেয়ে কি আজ শহরের পথে পথে ধনীর প্রাসাদের দিকে চেয়ে দু'টি অন্নের প্রার্থী? এই কি সেই কৃষ্ণকলি? অনুমান করা কি যায় যে এই মেয়ে—

হয়ত বা সেই ময়নাপাড়ার মাঠের কালো মেয়ে—
মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নের সেই মেয়ে—
জীবন নদীর খরস্রোতে ভাসা
মহাকালের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা
কেন কবির স্বপ্নকুসুম বিফল হয়ে ঝরে?

নির্মম প্রাণহীন শহরের পথে পথে অগণ্য নগণ্যের মধ্যে জীর্ণ শীর্ণ কোন এক নারীর মধ্যে যেন রয়ে গেছে কৃষ্ণকলি মেয়ের করুণ উপসংহার। কঠিন বাস্তবতার ঝড়ে জীবনের দিশাহীন খরস্রোতে ভাসা, যেন নিয়তির কঠোর জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে কেন কবির স্বপ্নে রচিত ফুল্ল কুসুমিত একটি স্নিগ্ধ নারীজীবন এমন অরুন্তুদ পরিণাম মেনে নিল? গীতিকার এবারে ভাবতে বসেন,

হয়ত তাকে কৃষ্ণকলি বলে কবিগুরু তুমি চিনেছিলে
কিন্তু আজ,
তার দু'টি কালো-হরিণ চোখে চোখে
শুধু বেদনার দহন ঝলকে
বাঁকা দু'টি ভুরু ধনুর টঙ্কারে
আমি যে দেখেছি মরণ শঙ্কারে
ঘিরেছে নিঃসহায়ে।
হয়ত বা সেই ময়নাপাড়ার মাঠের কালো মেয়ে,
মেঘলা দিনের কবির স্বপ্নের ছবি সেই মেয়ে।

এত বেদনাবিহত স্বপ্নভঙ্গের গান আমরা আগে শুনিনি। কিন্তু তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় সেই কথককে, রবীন্দ্রনাথ যার জবানিতে উপস্থাপন করেছিলেন কালো মেয়ের কাহিনি। সেই জৈবনিক উষ্ণতায়ভরা যাপনের উলটো পিঠে শুনতে পাই এক নিঃস্ব রিক্ত জীবনের মরণশঙ্কাতুর শোকগাথা, যার জন্য সেই মেয়েটি কোনও ভাবেই দায়ী নয়। অথচ কী করুণ ভিশাপে তার ভরা খেত জ্বলে গেল, মুছে গেল তার স্বপ্নালি দিনের রূপকথা, শ্যামলা গাভীর অস্তিত্ব আর টানা টানা হরিণ-চোখের ভাবাকুল চাহনি।

গানটির শেষে অবশ্য বোনা থাকে ভাবী আশ্বাসের বার্তা। এই গানের নবীন কথক উচ্চারণ করেন এই আশা-স্বপনের বয়ান যে,

আবার কোনোদিন যদি তুমি
তারে দেখ পথে;
বোলো তারে বোলো তারি তরে
ময়নাপাড়ার থেকে খবর আসে
তারি কাছে রে—
সে যেন ফিরে যায় রে।

গৃহস্থীঘর ভেঙে যে-নারী আজ পথের ভিখারি নাগরিক রাজপথে, তার গ্রাম প্রত্যাবর্তনের আশ্বাসবার্তা, সেই ময়নাপাড়ার মাঠের পরিচিত স্বপ্নে ফেরা কথকের অভীষ্ট। তাই ভাবতে ভাল লাগে—

সেখানে গাছে গাছে
রাঙা ফুল ফুটিয়াছে
রাঙা মেঘ রাঙা কন্যার আশা।
পৌষালি মাঠে মাঠে,
সোনালি ফসল কাটে
গড়বেই নতুন জীবনের বাসা।
আহা, বুঝি কবি কবিতা তোমারি
নতুন ছন্দে হবে গাঁথা
সে বারতা তারি তরে,
সে যেন ফিরে যায় রে।

এ যেন মায়াবাস্তবের আমন্ত্রণলিপি। সত্যিই তো তা ঘটে না বাস্তবে। কোনও এক গাঁয়ের বধূর আশা-স্বপনের সমাধি রচনা করেছিলেন যে-গীতিকার, এখানে এই গানে যেন তারই সংশোধন। গ্রাম থেকে উৎখাত হওয়া জীবন আবার কি ফুলে ফলে ভরে ওঠে? নির্বাসের পুনর্বাসন তো নিতান্ত কবিকল্পনা। হোক কবিকল্পনা, তবু বাংলা গানের আবহমান ধারাবাহিকতায় কৃষ্ণকলির পাশে সেই মেয়ে একটি স্মরণীয় পাদপীঠ রচনা করতে পেরেছে কল্পনার চমৎকারিত্বে, সমাজ সম্পৃক্তিগত বাস্তবতায় এবং বিচিত্র ও পরিবর্তমান সুর তালের স্পন্দে।

কিন্তু এখন ভাবলে অবাক লাগে যে 'কৃষ্ণকলি' মেয়ের গান আর 'সেই মেয়ে'র গান ঘটনাচক্রে কিংবা নিতান্ত সমাপতনে রেকর্ড করেছেন একজনই শিল্পী—তিনি সুচিত্রা মিত্র। তাঁর বলিষ্ঠ স্বরক্ষেপে ও দৃপ্ত গায়নে সেই মেয়ে যেমন গভীর বেদনাসিঞ্চিত হয়ে শ্রোতাদের আপ্লুত করে তেমনই তাঁর মিড়বহুল সমর্থ কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখের ঝলক। কিন্তু দু'টি গান গেয়ে তাঁকে দু'রকম

অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কৃষ্ণকলির জন্য নন্দিত অথচ 'সেই মেয়ে'র জন্য নিন্দিত হয়েছেন তিনি। সেকথা সবিস্তারে বলার আগে জানা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ পরবর্তী শান্তিনিকেতনে যাঁরা কর্তাব্যক্তি ছিলেন তাঁদের মতে রবীন্দ্রসংগীতের পাশে অন্য কোনও গানের চর্চা অন্তত বিশ্বভারতীর পরিসরে নিতান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত। তাই সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে বোনা অনবদ্য গণসংগীতগুলি সেখানে সমাদৃত হয়নি। সলিল চৌধুরী তাঁর 'জীবন-উজ্জীবন' নামের আত্মকথায় (পৃষ্ঠা ২৬-২৭) জানিয়েছেন শান্তিনিকেতন নিবাসী সুকণ্ঠী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে তিনি দু'খানি গান রেকর্ড করাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার প্রথমটি হল 'প্রান্তরের গান আমার' এবং দ্বিতীয়টি 'আমার কিছু মনের আশা'। গান শেখানো, মিউজিকাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, রেকর্ডিং সবই সম্পন্ন করে HMV থেকে টেস্ট কপি পর্যন্ত যখন প্রস্তুত তখন হঠাৎ ডাকযোগে মোহরদির একটি অশ্রুভেজা চিঠি পান সলিল। তাতে লেখা : 'কর্তৃপক্ষ বলেছেন তোমার গান গাইলে আমাকে শান্তিনিকেতন ছাড়তে হবে। কাজেই আমাকে ক্ষমা কোরো ভাই।' ওই গান দু'টি তখন অগত্যা রেকর্ডে গাওয়ানো হয় উৎপলা সেনকে দিয়ে।

কিন্তু 'সেই মেয়ে' কী করে সুচিত্রা রেকর্ড করলেন? সেটি সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি তখন থাকতেন বিশ্বভারতীর আওতার বাইরে এবং কলকাতায়। তবু তাঁর হেনস্থা ঘটেছিল। শান্তিনিকেতনে তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে গুরুদেবের গানের প্যারডি গাইবার জন্য ভর্ৎসনা করা হয় এবং তাঁকে সামনে দাঁড় করিয়ে 'সেই মেয়ে' ৭৮ রেকর্ডটি পদদলিত করে ভেঙে ফেলা হয়। প্রসঙ্গক্রমে সুচিত্রা মিত্রের স্বীকারোক্তির কিছু অংশ এখানে উল্লেখ্য। তিনি 'পুরানো আখরগুলি' নামে একটি স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> কালো মেয়েরা দুঃখ না পেয়ে বরং গর্ব করে বলতে পারে আমাকে নিয়ে বিশ্বকবি কৃষ্ণকলি লিখেছেন। পল্লীবাংলার সেই শ্যামশ্রীকে রবীন্দ্রনাথ অমর করে রেখেছেন কৃষ্ণকলিতে। আর তখন দুর্ভিক্ষের কবি সলিল দেখেছে কীভাবে ময়নাপাড়ার মেয়েরা তিলে তিলে মরেছে। শহরের রাজপথে কঙ্কালের সারি পড়ে থাকত। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন কৃষ্ণকলি যুগল ভুরু তুলে ঘনকালো মেঘের ঘটা দেখছে। সলিল দেখেছে জঠরের আগুনের সঙ্গে আকাশের নির্মম সূর্য দারুণ তেজে ঝলসে মারছে ময়নাপাড়ার মেয়েকে। আমাদের কাব্যসংগীতে সলিল নিয়ে এসেছিল socialist realism। আমাকেই গানটা গাওয়ার জন্য নির্বাচন করেছে শুনে ভীষণ খুশি হলাম।
>
> 'সেই মেয়ে' গাওয়ার পর চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল। রবীন্দ্রভক্তরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। আমাকে আক্রমণ করলেন, অপমান করলেন, আমাকে দেখিয়ে আমার ডিস্কটা ভাঙলেন। আমি কেন এক দাগী কমিউনিস্টের পাল্লায় পড়ে রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলির parody গাইলাম। আমি সেদিনও বলেছি, আজও বলছি—'সেই মেয়ে' কৃষ্ণকলির parody নয়। সলিলের প্রতিভাকে আমি ঠিকই চিনেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যে-কবির জন্য কান পেতেছিলেন কিষাণের জীবনের শরিক সলিলের মতো কতজন ছিলেন জানি না। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে সলিলের সংগীত-প্রতিভাকে সম্মান জানাতেন, স্বীকৃতি দিতেন এতে আমার সন্দেহ নেই। অনেকে জানেন না রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সলিল অশৌচ পালন করেছিল স্বেচ্ছায়। তখনও ওর মা-বাবা জীবিত। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে এযুগের শ্রেষ্ঠ সংগীতকার নিজেকে পিতৃহীন ভেবেছিলেন, ভাবা যায়!

সেই জন্যই বলেছি রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি এক চমকপ্রদ সৃষ্টি। তবে পরিতাপের কথা, রবীন্দ্রনাথ বরাবরই চাইতেন গানের আধুনিকতা তথা সংগীতের মুক্তি। কিন্তু সেই প্রয়াসই তাঁর আশ্রমে নির্মমভাবে দলিত হয়।

তথ্য ঋণ : স্বপন সোম। প্রণব দাশগুপ্ত।

বন্দে আলী মিয়া ও বাংলা সাহিত্য

আজহারউদ্দীন খান্

শেক্সপিয়র-গ্যেটে-তলস্তয়, বাল্মীকি-কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ সবাই নয়। বড় প্রতিভা সব সময় জন্মায় না। প্রথম শ্রেণির লেখকের সংখ্যা চিরকালই কম। তাঁরা মাইনরিটি। অধিকাংশই মাঝারি শ্রেণির। সংখ্যায় তাঁরা মেজোরিটি। তাঁরা মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। কোনও অক্ষয় কৃতিত্ব রেখে যেতে পারেন না। অথচ সাহিত্যের ধারাকে তাঁরাই সচল রাখেন। সাহিত্যের পদাতিক তাঁরা। বড় প্রতিভাকে ধরলে দেখা যাবে যে তাঁদের আবির্ভাব বহু বছর পর পর। মাঝারি শ্রেণিরাই বড় বড় প্রতিভার মাঝখানের ব্যবধান পূরণ করে সাহিত্যের প্রাণধারা চালু রাখেন। বাল্মীকি থেকে কালিদাস, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ—ব্যবধান হাজার হাজার বছরের। এই ব্যবধানের ফাঁক পূরণ করেছেন এই মাঝারি শ্রেণির লেখকরাই। তাঁরা ছিলেন বলেই সাহিত্যের একটি অখণ্ড ধারা সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত চলে এসেছে। এই মাঝারি শ্রেণির লেখকরা তাঁদের সমকালের বড় প্রতিভাকে কেন্দ্র করেই নিজেদের রচনাকর্ম গড়ে তোলেন। তাঁদের রচনার মধ্যে বড় রকমের কিছু থাকে না কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে থমকে যাবার মতো আশ্চর্য রকমের এমন কিছু থাকে, কিছু মৌলিকত্ব থাকে যা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করে। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও তাঁদের সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে পাঠকদের প্রীতি ও উৎসাহ কবোষ্ণ এবং তাঁদের প্রতি উদাসীনতা হীনমন্যতা মারাত্মক ধরনের শীতল।

বন্দে আলী মিয়ার কথাই ধরা যাক। অত্যুচ্চ প্রতিভার অধিকারী তিনি নন কিন্তু তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটকে ছোট-বড় সবার জন্য অকাতরে লেখনী চালনা করেছেন। তাঁর মধ্যে কিছু গুণ থাক বা না থাক একটি মানুষের অক্লান্ত পাঠশ্রমের স্বীকৃতি যেটি সাহিত্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে তার পুরস্কার বড় কেউ একটা তাঁকে দেয়নি। কিছু প্রাপ্যের প্রত্যাশা না করেই তিনি তাঁর সারাজীবনের সাধনাকে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদও এপারের সব কাগজে বেরয়নি। ট্র্যাজিক চরিত্রের আর একটি অঙ্ক বাড়ালেন তিনি। এই ট্র্যাজেডি নির্মাণে তাঁরও কিছু অবদান রয়েছে। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে লেখনীযজ্ঞের ঘোড়া চালিয়ে যাওয়া অসীম ক্ষমতার পরিচয় দেয়। কিন্তু ক'জনা রাজচক্রবর্তী হতে পারে? সবারই অশ্বমেধ যজ্ঞ করার অধিকার আছে কিন্তু যোগ্যতা আছে ক'জনার? যোগ্যতার অভাব ছিল তাঁর। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তিনি লেখনী চালনা করেছেন। কিন্তু কোনওটাই তাঁকে বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত করতে পারেনি। বড়রা ভেবেছে তিনি ছোটদের লেখক, ছোটরা ভেবেছে তিনি বড়দের লেখক। সর্বক্ষেত্রে ছোট-বড় সবার জন্য লেখনী চালনার এই বিয়োগান্ত পরিণাম বন্দে আলী মিয়া স্বহস্তে টেনে এনেছেন। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে মানুষ হয়েও বন্দে আলী মিয়া নিজের যেটি সাধনক্ষেত্র তার ওপর স্থিত না হয়ে সব দিকে

পক্ষবিস্তার করতে গিয়ে কোনও দিকটির ওপর সুবিচার করতে পারলেন না। তাঁর সঠিক ক্ষেত্র ছিল কবিতা এবং সেই ক্ষেত্রের বাসিন্দা ছিল ছোটরা। তিনি তাদের বঞ্চিত করে জীবন ও জীবিকার তাগিদে নানা দিকে ছুটেছেন, যখন যেটির দরকার হয়েছে সেটি লিখে অর্থ উপায় করেছেন। শুনেছি তাঁর বইয়ের সংখ্যা দুই শতাধিক। আমি চেষ্টাচরিত্র করে বইয়ের সংখ্যা শতখানেকের বেশি পাইনি—পরিশিষ্টে তা উল্লেখ করেছি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা আজও নির্ণীত হয়নি। আলী আহমদ সংকলিত 'মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী' (ঢাকা ১৯৮৫), শামসুল হকের 'বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী' দু'খণ্ড (ঢাকা ১৯৭০, ১৯৭৩), 'বাংলা শিশু সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী' (১৯৭৪), ড. তসিকুল ইসলাম রচিত 'শিশু সাহিত্যে বন্দে আলী মিয়া' (১৯৮৩) গ্রন্থেও পূর্ণ তালিকা নেই। 'ঢাকা বাংলা একাডেমী' থেকে আলাউদ্দিন আল আজাদের সম্পাদনায় 'বন্দে আলী মিয়া রচনাবলী' তিন খণ্ড বেরিয়েছে। আরও খণ্ড বেরতে পারে কিন্তু সম্পাদকের মৃত্যুতে (জুলাই ২০০৯) রচনাবলির কাজ কতটা এগবে তা বলা কঠিন। পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা দেখলে দেখা যাবে বন্দে আলী সাহিত্যের এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি অনুপস্থিত। তাঁর এই উপস্থিতি সব সময়ে প্রেরণার তাগিদে হয়নি, হয়েছে লিখতে লিখতে এক প্রকার স্বভাবজাত লেখনীকৌশল আয়ত্ত করার ফলে। তিনি সর্বচর হয়ে গেছেন কিন্তু কোনও চরাচরই তাঁকে বিশিষ্টতা দিতে পারল না। তিনি বিশিষ্ট হতে পারতেন পুরোপুরি ছোটদের জন্য নিজেকে সমর্পণ করলে। আজকাল speciality-র যুগে 'Jack of all trades master of none' সাহিত্যের ক্ষেত্রে অচল। সবাই রবীন্দ্রনাথ নন—মাঝারি শ্রেণির লেখকরা নিজস্ব ক্ষেত্র নির্বাচন করে তার মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করে রাখলে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হতে পারেন। বন্দে আলী মিয়া সে-পথও বন্ধ করে দিয়েছেন।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তাতে বন্দে আলী মিয়ার সাহিত্যকৃতির ওপর নিন্দা বা প্রশংসার ছায়াপাত করা হয়নি। সামগ্রিকভাবে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের মূল্যায়নের মোদ্দা কথাটা বলা হল। এত লিখেও কেন তিনি জীবিতাবস্থায় অনাদরে কুণ্ঠিত রয়ে গেলেন অথচ তাঁর চেয়ে অনেক কম লিখেও কত লেখক নিজেদের গুছিয়ে নিলেন—এই পার্থক্যটা সর্বপ্রথমে বুঝে নিলে তাঁর সাহিত্যকৃতির বিচার করা সহজতর হবে।

২

বন্দে আলী মিয়ার প্রথম বই 'চোর জামাই' যদিও ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু লেখার চর্চা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল যার সমাপ্তি ঘটেছে ১৯৭৯ সালের ২৮শে জুনে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি লিখেছেন। ২৫শে জুন রাজশাহি বেতার ভবনে বসে নজরুলের ওপর একটি কবিতা লিখেছিলেন ('হে মরমী কবি নজরুল')। ওইদিন ঢাকার এক প্রকাশককে চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠির এক স্থানে লিখছেন, 'আমার জীবনের এখন শেষ প্রহর। 'গল্পের মায়াপুরী', 'বনে জঙ্গলে' ও ছড়ার বইটা আপনাকে জীবনের শেষ দান রূপে দিয়েছি। আর লিখবার ক্ষমতা নাই। বইয়ের নূতন পাণ্ডুলিপি আর আপনাকে দিতে পারিব না। ......আপনাদের কুশল কামনা করে বিদায় গ্রহণ করি।' ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'ধরিত্রী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা 'বিদায় প্রহর'-এ এই সুর ধ্বনিত হয়েছিল—

এবারে আমার শেষ হয়ে এলো
প্রবাসের দিনগুলি
যাবার বেলায় বারে বারে হায়
মন ওঠে তবু দুলি।
... ...
জনতার মাঝে ছিলাম হেথায়
একটি নীরব কোণে
বিদায়ের দিনে চলে যাব আমি
একেলা সঙ্গোপনে।

কিশোর বয়স থেকেই অর্থাৎ তিনি যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর প্রথম কবিতা 'ছিন্নপত্র' রাজশাহি জেলার নাটোর মহকুমা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী গেজেটে' ছাপা হয়। তারপর 'কল্লোল', 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'পঞ্চপুষ্প', 'পুষ্পপাত্র', 'মোয়াজ্জিন', 'মোহাম্মদী', 'সওগাত', 'প্রচার', 'বঙ্গশ্রী', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'দীপালি' প্রভৃতি—সে সময়কার এমন কোনও পত্রিকা নেই যাতে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়নি। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশকাল ১৯২৯ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যসাধনা পঞ্চাশ বছরের ওপর হবে। সাহিত্যের প্রতি দীর্ঘকালের এই একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা তাঁকে মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছে।

বন্দে আলী মিয়ার জন্ম ১৯০৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পাবনা জেলার রাধানগরে। পিতার নাম মুনশি উমেদ আলী মিয়া মাতার নাম নেকজান নেসা। উমেদ আলী জজ আদালতের নিম্নপদের কর্মচারী ছিলেন—অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। বন্দে আলী মিয়া তাঁদের একমাত্র সন্তান। 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থে 'মা', 'নানা ও নানী', 'বড়ো বুবু' নামে তিনটি কবিতা আছে। বড় বুবু হচ্ছেন তাঁর মাসির মেয়ে, বয়সে বড়, নাম রফিকজান নেসা। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে

কবিতাটি রচিত। আর মায়ের মৃত্যুতে 'মা' কবিতা। মা সম্পর্কে 'জীবনের দিনগুলি' আত্মচরিত থেকে জানা যায় তিনি ভাল গল্প-বলিয়ে ছিলেন। গ্রামের নদী, গাছপালা, আকাশ, ফুল, পাখি ছোটবেলা থেকেই তাঁর ভাল লাগত—

আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠ-ভরা ধান তার জল-ভরা দীঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।

আমগাছ, জামগাছ, বাঁশঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পূব দিকে ওঠে,
পাখী ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

কবিতা করে কথা বলতেন। বাঁধাধরা লেখাপড়ায় খুব বেশি মনোযোগী ছিলেন না। ১৯২৩ সালে স্বগ্রামের রাধানাথ মজুমদার একাডেমি থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে করটিয়ার সাজত কলেজে আই.এ-তে ভর্তি হন। ভাল লাগল না, পড়া ছেড়ে দিয়ে কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট একাডেমিতে ভর্তি হলেন। বিভিন্ন প্রকাশকের বইয়ের প্রচ্ছদ অলংকরণ করার কাজ করলেন। 'সওগাত'এ প্রায় বিনা বেতনে কাজ করলেন কিছুদিন। তিনি নিজের কিছু গ্রন্থের যেমন 'চোরজামাই', 'জঙ্গলের খবর'-এর প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ যার প্রশংসা করেছিলেন— 'ময়নামতীর চর' গ্রন্থের প্রচ্ছদও তাঁর আঁকা। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি আঁকার নেশা ছাড়তে পারেননি। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দক্ষিণ দিগন্ত'-র প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন তিনি। তাঁর অঙ্কিত রঙিন চিত্র সে সময়কার পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ বাবদ কিছু আয় হলেও সে আয় নিশ্চিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭২-১৯৪০) মে ফেয়ার রোডের বাড়িতে 'হারামণি'র লেখক মুহম্মদ মনসূরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭) ভাড়া থাকতেন। বন্দে আলী মিয়া বন্ধুর বাড়িতে প্রায়ই যেতেন। এই যাতায়াতের ফলে সুরেন্দ্রনাথ ও তদীয় পত্নী সংজ্ঞা দেবীর (১৮৯১-১৯৭৬) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁরা দু'জনেই বন্দে আলী মিয়ার অনুরাগী হয়ে পড়েন। তাঁদের জামাতা ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৭-১৯৬৩) ছিলেন কলকাতা করপোরেশন পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের এডুকেশন অফিসার। জামাতাকে বলে কয়ে বন্দে আলী মিয়াকে করপোরেশনের প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। করপোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা করতে করতে কিছু কাল রাত্রিকালীন বিদ্যাসাগর কলেজে পড়েছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দেননি। ইতিমধ্যে ১৯২৬ সালের নভেম্বরে (১৩৩৩ অগ্রহায়ণ) পিতামাতার ইচ্ছানুসারে পাবনা শহরের কন্যা রাবেয়া খাতুনকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি পর পর আরও তিনটি বিবাহ করেন। প্রথম পত্নীর গর্ভে এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। দ্বিতীয় বিবাহ করেন করপোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় ওই স্কুলের শিক্ষিকা হেনাকে—তাঁর তরফে এক কন্যা। তৃতীয় বিবাহ করেন, বগুড়ার বৃন্দাবনপাড়ার শামসুন নাহারকে। তাঁর গর্ভে ছয় পুত্র দুই কন্যা। চতুর্থ পত্নী সান্তাহারের পরীবানু—তাঁর দু'টি পুত্র। চতুর্থ পত্নীর সঙ্গে পরে ছাড়কাট হয়ে যায়।

১৯৩২ সালে 'হিজ মাস্টারস ভয়েস', 'কলম্বিয়া', 'টুইন', 'মেগাফোন', 'তাজ', 'রিগ্যাল' প্রভৃতি কোম্পানির রেকর্ডের জন্য গান, পালাগান, হাসির নকশা জাতীয় নাটিকা প্রচুর পরিমাণে লেখেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (১৯০৫-১৯৯১) তাঁর দু'টি নাটিকা পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর লেখা গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন শেফালী দাস, ধীরেন দাস, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, আবদুল হালিম চৌধুরী, রাধারাণী দেবী প্রমুখ। রেকর্ডের গানগুলি সংকলিত করে পরে 'কলগীতি' নামে একটি গানের বই বের করেন (১৯৭১)। এই গানের বইতে আধুনিক ৪৯টি, পল্লিগীতি ৮টি, হামদ নাত ও কাওয়ালি ২০টি, দেশপ্রেম ১২টি, হাসির গান ৭টি, আধ্যাত্মিক ১৫টি নিয়ে মোট ১১১টি গান রয়েছে। সেনোলা রেকর্ড কোম্পানি থেকে নবদ্বীপ হালদারের অভিনয়ে সমৃদ্ধ হয়ে 'বৌদিদি রেস্টুরেন্ট', 'বাঞ্ছারাম ঢ্যাং', কলম্বিয়ার তত্ত্বাবধানে রিগ্যাল থেকে 'নসীবের ফের' রেকর্ড বেরয় এবং বিপুল জনসমাদর লাভ করে। কলকাতা ও ঢাকা বেতার কেন্দ্রে তাঁর নাটক একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যজীবনের যা কিছু খ্যাতি ও সমৃদ্ধি এই কলকাতা থাকাকালেই ঘটেছে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংযোগ গভীরভাবে স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতায় অবস্থান যেমন তাঁর সাহিত্যচর্চার সহায়ক তেমনই এখানে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জলধর সেন, নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তাফা, আকরম খাঁ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নরেন্দ্র দেব, সরলা দেবী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে চলে গেলেও কলকাতার সঙ্গে সংযোগ তিনি ছিন্ন করেননি—সংযোগ সূত্রটি আজীবন ধরে রেখেছিলেন। ওধারে থেকে তিনি বয়স্ক ও শিশুদের জন্য রচনা এধারের পত্রপত্রিকায় প্রচুর পাঠিয়েছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর প্রেরিত রচনা বেরিয়েছে। যেমন বয়স্কদের

পত্রিকা 'নবকল্লোল' ভাদ্র ১৩৮৬ সংখ্যায় 'রাতের পথিক' কবিতা, শিশুপত্রিকা 'শুকতারা' ভাদ্র ১৩৮৬ সংখ্যায় অসকার ওয়াইল্ড (১৮৫৪-১৯০০) অবলম্বনে 'যুবরাজের অভিষেক' গল্প।

দেশবিভাগের পর ১৯৫২ সালে কলকাতার ত্রিশ বছরের পাট চুকিয়ে দিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। পাবনা শহরে তিনি একটি গেঞ্জির কল স্থাপন করেন—ব্যবসায়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। সাহিত্যের ওপর নির্ভর করেই কোনও রকমে জীবিকানির্বাহ করতে থাকেন। রাজশাহি বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন—সেখানে স্ক্রিপট-রাইটারের পদে নিযুক্ত হন। রাজশাহি বেতার কেন্দ্রের শিশুবিভাগও পরিচালনা করেছেন। এই বেতার কেন্দ্রে তাঁর রচিত গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে। কবিতা, গল্প, পঠিত হয়েছে। 'মুশকিল আসান', 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' নামে দু'টি শিশুনাটিকা অভিনীত হয়েছে। দুই বঙ্গের সাহিত্য রসিকদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা পাঠকদের অকুণ্ঠ ভালবাসা তিনি পেয়েছিলেন। জীবনে প্রথম সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৬২ সালে। ঢাকার বাংলা একাডেমি শিশু সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য পুরস্কার দেন। ১৯৬৫ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পান, যার অর্থমূল্য ছিল নগদ পাঁচ হাজার টাকা। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে সম্মানিত করেন। ১৯৭৮-এর ২১শে জানুয়ারি রাজশাহির 'উত্তরা সাহিত্য মজলিস' তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করে এবং এই উপলক্ষে মজলিসের মুখপত্র 'প্রতীতি' বন্দে আলী মিয়া সংবর্ধনা-সংখ্যা প্রকাশ করেন। তাঁর মৃত্যুতেও এই পত্রিকা স্মারকসংখ্যা বের করেন। রাজশাহির নিজস্ব বাসভবনে ১৯৭৯ সালের ২৮শে জুন বৃহস্পতিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোকগমন করেন। জন্মস্থান রাধানগরে তাঁর দাফনকার্য সম্পন্ন হয়। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পর মিরপুর ঢাকায় 'কবি বন্দে আলী মিয়া স্মরণ পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদ প্রতি বছর তাঁর মৃত্যুর দিনে স্মরণসভার আয়োজন করে থাকেন। ১৯৯৫ পর্যন্ত এই স্মরণ পরিষদের কার্যবিবরণীর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। বর্তমানে আছে কি না আমার জানা নেই।

৩

কলকাতায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একাধিকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। সময় নেই অসময় নেই বন্দে আলী মিয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির হতেন। আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) 'আমার বন্ধু বন্দে আলী মিয়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বন্দে আলী মিয়া কীভাবে করিয়ে দিয়েছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। ওই বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিনি কবির সঙ্গে অনেক বারই দেখা করেছেন এবং কবির চেনা মানুষ হয়ে গেছেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথ বন্দে আলী মিয়াকে উপন্যাস রচনার তাগিদ দিয়ে গল্পের প্লট পর্যন্ত বলে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বলা গল্পের প্লটকে তিনি উপন্যাসের রূপ দিয়েছিলেন। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে ছিলেন—তিনি কোনও কোনও জায়গায় সংস্কার, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করেছিলেন। একথা উপন্যাসের ভূমিকায় বন্দে আলী মিয়া বলেছেন। উপন্যাসের নাম 'শেষলগ্ন' (১৯৪১)। উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে উত্তরায়ণের বারান্দায় রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে আমি আর জনৈক শিল্পীবন্ধু বসেছিলাম; কথার পর কথা—প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ চলছিলো। এক ফাঁকে আমার 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা উঠলো। সেই প্রসঙ্গে তাঁর যৌবন দিনে শিলাইদহ বাসের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি বললেন : দেখ, শিলাইদহের কাছারী বাড়ীর কিছুটা দূরে একজন খোঁয়াড়ালা ছিলো। তার জীবনকথা আমি জানি। কাহিনীটা লিখবার জন্য মনের মধ্যে আমার লোভ এখনো আছে। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে রেখেছি। মুসলমান পরিবারের খুঁটিনাটি খবর আমার জানা নেই। অথচ গল্প লিখতে এটা নিতান্তই অপরিহার্য। লিখলে কোথায় কি ত্রুটি থেকে যাবে, যার জন্য সমালোচকদের তীক্ষ্ণ আক্রমণ আমার ওপর হতে থাকবে। এই বুড়ো বয়সে সেটা মোটেই প্রীতিকর নয়। সুতরাং কাহিনীটা তোমাকে বলছি, তুমি এ বিষয়ে চেষ্টা করো।' এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বন্দে আলী মিয়া—নাম ছিল 'নসীবের ফের'। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে অভিনীত এবং গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে রেকর্ডও বেরিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে তাঁর কবিতার বই যথা 'ময়নামতীর চর' (১৯৩২), 'কাকলি' (১৯৩৩), উপন্যাস 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' (১৯৩১), 'নারী রহস্যময়ী' (১৯৩৮), 'শেষ লগ্ন' (১৯৪১), এবং নাটক 'মসনদ' (১৯৩২), 'বনের ফুল' (১৯৩৫), 'তিনটি নাটিকা' (১৯৩৮) বেরিয়ে ছিল। 'ময়নামতীর চর' ছাড়া আর কোনও গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত পাওয়া যায় না।

বন্দে আলী মিয়া যা কিছু লিখে থাকুন না কেন প্রধানত তিনি কবি এবং এই পরিচিতিই তাঁকে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থটি তাঁর এই প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থের ছাপানো ফর্মা রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য জানার জন্য দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ

কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন সেটি ব্লক করে বন্দে আলী মিয়া 'ময়নামতীর চর'-এ যুক্ত করেছিলেন—

VISVA-BHARATI
Santiniketan, Bengal
কল্যাণীয়েষু,

তোমার 'ময়নামতীর চর' কাব্যখানিতে চরাচরের দৃশ্য এবং তার জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি দেখা গেল। পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তোমার রচনা সহজ এবং স্পষ্ট, কোথাও ফাঁকি নেই। সমস্ত মনের অনুরাগ দিয়ে তুমি দেখছ এবং কলমের অনায়াস ভঙ্গীতে লিখেছ। তোমার সুপরিচিত প্রাদেশিক শব্দগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হওনি, তাতে করে কবিতাগুলি আরো সরস হয়ে উঠেছে। পদ্মাপারের পাড়া গাঁয়ের এমন নিকট স্পর্শ বাংলা ভাষায় আর কোনো কবিতায় পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না। বাংলা সাহিত্যে তুমি আপন বিশেষ স্থানটি অধিকার করতে পেরেছ বলে আমি মনে করি। ইতি ২৬ জুলাই ১৯৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'ময়নামতীর চর' থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' (১৯৩৮) সংকলনে 'ময়নামতীর চর' নাম-কবিতার 'গ' অংশটি (এ-পারের এই বুনো ঝাউ আর ও-পারের বুড়ো বট) গ্রন্থভুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর দু'টি কবিতার সন্ধান পেয়েছি—'রবীন্দ্রনাথ', 'রবি অস্ত যায়'। এই দু'টি কবিতা তাঁর 'ধরিত্রী' (১৯৭৫) কাব্যগ্রন্থে আছে। প্রথম কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের আশীতম জন্মদিন উপলক্ষে, দ্বিতীয় কবিতাটি তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী প্রতিভার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই ভাবে—

হে প্রাচীন বনস্পতি
অশীতি বৎসর আজি পূর্ণ হলো তব
মোরা ক্ষুদ্র তরুদল
আজি তব জন্মদিনে
শাখা আর পাতা নোয়াইয়া
তোমারে জানাই প্রণতি।
এ বিশাল অরণ্য প্রদেশে
একমাত্র মহীরুহ তুমি। (রবীন্দ্রনাথ)

রবি অস্ত যায়

নিভে যায় আলো—স্তব্ধ ধরণী শোকে করে হায় হায়।
চলে গেলে তুমি—রেখে গেলে হেথা অমর সিংহাসন—
ধরণী তোমার উদয় অস্ত হবে না বিস্মরণ।
অক্ষয় তব মধু ভাণ্ডার—শেষ নাই কভু তার
সকল যুগের জনগণ তরে মুক্ত তাহার দ্বার
(রবি অস্ত যায়)

'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন আম্মার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে। প্রথম সংস্করণে (১৯৩২) মোট কুড়িটি কবিতা ছিল, যথা—ময়নামতীর চর ক খ গ ঘ, ময়নামতীর বটগাছ, পদ্মার চর, ঝপঝপের দহ, ডাকাতমারির ভিটে, বালিহালটের সাঁকো, পড়োঘর, সোনাপাতিলার বিল, ভাতার মারার পাথার, বড়ো বুবু, নানা আর নানী, হিতমপুরের বাওর, দুই ভাই, কৃষাণী বধূ, মা, সোনার বরণ মেয়ে, রাঙা শাড়ী। পরবর্তীকালে আরও কবিতা যোগ করেছিলেন, সেগুলি হল এই—ময়নামতীর চর 'ঙ', বর্ষার মাঠ, দোকানী, ভাঁড়ালার মজিদ, বোশেখের মাঠ, কচুরীপানার ফুল, গাঁয়ের ছবি, দূরে একখানি গ্রাম, শাকতোলা বুড়ি, বাদল দিনে, বন্ধুর আগে কইয়ো খবর, দূর বিদেশে রইলাম একা, মেঘরাঙা মেয়ে, কুঁচবরণ কন্যা, ও বন্ধুরে, বাঁশী শুনে এসো তুমি, পোউষ, বন্ধুর বাড়ী সোনালী কর্ণপুরে, তোমার দেশেতে আসিনু বন্ধু, কোথায় রে যাও নাইয়া, করতোয়া, শিকারী ফৈজু। দেশভাগের পর কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে গ্রাম্যজীবনে ফিরে গিয়ে গ্রামভিত্তিক অভিজ্ঞতার কাব্যরূপ দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। 'ময়নামতীর চর'-এর নতুন সংস্করণ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বর্ধিত আকারে বেরয়। বিষয় বৈচিত্রের দিক দিয়ে কবিতাগুলোকে চার ভাগে করা যায়—প্রকৃতি বিষয়ক, কিংবদন্তি অর্থাৎ লোকগাথা, স্মৃতিমূলক ও কাহিনিমূলক। নাম-কবিতার পাঁচটি অংশ ও 'পদ্মার চর' মূলত পদ্মা প্রকৃতির, 'ময়নামতীর বটগাছ', 'ঝপঝপের দহ' 'ডাকাতমারির ভিটে', 'বালিহালটের সাঁকো', 'সোনাপাতিলার বিল' কিংবদন্তিকে আশ্রয় করে কবির নিজস্ব অভিব্যক্তি, 'বড়ো বুবু', 'নানা আর নানী', 'মা' স্মৃতিমূলক, 'দুই ভাই', 'রাঙা শাড়ী', কাহিনিমূলক কবিতা। সব মিলিয়ে কবিতাগুলির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগসূত্র রয়েছে—সেটি হচ্ছে পদ্মা প্রকৃতি ও তার আনুষঙ্গিক জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি—কোনওটিকেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, একটি অখণ্ড সুর প্রকৃতি সারা অঙ্গে প্রকীর্ণ।

'ময়নামতীর চর'-এর কবিতাগুলির মধ্যে কোনও তত্ত্বকথা নেই, বিষয়বস্তু নিতান্তই সাধারণ এবং প্রকাশের হৃদয়াবেগ, অনায়াস সারল্য, অকপট বেদনানুভূতি কবিতাগুলিকে প্রাণদ করেছে। কবিতার বিষয়বস্তু গ্রামবাংলা থেকেই আহরিত। গত শতকে যে-ক'জন গ্রামবাংলাকে

কাব্যের দরবারে উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বন্দে আলী মিয়া। রাঢ়বঙ্গের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০) আর পূর্ববঙ্গের জসীমউদ্দীন (১৯০৪-১৯৭৬) আমাদের সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এই দু'জন কবির সঙ্গে যেন তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। তিনি প্রধানত পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের গ্রামবাংলার পথে পথে ছড়ানো ছিটানো রোমান্টিক কাব্যভাবনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের প্রকরণগত কলাকৌশলের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 'কল্লোল'-এ শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ থেকে নতুন কিছু বলা ও করার প্রয়াস শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে বন্দে আলী মিয়া ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কবিতা 'ঝপঝপের দহ' 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়েছিল (অগ্রহায়ণ ১৩৩৬)। কবিতায় সচেতন স্টাইলের জন্য নয়, প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর কবিতার মধ্যে পদ্মাচরের জীবনচিত্রের এমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব রস ছিল যেটি সেদিন বাংলা সাহিত্যে অলভ্য ছিল। গ্রামজীবনই তাঁর কবি-মানসের ভিত্তিভূমি। তাঁর কবিতা কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখের মতো প্রাচীন বাংলা কাব্যের সঙ্গে নব্য বাংলা কাব্যের যোগ রক্ষা করেছে। এঁরা না থাকলে প্রাচীন ও নব্যযুগের সংযোগ রক্ষা হত না—ব্যবধান আরও দুস্তর হয়ে উঠত। ইংরাজি না জানা বাঙালির সংখ্যা এখনও কোটি কোটি। এই বৃহৎ জনতার কবি এঁরা—বন্দে আলী মিয়া এঁদের সগোত্র।

পদ্মার ভাঙাগড়ার চিত্র তিনি ফুটিয়েছেন। বর্ষাকালে পদ্মার দুরন্ত বেগ বন্যার চিত্র যেমন আছে তেমনই গ্রীষ্মকালে নদীর শীর্ণ চেহারার চিত্রও তিনি অঙ্কিত করেছেন। বিভিন্ন ঋতুতে দুরন্ত পদ্মা যে যে রূপ ধারণ করে তার চিত্র নিপুণ তুলিতে 'ময়নামতীর চর' নামক কবিতায় এঁকেছেন। তবে ধ্বংসপ্লাবী পদ্মার রুদ্রসংহার মূর্তি কবির মানসলোকে গুরুত্ব পায়নি, তা বলে তিনি তার এ মূর্তি বিস্মৃত হননি। ডানপিটে ছেলেকে আদর করার সময় মায়ের যেমন তার দুষ্টুমির কথা মনে থাকে না কবিও তেমনই পদ্মার অপরাধকে মনে না রেখে মায়ের মতো আদর করেছেন। তাঁর চিত্র ধ্বংসপ্লাবী পদ্মার নয়, শান্ত পদ্মার এক অপরূপ আলেখ্য—যে আলেখ্যের মধ্যে গ্রামের শান্ত নিরুত্তেজ সহজ সরল নিরুপদ্রব জীবনধারা প্রবাহিত। পদ্মার সকাল দুপুর সন্ধ্যা ও রাত্রের চিত্র বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, সেখানকার মানবজীবনের সঙ্গে গাছ-পালা, পশু-পাখি কেমন যেন একাত্ম হয়ে গেছে এবং সব কিছু মিলিয়ে একটা অনাবিল শান্তি বিরাজ করছে—তারই মনোমুগ্ধকর স্পর্শগোচর চিত্র বন্দে আলী মিয়া এঁকেছেন। ব্যক্তিজীবনের অনুরাগ, আসক্তি, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা গ্রামজীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে কবিজীবনে নব নব রূপে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামপ্রকৃতির সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তাঁর এই প্রকাশলীলা যে এত সহজ সরল হয়েছে তার মূলে রয়েছে তাঁর স্বভাবজাত ভালবাসা যেটি যত্নকৃত কিংবা কবিতা লেখার প্রয়োজনে লোকদেখানো ভাললাগা নয়, আদি অকৃত্রিম ভালবাসা তার উৎসমুখ। নিজস্ব অনুভূতিকে আধুনিক কলাকৌশলগত জটিলতায় দুরূহ করে তোলেননি—সাদামাটা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। জীবনে জটিলতা আছে সে জটিলতা গ্রামজীবনের ওপরেও ছায়া ফেলেছে কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রকে জটিল করে তোলেননি, কারুনৈপুণ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেননি, অনুরাগের রঞ্জনে তিনি রঞ্জিত করেছেন এবং এই অনুরাগের স্পন্দনেই তাঁর কবিতাগুলি আশ্চর্যভাবে স্পন্দিত। বর্তমান নাগরিক জীবনের সংশয় সংকটপূর্ণ পরিবেশে গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার কথা শুনতে ভাল লাগবে না কিন্তু সহজ সরল দৃষ্টিতে নিরাভরণ সৌন্দর্যের যে এফেক্ট (Effect) তিনি তৈরি করেছেন তা চোখ দিয়ে দেখলে, কান পেতে শুনলে কবির গভীর আনন্দানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রকৃতি চিত্রণে ও গ্রামজীবনের বর্ণনায় তিনি যেসব উপমা ব্যবহার করেছেন তা গ্রাম থেকেই নেওয়া এবং কোনও ভাবকল্পনার আশ্রয় নিয়ে তিনি ঘোলাটে করেননি—যা দেখেছেন তাই বলেছেন, যা বলেছেন তাই দেখেছেন। নিজের দেখা জীবন ও প্রকাশের নিজস্ব কলাকৌশলে স্থিতধী হতে পেরেছিলেন বলেই 'ময়নামতীর চর' কিয়ৎ পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরবর্তী গ্রামজীবনের চিত্রকে 'গল্পগুচ্ছে' ধরে রেখেছেন, কিছু কবিতায় ছুঁয়ে রেখেছেন। কিন্তু গভীরে যাননি, তাঁর সময়ও ছিল না, বিরাট প্রতিভার পক্ষে সর্ব বিষয়ে detailed documentation করা সম্ভব হয়নি। ডিটেলের কাজ করেছেন বন্দে আলী মিয়া, যে জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের প্রশংসা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর কাজ অনেকটা রবীন্দ্রনাথেরই ভাবসম্প্রসারণের মতো হয়েছে—রবীন্দ্র-সমকালের কবিরা তো তা-ই করেছেন।

বন্দে আলী মিয়ার অভিজ্ঞতার পুঁজি ছিল স্বল্প। জসীমউদ্দীনের মতো গ্রামজীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। তিনি তাঁর মতো গ্রাম্যসাহিত্য লোকগাথা, লোকসাহিত্যের উপাদানকে কাব্যের উপাদান করতে পারেননি। পুঁজি স্বল্প থাকার দরুণ 'ময়নামতীর চর'-এ বেশিক্ষণ অবস্থান করতে পারেননি—নাগরিক জীবনের দিকে মন ফিরিয়েছেন, কলকাতার জীবন তাঁকে হাতছানি দিয়েছে কিন্তু তাঁর অনন্যতা কিছু ছিল না। 'অনুরাগ', 'দক্ষিণ দিগন্ত' কাব্যগ্রন্থে গ্রামীণ লোক শহরে এসে নগরজীবনকে যেভাবে দেখে তারই চিত্র রয়েছে, তার মধ্যে 'higher imagination' নেই, তবে যা কিছু বলেছেন তা

আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছেন এবং সে বলা যা তিনি বিশ্বাস করতেন তারই অকপট প্রকাশ। কিছু কাহিনিমূলক কবিতাও তিনি লিখেছেন—'কাহিনী ও কথিকা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ও লোককাহিনি, কিছু চেনা লোকের কাহিনির মাধ্যমে নীতিশিক্ষা, আদর্শমুখী চরিত্র সৃষ্টি ও কিছু সৎগুণের প্রতীকও রয়েছে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের আকালের চিত্রও আছে কিন্তু কাব্যরসের sublimity না থাকার দরুন তা আবেগহীন বিবৃতিতে পরিণত হয়েছে।

নাগরিক জীবনের পটভূমিকাতেই তিনি কিছু গল্প উপন্যাস লিখেছেন যদিও তার মধ্যে কিছু গ্রামজীবনের কথা আছে যেমন 'ঘূর্ণি হাওয়া' উপন্যাস। কিন্তু গ্রামজীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতার নির্যাস তখন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন—নাগরিক জীবনের মোহ তাঁকে পেয়ে বসেছে। উপন্যাসগুলিতে নগরজীবনের ব্যথা-বেদনা-দ্বন্দ্বের চিত্র নেই, সময়ের ঘোলা জলের স্রোতকে তিনি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেছেন। একটি মোটামুটি সাদামাটা কাহিনি বুনেছেন, চরিত্র অঙ্কনে কোনও মুনশিয়ানা দেখাতে পারেননি। সবচেয়ে দুর্লভ যে মানুষ আপন অন্তরালে সেই মানুষের গল্প বলতে গিয়ে গভীরে প্রবেশ করেননি—জানালা দিয়ে এক ঝলক দেখেই লেখার টেবিলে বসেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে যত লেখা আছে তত স্রোত নেই, যত অঙ্গীকার আছে তত সামর্থ্য তাঁর ছিল না। তিনি পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকও কিছু লিখেছেন। 'বৌদিদি রেস্টুরেন্ট' ক'টি নকশাজাতীয় একাঙ্ক নাটকের সমাহার—বৌদিদি রেস্টুরেন্ট, বাঞ্ছারাম ঢ্যাং, গাধা হাকিম, সতী, লক্ষহীরা, নসিবের ফের। নকশা জাতীয় নাটকগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, রেকর্ডও বেরিয়েছিল। হাস্যকৌতুক সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু হাসিটা সূক্ষ্ম নয় স্থূল, লোকরঞ্জনের খাতিরে কিছু কমিক সৃষ্টি করেছেন। এই একাঙ্ক সংকলনে কাব্যনাটিকা 'সতী' কিঞ্চিৎ ইতিহাসগন্ধী, 'লক্ষহীরা' পৌরাণিক। 'নসিবের ফের' তাঁর 'শেষলগ্ন' উপন্যাসের নাট্যরূপ। এই উপন্যাসের আদিনাম ছিল 'ঘূর্ণি হাওয়া'—কোন সংস্করণ থেকে উপন্যাসের নাম 'ঘূর্ণি হাওয়া' থেকে 'শেষলগ্ন'-এ রূপান্তরিত হল তা জানা যায় না। সাহিত্যের কান মুলে তিনি একই বইকে বিভিন্ন নামে চালিয়ে পাঠকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। 'জোয়ার ভাটা' নাটকটি 'শেষলগ্ন' তথা 'ঘূর্ণি হাওয়া'র নাট্যরূপ। কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানি রেকর্ড-নাট্য তৈরি করে দেবার বরাত দিলে তিনি এই 'জোয়ার ভাটা' নাটককে 'নসিবের ফের' নামে রূপান্তর করেন। আবার ওই একই বিষয় নিয়ে তৈরি নাটক 'গাঁয়ের মেয়ে' নাম দিয়ে রেডিও পাকিস্তানে বার কয়েক অভিনীত হয়েছে। 'উদয় প্রভাত' ও 'মসনদ' যথাক্রমে তুরস্কের কামাল আতার্তুক ও আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহর জীবনী অবলম্বনে ঘটনাপ্রধান নাটক। জীবনীনাটক রচনায় নাটকীয় তাৎপর্য উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেননি—নাটকে নাট্যসংহতি, পরিবেশ সৃষ্টি, নাট্যক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান বেগ সঞ্চার করতে পারেননি।

মোট কথা, কতিপয় রচনায় তাঁর যেটুকু মৌলিকত্ব ছিল গল্প-উপন্যাস-নাটকে অনুভূতির মধ্যে intellect, কল্পনার realistic revelation তাঁর ছিল না। তবু তাঁর অক্লান্ত লেখনীর ফলে তিনি অজস্রপ্রসবী লেখকরূপে নিজের নাম পাঠকচিত্তে জাগিয়ে দিতে পারেন আর সেজন্য সাহিত্যের ইতিহাসে বহুকর্মা অল্পধ্যানী লেখক হিসাবে তিনি জায়গা পেতে পারেন।

৪

কবিতায় তিনি যতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন গল্প, উপন্যাস, নাটকে ততটা সফল হতে পারেননি। শিশু সাহিত্য রচনায় তিনি সব চেয়ে বেশি সফলতা দেখিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রটিই তাঁর প্রতিভা স্ফুরণের যথোপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু পুরোপুরিভাবে নিজেকে এক্ষেত্রে নিয়োজিত না করে নানাদিকে পক্ষবিস্তার করেছেন। যদিও তাঁর প্রথম বই 'চোর জামাই' ছিল ছোটদের জন্য রচিত কবিতার বই। সারাজীবনে যেটুকু ছোটদের জন্য দিয়েছেন সেটিই শিশু ও কিশোরদের কাছে অগাধ রত্নখনি। কবিতা, গল্প, নাটিকা, জীবনী তিনি প্রচুর লিখেছেন। এগুলি শিশুসাহিত্যের সম্পদ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭), যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) প্রমুখ শিশুসাহিত্যের যে অভিনব পথ প্রদর্শন করেছিলেন তার সার্থক কুশলী ও যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন বন্দে আলী মিয়া। যে ধরনের লেখা ছোটদের মনকে বিহ্বল করে, অভিভূত করে সেই যাদুকাঠিটি ছিল তাঁর হাতে—ছোটদের জন্য তাঁর কলমটি ছিল যাদুদণ্ড। সেই দণ্ডটি দিয়ে তিনি যা কিছু ছুঁয়েছেন তাই শিশু-কিশোরদের মন হরণ করেছে, তা বনজঙ্গলের খবর হোক আর রূপকথা পরীদের গল্পই হোক, হাসির গল্প কিংবা শিকারের গল্পই হোক, বোকা জামাইয়ের কথা হোক আর চোর জামাই-এর কবিতা হোক।

রহস্য-রোমাঞ্চের পথে তিনি পা বাড়াননি। তিনি সবচেয়ে বড় একটি কাজ করেছিলেন। সেটি হল ইসলামি ঐতিহ্যকে সহজ সরল ভাষায় ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের গল্প অনেকেই শুনেছেন কিন্তু একটি সম্প্রদায় যে দেশে হাজার বছর ধরে বসবাস করল

তাদের সংস্কৃতি, তাদের ঐতিহ্য, তাদের সম্পদের কথা কেউ ছেলেদের হাতে ছেলেদের মতো করে তুলে দিল না। এদিকের অভাবটা অনুভব করেই বন্দে আলী মিয়া সেই কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। 'কুর আনের গল্প', 'শাহনামার গল্প', 'কারবালার কাহিনী', 'পয়গম্বরের কাহিনী', 'হযরত মোহম্মদ (দঃ)', 'হযরত আবুবকর', 'হযরত ওমর', 'হযরত ওসমান', 'রাবেয়া', 'চাঁদ সুলতানা', 'স্যার সৈয়দ আহমদ', 'কামাল আতাতুর্ক' প্রভৃতি তাঁর কাজের নিদর্শন এবং এগুলি শিশুসাহিত্যে বৈচিত্র এনেছে।

কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটকে তাঁকে নাই-বা মনে রাখি, তারার পানে চেয়ে চেয়ে তাঁকে নাই-বা ডাকি কিন্তু শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে যাদুকর হিসাবে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, সেখানে শিশুদের আহ্বানে তাঁর সাহিত্য সাড়া দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে।

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)

- কবিতা
  কাকলি (১৯৩১)। ময়নামতীর চর (১৯৩২)। অনুরাগ (১৯৩৩)। কচিপাতা (১৯৪৯)। পদ্মানদীর চর (১৯৫৩)। মধুমতীর চর (১৯৫৩)। দক্ষিণ দিগন্ত (১৯৬৯)। ধরিত্রী (১৯৭৫)।
- গান
  সুরলীলা (১৯৪২)। কলগীতি (১৯৭১)।
- সম্পাদিত কবিতা সংকলন
  কাব্য বীথিকা (১৯৬১)।
- উপন্যাস
  ঘূর্ণি হাওয়া (১৯৩০)। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (১৯৩১)। অস্তাচল (১৯৩৩)। পরিহাস (১৯৩৩)। নারী রহস্যময়ী (১৯৩৮)। শেষ লগ্ন (১৯৪১)। নীড়ভ্রষ্ট (১৯৪৫)। ঝড়ের সংকেত (১৯৪৮)। প্রেমের বহ্নিশিখা (১৯৪৮)। জাগ্রত যৌবন (১৯৪৯)। দিবাস্বপ্ন (১৯৫৭)। মনের ময়ূর (১৯৫৬)। অরণ্য গোধূলি (১৯৬১)।
- গল্প
  নারী কলঙ্কময়ী (১৯৪৮)। তাসের ঘর (১৯৫৪)। কায়কল্প।
- নাটক ও প্রহসন
  আমানুল্লাহ (১৯৩০)। মসনদ (১৯৩১)। বনের ফুল (১৯৩৫)। তিনটি নাটিকা (১৯৩৮)। কামাল আতাতুর্ক (১৯৪৮)। বৌদিদি রেষ্টুরেন্ট (১৯৪৯)। জোয়ার ভাটা (১৯৫৬)। আলাদিন (১৯৬৯)। উদয় প্রভাত। জয় পরাজয়। সোহরাব রুস্তম।
- রেকর্ডনাট্য
  নসীবের ফের (শেষলগ্ন উপন্যাসের নাট্যরূপ)।
- স্মৃতিকথা ও জীবনী
  জীবনের দিনগুলি (১৯৬৬)। জীবনশিল্পী নজরুল (১৯৭৯)।
- উর্দু ভাষায় অনুবাদ
  গাঁও কী লেড়কী।
- শিশু সাহিত্য
- কবিতা
  চোর জামাই (১৯২৯)। কাহিনী ও কথিকা (১৯৭১)।
- গল্প ও ইতিহাস
  মেঘকুমারী (১৯৩২)। ভূতের হাতে (১৯৩৩)। মৃগপরী (১৯৩৩)। রূপরাণী (১৯৩৪)। জঙ্গলের খবর (১৯৩৪)। কোরাণের গল্প (১৯৩৪)। হাদিসের গল্প। কারবালার কাহিনী (১৯৩৫)। তাজমহল (১৯৩৮)। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা (১৯৩৯)। ছোটদের বিষাদসিন্ধু (১৯৪০)। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা (১৯৪০)। গল্পের আসর ১-২ (১৯৪০)। শিশুদের বিষাদসিন্ধু (১৯৪০)। বোকা জামাই (১৯৪১)। কচি কথা (১৯৪১)। রামধনুকের দেশে (১৯৪২)। সুন্দরবনের বিভীষিকা (১৯৪২)। শাহনামার গল্প (১৯৪৮)। কোহিনূর মালা (১৯৫২)। দুই বন্ধু (১৯৫৩)। গুপ্তধন (১৯৫৩)। রীতিমত কাণ্ড (১৯৫৩)। ছুটির গল্প (১৯৫৩)। সোনালী সকাল (১৯৫৩)। শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা (১৯৫৫)। ভূতুড়ে কাণ্ড (১৯৫৫)। গুলিস্তাঁর গল্প (১৯৫৫)। ডাইনী বউ (১৯৫৫)। রাজকন্যা কাঞ্চনমালা (১৯৫৬)। দুই বন্ধু (১৯৫৯)। সোনার কাঠি রূপার কাঠি (১৯৬০)। রূপকথা (১৯৬০)। অতিবুদ্ধির বাহাদুরী (১৯৬১)। ছুটির দিন এলো (১৯৬১)। ডাইনী বউ (১৯৬১)। দুঃসাহসীর জয়যাত্রা (১৯৬২)। গল্পের মজলিস (১৯৬৩)। অতি চালাকির বিপদ (১৯৬৩)। সোনার হরিণ ১-২ (১৯৬৫)। যেমন কর্ম তেমন ফল (১৯৬৭)। সাঁঝের রূপকথা (১৯৬৯)। ঈশপের গল্প (১৯৭০)। ইরাণ তুরাণের গল্প (১৯৭৩, ২য় সং)। গরীবের ছেলে (১৯৭৭)। সাত রাজার গল্প। কুঁচবরণ কন্যা। রূপবতী রাজকন্যা। ইউসুফ জুলেখা। সত্যপীর। নমরূদ। গোলে বকাওলী। রাজকন্যা মাণিকমালা। রাজকন্যা চম্পাবতী। গুপ্তধন। ছুটির দিনের গল্প। দাতা যেমন দান তেমন। বিজয়ী বীর।
- নাটক
  তিনটি নাটিকা (১৯৩৮)। টো টো কোম্পানীর ম্যানেজার (১৯৫৫)। শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা (১৯৫৬)। ছোটদের অভিনয় ও গান (১৯৬৩)। হাতেম তাই (১৯৬৩)। হাজি মোহম্মদ মহসীন (১৯৬৪)। শঠে শাঠ্যাং (১৯৭১)। আজ বাকী কাল নগদ (১৯৭২)।
- জীবনী
  চাঁদ সুলতানা (১৯৩৪)। স্যার সৈয়দ আহমদ (১৯৩৬)। কামাল আতাতুর্ক (১৯৪০)। মুসলিম সতী নারী (১৯৪০)। পয়গম্বরের গল্প (১৯৫৫)। ছোটদের হাজী মোহম্মদ মহসীন (১৯৫৬)। ছোটদের গান্ধীজী (১৯৫৬)। তাপসী রাবেয়া (১৯৫৬)। বিবি রহিমা (১৯৫৭)। আমাদের নারী (১৯৫৭)। বিবি খাদিজা (১৯৫৭)। সিরাজদ্দৌলা (১৯৫৭)। ছোটদের নজরুল (১৯৫৮)। হযরত আয়েষা (১৯৫৮)। হযরত ফাতেমা (১৯৫৮)। চাঁদ বিবি (১৯৫৮)। রাবেয়া বাসরী (১৯৫৮)। মুহম্মদ বিন কাসেম (১৯৫৮)। উম্মাহাতুল মুমিনীন (১৯৫৮)। হযরত আবুবকর (১৯৫৯)। হযরত ওমর ফারুক (১৯৫৯)। হযরত ওসমান (১৯৫৯)। বেগম রোকেয়া (১৯৫৯)। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র (১৯৫৯)। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র (১৯৬০)। মীরকাসেম (১৯৬১)। হযরত আলী (১৯৬১)।

মাইকেল মধুসূদন (১৯৬১)। হযরত বেলাল (১৯৬১)। ছোটদের কামাল আতাতুর্ক (১৯৬২)। ছোটদের দুঃসাহসী কলম্বাস (১৯৬২)। ছোটদের সোহরাওয়ার্দী (১৯৬২)। ছোটদের হযরত আলী (১৯৬২)। বিবি রহিমা (১৯৬২)। ছোটদের আব্রাহাম লিঙ্কন (১৯৬২)। আমাদের নবী (১৯৬৩)। অগ্নিকবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৯৬৩)। ছোটদের হিটলার (১৯৬৩)। ছোটদের নজরুল। হাতেম তাই (১৯৬৩)। হযরত মুশা (১৯৬৩)। ছোটদের বেগম রোকেয়া (১৯৬৪)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৯৬৪)। টিপু সুলতান (১৯৬৪)। মীর মশাররাফ হোসেন (১৯৬৫)। গোলাম মোস্তাফা (১৯৬৫)। ঈশা খাঁ (১৯৬৬)। কবি কায়কোবাদ (১৯৬৯)। ওমর খৈয়াম।

- কিশোর সংকলন
  পাতাবাহার (১৯৫৬)। ময়ূরপঙ্খী (১৯৬০। সুবোধ দাশগুপ্ত, শামসুল হক সহযোগে)
- অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি
  বিপদ পথে পথে। ডানপিটে। সাতরাজার গল্প। অনেক দেশের গল্প। বিদেশী গল্প। বিপদে বন্ধুর পরিচয়। যে দিকে দু চোখ যায়। গল্পের ঝরণা। নগদ সেলামী। হুতোম প্যাঁচার ছড়া। নকল রাজা। বিজয়ী বীর। ভাগ্যের লিখন।
- রচনাবলি
  বন্দে আলী মিয়া রচনাবলী খণ্ড ১-২, আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৯৭, জুন ১৯৯৮, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।
- সংকলনে বন্দে আলী মিয়ার রচনা
- ছোটদের চয়নিকা। সম্পাদক : গিরিজাকুমার বসু, সুনির্মল বসু। কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৩১।
  স্বাধীনতা (পৃ. ৯৪-৯৬, ১৩৭৫ সং অনুসারে)।
- বাংলা কাব্য পরিচয়। সম্পাদক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৩৮।
  ময়নামতীর চর
- কাব্য মালঞ্চ। সম্পাদক : আবদুল কাদির রেজাউল করিম। কলিকাতা, নুর লাইব্রেরী, ১৯৪৫।
  মিলন (পৃ. ১৪২), কলমিলতা (পৃ. ১৪২-১৪৩)।
- কাব্যদীপালি। সম্পাদক : রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব। কলিকাতা, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৩৪।
  প্রিয়া (পৃ. ১৮৪-১৮৬, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৫ অনুসারে)
- কাব্যবীথি। সম্পাদক : আবদুল কাদির। ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯৫৪। আজাদী প্রভাত (পৃ. ১৭), রূপকাহিনীর দেশ (পৃ. ৩৬-৩৭)।
- পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা। সম্পাদক : শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৩৭৬।
  কলমিলতা (পৃ. ৩৯)।
- শিশু-ভারতী। দশম খণ্ড। সম্পাদক : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কলিকাতা, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।
  আবু মহম্মদের কাহিনী (পৃ. ৩৬৯৩-৩৭০২)
  সোরাব ও রোস্তম (পৃ. ৩৭৭২-৩৭৮৯)
- ছোটদের মাধুকরী। সম্পাদক : ব্রজমোহন দাস। কলিকাতা, বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী, ১৩৪৫।
  পদ্মানদীর চরে (পৃ. ১২৪-১২৫)।
- চিত্রদীপ। সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়। কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৩৪৬।
  প্রতিদ্বন্দ্বী। (পৃ. ৬২-৬৮, গল্প)।
- নবারুণ। কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৩৫৯।
  প্রতিশোধ (পৃ. ৩৬২-৩৬৭, কবিতা)।
- রোশনাই। সম্পাদক : রমেন দাস। কলিকাতা, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, (১৩৬৬)।
  রাতের শিকারী (পৃ. ৬৯-৭১)।
- আলপনা। কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটির।
  জোড় বাংলা (পৃ. ২৯৬-৩০২ কবিতা)।
- আনন্দ। সম্পাদক—ধীরেন্দ্র লাল ধর। কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৭৬।
  দুষ্টু খোকা (পৃ. ৪৩৯)।
- বার্ষিক শিশুসাথী। সম্পাদিকা : শ্রীমতী দাশগুপ্ত। কলিকাতা, বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স, ১৩৭৬।
  চাষী আর মুন্সী (তুরস্কের উপকথা, পৃ. ১৯৩-১৯৭)।
- বার্ষিক শিশুসাথী। সম্পাদিকা : আশা দেবী। কলিকাতা, বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স, ১৩৭৯। রাজা ও ফুলপরী পৃ. ৪৪-৪৬ কবিতা, বিপদের বন্ধু (আরব দেশের কাহিনী, পৃ. ১৫৯-১৬২)।
- ছোটদের সেরা গল্প। সম্পাদনা : সুজিতকুমার নাগ। কলিকাতা, ভারতী প্রকাশনী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০।
  সেয়ানে সেয়ানে (পৃ. ৩৬-৪১)।
- বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ। মোহম্মদ নাসিরউদ্দীন। ঢাকা, জুলাই ১৯৮৫।
  সাঁঝের অতিথি (পৃ. ৭৬)।
- কবিতায় বাংলাদেশ। সম্পাদক : দেওয়ান শামসুল হক। ঢাকা, চন্দ্রিকা সাহিত্য বাসর, ডিসেম্বর ১৯৭৯। ৩য় সং ১৯৯৩।
  আমরা স্বাধীন পৃ. ৮৭-৮৮।
- নির্বাচিত বুলবুল। বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা। ২০০৫।
  ধরা দিলে দু'হাতে আমার, আমার ধরিত্রী কাঁদে, ফোটে ফুল—ঝরে দল পৃ. ২৩৫-২৩৬।

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৪ মার্চ মধ্যরাতের পর ২৫ মার্চ (১৯৭১) তারিখটি যখন ক্যালেন্ডারে এসে গেল তখনকার ও পরবর্তী ইতিহাস এই উপমহাদেশের প্রতিটি মানুষের জানা। ২৮/২৯ মার্চ থেকে আমার দিন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটছিল কার্যত পূর্ব-পাকিস্তানের চুয়াডাঙা, কুষ্টিয়া ও যশোরের সীমান্ত এলাকায়—যশোর-খুলনা থেকে যে-যশোর রোড আমার শৈশব থেকে জানা।

এপ্রিলের ৩/৪ তারিখ (১৯৭১) আমি যশোর শহরের খুব কাছের একটি গ্রাম থেকে আমাদের বনগাঁ সীমান্তের দিকে ফিরে আসছি। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে এই অনুরোধ রেখেছিলেন যে আমরা যারা সীমান্ত ঘুরে রিপোর্ট করছি তারা যেন সন্ধ্যার আগেই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় এলাকায় ফিরে আসি। ওইদিন আমি একাই ফিরে আসছি। তখনও দিনের আলো অনেকটাই আছে। এমন সময়ে আমার নজরে পড়ল ধুতিপরা একজন দীর্ঘকায় পুরুষ ও তাঁর সঙ্গে একজন মহিলা যশোর রোডের পাকা রাস্তা থেকে নেমে মাটির রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। আর একটু এগিয়ে আসতেই প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল '...ওমা! এ যে জয়প্রকাশ নারায়ণ দাঁড়িয়ে...।' আমি হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে জয়প্রকাশ ও প্রভাবতীদেবীকে প্রণাম করলাম। জয়প্রকাশ তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে বললেন, 'এই ছেলেটি কোহিমাতে অনেকদিন আমাদের সঙ্গে ছিল খবরের কাগজের রিপোর্টারের কাজে...।' এরপর জয়প্রকাশ প্রায় দশ মিনিট আমাকে জেরা করলেন একজন পাক্কা রিপোর্টারের মতো। আমি বা অন্য রিপোর্টাররা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানি ভূখণ্ডের কতটা ভিতরে যেতে পারছি, যেখানে যেখানে যাচ্ছি সেখানে শাসনব্যবস্থা আছে কি না? এবং তা না থাকলে কেমন অবস্থা চলছে? সাধারণ মানুষের কী প্রতিক্রিয়া? আমি যখন জয়প্রকাশের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন পূর্ব-পাকিস্তান সড়ক পরিবহনের একটি বাস অন্তত শ'খানেক লোক নিয়ে ভারতীয় সীমান্তে কাস্টমস অফিসের সামনে এসে থামল।

জয়প্রকাশ আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'এভাবেই কি ওখানকার লোকেরা ভয়ে কিংবা অত্যাচারিত হয়ে চলে আসছে?' আমি জয়প্রকাশ ও প্রভাবতীদেবীকে বাসটির কাছে নিয়ে এলাম। ওঁরা দু'জনেই মোটামুটি বাংলা কথাবার্তা বুঝতে পারেন। বাসটির মধ্যে মানুষের সঙ্গে কিছু হাঁস, মুরগি, ছাগল, পাঁঠা রয়েছে। এমনকী তিন-চারটে বড় গামলায় রান্না করা ভাত, তরকারি ও মাঝের ঝোল পর্যন্ত রয়েছে। জয়প্রকাশ আমার মাধ্যমে ওদের কাছ থেকে জেনে নিলেন যে পাশের গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি আক্রমণ চালিয়ে মারধর করছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই খবর পেয়ে এই লোকেরা রান্না খাবার নিয়ে এভাবে পালিয়ে এসেছে! কয়েকদিন পরে জানতে পেরেছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জয়প্রকাশ ও প্রভাবতীদেবী দু'জনের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অনুরোধ করেন সীমান্ত এলাকায় এসে নিজের চোখে সবকিছু দেখে যেতে। জয়প্রকাশ পশ্চিমবাংলা, অসম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার কয়েকটি সীমান্ত অঞ্চলে শরণার্থী শিবিরে গিয়েছিলেন। ওই সময়ে একদিন আমার চিফ-রিপোর্টার ('যুগান্তর' পত্রিকা) সুধীন ঘোষ আমাকে দ্রুত কলকাতা ফিরতে বললেন। আমি কলকাতায় ফিরে এসে জানলাম দিল্লি থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও ওদের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠান Spot Light কর্মসূচিতে 'পূর্ব-পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশের অভ্যুত্থান' নিয়ে আমাকে একটি লেখা পাঠাতে অনুরোধ করেছে। ১৫ এপ্রিল (১৯৭১) তারিখে দিল্লি থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও আমার লেখা এই Spot Light কথিকাটি প্রচার করল—

—By Sukharanjan Sengupta
Correspondent,
Jugantar, (Calcutta)

The East Pakistan Rifles Havildar was walking beside me closely followed by his men carrying Light Machine Guns and Stens. It was a tiny village, Malancha, 3 miles west of Jessore town and about 19 miles inside Bangla Desh

from the Indian border. Suddenly we heard a panic stricken cry of alarm and saw two young Bengali muslim girls running away from the tube-well, from which they were drawing water. Bewildered, I looked at the Havildar. Then the Havildar in his Noakhali accent called and told them that they were not those soldiers whom they considered enemy soldiers. The girls came back to the tube-well and smiled shyly. But the Havildar sighed heavily and could not speak for few moments. Later he explained why the girls raised such an alarm. It was a heart rending commentary on the torture bordering on animalism committed by the West Pakistani troops on the womenfolk and children of Jessore town and other areas of their aggression. He put it in these words, 'West Pakistani troops can kill us, because we are fighting a war. But why they torture and kill the women and girls? Even the wives and daughters of high Bengali Muslim officials have been raped and killed. I cannot describe the vulgarity the West Pakistani troops have used in killing them. The world may or may not support our cause. But why the conscience of the world has kept silent on the barbarism committed on the womenfolk and children?' He paused a little and continued, 'who can tell what the future holds for us. But it is certain that we will not be able to live with these people any more. I was a paid soldier serving East Pakistan Rifles. But now I am fighting for an ideology, for independence. I have become a revolutionary.'

But why this war of Independence was forced on the people of East Bengal? In Yahya's own words to Time correspondent, Dan Coggin in December, 1969, 'The people of East Pakistan did not have their full share in the decision making process. They are fully justified in being dissatisfied.' As early as in 1954, Fazlul Huq, the then Chief Minister, first wanted the rightful place of East Bengal in the body politic of Pakistan and a voice in the decision making process. In an interview with the New York Times correspondent, Huq Sahib spelled out East Bengal autonomy. When this interview was published, Karachi considered it 'an act of treason,' and Fazlul Huq was dismissed from office and was placed under house arrest. Times rolled on, East Bengal was silently simmering with discontent. By then Fazlul Huq was dead. So was Hashan Saheed Surhawardy, who few days before his tragic death at a Beirut Hotel told an East Bengali journalist that for the restoration of democracy and rights of the people of East Bengal, he was prepared to go to prison. But he could not lead a movement at this age. He was then 73. Since then the mantle fell on his God son Sheikh Mujibur Rahaman who was his General Secretary in the party, that is, Awami League.

General Yahya Khan admitted 'the rightful discontent' of the people of East Bengal. But to remove this, he forced the war of Independence on the people of East Bengal. Under his instruction the West Pakistani troops struck at the people of East Bengal on 25th March midnight. Under the smokescreen of talks for settlement in Dacca, Yahya's army brought large number of West Pakistani troops in East Bengal. Army Headquarters also passed orders for disarming the East Pakistan Riflesmen, composed mainly of Bengali Musalmans and their armoury and for taking over of their ammunition stores. Detachments of the East Pakistan Rifles posted at the border areas were asked to send mortars and other heavy weapons to the cantonments. They were also asked to keep minimum amount of fire power with them. Members and officers of East Bengal Regiment based at Jessore Cantonment were ordered to go on leave. On 25th March night, the Lt. Col. belonging to this Regiment, refused to go on leave and was placed under arrest. Some of his men got this information and immediately they stormed the armoury and the ammunition stores. While coming out of the Cantonment they were attacked by West Pakistani troops. 'We were caught napping', a soldier belonging to that Regiment told me in his forward base near Jhikargacha, 8 miles west of Jessore town. 'But' he continued, 'we are fighting a full scale war with small arms!'

In the morning of 4th April, I slipped into Benapole, the East Bengal border village. There at the East Pakistan Rifles Headquarters, I was waiting for my contact man. After waiting for a

few hours, I was called in a room and was informed by a Khaki clad Liberation force volunteer that my contact man while coming out from Jessore town early in the morning by a jeep was fired upon at a point called Polerhat on the Jessore Road. He escaped the bullets but the car was hit. So I will have to wait for an alternative transport. The transport I got ultimately was a post office coloured open jeep. The jeep took me to Jhikargacha, an important business centre for raw jute. There I was introduced to a very important member of the Awami League. He in his mid forties, handsome and always smiling. He briefed me on the latest war situation in this vital sector. He called some East Pakistan Rifles men and introduced me to them. He advised them to take me to forward positions where my safety is ensured. This time I was led into a jeep which really was in a war mood. I was flanked by at least 8 men in full battle dress carrying light machine guns and other automatic weapons. I was driven to Chachra village, hardly one and half miles west of Jessore town, where liberation forces men took up their forward positions. During my one hour stay I heard the sounds of shell fire and felt the vibration. But two days later these positions were directly hit by heavy mortar and machine gun fire by Pakistani troops and my visit had to be halted at village Malancha.

On last Thursday morning, Pakistani troops made outflank moves from their Cantonment at Jessore. Crossing a local river Mukteswari they advanced upto Malancha and started heavy machine gunning. After machine gunning, the Pakistani troops set fire to the huts of 17 villages including Malancha. That day I could not proceed beyond Laujani level crossing gate on the Jessore Road. I was sitting over a railway slipper flanked by six East Pakistan Rifles Havildar. They were grave. Then we noticed the rush of large number of people from the burning villages. They were mostly women and children trekking towards safer places of Indian border areas. They were carrying household articles including goats, ducks and chickens. Many of them were in tears. Children were separated from their mothers and husbands from their wives. I came forward to talk to them. I could hardly check my tears when I heard a girl of five or six years waiting for her lost mother and was constantly consoled by another elderly woman that her mother was ahead of them! Going back to the Riflemen, I questioned them about the future of the war. 'Future is uncertain', commented one of them and he continued, 'we are not Commanders. We are soldiers. How can we win against such a powerful enemy without any big assistance from any country? But we will have to fight, because there is no alternative left to us.' That is the real point. Whether any country gives them any assistance or not, the people of East Bengal will have to continue their fight.

১৫ এপ্রিল (১৯৭১) সন্ধ্যায় অল ইন্ডিয়া রেডিও মর্যাদাপূর্ণ Spot Light অনুষ্ঠানে আমার ওই লেখাটি প্রচার করেই বিরত থাকেনি—পরের দিন অল ইন্ডিয়া রেডিও'র 'External Services' অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিকভাবেও প্রচার করেছিল। ওই সময় দিল্লিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় বাঙালি সাংবাদিক ছিলেন 'আনন্দবাজার ও হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকাগোষ্ঠীর 'ব্যুরো চিফ' (Bureau Chief) রণজিৎ রায়। তিনি ওই অনুষ্ঠানটি শুনে পরের দিনই আমাকে এই চিঠিটি লিখলেন :

Hindusthan Standard
A NATIONAL ENGLISH DAILY

1/3 IENS Building,
Rafi Marg,
New Delhi 1.

April 16, 1971.

My dear Sukharanjan,

I thought I should congratulate you on your Spotlight on Bangla Desh yesterday.

The script was excellent, combining as it did some essential background facts with personal experience in Bangla Desh.

With best wishes.

Yours sincerely,
Ranjait Ray

Mr. Sukharanjan Sen Gupta,
Reporting Section,
Jugantar,
Ananda Chatterjee Lane,
Calcutta 3.

২৫ এপ্রিল দিল্লির সবচেয়ে নামকরা সুপরিচিতা মহিলা সাংবাদিক ও সমালোচক The Times of India পত্রিকায় তাঁর Sight and Sound কলামে 'বাংলাদেশ' সম্পর্কে আমার ওই কথিকার উল্লেখ করে লিখলেন :

It is embarassing for this writer to say this about professional colleagues, but I met a wide range of newpapermen in Calcutta who remarked that AIR's tendency has been to choose commentators, who rely on such methods. This was most notable during the recent elections, wrote one Calcutta newspaper which has so far enjoyed virtual monopoly of broadcast commentaries, particularly for Spotlight. It was therefore refreshing to find that what I consider the best commentator on Bangla Desh for the week under review came not only from another paper but from a Bengali paper, Jugantar. Mr. Sukharanjan Sengupta seems born with a Badshah Khan's visit to India, when he produced a Spotlight script which can only be described as outstanding in three aspects; involved content, style and comment. Similarly, in his commentary on Bangla Desh Mr. Sengupta had a rare combination of human compassion, discriptive power and skilled political comment which would have made the script stand out on any international network. I am surprised that AIR took almost two years to rediscover Mr. Sengupta and one can only hope that the External Services of All India Radio also make use of him, because his literary ability and sophisticated style makes him something of a rarity on the Indian broadcasting scene.

Amita Malik

অমিতা মালিক তাঁর এই লেখায় আমার আগেকার একটি Spot Light অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন। সেটি ছিল সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান সম্পর্কে। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে গান্ধীজির শতবর্ষ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি উপলক্ষে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ইন্দিরা গান্ধীর একান্ত আবেদনে রাজি হয়ে সীমান্ত গান্ধী তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসন আফগানিস্তান থেকে দিল্লি আসেন। ওটা ছিল তাঁর দেশবিভাগের পর প্রথম ভারতে আসা। এখানে সীমান্ত গান্ধী সম্পর্কে আমার দীর্ঘ Spot light কথিকাটি উদ্ধৃত করলাম না। তবে The Times of India পত্রিকায় অমিতা মালিকের সমালোচনাটির উদ্ধৃতির আবেগ সংবরণ করতে পারলাম না। সে সময় তিনি ওই পত্রিকার Sight and Sound কলামে (অক্টোবর ৫, ১৯৬৯) লিখেছিলেন—

The arrival of Badshah Khan was heralded the evening before by one of the finest Spotlights heard in a long while. This was a script by Sukharanjan Sengupta of *Jugantar* in Calcutta and aptly titled 'the Servant of God'. It is not every newspaperman who can write a good radio script—Frank Moraes, Chanchal Sarkar, G. S. Bhargava, Niranjan Majumdar and perhaps two or three more (I am here referring only to scripts in English). Mr. Sengupta certainly is a front rank radio writer too. His tribute, in beautifully fluid language was a happy combination of anecdote, emotion shorn of false sentimentality and careful documentation which allowed for the fact that there might be a new generation of listeners who might not even have heard of Badshah Khan. This is the first time I have heard a script by Mr. Sengupta and one trusts it will not be the last. I am sorry to add a critical post-script, but although the ghost reader of the script had a good voice and a semblance of style he was woefully ignorant of the pronunciation of basic terms like Khudai Khidmatgar. The producer should have checked up on all this and not let those inaccuracies through...

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে অল ইন্ডিয়া রেডিও'র এই মর্যাদার অনুষ্ঠানে সর্বদাই ইংরাজি খবরের কাগজের সাংবাদিকদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। বাংলা কেন, অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার খবরের কাগজের সাংবাদিকদের Spot Light অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার ছিল না। এটা আমার মস্ত গরিমা যে আমি একটি অন্যতম ভারতীয় ভাষার সাংবাদিক হয়ে ইংরাজি সাংবাদিকদের মৌচাকে একটা সাংঘাতিক ঢিল ছুঁড়েছিলাম। তার সরকারি স্বীকৃতি এটা :

P. K. Ramanujam
Deputy Director of News

Dated the 7th October, 1969

Dear Shri Sen-Gupta,

I write to thank you for the excellent script you were good enough to write for us on Badshah Khan. It was broadcast on the 30th of last month. The weekly radio columns of the local newspapers have been full of praise for your

script. You may be interested to know what one paper has written. The Times of India radio columnist devoted a whole paragraph to your script and one sentence read : 'This is the first time I have heard a script by Mr. Sen-Gupta. One trusts it would not be the last.' I heartily endorse these sentiments and I do hope you will continue to write for us. I am enclosing a copy of the script for your record.

I believe you have already signed the contract form of the fee in respect of the talk, which I sent through our Senior Correspondent in Calcutta, Shri Robi Dey. The cheque will be sent to you by registered post on getting the contract form sent to you.

With my warmest regards.

Yours sincerely,
(P. K. Ramanujam)

Shri Sukharanjan Sen-Gupta,
Senior Reporter, Jugantar,
14, Ananda Chatterjee Lane,
CALCUTTA–3

বলতে গেলে ঢাকায় ২৫ মার্চ মধ্যরাতে গ্রেফতারের আগে শেখ মুজিবর রহমানের '...এই সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণার পর পরই ২৬ ও ২৭ মার্চ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরপর দুটি বৈঠকে 'প্রয়োজনে পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে' যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বর পূর্ব-পাকিস্তানের 'স্বাধীনতা' অর্থাৎ 'বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের' প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি যশোর ক্যান্টনমেন্ট ভারতীয় বাহিনী দখল করে নিলে ৮ ডিসেম্বর বিদেশি সাংবাদিকদের একটি বড় দলের সঙ্গে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছলাম সকালেই। সেখানে ভারতীয় বাহিনীর কম্যান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল দলবীর সিং অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বিদেশি সাংবাদিকদের লক্ষ করে বলেছিলেন, 'we not only sacrifice ourselves to protect our own freedom but also to achieve Freedom to other...'। যুদ্ধের গতি তীব্রতর হতেই 'যুগান্তর-অমৃতবাজার পত্রিকা' কর্তৃপক্ষ আমাকে যে কোনও রাস্তায় ও যে কোনওভাবে ঢাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন। এদিকে যুদ্ধের জন্য ভারত সরকার পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে সকল রকম যাত্রীবাহী বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় খবরের কাগজের রিপোর্টারদের চলাফেরায় খুবই অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বর কেবল দিনে একবার কলকাতা-গৌহাটি (এখন গুয়াহাটি) বিমান চালু হলে ওইদিনই সকালে আমি আমার ফটোগ্রাফার সহকর্মী গণেশ সিংহকে নিয়ে অসমের পথে পাড়ি দিলাম। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম যে আগরতলা হয়ে কুমিল্লা দিয়েই তখন একমাত্র সহজ ও নিরাপদ পথ হল ঢাকা পৌঁছানোর। পরদিন ভোরে অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর শিলং থেকে একটি প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে সন্ধ্যায় পৌঁছালাম করিমগঞ্জ শহরে। রাতে করিমগঞ্জ থেকে অন্য একটি গাড়ি নিয়ে রওনা দিলাম আগরতলার পথে। রাত শেষ হওয়ার আগেই পৌঁছে গেলাম আগরতলা শহরে। সেখানে চূড়ান্ত সামরিক তৎপরতা। সামরিক কমান্ডের সঙ্গে কথা বলে কুমিল্লা শহরে পৌঁছানোর একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে সামরিক বাহিনীর ট্রাকে উঠে বসেছি। এই সময় একজন অফিসার আমাকে জানালেন যে এখুনি দমদম থেকে ৩০/৩৫ জন বিদেশি ও ভারতীয় সাংবাদিকদের একটি দল সামরিক বিমানে এসে পৌঁছবেন। তাঁদেরও এই গাড়িতেই কুমিল্লা পৌঁছে দিতে হবে। অতঃপর আমি ও গণেশ ওই মুহূর্তে নিজেদের ভাগ্যের কাছেই সমর্পণ করলাম। আমাদের নিয়ে সামরিক ট্রাকটি আগরতলা বিমানঘাঁটির দিকে ছুটল। দমদম থেকে আসা সামরিক বিমান থেকে কলকাতা ও দিল্লির জনাদশেক বাঙালি ও ৩০ জনের মতো বিদেশি সাংবাদিক নামলেন। তাঁদের নিয়ে আমরা যখন কুমিল্লার পথে রওনা হলাম, তখন আমাদের নির্দিষ্ট সময় থেকে দু'ঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছে। আগরতলা থেকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগল কুমিল্লা শহরে পৌঁছতে। ওই পথ তখন সবটাই আমাদের সামরিক বাহিনীর দখলে। কুমিল্লা সার্কিট হাউসে আমাদের সামরিক বাহিনীর কমান্ড অফিসে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে চারটা। আমাদের সকলেরই আশা ছিল এই, ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগেই আমরা কুমিল্লা থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকা পৌঁছতে পারব। কিন্তু আমরা কুমিল্লায় বেলা চারটার মধ্যেও পৌঁছতে না পারায় ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমাদের জন্য অপেক্ষারত তিনটি হেলিকপ্টার কাউকে না নিয়েই তখন ঢাকায় উড়ে গিয়েছে। আমার ও গণেশের চোখে তখন জল। কারণ, আমরা যখন প্রথম কুমিল্লার পথ ধরেছিলাম, তা পরিবর্তন না হলে আমরা দু'জনে অন্তত দু'ঘণ্টা আগেই কুমিল্লা পৌঁছতাম। উপমহাদেশের এই অঞ্চলে অর্থাৎ যশোর-খুলনা বাদে পূর্ববঙ্গে সূর্য যেমন প্রায় আধ ঘণ্টা আগে ওঠে, তেমন অস্তও যায় প্রায় আধ ঘণ্টা আগে। ফলে কুমিল্লা শহরে শীতের বিকেল পাঁচটার আগেই অন্ধকার নেমে এল। আমরা কীভাবে

কত তাড়াতাড়ি ঢাকা পৌঁছব এই নিয়ে কুমিল্লায় আমাদের সামরিক কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তার পর ঠিক হল আমরা এখনই চাঁদপুরে রওনা হব। ১৬ ডিসেম্বর রাত সাড়ে আটটা-ন'টা নাগাদ চাঁদপুর স্টিমার ঘাটে পৌঁছলাম। সেখান থেকে মধ্য রাতের পর মালটানা একটা বড় স্টিমারে আমরা ঢাকার পথে নারায়ণগঞ্জ রওনা হলাম। চাঁদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত অনেকটা পথই মেঘনার জলরাশির উজান পাড়ি। তার ওপর অতি ধীরগতির স্টিমার। ১৭ ডিসেম্বর বেলা প্রায় তিনটায় নারায়ণগঞ্জ পৌঁছলাম। নারায়ণগঞ্জ ঘাটটি মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। ফলে স্টিমার থেকে নামতেই আমাদের ভারতীয় সাংবাদিকদের বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁদের সে কী উচ্ছ্বাস। মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব আমাদের চমৎকার দু'টি বাসে তুলে দিলেন ঢাকার পথে। নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকার পথে বাসটির ফুটবোর্ডে সারাক্ষণ বসে ঢাকা শহরে যখন ঢুকলাম তখন অস্তগামী সূর্যের বাঁকা ছায়া ঢাকার পথে ছড়িয়ে পড়েছে। বাসটি রমনা 'মহিলা উদ্যানের' পাশ দিয়ে যখন বাঁক নিল, সেসময় চোখে পড়ল উদ্যানের সামনে জলাশয়ে লাল শাপলা ফুলের ছড়াছড়ি। বোধহয় ঠিক ওই মুহূর্তে ওটাই ছিল ঢাকার জীবন-প্রতীক। কেবল রক্ত আর লাল।

রমনা মহিলা উদ্যানের পরে একটা বাঁক নিয়ে বাসটি যেখানে গিয়ে দাঁড়াল সে জায়গাটি হল ঢাকা এয়ারপোর্টের রাস্তা বরাবর হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টাল—যেটি সেই সময় ঢাকার একমাত্র ফাইভ স্টার হোটেল। বাস থেকে আমরা নেমেই দেখি দশ-বারোতলা সেই বিরাট হোটেলের শীর্ষে রাষ্ট্রসংঘের এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রসের পতাকা উড়ছে। হোটেলটির বাইরে তখন যেটুকু চোখে পড়ল তা হল আমাদের সৈন্যবাহিনীর গোটা পাঁচেক ট্যাংক ও সাজোয়া গাড়ি। হোটেলের প্রবেশপথে আমাদের সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে ঢাকার রাষ্ট্রসংঘ অফিসারেরও কয়েকজন কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে। দিল্লিতে আমাদের প্রতিরক্ষা দফতর থেকে Work Correspondent হিসাবে আমাদের যে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল সেটি প্রত্যেক রিপোর্টারের কাছ থেকে ওই অফিসাররা যাচাই করে নিলেন। আগেই বলেছি মোট চল্লিশ-বিয়াল্লিশজন রিপোর্টারের মধ্যে মাত্র দশ-বারোজন আমরা ভারতীয় রিপোর্টার ছিলাম। বাকিরা সকলেই আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের। রাষ্ট্রসংঘের অফিসাররাই আমাদের হোটেলের রিসেপশানে নিয়ে এলেন। তখন বুঝতে পারলাম যে এই এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে 'যুদ্ধ নিরপেক্ষ' রাষ্ট্রসংঘের এক্তিয়ারে। হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাদের রুম বণ্টন করে দিলেন। আমি ও আমার ফটোগ্রাফার সহকর্মী গণেশের জন্য সাততলার একটি ঘর বরাদ্দ হল। আমি ও গণেশ লিফটে উঠতে যাব সেইসময়ে বরুণ সেনগুপ্ত (আনন্দবাজার পত্রিকা) তাঁর অননুকরণীয় সম্বোধনে আমাকে হাত দিয়ে ডাকল। বরুণ আমার চেয়ে আঠারো ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) সন্ধ্যায় ঢাকা পৌঁছে গিয়েছিল। ঢাকা পৌঁছনোর পথ-নির্বাচনে বরুণের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। বরুণ শিলং থেকে টুরা হয়ে ময়মনসিং জেলার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে টাঙাইল পৌঁছেছিল। টাঙাইল থেকে সে সরাসরি ঢাকার সড়কপথ ধরেছিল। সেক্ষেত্রে আমি আগরতলা হয়ে কুমিল্লা-চাঁদপুর ঘুরে মেঘনা অতিক্রম করে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছেছিলাম। ফলে আমার সময়টা বেশি লেগে গেল। আমার হিসাব ছিল আমি কুমিল্লা থেকে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার পেয়ে যাব। কুমিল্লা সময়মতো পৌঁছতে পারলে আমি বরুণের আগেই ঢাকা পৌঁছতে পারতাম।

বরুণ লিফটে ওঠার আগে আমার রুম নাম্বারটা জেনে নিয়ে বলল, 'রাত আটটায় তোমার ঘরে যাব।' গত দু'দিনের প্রচণ্ড ক্লান্তি উত্তেজনা সব মিলিয়েও আমি তখন টগবগ করে ফুটছি। হোটেলে ঢোকার মুখেই আমাদের সামরিক বাহিনীর অফিসাররা আমাদের ভারতীয় রিপোর্টারদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন আমরা সন্ধ্যার পরে ঢাকা শহরের পথে না বের হই। ফলে হোটেলের রুমে দাঁড়িয়ে পর্দাগুলো সরিয়ে ঢাকা শহরের যতটা চোখে আসে দেখে নিলাম। ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে সেই সময়ে আমিই বোধহয় একমাত্র রিপোর্টার যে দেশবিভাগের আগে এবং দেশবিভাগের পরে তিনবার ঢাকা এসেছিলাম। রাত আটটা নাগাদ বরুণ যথারীতি আমার ঘরে ঢুকল। আমি তখন বরুণকে সরাসরি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, 'ভারতীয় বাহিনীর কাছে প্রায় নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণ চোখে দেখা যে কোনও ভারতীয় রিপোর্টারের পক্ষে গৌরবের। তুমি সেই গৌরবের অধিকারী। আজ চাঁদপুর থেকে স্টিমারে আসতে আসতে একজন রিপোর্টার ট্রানসিসটারে 'ভয়েস অফ আমেরিকা' ধরতে পেরেছিল। সেখানে তোমার নাম করে আনন্দবাজার পত্রিকায় আজ সকালে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছিল। কিন্তু আমার একটা কৌতূহল আছে, তুমি কি আত্মসমর্পণের পুরোটাই দেখতে পেয়েছিলে?' বরুণ একটা প্রাণখোলা হাসি দিয়ে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তুমি ধরলে কী করে? আমি যখন রমনা রেসকোর্সে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে। আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান একেবারে শেষলগ্নে। আমি পড়ি কী মরি এভাবে দৌড়ে যখন ঘটনাস্থলে হাজির হলাম তখন

পাকিস্তানের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি আন্তর্জাতিক প্রথা অনুযায়ী তাঁর ইউনিফর্মের সামরিক ব্যাজ ও সব প্রতীক চিহ্ন ছিঁড়ে আমাদের বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে তুলে দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান শেষ। তখন অফিসাররা সকলে গাড়ি করে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে। আমি কারও একটা গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম। এয়ারপোর্টে নেমে আমি সরাসরি লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, আমাকে খবর পাঠানোর জন্য সবচেয়ে কাছের যে কোনও ভারতীয় শহরে পৌঁছে দিতে। জেনারেল অরোরা আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'Don't worry. I shall make arrangement.'। জেনারেল একজন অফিসারকে ডাকলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আগরতলায় কোন হেলিকপ্টার যাবে? তার পাইলটকে ডেকে নিয়ে এসো। পাইলট অফিসার জেনারেল অরোরাকে এক লম্বা স্যালুট দিয়ে দাঁড়াতেই অরোরা তাঁকে হিন্দিতে আমাকে দেখিয়ে বললেন, একে চিনে রাখো, এর নাম জেনে নাও, একে এখন আগরতলা নিয়ে যাবে এবং কাল সকালে আবার ঢাকায় পৌঁছে দেবে। সুখরঞ্জন, আমি এই সহৃদয়তা ও উপকার ভুলতে পারব না। আমি আগরতলা থেকে 'ঢাকা ডেটলাইন'-এ সংবাদ পাঠিয়েছি। আমার টেলিফোন যখন আমার পত্রিকা অফিসে রিপোর্টারদের টেবিলে পৌঁছল আমি আগরতলায় বসে বুঝতে পারছিলাম সারা অফিস আমার টেলিফোনের কাছে জড়ো হয়েছে। সে যে কত বড় মুহূর্ত...।'

রাত্রে আমরা নীচে একইসঙ্গে ডাইনিং রুমে খেতে গেলাম। দশ-বারো ঘণ্টা বলতে গেলে কিছুই খাওয়া হয়নি, পেট জ্বলছে। আমরা টেবিলে বসতেই ওয়েটাররা বড় এক ডেলা ভাত ও এক টুকরো মাংস, ঝোল বলতে গেলে নেই, প্লেটে করে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পাতে হাত দিলাম। ভাত এবং মাংসের টুকরো শেষ হওয়ার পর ভাবছিলাম আরও কিছু আসবে, কিন্তু বরুণ ধাক্কা দিয়ে বলল, ওঠো, আর কিছু পাবে না। রেশনিং চলছে, ঢাকা শহরের দোকানপাট, হাটবাজার সব বন্ধ। এত বড় হোটেলে প্রায় হাজার খানেক লোক রয়েছে। তার মধ্যে সেই পাকিস্তানি অসামরিক অফিসার ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা আছে। হোটেলের মজুতভাণ্ডার কমে আসছে। রাত্রে ঘরে বসে আমি ঢাকা পৌঁছনোর বর্ণনা লিখতে বসলাম। গণেশ তার খাটে ঘুমোচ্ছে। আমি প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক লেখার পর ভাবছি লিখলাম তো কিন্তু খবর যাবে কীভাবে! এই ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ 'আজানে'র শব্দে আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল। আমার শৈশব, আমার কৈশোরের যে দিনগুলি, যে বছরগুলি পূর্ববাংলার জেলা ও মহকুমা শহরে কেটেছে সেই স্মৃতি বারংবার ভেসে উঠল। আমি পর্দা সরিয়ে ভোরের ঢাকা শহরের রূপ দেখতে লাগলাম। শীতের কুয়াশায় ঢাকা শহর তখন আচ্ছন্ন। বলতে গেলে ১৮ ডিসেম্বর (১৯৭১) ওই দিনটি থেকেই আমার পরবর্তী প্রায় দু'বছরের ঢাকায় রিপোর্টারের জীবনের শুরু।

সকালে আমার প্রথম কাজ ছিল কলকাতায় সংবাদ পাঠানোর কোনও ব্যবস্থা আছে কি না তার খোঁজ নেওয়া। হোটেলে আমাদের সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন পদস্থ অফিসার ছিলেন তাঁদের কাছে গিয়ে আমাদের রিপোর্টারদের এই সমস্যার সুরাহার কোনও ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি না জানতে চাইলাম। আমাকে একজন অফিসার আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে আমার মতো আরও অনেক রিপোর্টার বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদদাতারা গত রাত্রি থেকেই এই বিষয় নিয়ে তাঁদের কাছে এসেছিলেন। সুতরাং আজ দুপুরের মধ্যে এ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা অবশ্যই হবে। দুপুরে আমাদের সব রিপোর্টারদের ঘরে ঘরে জানিয়ে দেওয়া হল যে যারা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর 'ক্যুরিয়ার' ব্যবস্থায় সংবাদ পাঠাতে চান, তাঁরা বেলা একটার মধ্যে হোটেলের নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট অফিসারের কাছে সংবাদের প্যাকেটগুলো যেন জমা দিয়ে যান। এই ব্যবস্থা প্রায় ৩০ ডিসেম্বর অবধি চলেছিল। পরবর্তী কয়েকটা দিন আমার মন খুব উথাল-পাথাল করছিল এই ভেবে যে আমার শৈশব, আমার কৈশোর এবং যৌবনের প্রারম্ভের সময় পর্যন্ত পূর্ববাংলার যে মানুষগুলোকে দেখেছিলাম তাঁরা কতটা বদলেছে? কতটা এগিয়েছে? এবং বাঙালি মুসলমান সমাজের মেয়েদের আমার ছোটবেলায় যেভাবে দেখেছি তাঁরা কি সেরকমই আছেন? কিংবা তাঁরা লেখাপড়া শিখে অনেক এগিয়েছেন? বলতে গেলে পূর্ববাংলার শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজ নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্যের যে মানসিকতা তৈরি করেছিলেন ১৯০৫ ও তার পরবর্তী সময়কালে তাঁদের সে আশা, সে আকাঙ্ক্ষা দ্বিতীয়বারের বঙ্গবিভাগ সেইসঙ্গে স্বাধীনতা কতটা পূরণ করতে পেরেছে?

১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যার কিছু আগে একটা খবর পেলাম ছাত্র লিগের (আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন) কিছু নেতা ও কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওল্ড ক্যামপাসে এক সভায় মিলিত হচ্ছে। 'বাংলাদেশ' জন্ম নেওয়ার পর বলতে গেলে রাজনৈতিক কর্মীদের ওটাই প্রথম সমাবেশ। ২৬ মার্চের (১৯৭১) পর ঢাকা শহর ও জেলাগুলিতে ছাত্র লিগের ছেলেমেয়েরা কার্যত গুপ্ত সংগঠন পরিচালনা করছিল।

সেদিক থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের ভিতরে ও বাইরে ছাত্র লিগের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সন্ধ্যার পর আমাদের সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সাংবাদিকদের বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন তা হলেও আমি খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওল্ড ক্যামপাসের দিকে রওনা দিলাম। প্রায় ৭০-৭৫ জন ছেলেমেয়ে সকলের বয়স হবে বাইশ পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। বলতে গেলে প্রত্যেকেই সশস্ত্র। এমনকী কারও কাঁধে স্টেনগান ও মারাত্মক কার্বাইন। আমি একটু ভয়ই পেলাম। সভা বাইরেই আরম্ভ হল, আমি পরিচয় দিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। বেশ খানিকটা উত্তেজিত কথাবার্তা সভার মধ্যে চলছিল। হঠাৎ আমার নজরে এল তখনকার বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ছাত্রনেতা আবদুর রব সেখানে দাঁড়িয়ে। আবদুর রবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে। এমনকী ১৬ ডিসেম্বর আগরতলা থেকে কুমিল্লার পথে রওনা দেওয়ার আগে আমি যে-বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য উঠেছিলাম সেটাই ছিল রবের আস্তানা। আমি, রব ও আমার সহকর্মী গণেশকে ওই বাড়ির গৃহকর্ত্রী একটা বড় থালায় আলু সেদ্ধ আর ভাত মেখে দিয়েছিলেন। আমরা তিনজন একসঙ্গে একই থালা থেকে ভাত খেয়ে দ্রুত কুমিল্লার পথে ছুটেছিলাম। আবদুর রব কুমিল্লা থেকে আমাদের সামরিক বাহিনীর একজনের সঙ্গে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে গিয়েছিল। রব সভায় আমাকে দেখতে পেয়ে কাঁধে ঝোলানো স্টেনগানসহ আমায় জড়িয়ে ধরল এবং তার অন্যতম সহযোদ্ধা সাজাহান সিরাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সাজাহান সিরাজের গায়ের রঙ বেশ ময়লা কিন্তু অসাধারণ সুন্দর। সিরাজও আমাকে আলিঙ্গন করল। সভায় দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে, শেখ মুজিবর রহমান ফিরে আসবেন কবে এবং তিনি আদৌ ফিরবেন কি না, তিনি জীবিত না মৃত—এটাই ছিল আলোচনার মূল বিষয়। কোনও একজন ছাত্রনেতা, তার নাম আমি এখন আর মনে করতে পারছি না, তিনি সভায় উদ্বিগ্ন চিত্তে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, সেই প্রশ্নটা হল, 'আমরা কি শেষ পর্যন্ত ভারত এবং ভারতীয় হিন্দুদের আধিপত্যের অধীনে চলে যাচ্ছি?' এই প্রশ্নে সভার মধ্যে খুব সোরগোল উঠল। রব খুব উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই প্রশ্ন করার সময় এখনও আসেনি—এখনও আমাদের হাজার হাজার মুক্তিবাহিনীর কর্মীদের হাত থেকে হিন্দুদের ভাতের গন্ধ শুকিয়ে যায়নি।' রবের এই মন্তব্যের পর কিছুক্ষণ সভায় স্তব্ধতা নেমে আসে। তারপর রব আবার বলল, 'আমরা কারও আধিপত্যের অধীনে যাওয়ার জন্য এই যুদ্ধ করিনি।'

তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঢাকার রাজপথে অন্ধকার নেমেছে। ওল্ড ক্যামপাসের লো ভোলটেজে বিদ্যুতের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। আমি ভাবছিলাম যদি রিকশা না পাই তাহলে হোটেলে ফিরব কী করে? এই সময় রব এগিয়ে এসে আমায় বলল, 'তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেওয়ার দায় আমার।' এই বলে সিরাজকে ইশারা করল। সিরাজ তখন একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। রবের ইশারায় মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়েই সিরাজ আমার পাশে এসে দাঁড়াল। সিরাজ বুঝতে পারছিল যে আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ওকেই নিতে হবে। সিরাজ কোনও ভূমিকা না করেই আমায় বলল, 'চলেন, আপনারে জায়গা মতো পৌঁছাইয়া দি।' সিরাজের এই কথা শুনে মেয়েটিও বলল, 'তা হইলে আমি-ও তোমাদের লগে যাই।' সিরাজ তখন মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। এম.এ পড়ে, ছাত্র লিগের কর্মী। মেয়েটির নাম খুব বড়। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। ভাল দেখতে। আমি বললাম, 'অতবড় নাম আমি মনে রাখতে পারব না, আমি আপনাকে 'খুকি' বলেই ডাকব।' মেয়েটি হেসে উঠে বলল, 'তা হইলে তো তুমি কইতে হইব, খুকি ডাইক্যা 'আপনি' কওয়া যাইবে না।' আমিও তাতে রাজি হলাম। ওরা আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল হোটেল ইন্টার কনটিনেনটালের দিকে। প্রায় মিনিট পনেরো-কুড়ি সময় লাগল সেখানে পৌঁছতে। হাঁটতে হাঁটতে আমি বুঝতে পারছিলাম যে সিরাজ ও খুকি খুব অন্তরঙ্গ এবং সে সিরাজের বাগদত্তা। আমাকে হোটেলের গেটে পৌঁছে দিয়ে সিরাজ যখন বিদায় নিচ্ছিল আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, 'তোমরা কি এভাবেই ফিরবে, কোনও অসুবিধে হবে না?' সিরাজ একটু হেসে আমার দুটো হাত তার কোমরে বুলিয়ে দিল। সেখানে তার দু'টি মারণাস্ত্রই রয়েছে। ওরা আমাকে 'আদাব' জানিয়ে চলে গেল। যাবার আগে সিরাজ আমার হোটেলের ঘরের নম্বরটা জেনে নিল।

২০ কিংবা ২১ ডিসেম্বর আমরা সকালে জানতে পারলাম যে আজ দুপুরের দিকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান, কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরছেন এবং এঁরাই ঢাকায় বাংলাদেশের জন্য নতুন প্রশাসনের নেতৃত্ব দেবেন। বিকেলে খবর পেলাম সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলামকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। এই অনুষ্ঠানটি হবে আগেকার গভর্নরের বাসভবনের একটি হলঘরে। এই ভবনটির কিছু কিছু অংশ ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণে ভেঙে গিয়েছে। কারণ

এখানে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি এবং সাবেক 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর শেষ গভর্নর ডা. এ. এম. মালেক বাস করছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা ভারতীয় সাংবাদিকরা সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। আমাদের রিপোর্টারদের অনেকেই 'অলিভ গ্রিন' অর্থাৎ সৈন্যদের পোশাকের মতো শার্ট প্যান্ট পরা ছিলেন। শপথ অনুষ্ঠান যখন চলছে তখন হঠাৎ আমার নজরে এল বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে বিখ্যাত ভারতীয় অর্থনীতিবিদ এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী বসে আছেন। সুখময়ের ছাত্রজীবনে ওর সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু এখন তো অনেকটা তফাৎ। আমাকে চিনতে পারবে কি না বলা মুশকিল। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে একজন উর্দিপরা পিওন একটা ছোট্ট চিরকূট আমার হাতে দিল। তাতে আমার ডাক নামে সম্বোধন করা সুখময়ের উক্তি 'চলে যাবে না'। আমি চিরকুটটি পকেটে রেখে দিলাম। রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদসহ পাঁচ-ছয়জন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হলে আমাদের চায়ের আসরে নিয়ে যাওয়া হল। তখন অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী এগিয়ে এসে আমায় বলল, 'আমি একদমই চিনতে পারছিলাম না, তোমার এই শার্ট-প্যান্ট পরা দেখে। চা খাওয়ার পরে তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

অন্যান্য রিপোর্টার ও অতিথিরা স্থানত্যাগ করার পর সুখময় ও আমি একটা লম্বা করিডর দিয়ে খানিকটা নির্জন জায়গায় দাঁড়ালাম। সেখানকার একটা অংশ আমাদের বিমানবাহিনীর রকেট হামলায় ভেঙে গিয়েছে। সুখময় আমার কাছে জানতে চাইল আমি কবে ঢাকায় ঢুকেছি। এসে কী কী দেখেছি, পাকিস্তানি আমলের কোনও নেতা বা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কি না। এখনকার প্রজন্মের বাঙালিরা নিশ্চয়ই জানেন না যে সুখময়ের বাবা সোমনাথ চক্রবর্তীমহাশয় ঢাকা হাইকোর্টের প্রথম হিন্দু বিচারপতি। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকসাহেব সুখময়ের বাবাকে চট্টগ্রামের জেলা জজের পদ থেকে হাইকোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত করেছিলেন। সেই সময় বিশেষ করে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত সুখময় মাঝেমধ্যে ঢাকায় বাবা-মায়ের কাছে আসত। আমি সুখময়কে বললাম, 'তোমার বাবার পুরনো সহকর্মী ও আইন জগতের লোকজনেরা তো কেউ কেউ নিশ্চয়ই ঢাকায় এসেছেন। তুমি সরকারিভাবে না হোক ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে একবার কথা বলতেই তো পার, তোমার বাবার খুব খাতিরের লোক ছিলেন সেই সময়কার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। ঢাকাতেই রয়েছেন।' সুখময় সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে জানতে চাইল আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি কি না? এখানে একটা মজার কথা বলা যেতে পারে সুখময় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে বি.এ ও এম.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পর যখন ঢাকায় ওর বাবার (সোমনাথ চক্রবর্তী) কাছে গিয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান সুখময়কে তাঁর বাড়িতে ডিনার খাইয়েছিলেন এবং বাবা-মায়ের উপস্থিতিতে আতাউর রহমানসাহেব সুখময়কে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সুখময় তাতে রাজি হলে পাকিস্তান সরকার তাঁর অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ বা হারভার্ডে পড়ার সব খরচ বহন করবে। কিন্তু সুখময় হেসে জবাব দিয়েছিলেন যে সেটা সম্ভব নয়। আমি সুখময়কে খানিকটা প্রগলভভাবে বলেছিলাম, 'সে সব কথা মনে পড়ে মানিক'—সুখময়ের ডাক নাম মানিক। একথা বলে সুখময়ের গাল টিপে দিয়েছিলাম। সুখময় হেসে আমায় বলেছিল, 'তুমি একেবারেই বদলাওনি। সেই একইরকম রয়ে গেলে!' গভর্নরের বাড়ি থেকে আমি সুখময়ের সঙ্গেই হোটেলে ফিরে এলাম। পরের দিন সকালে সুখময় ওর ঘরে আমাকে ব্রেকফাস্ট খাইয়েছিল। সুখময়কে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যুদ্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যেই ঢাকা পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারাটা কেমন এবং অত্যাবশ্যক পণ্যাদির কতটা প্রয়োজন সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের পক্ষে তা আনুমানিক যাচাই করার জন্য।

আমার দু'টো ব্যাপারে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। তার মধ্যে এক নম্বর হল লেখার কাগজের অভাব কারণ ঢাকায় তখনও দোকানপাট বন্ধ। দ্বিতীয়টা হল, আমি আমার জামাকাপড় সবই আগরতলায় ফেলে রেখে বলতে গেলে একবস্ত্রে ঢাকায় এসেছি। সেটা একটা মস্ত বড় অসুবিধা, আর অলিভ গ্রিন পোশাক পরে সব জায়গায় যাওয়াটাও বেমানান। লেখার কাগজ বা খাতা কোথাও পাওয়া যায় কি না এজন্য একদিন দুপুর নাগাদ হোটেলের গেটের কাছে অপেক্ষমাণ একটা রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। হোটেল ইন্টার কনটিনেন্টালের গেটের কাছে সবসময়ই কিছু না কিছু লোক দাঁড়িয়ে থাকত। আমি যখন রিকশাওয়ালাকে কাগজের দোকানের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, ওই দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মধ্যে সেটা কারও কানে গিয়েছিল। প্রায় আমারই কাছাকাছি বয়সের এক ভদ্রলোক, খুবই সুন্দর দেখতে, তিনি এগিয়ে এসে আমার কাছে জানতে চাইলেন আমি কলকাতার কোন কাগজের রিপোর্টার? আমার উত্তর পেয়ে তিনি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রমহিলাকে ডেকে আনলেন, এনে

আমার সঙ্গে পরিচয় করালেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী, এবং স্ত্রীও বেশ সুশ্রী। ওই ভদ্রলোক আমার হোটেলের ঘরের নম্বরটা জেনে নিলেন। বললেন ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে তিনি অন্তত শ'খানেক পাতার খাতা আমাকে জোগাড় করে দেবেন। পাওয়ার আগেই আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। আমি হোটেলের ঘরে ফিরে গেলাম। ঘণ্টা দু'য়েক পরে রিসেপশান থেকে আমায় জানাল মোস্তাফা জামান আব্বাসি বলে এক ভদ্রলোক আমার ঘরে আসতে চাইছেন। আমি সম্মতি দিলাম, সেই ভদ্রলোক আমার ঘরে এলেন দু'খানা মলাটহীন খাতা নিয়ে, বোঝা গেল অন্য কারও লেখাপড়ার কাগজ তিনি আমার জন্য নিয়ে এসেছেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম এবং তাঁকে আমার এখানে আরেক দিন আসার জন্য অনুরোধ করলাম। এই কাগজ পাওয়ার ফলে আমার একটা সংকট অনেকটাই মিটল। এদিকে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। হোটেলে খানিকটা সাজগোজ হচ্ছে কারণ তখন বাংলাদেশে একটা নতুন সরকার প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছেন। ঢাকা শহর অনেকটা ধীরে হলেও স্বাভাবিক হতে আরম্ভ করেছে। সম্ভবত ২৩ কি ২৪ ডিসেম্বর সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ মোস্তাফা জামান আব্বাসি সস্ত্রীক আমার ঘরে এলেন। আমাকে ও আমার সহকর্মী গণেশকে তাঁদের বাড়িতে একদিন সন্ধ্যায় খেতে নিমন্ত্রণ করার জন্য। আমি আব্বাসিকে বললাম যে ভাই আমি খুব বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাচ্ছি, অন্তত তৈরি পাজামা-পাঞ্জাবির দোকান খুলছে কি না। এই সময় আব্বাসির স্ত্রী আর আব্বাসি দু'জনে নিজেরাই কয়েকটা লোকের নাম উচ্চারণ করলেন। যদি ওখানে ওদের বাড়িতে রেডিমেড কিছু পাওয়া যায়। আব্বাসির স্ত্রী আমাকে এবং তাঁর স্বামীকে পিঠে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াতে বললেন। মেয়েদের একটা আলাদা দৃষ্টি থাকে। তিনি আমাদের দু'জনের উচ্চতা এবং দেহে আমরা দু'জন কতটা কমবেশি চওড়া এটা অনুমান করে নিলেন। অর্থাৎ তাঁর চোখের এই মাপ দিয়ে তিনি আমার জন্য রেডিমেড কিছু সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন। ঠিক পরের দিন সকালে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী আমার ঘরে এলেন একজোড়া পাজামা, একজোড়া পাঞ্জাবি নিয়ে। পাঞ্জাবি দু'টো একটু বড়, কিন্তু পাজামা দু'টো মোটামুটি আমার মাপেই আছে। আমি এর দাম জিজ্ঞেস করলাম। আব্বাসির বাচনভঙ্গিতে কোনও বাঙাল উচ্চারণ ছিল না কিন্তু ওর স্ত্রী 'বাঙাল' সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তিনি কোন জেলার লোক সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি যখন পয়সার কথা তুললাম, তখন আব্বাসির স্ত্রী কপালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, 'এই আল্লা কিথা কন, বইনে দিছে পয়সা লাগে না কি!' 'কিথা কন' শব্দটি শুনে আমি বুঝতে পারলাম এই ভদ্রমহিলা শ্রীহট্ট জেলার লোক।

আসমা ও আব্বাসি স্বামী স্ত্রী দু'জনে আমাদের নিমন্ত্রণ করল ওদের পুরানাপল্টনের বাড়িতে খেতে যাওয়ার জন্য। ঠিক হল পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা পুরানাপল্টনে যাব। চলে যাওয়ার সময় আব্বাসি আমাদের বলল, 'আপনারা আমার বাবাকে চিনবেন, বোধহয় দেখেও থাকবেন।' আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলাম। আব্বাসি জানাল ওর বাবার নাম আব্বাসউদ্দিন। আমার সহকর্মী গণেশ এতক্ষণ অনেকটা নিস্পৃহ ছিল কিন্তু আব্বাসউদ্দিনের নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমার বাবার বন্ধু। আব্বাসউদ্দিন ও সাইগল আমাদের বাড়িতে যেতেন।' গণেশ পেশায় ফটোগ্রাফার হলেও গানবাজনা ও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই গণেশ আব্বাসউদ্দিনের একটা গানের লাইন গেয়ে উঠল। আসমা হেসে বলল, 'গানটা ঠিক আছে তবে সুরের গন্ডগোল হইতাছে', বলে নিজেই গানে ঠিক ঠিক সুর দিয়ে গেয়ে উঠল। কিছুক্ষণ গণেশ, আসমা ও আব্বাসি তিনজনেই আব্বাসউদ্দিনের একটা গান একসঙ্গে গাইল। আগেই বলেছি শীতের দিনে ঢাকায় বিকেল পাঁচটা বাজতেই অন্ধকার হয়ে আসে। পরের দিন আমরা সন্ধ্যার দিকে পুরানাপল্টনে আব্বাসউদ্দিনের বাড়িতে গেলাম। পূর্ববাংলার মফস্বল শহরগুলোর প্রায় সব জায়গাতেই ঘরবাড়ির একটা একইরকম ধরন আছে। ঢাকাও তার ব্যতিক্রম নয়। বাড়িটির চারপাশে বাঁশের ও টিনের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা দরজায় কড়া নাড়তেই আসমা খিল খুলে দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করে নিল। বাড়ির উঠানে পা দিয়ে আমি যতটা বিস্মিত হয়েছি তারচেয়ে বেশি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। সরুপাড়ের একখানা সাদা শাড়িপরা এক বর্ষিয়সী মহিলা একটি তুলসীগাছের গোড়ায় জল ঢালছেন। লাল সিমেন্টে প্রায় কোমর সমান উঁচু মঞ্চে বেশ একটি বড় তুলসী গাছ। আমি একটা ছোট্ট ঘরের মাটির বারান্দায় বসে পড়লাম, তখনও ওই মহিলা ঘটি উপুড় করে জল ঢালছেন। আমি মাটিতে বসে পড়ায় আসমা হা হা করে দু'খানা আসন নিয়ে ছুটে এল। আমি আসন ছাড়াই মাটিতে বসে রইলাম। তুলসী গাছের গোড়ায় জল ঢালার পরে ওই মহিলা এগিয়ে আসতেই আমি তাঁকে প্রথম নমস্কার করলাম। তিনি বিনা দ্বিধায় আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে আসমাকে বললেন, 'ওই বারান্দায় একটা মাদুর পাতো। আমার স্বামী আব্বাসউদ্দিনসাহেব মাটির বারান্দায় মাদুরে বসতে এবং শুতে খুব ভালবাসতেন।' বাড়িটিতে দু'খানা আলাদা আলাদা দালান আছে আর একটা টিনের চালের মাটির মেঝের বাড়ি, যেখানে আমি বসে আছি। আব্বাসউদ্দিনসাহেব দেশভাগের পরে এই বাড়িটি তাঁর পরিচিত একটি হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে কিনেছিলেন।

বাড়ির উঠানে একটা নিম গাছ, একটা বড় বেলগাছ ও তুলসী মঞ্চ সেইসময় থেকেই রয়েছে। আব্বাসউদ্দিন ও তাঁর ছেলেমেয়েরা যথাযথভাবে অন্য দুটি গাছের সঙ্গে তুলসী গাছেরও পরিচর্যা করে চলেছেন। আমি আব্বাসউদ্দিনের স্ত্রীকে জানালাম যে আমি আব্বাসউদ্দিনসাহেবকে একবারই ১৯৫৪ সালে কলকাতায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে গান গাইতে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে তাঁর গায়িকা কন্যা ফেরদৌসিও ছিলেন। ফেরদৌসি তখন ফ্রক পরে, তেরো-চোদ্দ বছর বয়স। পরবর্তীকালে ফেরদৌসি বাংলা গানের সঙ্গে এই উপমহাদেশের ক্ল্যাসিকাল গানের জগতেও খুবই নাম করেছেন। সেদিন ঢাকায় আব্বাসউদ্দিনের বাড়িতে আমাদের একটি চমৎকার সন্ধ্যা কেটেছিল। কেবল তাই নয় ঢাকায় ওই প্রথম আমি একটি মুসলমান পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আসমা ও আব্বাসির চার-পাঁচ বছরের একটি মেয়ে তখনই ভাল গান গাইত এবং ঢাকার টিভিতে তাকে প্রায়ই শিশুমহলে গান গাইতে দেখা যেত। পরবর্তীকালে শুনেছি তিনি খুব বড় গায়িকা হয়েছেন।

ঢাকায় আমার এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে। এখন ঢাকা শহর ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। যদিও শেখ মুজিবর রহমানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত খবর ছিল না। তবে তিনি জীবিত এটা মোটামুটি ঠিক। এই সময়ের ভিতরে সম্ভবত ১৮ কিংবা ১৯ ডিসেম্বর আমি ও গণেশ মুজিবর রহমানের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন এই উপমহাদেশের তৎকালীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ। বেগম মুজিবর রহমান তাঁদের ধানমন্ডির বাড়িতে থাকতেন না, তাঁদের নিজের বাড়ির পাশে তিনি তাঁর বোনের বাড়িতে থাকতেন। ওই বাড়িতেই মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হাসিনা তাঁর প্রথম কন্যাসন্তানের মা হলেন। আমরা দু'জনে যখন তোফায়েলের সঙ্গে বাড়ির বসার ঘরে পৌঁছলাম তখন হাসিনা তাঁর মেয়েকে কোলে নিয়ে জানলার বেদিতে বসেছিলেন। হাসিনার তখন তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স। গণেশ বেগম মুজিবের কয়েকখানা ছবি তুলল, তারপর বেগমসাহেবা একখানা ট্রেতে করে দু'গ্লাস খাওয়ার জল নিয়ে এলেন। বেগম যখন খাওয়ার জল ট্রে করে আনছিলেন হাসিনা তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে বেদি থেকে কন্যাকে বুকে জড়িয়ে চিৎকার করে মা'কে বলল, 'মেহমানদের খালি পানি দিলা!'—এই কথা বলে হাসিনা এক হাত দিয়ে মাকে নিরস্ত করলেন। ভেতরে মা-মেয়ের জোরে কথা হচ্ছে। মা বলছেন, 'কী করুম, ঘরে তো আস্ত বাতাসা, বিস্কুট কিছুই নাই। যা আছে সব ভাঙা, গুড়াগুড়া।' মেয়ের জবাব, 'ওই ভাঙাগুলোই দাও। খালি পানি দিও না।' খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরের কথা। হাসিনার মনের এই মাধুর্য আমার মনে চিরদিনের জন্য গাঁথা আছে।

এই সময়টায় আর একদিন আমার ঢাকা জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু কামাল লোহানি এক ঘন কুয়াশার ভোরে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে আমার ঘরে চলে এলেন। কামাল লোহানি কলকাতায় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'-র নিউজ এডিটার ছিলেন। কলকাতায় ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। কামাল পাবনার ছেলে, কলকাতায় আকাশবাণীর খুব পরিচিত সাংবাদিক প্রণবেশ সেনের সহপাঠী ছিলেন। শৈশব ও কৈশোরে তাঁরা পাবনা শহরে একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন। কামাল গল্প লেখে, কবিতা লেখে, অভিনয় জানে, নাট্যনির্দেশক এবং একসময়ে পূর্ববাংলার বিখ্যাত 'বেহুলা' ছবিতে নৃত্যনির্দেশকও ছিলেন। কামাল আমার ঘরে ঢুকেই বললেন, 'চলো একটা বাড়িতে তোমারে নিয়ে যাব।' আমি বললাম, 'এত ভোরে!' কামাল জবাব দিলেন, 'সেটা আমার বিবেচ্য'। আমরা দু'জন বেরিয়ে পড়লাম। ঘন কুয়াশায় তখনও ভাল করে পথ দেখা যাচ্ছে না। খানিকটা হেঁটে একটা রিকশা পাওয়া গেল। যে-বাড়ির সামনে আমরা রিকশা থেকে নামলাম সেটি একটি ছোট্ট দোতলা বাড়ি। কিন্তু বাড়ির লনটি খুব সুন্দর। রিকশা থেকে নেমেই দেখতে পেলাম এক বৃদ্ধদম্পতি লনে পায়চারি করছেন। বৃদ্ধা আমাদের পায়ের শব্দে তাকিয়ে উৎসাহের সঙ্গে তাঁর স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন, 'দেখো, দেখো কে আইছে।' কামাল লোহানি এগিয়ে এসেই প্রথমে ভদ্রমহিলাকে প্রণাম করলেন তারপর ভদ্রলোককে প্রায় পা স্পর্শ করার মতো করলেন। ভদ্রলোক টাই ভেস্ট কোট এবং মাথায় ফেল্ট হ্যাট পরা একেবারে সাহেবি পোশাকে, হাতে লাঠি। কামাল আমার হাত ধরে ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'কলকাতার রিপোর্টার' বলে আমার নামটা জানালেন আর ওঁর পরিচয় দিয়ে আমাকে বললেন, 'ইনি সুফিয়া কামাল।' আমি সঙ্গে সঙ্গে ওঁর পায়ে হাত দিলাম। উনি 'আরে, আরে কী করো' বলে উঠলেন। আমি জবাব দিলাম, 'আপনার মতো সাহসি মহিলা ঢাকায় খুব বেশি আছে বলে তো শুনিনি। আমি আপনার সাহসকেই প্রণাম করলাম।' ভদ্রলোক আমাকে হাত ধরে নিয়ে লনে একখানা খালি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। কামাল লোহানি বাড়ির বারান্দা থেকে আরও তিনখানা চেয়ার নিয়ে এলেন। সুফিয়া কামাল যে বাংলা সাহিত্যের খুব পরিচিত ব্যক্তিত্ব এটা না বললেও চলে। তবে তাঁর স্বামীকে অনেকেই চেনেন না। তিনি অবিভক্ত বাংলার বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের অফিসার ছিলেন। দেশভাগের পরে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের অনেক উচ্চপদে

কাজ করেছেন। বছর দশেক আগে অবসর নিয়েছেন। একটু পরে সুফিয়া কামাল আমাদের সকলকে নিয়ে ভেতরে খাবার টেবিলে বসালেন এবং শীতের বাংলার এমন লোভনীয় খাবার আমার সামনে দিলেন যেটাও ঢাকায় আমার প্রথম খাওয়া—খেজুর রসের পায়েস ও পাটিসাপটা। কামাল লোহানি এই পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ এবং পরবর্তীকালে আমি যতদিন ঢাকায় ছিলাম সুফিয়া কামালের সঙ্গে আমার দেখা হত বাংলা একাডেমিতে, কখনও কবিতার আসরে ও সাধারণ সাহিত্য-আলোচনায়। পঁচিশ মার্চ (১৯৭১) শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতারের পর ঢাকা শহরে যে বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থান ঘটেছিল তাতে সুফিয়া কামালের একটা বড় ভূমিকা ছিল। তখন এরকম একটা অসমর্থিত খবর কলকাতার খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল যে 'কবি সুফিয়া কামাল পাক সৈন্যদের গুলিতে নিহত'।

একত্রিশে ডিসেম্বর (১৯৭১) আমি কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় আসি, কারণ আগেই বলেছি, বলতে গেলে এক বস্ত্রে ঢাকা পৌঁছেছিলাম। আমার জিনিসপত্র আগরতলায় আমার এক সহকর্মী বন্ধুর বাড়িতে ছিল। ঢাকা থেকে আগরতলা আমাকে আসতে হয়েছিল এমন এক পথে যা প্রায় আট ঘণ্টার অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ যাত্রাপথ। ঢাকা থেকে বাসে করে নারায়ণগঞ্জ। সেখান থেকে রিকশায় শীতলক্ষার পারে এসে একটি লঞ্চে শীতলক্ষা পেরিয়ে আবার ঘণ্টাখানেক একটা বাসে করে সাবেক সোনারগাঁও বিখ্যাত গ্রামে পৌঁছলাম। সোনারগাঁও যে নদীর পারে সেটিকে ছোট মেঘনা বলা হয়। কিন্তু ছোট মেঘনা যতখানি বিস্তৃত তা দেখে আমার বিস্ময় হয়েছিল এই ভেবে যে বড় মেঘনা তাহলে কতখানি বড়? ছোট মেঘনা আমি পাড়ি দিলাম অন্য কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে নৌকাতে এবং যে ছেলেটি নৌকো চালাচ্ছিল তার বয়স খুব বেশি হলে চোদ্দ-পনেরো বছর। ওই বয়সেই সে পাকা মাঝি। শীতের মেঘনা নিস্তরঙ্গ হলেও জলের দিকে চোখ মেলে চাইলে একটু ভয় হয়। জলের রঙ আকাশের কালো মেঘের মতো। আমি ভাল সাঁতার জানি কিন্তু যতক্ষণ নৌকোতে ছিলাম ততক্ষণ আমার বেশ ভয় ভয় করছিল। ছোট মেঘনা পাড়ি দিয়ে আবার রিকশায় চেপে দশ-পনেরো মিনিট পরে বড় মেঘনার পাড়ে এসে পড়লাম। সেখানে দেখলাম আমাদের ভারতীয় সৈন্যদের একটি ঘাটে, স্টিমারের মতো বড় বড় লঞ্চ এবং সেইসঙ্গে ভাসমান লোহার প্ল্যাটফর্মের মতো কতগুলো জিনিস বাঁধা রয়েছে। আমাদের কতগুলো ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়িও আছে। একটি বড় লঞ্চ এগুলিকে টেনে বড় মেঘনা পাড়ি দিয়ে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ঘাটে যাবে। আমি লঞ্চে উঠে বসলাম। এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল দাউদকান্দির ঘাটে পৌঁছতে। দাউদকান্দি এই অঞ্চলের খুব বড় বাণিজ্যকেন্দ্র তাছাড়া মেঘনার পাড়ে অবস্থিত এই জায়গাটির অনেক ইতিহাস আছে। আমি ইতিহাসের যে কণামাত্র জানি তাতে ১৯৩০-এর এপ্রিলে 'চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান' ঘটিয়ে গণেশ ঘোষসহ কয়েকজন বিপ্লবী দাউদকান্দিতে সেই সময়কার ও পরবর্তীকালেরও বিখ্যাত আইনজীবী কামিনীকুমার দত্তর বাড়িতে কয়েক দিন আত্মগোপন করেছিলেন। দাউদকান্দি ঘাট থেকে কুমিল্লা শহরে যাওয়ার পাকা সড়ক আছে। অটোতে করে কুমিল্লার দিকে এগবার একটু পরেই দেখতে পেলাম অনেকগুলো হিন্দু মন্দির এবং সেখানে রাস্তার ওপর আমাদের জওয়ানদের বেশ ভিড়। আমি একজন জওয়ানকে প্রশ্ন করে জানলাম এগুলো শিবমন্দির। আমিও অটো থেকে নেমে মন্দির দেখতেই এগিয়ে গেলাম এবং আমাদের সৈন্যদের মতো শিবলিঙ্গে বেলপাতা অর্পণ করে এলাম।

কুমিল্লা শহরে পৌঁছে একটা চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম ত্রিপুরা সীমান্ত এখান থেকে কতটা পথ? যে নদীটির পাড়ে ত্রিপুরার বিলোনিয়া শহর তা কুমিল্লা থেকে প্রায় আঠারো মাইল এবং আমাকে কয়েকটি রিকশা বদল করে ওই পথ পাড়ি দিতে হবে। রিকশা করে কুমিল্লা শহরের পথ দিয়ে সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা স্কুলবাড়ি। তার গায়ে বড় করে লেখা 'ঈশ্বর পাঠশালা'। এই বিদ্যালয়টির অবিভক্ত বাংলায় খুব নামডাক ছিল। আমি রিকশাওয়ালাকে থামিয়ে বিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে আছি এই সময় উলটোদিকের বাড়ি থেকে ধুতিপরা একজন বৃদ্ধ লোক এগিয়ে এলেন। যেহেতু আমার পরনে সৈন্যদের মতো সবুজ প্যান্ট ও শার্ট ছিল ভদ্রলোক ভেবেছিলেন আমি বোধহয় ভারতীয় সৈন্য। তিনি এগিয়ে আসতেই আমি তাঁকে নমস্কার করলাম। তিনি জানতে চাইলেন আমি কেন এই স্কুলটার সম্পর্কে কৌতূহলী? আমি বললাম যে এই স্কুলটির অনেক নাম শুনেছি, তাছাড়া আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা অধ্যাপককে খুব ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি যিনি এই 'ঈশ্বর পাঠশালা'-র ছাত্র ছিলেন। ভদ্রলোক তাঁর নাম জানতে চাইলে আমি জবাব দিলাম, 'তাঁর নাম অধ্যাপক অম্লান দত্ত।' ভদ্রলোক বললেন, 'ও, চিনতে পারলাম, 'ওই তো অগো বাড়ি কাছেই, দেখবেন?' কিন্তু, বাড়ি দেখতে চাই না, আমি 'ঈশ্বর পাঠশালা'ই দেখতে চাই। তিনি আমাকে পাঠশালার মধ্যে নিয়ে গেলেন। পাঠশালাটি প্রথম যেভাবে ছিল, তার চালের টিন ও কাঠের খুঁটি কালচক্রের আবর্তনে মাটিতে বসে গিয়ে এতটা নিচু

হয়েছে যে চাল মাথায় ঠেকে যায়। সেখানে এখন আর ক্লাস হয় না, কিন্তু স্মারক হিসাবে সেটি রয়েছে। পাশে দালান বাড়িতে ক্লাস হয়। পরে কলকাতায় সেই যাত্রাতেই আমি অধ্যাপক অম্লান দত্তের সঙ্গে দেখা করে তাঁর 'ঈশ্বর পাঠশালা'-র কথা বলেছিলাম। অধ্যাপক অম্লান দত্তকে আমি 'অম্লানদা' বলেই ডাকি। ওই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রোভাইসচ্যান্সেলার। তিনি আমাকে এতটাই স্নেহ করতেন যে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে আমাকে দেখিয়ে বলতেন, 'সুখরঞ্জন যদিও আমার ছাত্র নয় তাহলেও ও আমার ছাত্রের মতো। বলতে গেলে ওকে আমি ছোট থেকেই চিনি।' অধ্যাপক অম্লান দত্ত আমার লেখা যুগান্তরের বিভিন্ন রিপোর্টের বহুবার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। এভাবেই আমি আগরতলা পৌঁছে ছিলাম।

কলকাতা থেকে আমি ১৯৭২-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই ঢাকা ফিরে গেলাম। এবার ঢাকার দামি হোটেলে না উঠে অনেকটা কম দামের হোটেলে থেকে ঢাকা প্রেস ক্লাবের খুব কাছে তোপখানা রোডে একটি বাড়ি ভাড়া করলাম। পূর্ববাংলায় ভাড়াবাড়িকে 'বাড়ি' না বলে 'বাসা' বলা হয়ে থাকে। শুধু বাংলাদেশ নয় সারা উপমহাদেশ তখন শেখ মুজিবর রহমানের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত। তবে মোটামুটি এটা তখন জানা গিয়েছিল যে পাকিস্তানের সামরিক ট্রাইবুনাল শেখসাহেবকে 'দেশদ্রোহিতার অপরাধে' ফাঁসির আদেশ দিলেও তা তখনও কার্যকর হয়নি। যুদ্ধে পরাজয় এবং বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক ও সামরিক অস্তিত্ব একেবারেই শূন্যে নেমে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক দুনিয়া সে সময় নিশ্চিত ছিল যে যেকোনও সময় জেনারেল ইয়াহিয়া পদত্যাগ করবেন। এদিকে লাহোরে, রাওয়ালপিন্ডিতে এবং করাচির রাস্তায় রাস্তায় পাকিস্তানের সামরিক অফিসারদের স্ত্রীরা তাদের সন্তানদের নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে শ্লোগান তুলেছিলেন 'কোর্ট আমাদের স্বামী ও সন্তানদের ফিরিয়ে দাও'। এই অবস্থায় শেখ মুজিবর রহমানকে ফাঁসি দেওয়া ইয়াহিয়া খানের পক্ষে খুব সহজ কাজ ছিল না। রবার্ট পাইন (Robert Pyne) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Massacre'-এ শেখসাহেবের মুক্তি ও ইয়াহিয়ার পদত্যাগ সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। দশ জানুয়ারি, ১৯৭২ পাকিস্তানি ইন্টারন্যাশানাল এয়ার লাইন্সের একটি বিমান লন্ডনের সময় অনুযায়ী মধ্যরাতের শেষলগ্নে (ইংরাজি মতে তখন তারিখটা বদলে গেছে) শেখ মুজিবর রহমানকে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে নামিয়ে দিল। ব্রিটিশ সরকার ও তার 'সিক্রেট সার্ভিস' আগের থেকেই শেখসাহেবের মুক্তির কথা জানতে পেরেছিল। শেখসাহেব লন্ডন বিমানবন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ পুলিশ ও গোয়েন্দারা তাঁকে একটি গাড়িতে তুলে নির্দিষ্ট হোটেলে পৌঁছে দিল। হোটেলের ঘরে শেখ মুজিবর রহমান কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তখন শেষ রাত, তিনি অনুমানে বুঝেছিলেন যে এই মুহূর্তে লন্ডন থেকে তিনি টেলিফোনে ঢাকাকে পাবেন না। দিল্লিতে কীভাবে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় সেটাও তিনি তখন বুঝতে পারছিলেন না। হোটেলে তাঁর ঘরে টেলিফোন ডাইরেকটরি থেকে তিনি ভারতীয় হাইকমিশনার আপ্পা-বি-পন্থের ফোন নম্বর পেয়ে গেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনারকে ফোন করলেন। লন্ডনের রাজপথ তখন ভোরের কুয়াশা ও ঝিরঝিরে তুষারে আচ্ছন্ন। আপ্পা-বি-পন্থ টেলিফোন তুলতেই শেখসাহেব তাঁকে জানালেন, 'Shekh Mujibur Rahaman on the other side'। আপ্পা-বি-পন্থ লাফিয়ে উঠলেন, তিনি শেখসাহেব কোন হোটেলে আছেন এবং তাঁর ফোন নম্বর জেনে নিলেন। পন্থজি প্রথমে দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়ে দিলেন লন্ডনে শেখ মুজিবর রহমানের উপস্থিতির সংবাদ। ঢাকার সময় অনুযায়ী ভোর সাড়ে সাতটা-আটটার মধ্যে সারা বাংলাদেশ জানতে পারল শেখ মুজিবর রহমান জীবিত এবং তিনি পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডনে পৌঁছেছেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর হাইকমিশনারকে এরকম নির্দেশ দিলেন যে লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে বাংলা জানা ও বাংলা বলতে পারা কোনও পদস্থ অফিসার থাকলে তাকে এখনি শেখসাহেবের জন্য যেন হোটেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লন্ডনের আকাশে সূর্য ওঠার আগেই আপ্পা-বি-পন্থ হোটেলে এসে মুজিবর রহমানকে আলিঙ্গন করলেন। তখন শুরু হল লন্ডন-কলকাতা এবং কলকাতা-ঢাকা সংবাদ আদান-প্রদানের পালা। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশ অনুযায়ী ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি পদমর্যাদার একজন অফিসার, যিনি বাংলা বলতে পারেন ও বাংলা জানেন তাকে শেখসাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই অফিসারের নাম বেদমারোয়া। তিনি এক সময়তে পশ্চিমবাংলায় সরকারি অফিসার ছিলেন। ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) সকাল দশটা-সাড়ে দশটার মধ্যে আমরা ঢাকায় বসে জানতে পারলাম বাংলাদেশের জন্মদাতা শেখ মুজিবর রহমান ওইদিন বিকেলের মধ্যে ঢাকায় পৌঁছবেন, তবে তাঁর আগে তিনি কিছুক্ষণের জন্য দিল্লিতে বিমান থেকে নামবেন। দিল্লিতে ভারত সরকার পালাম বিমানবন্দরে স্বল্পক্ষণের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি বিশেষ বিমানে

দিল্লি হয়ে শেখসাহেবকে ঢাকা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিলেন। দুপুরের কিছুক্ষণ পরে (১১ জানুয়ারি) শেখসাহেবকে নিয়ে ওই বিমানটি দিল্লিতে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল। সেখানে পালাম বিমানবন্দরের বাইরে কয়েক হাজার বাঙালি শেখসাহেবের উদ্দেশে শ্লোগান দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী খুব সংক্ষিপ্তভাবে স্বল্পভাষণে শেখসাহেবকে সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানালেন। শেখ মুজিবর রহমান তাঁর জবাব দিয়েছিলেন বাংলায়। আমরা ঢাকায় বসে প্রতি মুহূর্তে শেখসাহেবের সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে পারছি। ভারত সরকার শেখসাহেবের জন্য বেদমারোয়া নামের যে অফিসারকে নির্দিষ্ট করেছিলেন তিনি ইন্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসের পশ্চিমবাংলা ক্যাডারের অফিসার। তিনি বস্তুতপক্ষে শেখ মুজিবর রহমানের চিফ-সিকিউরিটি অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। শেখসাহেবের বিমান দিল্লি থেকে ঢাকার পথে পাড়ি দেওয়া আরম্ভ করল। বেদমারোয়া শেখসাহেবের ঠিক পিছনের সিটে বসেছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন শেখসাহেব আবৃত্তির সুরে গান গাইছেন...'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি..সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা...ভায়ের মায়ের এত স্নেহ...।' পরমুহূর্তে শেখসাহেব আবার গুনগুন করে আবৃত্তি করছেন 'আ মরি বাংলা ভাষা...কী যাদু বাংলা গানে...গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে...গান গেয়ে ধান কাটে চাষা...আ মরি বাংলা ভাষা।' বেদমারোয়া আর বসে থাকতে পারলেন না, তিনি শেখসাহেবের সিটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। গোয়েন্দা অফিসাররা যেভাবে রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানান সেভাবে তিনি শেখসাহেবকে অভিবাদন জানিয়ে বাংলায় বললেন, 'স্যার আমি বাংলা জানি, স্যার আমি চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ডহারবারে সাব-ডিভিশানাল পুলিশ অফিসার ছিলাম। আমি বাংলা পড়তে পারি, বলতে পারি।' শেখসাহেব উৎফুল্ল হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন, 'আরে এতক্ষণ সেই কথা বলেন নাই কেন!' শেখ মুজিবর রহমান বেদমারোয়াকে হাত ধরে তাঁর পাশের সিটে বসিয়ে নিলেন। এই সময় বিমানের পাইলট শেখসাহেবের কাছে এসে জানালেন যে এই বিমান বাংলাদেশের আকাশসীমায় পৌঁছেছে। শেখসাহেবের চোখ সজল হয়ে উঠল। তিনি জানলার কাচ দিয়ে বাংলাদেশের শ্যামল প্রান্তর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। পাইলট যখন জানালেন যে বিমানটি ঢাকা বিমানবন্দরের ওপর এসে পড়েছে তখন শেখসাহেব উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন। ভারতীয় অফিসার বেদমারোয়া শেখসাহেবকে বসিয়ে দিয়ে তাঁর সিট বেল্ট বেঁধে দিলেন। যতদূর মনে পড়ে বেলা তখন প্রায় সাড়ে তিনটা হবে, শেখসাহেব বিমানের গ্যাংওয়েতে দাঁড়ালেন। যতদূর চোখ যায় কেবল মানুষের মাথা। রমনা রেসকোর্সে শেখসাহেব বাংলাদেশের মাটিতে তাঁর প্রথম ভাষণ দিলেন, যেটি আমার মনে হয়েছে একটি অসাধারণ বক্তৃতা। তিনি যতক্ষণ বক্তৃতা করছিলেন ততক্ষণ ওই ভারতীয় অফিসার বেদমারোয়া পাথরের মূর্তির মতো শেখসাহেবের পিছনে দাঁড়িয়ে। শেখসাহেবের জন্য একটি নিরাপত্তাবলয় অবশ্যই ছিল। কিন্তু তারা, সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছে, সকলেই ভারতীয় অফিসার ছিলেন। শেখসাহেবের বক্তৃতাকে আমার অসাধারণ মনে হয়েছে এই কারণে যে তিনি কোনও প্রতিহিংসার কথা বলেননি, কোনও প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলেননি, কারও বিরুদ্ধে কোনও বিদ্বেষপ্রসূত উক্তি করেননি। কোনও ঘৃণা দেখাননি—তিনি আবেগের সঙ্গে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কেবল এই একটি কথাই বলেছিলেন, 'আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও, আমাদের ভাল থাকতে দাও, তোমরা পাকিস্তানে ভাল থাকো, সুখে থাকো...' ১২ জানুয়ারি (১৯৭২) সারা উপমহাদেশের ঢাকা, কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ সব সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিল এটাই—'শেখ মুজিবর রহমান এখন বাংলাদেশে।' কিন্তু ১১ জানুয়ারি দিনটি ছিল ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাময় মুহূর্ত। ওই সন্ধ্যায় আমি বেদমারোয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কারণ তিনি যখন ডায়মন্ডহারবারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরিতে ছিলেন—১৯৫৭-১৯৬০ সালে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন নীতিশ সেনগুপ্ত ডায়মন্ডহারবারের এস-ডি-ও ছিলেন এবং এই নীতিশবাবুই আমাকে বেদমারোয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই অফিসারের কাছ থেকে আমি শেখসাহেবের লন্ডন থেকে ঢাকা বিমানযাত্রার কিছু ঐতিহাসিক মুহূর্তের খবর নিয়েছি, যেগুলো আমি ওই সময়ই লিখেছি।

বলাবাহুল্য যে সেই সময় অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের (১৯৭২) ঢাকার কাগজগুলিতে শেখসাহেব ছাড়া বলতে গেলে আর কোনও খবরই জায়গা পেত না। যথারীতি শেখসাহেব প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। এর আগে, ঠিক তারিখটা আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না তবে নির্দিষ্ট তারিখটিরও কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে তা জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের একেবারে শেষদিকে হবে। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলেন আবু সঈদ চৌধুরী। সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে অর্থাৎ ২৬ মার্চ (১৯৭১) ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে আবু সঈদ চৌধুরী

জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করেছিলেন, ঠিক তার পরের দিনই তিনি বিচারপতির পদে ইস্তাফা দিয়ে লন্ডনে চলে যান এবং সেখানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপকের চাকরি গ্রহণ করেন। শেখসাহেব ঢাকায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই তেজস্বী বিচারপতিকেই দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিচারপতি আবু সঈদ চৌধুরী খুব সুললিত বাংলায় বক্তৃতা করেন। তাঁর বাংলা গদ্য লেখার হাত যেকোনও পেশাগত বাংলা লেখকের ঈর্ষার বস্তু। আমি যথাসময়ে আমার এই রচনার মধ্যে আবু সঈদ চৌধুরীর বাংলা লেখার একটি প্রমাণ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেব।

শেখসাহেব ঢাকা ফিরে আসার বেশ কয়েকদিন আগেই বিখ্যাত কমিউনিস্ট ইন্টেলেকচুয়াল নিখিল চক্রবর্তী ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিল্লির 'অজয় ভবন'-এর একজন বড় কর্মকর্তা প্রভাত দাশগুপ্ত। প্রভাত দাশগুপ্ত পরবর্তীকালে 'কালান্তর' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। প্রভাতবাবুকে আমি আগে থেকে অল্প চিনতাম। একদিন সকালের দিকে ঢাকা সদরঘাটে বুড়িগঙ্গার পারে গিয়েছিলাম। পারে দাঁড়িয়ে আমি একটি স্টিমার দেখছিলাম। ঢাকার বুড়িগঙ্গার এই ঘাটটিকে বলা হয় বাদামতলির ঘাট। এটি হল দেশভাগের আগে থেকে ঢাকার স্টিমার ঘাট, এখানে সব স্টিমার এসে ভিড়ত, আমি যেই স্টিমারটিকে দেখছিলাম সেই স্টিমারটির নাম 'FLAMINGO'। এই স্টিমারটি প্রধানত বরিশাল-খুলনা এবং খুলনা-মাদারিপুর রুটে চলাচল করত। আমার শৈশব ও কৈশোর বয়স পর্যন্ত এই স্টিমারে আমি অসংখ্যবার উঠেছি। স্টিমারটি বুড়িগঙ্গায় মাঝনদীতে নোঙর করা ছিল। আমি এতক্ষণ তন্ময় হয়ে স্টিমারটির দিকে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম প্রভাত দাশগুপ্ত মশাই পলকহীন চোখে ওই স্টিমারটির দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি ধীরে ধীরে প্রভাতবাবুর কাছে গিয়ে 'প্রভাতদা' বলে সম্বোধন করে আমার পরিচয় দিলাম। তিনি চমকে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আমি তোমাকে চিনি। তুমি এখানে কোথায় এসেছিলে?' আমি হেসে বললাম, 'আপনি যা দেখছিলেন, আমিও তাই দেখছিলাম। অর্থাৎ আমরা দু'জনেই এই স্টিমার FLAMINGOকে দেখছিলাম।'

প্রভাত দাশগুপ্তর গায়ের রঙ একটু ময়লা কিন্তু অত্যন্ত সুপুরুষ। তিনি বরিশাল শহরের লোক। তিনি আবেগের সঙ্গে আমায় বললেন, 'জানো বরিশাল থেকে খুলনা এই স্টিমারে করে কতবার এসেছি তার গোনাগুনতি নেই।' আমি তখন প্রভাতদাকে বললাম, 'চলুন না স্টিমারটায় একটু উঠে আসি।' প্রভাতদা জানতে চাইলেন 'কী করে?' আমি তাঁকে বললাম, 'কেন একটা নৌকো ভাড়া করে স্টিমারের গায়ে লাগিয়ে তারপরে স্টিমারে উঠে সারেঙের অনুমতি নিয়ে একটু স্টিমারটাকে ঘুরে দেখা যেতে পারে।' পূর্ববাংলায় যাঁরা স্টিমারে ওঠানামা করেছেন তাঁরা বোধহয় জানেন যে নৌকো থেকে স্টিমারে উঠতে গেলে নৌকোটিকে স্টিমারের পিছনের দিকে নিয়ে আসতে হয়। কারণ স্টিমারের পিছনের দিকটা নিচু থাকে। নৌকোর গলুইতে পা দিয়ে স্টিমারের ডেকে ওঠা অনেকটা সহজ। প্রভাতদা আমার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন। আমরা দু'জনে একটা নৌকো ভাড়া করে FLAMINGO স্টিমারে গিয়ে উঠলাম। কয়েকজন খালাসিকে নমস্কার করে আমরা সারেঙের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। তারা সারেঙের কেবিনে আমাদের নিয়ে গেল। সারেঙ আমাদের অনুরোধ শুনে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন। আমরা সিঁড়ি বেয়ে স্টিমারের দোতলায় উঠলাম। ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে খানিকক্ষণ ঘুরলাম তারপর থার্ড ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, কেবিন দেখে অনেক পুরনো স্মৃতি গায়ে মেখে দোতলা থেকে আবার নীচে নেমে এলাম। সারেঙ তখন আমাদের পরিচয় জেনে আমাদের চা খাওয়ালেন। দু'জনে ফিরে এলাম স্মৃতিভারে।

ফেরার পথে প্রভাত দাশগুপ্ত আমাকে এক ভদ্রলোকের নাম ও টেলিফোন নাম্বার দিয়ে বললেন, 'এই ভদ্রলোককে তোমার কথা আমি বলেছি কিন্তু তোমার হোটেলের ফোন নাম্বার আমি জানি না বলে তাকে জানাতে পারিনি। তুমি এই ভদ্রলোককে ফোন করবে, একে তোমার খুব কাজে লাগবে।' পরের দিনই আমি ভদ্রলোককে ফোন করলাম। নাম সানাউল হক।

ক্রমশ

চলচ্চিত্র উৎসব

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

একটা কার্ড পেয়েছিলাম। সাতখানা
বিদেশি ছবি দেখলাম। খুব শব্দ। আর
যে-কোনও ছুতোয়—গাড়িতে, সোফায়, বাথরুমে,
শোবার ঘরে, নগ্ন নারীপুরুষের সঙ্গম।
এক সময় ওই সব দৃশ্য টানত। এবার ভাল লাগল না।
বুড়ো হয়েছি বলে হয়ত।

হল-এ বয়স্ক লোক বেশি। তরুণ তরুণীরা
উঠে চলে যাচ্ছে। অধৈর্য। নিরাবেগ, বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গতা
আর মৃত্যু ভয়ের গল্প ওদের
ভাল লাগছে না বোধ হয়।

আমি ভাবি, বর্তমান প্রজন্ম কী চায়?
হিন্দি সিরিয়ালে এ-সব নেই। সেখানে
একটাই সমস্যা—শাদি
হোগি কি নহি। শাদি হয়ে গেলেই
সব শেষ। সেই পচা প্লট।
বিদেশি ছবিতে শাদির ব্যাপারই নেই।
শুধুই মারামারি আর কোট-প্যান্ট খোলা।
ভায়োলেন্স আর গা-দেখানো। এদেশে বাংলা ছবিতে
ছেলেমেয়ের মেলামেশা বেড়ে যাওয়ায় ঢলাঢলি
আর কাঁধে হাত রাখা অবধি চলছে।
কথায় কথায় নায়িকার চোখে জল।

আমি ভাবি, এর শেষ কোথায়। কেউ
আঙুল ডুবিয়ে জীবন দেখবে না?

সেবাধর্ম

রেজাউদ্দিন স্টালিন

সেবাধর্ম উঠে গেছে মানুষ নিয়েছে নানা সংঘের শরণ
ক্ষুধা ও দৈন্যের দেশে সেবা পায় সুদখোর প্রভুর চরণ
বোধের উদ্যোগ নেই সমিতি বিভূতি আর বিদেশি বাহানা
কত পথে অর্থ আসে দৃশ্যে শুধু বস্তিবাসী কুমিরের ছানা

নদীবর্তী মানুষের আতঙ্ক ভাঙন নয় সেবকের ঋণ
ক্ষুধা ও খাদ্যের দ্বন্দ্বে দাতাদের নীতিমালা কুয়াশা কঠিন
করুণার লেশমাত্র নেই কারও ধর্মের অধিক তারা সাধু
প্রান্তিকের রক্তে রান্না বাংলার ব্যাঞ্জন সে তো বড়ই সুস্বাদু
খেয়েছে ইংরেজ আর্য পর্তুগিজ জলদস্যু ফরাসি বণিক
এখনও ভোলেনি তারা সেই স্বাদ লেহনের ইচ্ছে অনধিক

কেউ আসে খনিজের খোঁজে কেউ ঘন সবুজ গ্যাসের
চোখের জলের খনি কারও কারও উপজীব্য উপন্যাসের
স্বর্গের সড়ক খোঁজে কোনও কোনও মুনিঋষি মূষিক দেবতা
মানবশক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই বুঝে বলেন—নেবো তা'

প্রযুক্তির কলিযুগে অগণিত ইতিহাস অলিখিত থাকে
সরল হৃদয় যাকে মিত্র ভাবে সেও খায় সবুজ বাংলাকে
মুগ্ধ কোনও দৃশ্য নেই মাঝে মাঝে ঈসা খাঁর অশ্বের হ্রেষা
আর আর্তের সেবায় ঘরে ঘরে জেগে আছে মাদার তেরেসা

সাষ্টাঙ্গে

সুব্রত রুদ্র

ছয় ঋতু ভাগ হয়ে ভোরবেলাকে ডেকে তুলে প্রণাম করছে
এই আশ্চর্যকে আমি দু'নয়নে বার বার দেখতে পেলাম
আমার চেয়ে সুখী কে এ জগতে!
চাঁদকে যখন মাঝআকাশে দেখি
আমার ছায়া ছোট্ট হয়ে ধুলোয় পড়ে থাকে
বড়কে দেখে মাথা নুইয়ে ফেলা কোনওদিন
আমাদের ছেড়ে যাবে না
মাঝে মাঝে খুশিতে সমস্ত শরীর দিয়ে সাষ্টাঙ্গে চক্‌মকি ঠুকেছি
কেন রে মন ভারী হয়ে পিছন পানে ছুটিস?
এখনও গাছের পাতা নড়ে
সেই দূর্বাঘাস কম হলেও তো আছে পাখি আছে
পুকুরের পাশে এক আধটা ফড়িং

যতটুকু যা দেখি আমি ভাল সেগুনতলায়
খারাপ তার একটুও তো ভাল।

লাইন

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

তেকোনা চৌকোনা মাথা কেরোসিন ডিবা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি আ-সকাল
দারিদ্রসীমার নীচে দাঁড়িয়েছি স্লিপ হাতে চিনি তেল গম সরু চাল
সপ্তম স্বর্গের থেকে নেমে এল কাগজের প্রথম পাতার বকোয়াস
লোকাল কমিটি নেতা চটিপরা অবতার, বলেছিল, 'চাষ! চাষ! চাষ!
এখন চাষের দিন কারা বলে? শিল্প হবে মানুষের দুর্গতিনাশিনী
যে বলে ফসল শালা যারা বলে বিরোধিতা তাদেরকে বিলক্ষণ চিনি'
চেনার দুর্ভিক্ষে কালো হয়ে যায় হরিয়ালি মানুষেরা পাথরপ্রতিমা—

সত্য? সে তো নিচুমুখ সরকারি টিউকল, তৃষ্ণায় বাঁধানো পরিসীমা।

ভগ্নদূত

অজিত বাইরী

অন্ধকারে জ্বলছে নিভছে
শ্বাপদের চোখের মতো
বিড়ির আগুন।

জানলার গরাদে
বিপর্যস্ত মুখ
মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপের মতো।

কর্মহীন, দুর্ভাবনা-পীড়িত
আধুনিক চিত্রকলার মতো
ঘাড় থেকে
ঝুলে পড়েছে মাথা।

অন্ধকারে জ্বলছে নিভছে
নিভছে জ্বলছে
ক্ষয়পোকার মতো
বিড়ির আগুন।

নিরুদ্দেশের ওপর

গোলাম রসুল

সেই রাত আমাকে গ্রহণ করল
আমি তখন রবারের মতো গলে যাচ্ছি পাহাড়ের ভেতর
ওই চূড়োয় স্পন্দিত হচ্ছে আমার হৃদয়
মৃদু মৃদু

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ
স্তব্ধ বালিশ
মাদুরের স্তূপ
সেই গভীর রাত আমাকে গ্রহণ করল

নীল সাগর আধোডোবা
পাতার ধূসর ঘর ডুবে যাচ্ছে বালির ভেতর
রাত যেভাবে আমাকে গ্রহণ করেছে
তার মতো

আর রাস্তা ক্ষমা করতে করতে চলে যাচ্ছে আমাকে ছেড়ে
এই নিরুদ্দেশের ওপর চাঁদের আলো পড়েছে
আমার পায়ের কাছে

বাঁচা

অংশুমান কর

অসুস্থ রুগির সেবা করতে আসে তোতোন। স্পিরিটে গজ ভিজিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করে। বিটাডাইন দেয়। সমান করে কেটে লাগিয়ে দেয় লিউকোপ্লাস্ট। তার কাঁচি ও চিমটার টুংটাং শব্দে প্রস্তরযুগের পাথরের শব্দ পাওয়া যায়। তার হাঁটা, চলা, কথা বলায় লেগে থাকে শুশ্রূষার মিষ্টি গন্ধ। ঘরময় সে গন্ধ ঘুরে বেড়ায়—মনে হয় প্রাচীন পৃথিবীর লতাপাতার স্নেহচ্ছায়া মানুষের মাথার ওপর জেগে আছে। ক্ষত সেরে গেলে ফিরে আসে স্বাস্থ্য। চলে যায় তোতোন। নিয়ে যায় শুশ্রূষার মিষ্টি গন্ধ, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে, অন্য কোনও অসুস্থ মানুষের ঘরে।

বাসনাসংগীত

যশোধরা রায়চৌধুরী

অংশুক, শুকায়, আর্য! আমি আজ স্বতোৎসার ধারা।
আমি আজ মন খারাপ। সুতরাং রসশ্রান্তিহীন।
মাঝে মাঝে শুষ্কপথ, মাঝে মাঝে ভেজা নালীপথ
তবু এই সময়েও আমাদের চোখে জাগে এক রাত্রি তারা

ওই তারা ধ্রুব, তার আলো আসে প্রস্তর পেরিয়ে
শিলাপট্ট ফেটে যায়, উঠে আসে শ্রাবণ, প্রাচীন
আমি আজ শব্দে বাঁচি। শুদ্ধসত্ত্ব। বাকি যা, হারিয়ে
ফেলেছি বাচ্যের তৃষ্ণা। কেটে যায় বাস্তবের মোহ।

অংশুক শুকাল, আর্য! তুমি ডেকো আমাকে, প্রখর।
মন খারাপ মাঝে মাঝে পাই বলে বেঁচে আছে স্রোতও
নতুবা কী হত বলো, চেরাপুঞ্জি, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে
ছেয়ে গেলে তবু কত বৃষ্টিহীন, মরুভূমি, ভেজা।

এ মরুতে ঘাস জন্মে। বয়ে যায় আশ্চর্য মরুৎ।
এই জমিতে ফল নেই, ফসলের হাহাকার চলে।
এ মরুতে গাছ নেই। শুধু সূক্ষ্ম বস্ত্রপ্রয়োজনে
মৃত গাছে ঝুলে থাকে আঁশগুলি নিহত কীটের।

অংশুক শুকায়, আর্য, কীটদষ্ট ফলের উপরে
মাকড়শার সেই জাল ধরে নেব, বৃষ্টিফোঁটাসহ
সেই জাল মহামূল্য মণিমুক্তাখচিত সন্দেহে
এ অঙ্গে ধারণ করব। অসামান্য তবে শিল্প হবে।

মরিচঝাঁপি : ইতিহাসের মুদ্রণপ্রমাদ

অশ্রুকুমার সিকদার

'মরিচঝাঁপি : ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস' নিয়ে মধুময় পাল যখন কাজ শুরু করেন তখন থেকেই খুব উৎসাহ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলি। সাক্ষাতে-টেলিফোনে এই বিষয়ে কথা হতেই থাকে। এই কথা চালাচালির দিনগুলিতে একদিন আমি মধুময়কে বলি, 'মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের উৎখাত করা বামফ্রন্ট সরকারের আদিপাপ।' কথাটা নিশ্চয়ই মধুময়ের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, নইলে এই সংকলনের ভূমিকাস্বরূপ 'সত্যরে লও সহজে' প্রবন্ধে তিনি লিখবেন কেন 'মরিচঝাঁপি বাংলার বাম জমানার আদিপাপ।'

এই পাপ ছিল চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার পাপ। ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে জ্যোতি বসুরা, সমর মুখোপাধ্যায়েরা পূর্ববাংলা থেকে চলে-আসা শরণার্থীদের হয়ে বারবার, কখনও জওহরলাল নেহরুকে, কখনও রাজ্যস্তরে প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে জানিয়ে এসেছেন, এই উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে যেতে চায় না। বড়জোর শতকরা পাঁচ ভাগ পরিবার যেতে ইচ্ছুক। যারা যেতে চায় যাক, অন্য সবাইকে পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসিত করা হোক। বাম দলগুলির নেতারা, বাম-প্রভাবিত উদ্বাস্তু সংগঠনের নেতৃত্ব যেমন আন্দামানে, তেমনই দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি কুড়ি বছর ধরে বলে এসেছে পশ্চিমবঙ্গেই সব পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সম্ভব। মরিচঝাঁপি উৎখাত কাণ্ডের অন্যতম চরিত্র চব্বিশ পরগণা জেলার তৎকালীন এস পি অমিয়কুমার সামন্ত এই সংকলনের অন্তর্গত প্রবন্ধে লিখেছেন, সুন্দরবনে ও অন্যত্র যে 'অনাবাদি কৃষিজমি আছে সেখানে সবাইকে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। একথা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত বিরোধী দলই পঞ্চাশের দশক থেকে বলে এসেছে।' নানা জায়গায় বক্তৃতায় তাঁরা সরকারের বাইরে থাকার সময় বলেছেন, ক্ষমতায় এলে তাঁরা শরণার্থীদের পশ্চিমবাংলায় ফিরিয়ে আনবেন। উদ্বাস্তুরা স্বভাবতই বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে থাকতে চেয়েছিল, আর বাম নেতৃত্ব চেয়েছিলেন এরা বাংলায় থেকে গিয়ে নির্বাচনে-নির্বাচনে কমিউনিস্ট দলের, বাম দলগুলির ঝুলি ভরে দিক। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিতদের মনে আশা জাগে। ১৯৭৭ সালে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ ও জ্যোতিবাবুর ঘনিষ্ঠ মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি দণ্ডকারণ্য পরিদর্শন করে এসে প্রমোদ দাশগুপ্তকে রিপোর্ট দেন। দণ্ডকারণ্যে শিবির ছেড়ে চলে আসায় নানাভাবে উৎসাহ দেন সমর মুখোপাধ্যায়, হরিদাস মিত্র, কিরণময় নন্দ ইত্যাদি। ১৯৭৮-এর গোড়ায় মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি নানা শিবিরে গিয়ে বলে আসেন এই উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবাংলাতেই পুনর্বাসন হতে পারে। এই কথা বলবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর মন্ত্রীসভার এই সদস্যকে যে তিরস্কার করেছিলেন, বা তাঁর কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন তার প্রমাণ নেই। উদ্বাস্তুরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে দণ্ডকারণ্যের শিবিরগুলি ছেড়ে বন্যার স্রোতের মতো চলে এসে সুন্দরবনের এক অখ্যাত ছোট্ট জনহীন দ্বীপে যখন বসতি স্থাপন করল, তখন বাম সরকার ১৯৭৮-এর জুলাই থেকে ১৯৭৯-এর মে মাসের মধ্যবর্তী সময়ে ধাপে-ধাপে অবর্ণনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের উৎখাত করল। পান্নালাল দাশগুপ্তের ভাষায়, 'বাঙালি সরকার, বাঙালি জনসাধারণ কত হৃদয়হীন হতে পারে, কত দাম্ভিক হতে পারে, কত স্বার্থপর হতে পারে— তার অবিস্মরণীয় পরিচয় পেয়ে গেলেন দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুরা।' মরিচঝাঁপি থেকে গেল এক চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস হয়ে।

নন্দীগ্রামের ঘটনায় ত্রিশ বছরের বেশি সময়ের বামফ্রন্টের মসনদ টলমল করে উঠেছে, কিন্তু মরিচঝাঁপিতে বিশ্বাসঘাতকতার আদিপাপের দরুন বামফ্রন্টের গায়ে সেদিন আঁচড় লাগেনি কেন? বাঙালি সরকারের কথা আলাদা, বাঙালি জনসাধারণের বিরুদ্ধে হৃদয়হীনতার অভিযোগ একটু যাচাই করা দরকার। দীর্ঘদিনের কংগ্রেসি অপশাসনের পর, সত্তরের দশকে নকশালপন্থী ও অন্যান্য বামপন্থীদের ওপর নির্যাতনের পর, জরুরি অবস্থায় কণ্ঠরোধের পর, বিপুল জনসমর্থনে জিতে আসা বামফ্রন্ট সরকারকে বাংলার মানুষের মনে হয়েছিল উজ্জ্বল উদ্ধার। যে সরকারকে চোখের মণির মতো রক্ষার দায়িত্ব মনে-মনে তুলে নিয়েছিল

পশ্চিমবাংলার মানুষ, তাদের পক্ষে সেদিন ভাবাও অন্যায় ছিল বামপন্থী রাজ্য সরকার কোনও অন্যায় করতে পারে। সত্যিই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা জনগণমনে স্বপ্নের ঘোর জাগিয়েছিল। তাই বেসরকারি সমাজ দ্বিধায় পড়েছিল, বিভ্রান্ত হয়েছিল। একদিকে উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁদের গভীর সহানুভূতি ছিল, অন্যদিকে বামফ্রন্ট সরকারের কোনও ক্ষতি হোক তা তাঁরা চাইছিলেন না। এমন এক দোলাচলের পরিস্থিতিতে প্রচারিত প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে সমর সেন, বিনয় ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বাদল সরকার, শঙ্খ ঘোষের মতো মূলত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা একদিকে বলেছেন, 'কিছু সংখ্যক অশুভ রাজনৈতিক শক্তি উদ্বাস্তু জনসাধারণের দুঃখে মায়াকান্না কাঁদছে', অন্যদিকে পুলিশি নির্যাতনের খবরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন এবং 'বলপ্রয়োগের পথ পরিহার'-এর আবেদন জানিয়েছেন।

দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুদের শিবির ছেড়ে প্লাবনের মতো চলে আসা, মরিচঝাঁপিতে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলা, সরকারপক্ষ তাদের বহিষ্কার করতে চাইলে তাতে বাধা দেওয়া, এই সমস্ত ব্যাপারটিকে বামফ্রন্টের চালিকাশক্তি সি পি আই (এম) দল মূলত চক্রান্ত বলে ক্রমাগত প্রচার করেছিল। জ্যোতি বসু ১৯৭৮ সালের ১১ এপ্রিলের বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'কুচক্রীরা আপনাদের সরলতার সুযোগ' নিচ্ছে। পশ্চিমবাংলার বেসরকারিসমাজ, যাঁরা অব্যবহিত পূর্বের কংগ্রেসি শাসনের কদর্যতার সাক্ষী ছিলেন, তাঁদের কাছে এই চক্রান্তের প্রচার অনেকটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। 'অনেকে বলেছেন, উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে তোলা মানেই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে অসুবিধেয় ফেলার চেষ্টা করা।' রুশ বিপ্লবের পর নবজাগ্রত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটানোর জন্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রের কথা শিক্ষিত সমাজের অগ্রসর অংশ ভুলে যায়নি। কেরালায় নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট সরকারকে চক্রান্ত করে হঠানোর অনতি-অতীত-স্মৃতিও জাগরুক ছিল। তাছাড়া ১৯৬৭ সালে রাজ্যপাল ধর্মবীর প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেছিলেন আর দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছিল ১৯৭০ সালে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করায়। এইসব স্মৃতির ক্ষত তো দগদগ করছিলই। ফলে বহুজনেরই মনে হচ্ছিল মরিচঝাঁপি ব্যাপারটাও হয়ত বামফ্রন্ট উচ্ছেদের একটা নতুন চক্রান্ত। প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র সম্প্রতি লিখেছেন কিছু বুদ্ধিজীবী নাকি দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি নিয়ে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য বাম সরকারকে কাত করা। 'সেই সরকার কাত হলে নিশ্চিন্ত মনে মার্কিন কনস্যুলেটে খানাপিনায় মগ্ন হওয়া যাবে।' কিন্তু আদতে যে তেমন চক্রান্ত ছিল না সেটা আমরা পরে দেখাতে পারব।

একদিকে এক মোহাচ্ছন্নতা আবিষ্ট করে রেখেছিল আমাদের, ছিল চক্রান্তের সম্ভাবনা নিয়ে দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে সংবাদমাধ্যম ছিল অনুপস্থিত বা অবরুদ্ধ। নন্দীগ্রামের সময় যেন চোখের সামনে দেখেছি পুলিশের গুলি খেয়ে মানুষ পড়ে গেল, জঙ্গলমহলে দেখছি পুলিশ ও মাওবাদীদের গুলির লড়াই, কিন্তু মরিচঝাঁপির দিনগুলিতে ছিল না বৈদ্যুতিন মাধ্যম। এমনকী সরকারি দূরদর্শনও সেদিন ছিল না। বেসরকারি চ্যানেলগুলির দর্শকটানার মারমুখি লড়াই সেদিন ছিল না, যার ফলে টিভি সাংবাদিকরা বাধাবিঘ্নভয় উপেক্ষা করে ময়দানে নেমে পড়েননি। আমরা তাই পুলিশের গুলিচালনা দেখতে পাইনি, নৌযুদ্ধে লঞ্চ দিয়ে নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া দেখিনি, খাদ্যপানীয় নেওয়ায় বাধার দৃশ্য দেখিনি, চালাঘরগুলিতে আগুন দেওয়া দেখিনি—ফলে, ঘরে-ঘরে ঢুকে যায়নি সরকারি অত্যাচারের সেইসব মর্মান্তিক দৃশ্য, উদ্বেলিত করেনি মানুষকে। মুদ্রণ-মাধ্যমকেও অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। 'যুগান্তর' পত্রিকায় পান্নালাল দাশগুপ্তের এক কিস্তি বিবরণ প্রকাশের পর পত্রিকার মালিকপক্ষকে ডেকে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত ধমক দিয়ে শাসান যে পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে পরবর্তী কিস্তিগুলি প্রকাশিত হয় না। সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, নিরঞ্জন হালদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দত্ত নানাভাবে বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মরিচঝাঁপিতে বা নিকটবর্তী এলাকায় ঢুকতে পেরেছিলেন। তাঁদের কিছু লেখা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ঘটনার গুরুত্বের অনুপাতে সে সামান্যই। এই নিয়ে কণ্ঠরোধের চেষ্টা যে এখনও অব্যাহত তার একটা প্রমাণ আছে মধুময় পাল সম্পাদিত এই সংকলনে। জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের 'মরিচঝাঁপি : নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে' বইয়ের ঝিনুক চক্রবর্তীর লেখার আলোচনা ছাপা হয়েছিল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'পুস্তক মেলা'-র ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যায়, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৯ বঙ্গাব্দে। ক্ষমতাশালী মহলের চাপে, যেহেতু কলকাতা পুস্তকমেলা করতে সরকারি দাক্ষিণ্য লাগে, তাই চাপের কাছে নতজানু হয়ে কয়েক কপি বিতরণের পর সেই রিভিয়্যুটি পত্রিকা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। বিরোধী দলগুলি যাতে জনমত গঠনের সুযোগ না নিতে পারে তার বন্দোবস্ত করা হয়। বিধানসভার বিরোধী নেতা কাশীকান্ত মৈত্রের মরিচঝাঁপি প্রবেশের চেষ্টায় বাধা দেওয়া হয়। রাজ্যের জনতা পার্টি যতই তড়পাক

কেন্দ্রের ক্ষমতাশীল জনতা পার্টি চুপ করে থাকে যেহেতু কমলা বসুর ভাষায় 'পার্লামেন্টে তখন সি পি এমের দলের ২২ জন সদস্য, তাদের ভোটটা তো হাতছাড়া করা যায় না। তাতে কয়েক হাজার বঙ্গসন্তান মরলে আর কী করা যাবে।' জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে পাঠানো কাগজপত্র টেলিগ্রাম যাতে না পৌঁছায় তার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। মানবাধিকার আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা বিচারপতি তারকুন্ডেকে মরিচঝাঁপি আসা থেকে নিরস্ত করতে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি তাঁর কাছে চলে যান।

মরিচঝাঁপিতে অবস্থানরত মানুষের ওপর সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে না ওঠার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল দণ্ডকারণ্য থেকে চলে-আসা মরিচঝাঁপিতে উপনিবেশ-গড়া মানুষগুলির সামাজিক অবস্থান। এই কারণ আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম 'কালপ্রতিমা' পত্রিকা আয়োজিত সত্যপ্রিয় ঘোষ স্মারক বক্তৃতায়, ২২ মে ২০০৫ সালে। সেই বক্তৃতা পরে সংকলিত হয়েছে আমার 'ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য' বইতে। দেশভাগের সময় ও তারপরে পূর্ব পাকিস্তানে শোষিত আর অবজ্ঞাত নিম্নবর্ণের হিন্দু আর দরিদ্র মূলত কৃষিজীবী মুসলমানের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আগের ওয়াদা ভুলে মুসলিম লিগ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারই ফলে, ১৯৬১ সালে, ১৯৬৫ সালের পরে দলে-দলে নমশূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে আসে। এই নিম্নবর্ণের নিম্নবর্গের হিন্দুদেরই পাঠানো হয় গোড়ায় আন্দামানে, পরে দণ্ডকারণ্যে। কারণ, প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'এঁদের হয়ে উমেদারি করার মতো প্রভাবশালী মানুষ হয়তো ছিলেন না।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমি আন্দামানের রিফিউজি কলোনিগুলোও দেখেছি। দণ্ডকারণ্য-মালকানগিরির বহুজনের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে একজনও ঘোষ-বোস-মিত্তির-চ্যাটার্জী-ব্যানার্জী-গাঙ্গুলি নেই।' এরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষায় পাথর-চাপা কপাল 'ঘুঁটে কুড়ুনির ছানা' বলেই তাদের গোরুছাগলের মতো একবার তাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো যায় যেন নির্বাসনে, আবার তারা দণ্ডকারণ্য থেকে চলে এলে মরিচঝাঁপি থেকে তাদের খেদানো যায়। এদের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার দিনে বুদ্ধিজীবী ভালমানুষেরা মৌন পালন করেন, সংবাদপত্রগুলি দিনকয় সামান্য চেঁচামেচি করে চুপ করে যায়, মানবাধিকার আন্দোলন সাড়া দেয় না। কলকাতার সন্নিহিত উদ্বাস্তু কলোনিগুলির নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানত উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুরা। তাই তাঁদের আন্দোলন সাড়া ফেলেছিল। জবরদখল কলোনিগুলি পরে বৈধতা পায় যেহেতু সরকারি মহলের শাখাপ্রশাখার সঙ্গে এইসব উচ্চবর্ণের হিন্দু উদ্বাস্তুদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসা মরিচঝাঁপির নমশূদ্র ও অন্যান্য অন্ত্যজ মানুষদের সেই যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল না। 'জবরদখল কলোনিতে দীর্ঘদিন বাসের ফলে ও সরকারি আনুকূল্যে বিধিসম্মত স্বত্বস্বামিত্বে পরিণত হয়।' —এই কথা বলে শৈবালকুমার গুপ্ত প্রশ্ন তুলেছিলেন 'মরিচঝাঁপির বেলায় তার ব্যতিক্রম কেন ঘটবে?' ঘটবে, কারণ এই মানুষগুলি ছিল শতকরা একশোজন নিম্নবর্ণের। তাই তাদের উৎখাত হতে হয় নির্মমভাবে। এবং তাতে বাধা দেয় না রাজনীতি-সচেতন উচ্চবর্ণের বাঙালি বেসরকারি সমাজ। প্রান্তজন বলেই ওদের প্রতি উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে থাকে কলকাতার নাগরিক সমাজ।

কেন চলে এসেছিল দণ্ডকারণ্য থেকে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপির উদ্দেশে এই মানুষগুলি? বামফ্রন্ট সরকারকে কাত করবার ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসাবে এসেছিল তারা? দণ্ডকারণ্যে জীবনযাপন দুর্বিষহ হওয়ায় ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। তখন তো বামফ্রন্ট সরকার ছিল না। তখন তারা কার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল? কংগ্রেস আমলের শেষের দিকে যখন ১৯৭৫ সালে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সরকার দণ্ডকারণ্য আগত শরণার্থীদের পিটিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিল, তখন তো চক্রান্তের অভিযোগ ওঠেনি। বামপন্থীরাও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেনি। আসলে দণ্ডকারণ্যে বেঁচে থাকা অসহ হওয়ায় কখনও বিচ্ছিন্নভাবে, কখনও দলবদ্ধভাবে শরণার্থীরা চলে আসছিলই। ১৯৭৯ সালের ৭ই মে 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ' করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'স্বেচ্ছায় কেউ নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছাড়ে না। অপরের কুপরামর্শে শত শত মা তাঁদের শিশুদের হাত ধরে ঘর ছেড়ে অনিশ্চিতির উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় না।' কেন পা বাড়িয়েছিল তারা? দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃত্বের এক সময়ের অধিকর্তা শৈবালকুমার গুপ্ত তাঁর নানা লেখায়, এই মানুষগুলির জীবন কেন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তার কারণ বিবৃত করেছেন। এই ছিন্নমূলেরা ছিলেন প্রধানত নমশূদ্র, আর নমশূদ্ররা বাঙালিবাবু নয়, একেবারেই শ্রমবিমুখ নয়। দণ্ডকারণ্যের পাথুরে জমিতে জলের অভাবে এই শ্রমশীল মানুষেরা জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেনি। অভাব, অজন্মা, অনাহার ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। দণ্ডকারণ্য ঘুরে এসে পান্নালাল দাশগুপ্তের যে প্রতিবেদন ১৯৭৮ সালের ২৪ জুলাই তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল, তার থেকে জানা যায়

ওড়িশার নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলেন নদী, জল, নরম মাটির পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে প্রাকৃতিক কারণে বাস করতে পারবে না। জন্ম জন্ম কৃষক, মৎস্যজীবী মানুষগুলি পেটের দায়ে সস্তা জনমজুরি করেছে। মরিচঝাঁপির একজন শরণার্থী বলেছেন, তাঁরা কোনও ষড়যন্ত্র করেননি, ষড়যন্ত্র করেছে তাঁদের পেট। কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারে, পরিকল্পনার ত্রুটিতে, স্থানীয় রাজ্য সরকারগুলির প্রশাসনিক অসহযোগিতায় দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছিল। ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের বাধা ও বিরূপতা। বাংলা ভাষা ভুলে যাওয়া, বাঙালি সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা তারা মেনে নিতে পারেনি। মরিচঝাঁপি এসে তারা ভেবেছিল, 'এখন আর আমি রিফিউজি নই। আমার বাস্তুহারা দশা ঘুচিছে।' কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে 'মুসলমানরা একরকম কইরা খেদাইল আর এইখান থিকাও আর একরকম কইরা খেদাইল।' সরকারের হয়ে এই খেদানোর দায়িত্ব প্রধানত পালন করেছিলেন চব্বিশ পরগণার তৎকালীন এসপি অমিয়কুমার সামন্ত। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক যে একটি রচনা এই বইতে সংকলিত হয়েছে তার আলোচনা পরে করব। সেই রচনার শেষের দিকে একটি না-ভোলা দৃশ্য তিনি বর্ণনা করেছেন। এক দঙ্গল বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরী মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হওয়ার দিনেও 'one last time' কুরানখালি নদীর ঘোলা জলে জল ছিটিয়ে স্নান করছিল। এরা তো জলের দেশে জন্মায়নি, এদের জন্ম হয়েছিল দণ্ডকারণ্যের 'পাহাড়-পাথরের রুক্ষ দেশে'। তবে কেন কাদাজলে স্নান করে তাদের এত উচ্ছ্বাস, 'কোথায় কী একটা নাড়ির টান আছে?' এই প্রশ্ন নিজেকেই করেছেন এই পুলিশ অফিসার। নদী নৌকা নদীর সঙ্গে আসলে এই উদ্বাস্তু আবালবৃদ্ধের শুধু এই জন্মের নয়, জন্মজন্মান্তরের যোগ। তাদের ধমনীর রক্তধারার সঙ্গে, তাদের কৌম সত্তার সঙ্গে নদী আর জলের যোগ। তাই তারা জলহীন পাথরের রুক্ষ দেশে বাস করতে না পেরে জল আর দ্বীপে ভরা সুন্দরবনের উদ্দেশে ধাবিত হয়েছিল। তারা নিজের মতো করে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। সেই উপনিবেশ থেকে তাদের নির্মমভাবে খেদানো হয়েছিল।

চাকরির দায়ে অমিয়কুমার সামন্তকে মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তু-খেদানোর দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। এবার তাঁর কথাগুলি আমরা বিচার করতে পারি। প্রথমেই তিনি এই বিষয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডার গবেষক রস মল্লিকের The Journal of Asian Studies-এ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯-তে প্রকাশিত এবং বর্তমান সংকলনে পুনর্মুদ্রিত Refugee Resettlement in Forest Reserve প্রবন্ধের এবং তাঁর লেখা Development Policy of a Communist Government: West Bengal since 1977 গ্রন্থের তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মরিচঝাঁপির শরণার্থীরা দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে চাইলেও উদ্বাস্তুদের উন্নয়নশীল সমিতি ও সমিতির ভলান্টিয়ারদের বাধায় যেতে পারছিল না, এই খবর সরজমিনে না গিয়েই এসপি অন্য সূত্রে জেনেছিলেন। অন্য সূত্রে জানা তাঁর কথা নির্ভরযোগ্য হতে পারে, কিন্তু অন্য সূত্রে জানা রস মল্লিকের তথ্য নির্ভরযোগ্য নয়। সমিতি জমি বিলি করবার সময় বাংলাদেশিদেরও জমি দিয়েছে, এমন প্রমাণ নাকি গোয়েন্দাদের হাতে ছিল। সেই প্রমাণ অমিয়কুমার সামন্ত দাখিল করেননি। আসল সত্য নাকি একমাত্র জানেন মুখ্যসচিব, কমিশনার, জেলাশাসক। সরকারি স্তর পরম্পরায় পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যই একমাত্র সত্য। পুলিশের সত্যবাদিতার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম ১৯৯৩ সালের এক রাত্রিতে গ্রেপ্তার হয়ে লোপাট হয়ে যাওয়া ভিখারি পাসোয়ানের মামলায়। অমিয়কুমার সামন্ত আরও জানিয়েছেন, পুলিশ একবার মাত্র মরিচঝাঁপি কাণ্ডে গুলি চালিয়েছিল, যাতে কোনও উদ্বাস্তু নয়, দুজন আদিবাসী মহিলা মারা যান। পুলিশ গুলি অবশ্য চালিয়েছিল নিতান্ত বাধ্য হয়ে। কারণ উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী মরিচঝাঁপির অপর পারে কুমিরমারিতে প্রতিষ্ঠিত পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। আক্রমণের কারণ কী? মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তু আগন্তুকেরা চলে যেতে চাইছে, তাই হতাশ হয়ে সমিতির স্বেচ্ছাসেবীরা নাকি পুলিশকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত না হলে পুলিশ কখনওই গুলি চালায় না! তুহিন সামন্ত হত্যায় অভিযুক্ত ওসি-কে বাঁচাতে তৎপর সিআইডি জানায় পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছিল। ২০০৮ সালের জুন মাসে গুজরাট পুলিশ উনিশ বছরের তরুণী ইশরাত দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তবেই গুলি চালিয়ে তাকে হত্যা করে। পশ্চিমবাংলায় বারবার নকশালপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েই পুলিশ কাশীপুরে, বরানগরে, বেলেঘাটায় অনন্যোপায় হয়ে গুলি চালিয়ে খুন করেছে। খালিস্তানী আন্দোলনের সময় পাঞ্জাবে কে পি এস গিলের নেতৃত্বাধীন পুলিশ বারেবারে আক্রান্ত হয়ে গুলি চালিয়ে অগণিত খুন করেছিল। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সময়, মণিপুরে জঙ্গি আন্দোলনের সময় প্রত্যেকবার পুলিশ আক্রান্ত হয়ে বারবার দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রতিআক্রমণে বাধ্য হয়েছে।

১৯৭৮-এর মে মাসে উদ্বাস্তুদের ওপর প্রশাসন চাপ সৃষ্টি করতেই তারা অনেকে দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়, তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়নি। গুলি তো চলেইনি, এমনকী লাঠিও ব্যবহার করতে হয়নি। এই বাস্তুহারাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে

অভিযোগ অনেক। চলে-যেতে ইচ্ছুক পরিবারদের মরিচঝাঁপি-ত্যাগ আটকানো হয়েছে। মহকুমা শহরের তুল্য একটা জনপদকে এক বছর ধরে শাসন করেছে বাস্তুহারাদের সমিতি। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর সমান্তরাল সরকার চালানোর অভিযোগকে সমর্থন করেছেন বশংবদ এসপি। কিন্তু এখন যে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এক বছরের বেশি সময় ধরে, রাজস্ব না দিয়ে সমস্ত সরকারি সুবিধা ভোগ করে, দার্জিলিঙের পাহাড়ি অঞ্চলকে শাসন করছে, তার বেলা! তবে সমরাস্ত্র ধরতে অভ্যস্ত গোর্খাদের ক্ষেত্রে যা মেনে নেওয়া যায়, তা কি দরিদ্র ভিখারিপ্রায় নিম্নবর্ণের নমশূদ্র মানুষের ক্ষেত্রে মানা যায়? আগন্তুক বাড়ায়, মজুরি কমায় নিকটবর্তী অন্য দ্বীপের বাসিন্দাদের সঙ্গে তারা নাকি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু কুমিরমারি পঞ্চায়েতের বক্তব্য একেবারে উলটো। তাঁরা বরং মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উদ্বাস্তুরা উপনিবেশের মানুষদের জন্য চাল-চিনি-কেরোসিন সংগ্রহ করে নৌকা করে নিয়ে এলে, পরিমাণ দেখেই বলে দেওয়া হয়েছে, সেসব নাকি বাংলাদেশে চোরাচালানের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই মিথ্যা অছিলায় মানুষের ক্ষুধার খাদ্য আটক করা হয়েছিল।

১৯৭৯-এর ১৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রশাসনিক মিটিং ডেকে জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা ৩১ মার্চের মধ্যে উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপি ছেড়ে দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাক। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অতি অনুগত এই রাজ্য সরকার, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা-চাওয়া এই রাজ্য সরকার, কেন্দ্রের ইচ্ছাপূরণে নেমে পড়ল। সিদ্ধান্ত হল, পুলিশ সংঘর্ষ এড়িয়ে দ্বীপে নামবে; আগমন-নির্গমনের পথ বন্ধ করবে। জল ও খাবার বন্ধের সিদ্ধান্ত নাকি হয়নি। কিন্তু চোরাচালান বন্ধের অজুহাতে চাল-চিনি আটক করলে কি খাবার বন্ধ করে দেওয়া হয় না? তবে অমিয়কুমার সামন্ত মেনে নিয়েছেন, আংশিক অর্থনৈতিক অবরোধ করা হয়েছিল। প্রশাসনের ব্যবস্থায় যারা দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে উৎসুক ছিল, কিন্তু সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের বাধায় ফিরতে পারছিল না তারা আশ্চর্যভাবে স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর ক্ষিপ্ত না হয়ে, 'হতাশায় পুলিশ ও সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।' অমিয়কুমার সামন্তের বিবরণ অনুযায়ী আক্রান্ত পুলিশের গুলিতে মৃত্যু মাত্র দুইজনের, তবে তিনি মেনেছেন 'মরিচঝাঁপিতে ক্ষুধা ছিল, রোগ ছিল, অপঘাতে মৃত্যু ছিল।' অবরোধের দ্বারা এইসব মৃত্যু ঘটালে, ভারত সেবাশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবার কাজে বাধা দিয়ে, মাদার টেরিজাকে নিরস্ত করে যেসব মৃত্যু ঘটানো হয় তার দায় সরকার নেবে না? সত্যরঞ্জন বাপুলি বিধানসভায় জানতে চান 'পৃথিবীর কোথায় কবে ৩০,০০০ মানুষের অন্ন জল বন্ধ করার জন্য এক হাজার পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে?' ২৪ জানুয়ারি অবরোধ শুরু হওয়ার পর থেকে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা সতেরো, তার মধ্যে তেরোজন শিশু। কেউ-কেউ বলেছেন ওই এক সপ্তাহে 'কমপক্ষে ৩৭৫ জন অনাহারজনিত কারণে মারা যায়।' 'মরি তো বাংলার মাটিতে মরব' এই শ্লোগান দিয়ে যারা সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে বসবাস করতে এসেছিল তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া হল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'স্রেফ ক্ষুধার অস্ত্রে'। পুলিশ বিনা বাধায় দ্বীপে নামতে পেরেছিল, তারই ফলে পুলিশের 'আত্মতৃপ্তি'-র অন্যায় ঘটে। সব উদ্বাস্তু চলে গেল, পুলিশ খেয়াল করল না যে পরিত্যক্ত চালাঘরগুলির মধ্যে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির স্বেচ্ছাসেবী দুষ্কৃতীরা লুকিয়ে আছে। নিন্দা রটানোই যাদের কাজ তারা যেমন বলেছিল তেমন সি পি আই (এম) আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনী আগুন দেয়নি, পরিত্যক্ত চালাঘরগুলিতে আগুন দিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী নামের দুষ্কৃতীরা।

১৯৭৮ সালে ২৩ জুলাইয়ের আনন্দবাজারের রিপোর্ট অনুযায়ী পুলিশের গুলিতে আটজন উদ্বাস্তু নিহত হয়। অমিয়কুমার সামন্ত জানিয়েছেন পনেরো রাউন্ড গুলি চলেছে সেদিন ঠিকই, কিন্তু তিনি হতাহতের খবর জানেন না। রাইহরণ বাউড়ি সংসদীয় দলকে দেওয়া স্মারকলিপিতে জানান ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি পুলিশের গুলি চালনায় দশজন উদ্বাস্তু ও দুইজন স্থানীয় লোকের মৃত্যু হয়। আনন্দবাজারের বিবরণ অনুযায়ী অন্য বেসরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ছয়। ১২ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের আনন্দাবাজারে প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে ত্রিশজনের মৃত্যু হয়েছিল। গুলিতে নিহত দুজন উদ্বাস্তুর নাম সমরেশ বিশ্বাস ও কালীপদ সর্দার। তুষার ভট্টাচার্য লিখেছেন ৩১ জানুয়ারি কুমিরমারিতে চল্লিশজনকে পুলিশ হত্যা করে এবং মৃতদেহগুলি লঞ্চে নিয়ে গভীর সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। রস মল্লিকের বিবরণ অনুসারে সেদিন ঘটেছিল এক 'massacre'। যাতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। মৃতের সংখ্যা নিয়ে এইসব বৈষম্য ও পুলিশি অত্যাচার ও নিপীড়ন বিষয়ে 'যে সমস্ত গল্প লেখা হয়েছে তা বানাতে শয়তানের কল্পনা লাগে', এমন বলেছেন অমিয়কুমার সামন্ত। অন্যদিকেও কল্পনা সক্রিয় ছিল। তৎকালীন একজন মন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন, গুলি চালাবার অনুমতি মন্ত্রীবর দেননি, গুলি আদৌ চলেইনি। তথ্যের এইসব বৈষম্যের জন্যও দায়ী কিন্তু সরকারি 'মন্ত্রগুপ্তি'। গণমাধ্যমকে অকুস্থলে যেতে না দিয়ে, 'চুপ-চুপ হাশ্-হাশ্ সন্ত্রাস' ঘটিয়ে যাবতীয় পুলিশি ব্যবস্থা

নেওয়া হয়েছিল। ফলে যদি কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বাড়িয়ে বলা হয়, অতিরঞ্জন হয়, তার জন্যেও দায়ী রাজ্য সরকার। তথ্য গোপন করলে অতিরঞ্জন হবেই।

পুলিশের প্রশাসনের কার্যকলাপের পিছনে কার ছায়া? তৎকালীন জেলা পুলিশের কর্তা অমিয়কুমার সামন্ত পরিষ্কার বলেছেন, 'মরিচঝাঁপি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তই কেবল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নেয়নি। সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করেছেন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে।' দায় শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর ও মন্ত্রীসভার। এই প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে লেখা ডি ওয়াই এফ্ আই-এর তৎকালীন রাজ্য সম্পাদকের একটি চিঠির খানিকটা অংশ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমাদের কাছে উদ্ধারযোগ্য মনে হয়েছে। তখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসেনি। তখনও সেই রাজ্য সম্পাদক মন্ত্রিত্ব অর্জন করেননি। ডি ওয়াই এফ্ আই-এর রাজ্য সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'গোলমাল বাধে তখনই যখন সরকারের কোন একটি দলের সংকীর্ণ স্বার্থে পুলিশ-মিলিটারি-আমলাদের ব্যবহার করা হয়। ...জনসাধারণের সঙ্গে আচরণে, বিশেষ করে গণ-আন্দোলনের প্রতি পুলিশ বাহিনী রীতিমতো শত্রুভাবাপন্ন।...রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে যে সরকার থাকে সেই পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে।' আর সরকারের কর্তৃত্বে যে রাজনৈতিক দল থাকে কার্যত তারই নির্দেশে পুলিশ পরিচালিত হয়। মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের উৎখাত করতে পুলিশ-প্রশাসন যা-যা করেছিল, সব করেছিল মুখ্যমন্ত্রী ও বামফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে। আর সরকার যা-কিছু নির্দেশ দিয়েছিল তা দিয়েছিল সি পি আই (এম) দলের কথায়।

মরিচঝাঁপি বিষয়ে সেইসময় সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন সরকার কী বলেছিল? ১৯৭৮-এর ১১ এপ্রিল দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতি জ্যোতি বসু বলেছিলেন, দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে উদ্বাস্তু নেতৃত্ব তাদের হাসনাবাদে নিয়ে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিরোধের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সুন্দরবনে বসবাসের বা চাষের উপযোগী জমি আর নেই। যদিও আগে বারবার তাঁরাই বলেছিলেন সুন্দরবনে বা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী ১৯৭৯ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিধানসভায় বলেন, উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপিতে নির্বিচারে গাছ কাটছে, বনসম্পদ নষ্ট করছে, পরিবেশের ক্ষতি করছে। এই মিথ্যাচারের চমৎকার জবাব আছে শৈবালকুমার গুপ্তের 'মরিচঝাঁপি কি মরীচিকা' প্রবন্ধে। 'যেখানে গাছপালা নেই এবং ষাট-সত্তর বৎসরের মধ্যেও এমন গহন বন গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা নেই, যেটা বাঘের বা তার আহার্য শিকারের বিচরণস্থল হতে পারে' সেখানে বন সংরক্ষণের বা ব্যাঘ্র প্রকল্পের যুক্তি খাটে না। অন্য রাজ্যের লক্ষ-লক্ষ মানুষ এসে বসতি করায় কিছু হয় না, কিন্তু কয়েক হাজার শরণার্থী পরিবার আসায় নাকি আমাদের রাজ্যের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এরা সব সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশীদার; শুধু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানোর উশকানি দিচ্ছে না, তীরধনুক দিয়ে পুলিশকে বাধা দিচ্ছে, 'তাঁরা এক সমান্তরাল সরকার চালাতে চাইছেন।' উদ্বাস্তু নেতারা টাকা নিয়ে সরকারি জমি বিলি করছেন।

কলকাতার নিকটবর্তী এলাকায় বামপন্থী মদতে কলোনি প্রতিষ্ঠার সময় উদ্বাস্তুরা সরকারি-বেসরকারি জমি জবরদখল করে জমি বিলির বন্দোবস্ত করেছিলেন, তার ফলে যে অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে অনেক সময় বিরোধের ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলি অবশ্য এখন আর বিবেচ্য নয়। কারণ তখন নেতৃত্বে ছিলেন বর্ণহিন্দুরা, আর এখন নিম্নবর্ণের মানুষেরা, ঘুঁটেকুড়ুনির ছানারা। গুলি চালনার পর নৌবহর দিয়ে দ্বীপটি ঘিরে, নৌকো ডুবিয়ে, বাঁচার জন্য সংগৃহীত চাল-চিনি-কেরোসিন ছিনিয়ে নেবার পর, জীবিকার উপায় বন্ধ করবার পর, ভেড়ি কাটবার পর, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য বন্ধ করবার পর, মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতিতে বলছেন, অর্থনৈতিক অবরোধ করা হচ্ছে না, করবার কোনও পরিকল্পনাও নেই। মিথ্যার বন্যা বইয়ে বলা হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের কথা, বিদেশি শক্তির সাহায্যের কথা। প্রমোদ দাশগুপ্ত অভিযোগ করেন বাংলাদেশের উগ্রপন্থী নেতা তোহার লোকেরা মরিচঝাঁপিতে যাতায়াত করছে বলে তাঁর কাছে খবর আছে। অমিয়কুমার সামন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সমান্তরাল সরকার চালানোর অভিযোগ শুধু সমর্থন করেননি, বলেছেন হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা। প্রভু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ, সুতরাং মরিচঝাঁপিতে নাকি বাংলাদেশিদের যাতায়াত বেড়ে গিয়েছিল, এই দ্বীপ হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশে চাল-চিনি-কেরোসিন পাচারের ঘাঁটি, উদ্বাস্তু সমিতি যে জমি বিলি করছিল সেই জমি প্রাপকদের মধ্যে নাকি বাংলাদেশের নাগরিকরাও ছিল। চূড়ান্ত কাল্পনিকতার ওপর ভিত্তি করে বামফ্রন্টের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র সম্প্রতি মে-জুন ২০০৭-এর 'সৃষ্টির একুশ শতক' পত্রিকায় একটি উপাখ্যান রচনা করেছেন। মরিচঝাঁপিতে নাকি জমিদার-জোতদারদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমিতে অগণিত ছোট চাষি কৃষিকর্মে নিরত ছিল। সেই চাষিদের তাড়িয়ে উদ্বাস্তুদের বসানো হবে এই নাকি ছিল গভীর দুরভিসন্ধি। 'এই হতচ্ছাড়া

চাষীদের জমিতে দণ্ডকারণ্য থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের বসাতে হবে', এই নাকি ছিল বুদ্ধিজীবী মার্কিনপন্থী চক্রান্তকারীদের পরিকল্পনা। প্রাক্তন মন্ত্রীর এই লাগামছাড়া কল্পনার কথা জানতেন না বলেই পুলিশ কর্তা অমিয়কুমার সামন্ত লিখে ফেলেন, 'ওখানে বসবাস করা তো দূরের কথা' ওই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায় না, সেখানে কিছুটা জঙ্গল মুক্ত করে বন দপ্তর নারকেল-বাগান করেছিল, 'কোনও চাষের সম্ভাবনাই সেখানে ছিল না।'

কমিউনিস্টদের নির্জলা মিথ্যা রচনায় দারুণ দক্ষতা। সেই দক্ষতার প্রমাণ আমরা পেয়েছি সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে স্তালিনের কুৎসা রটনার বৃহৎ প্রকল্পের পাশাপাশি আমাদের দেশে অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সম্পর্কে ছোট-ছোট মিথ্যা রটনায়। কমিউনিস্টদের এইসব মিথ্যা-রটনা ও অপকর্মের তত্ত্বগত সারবত্তা বিষয়ে বিখ্যাত হাঙ্গেরীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও সাহিত্যবেত্তা গেয়র্গ লুকাচের গোটা তিনেক বাক্য আমার মনে চিরকালের জন্য গেঁথে গিয়েছে। বাক্য তিনটি—'The highest duty of Communist ethics is to accept the necessity of acting immorally. This is the highest sacrifice that the revolution demands of us. The conviction of the true Communist is that evil transforms itself into bliss through the dialectics of historical evolution.' ঘটনাচক্রে মধুময় পাল সম্পাদিত মরিচঝাঁপি বিষয়ক এই সংকলনটি পড়বার অব্যবহিত আগে আমি আনা লাবিনার *'This I Cannot Forget'* বইটি পড়েছি। এই আনা ছিলেন রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিনের ঘনিষ্ঠ সহচর নিকোলাই বুখারিনের স্ত্রী। কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, বুখারিন, রাইকভদের গভীর আস্থা ছিল বিপ্লবের ফলে গড়ে-ওঠা, নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের প্রতি। স্তালিন যখন ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপসারণের জন্য এঁদের একে একে জেলে ভরেন এবং মস্কো-বিচারের প্রহসনের আয়োজন করেন, তখন যে অপরাধ এঁরা করেননি আদৌ সেই অপরাধ করেছিলেন বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত নিয়তির কোনও গুরুত্ব নেই। তাঁদের ব্যক্তিগত ভবিতব্যের চেয়ে অনেক বড় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ। গেয়র্গ লুকাচ ভেবেছিলেন বিপ্লবের মহান প্রয়োজনে অনৈতিকভাবে কাজ করা একজন কমিউনিস্টের মহত্তম কর্তব্য। ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতার দৌলতে যা অন্যায় তা চূড়ান্তভাবে রূপান্তরিত হয় bliss বা পরম সুখে। বুখারিনরা ভেবেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সবকিছু তাঁদের করণীয়। যে-অপরাধ, যে-ষড়যন্ত্র আদৌ করেননি, সেই অপরাধের স্বীকারোক্তিও যদি করতে হয়, তাও করতে হবে, যাতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়। পশ্চিমবাংলায় সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্ব ১৯৭৭-৭৯ সালগুলিতে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছিলেন, চারদিকে ফ্রন্ট-বিরোধী চক্রান্ত দেখছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল মরিচঝাঁপি নিয়ে 'চক্রান্তের' দিনগুলিতে বামফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব রক্ষার কারণে দরকার হলে তাঁদের বানানো কথা বলতে হবে, মিথ্যা বলতে হবে, অনর্গল অপপ্রচার করে যেতে হবে।

গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বুখারিন তাঁর তরুণী স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'There are irritating misprints in history, but the truth will triumph.' পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতৃত্বও হয়ত মনে করেছিলেন মরিচঝাঁপি নিতান্তই ইতিহাসের একটি মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র। ইতিহাসের পরবর্তী সংস্করণে ছাপার ভুলটা শুধরে নেওয়া যাবে আর শুধরে নিলেই ইতিহাস থেকে মরিচঝাঁপি চিরতরে মুছে যাবে। কিন্তু সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, তাকে মুছে ফেলা যায় না। মৃতেরা ফিরে আসে, জীবিতদের তাড়া করতে থাকে। নিহত সিজারের প্রেত ব্রুটাসের সামনে যখন হাজির হয়, 'That makes my blood cold and my hair to stare', কবরের হা-মুখ খুলে হ্যামলেটের বাবার প্রেত বেরিয়ে আসে এবং তার 'foul and most unnatural murder'—লুকোনো বৃত্তান্ত জানিয়ে দেয়, নিহত ব্যাংকোর প্রেত ভোজসভায় প্রবেশ করে ম্যাকবেথের আসনে উপবিষ্ট হয়। মরেও মরে না, 'but now they rise again.' আবার জেগে ওঠে।

মরিচঝাঁপি : ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস—সম্পা: মধুময় পাল/ গাঙচিল, কলকাতা-৯/২৭৫.০০।

অপ্রাকৃতিক

মীনাক্ষী

কারও সাতে পাঁচে নেই, নিন্দে-মন্দ নেই, সদা হাসি-মুখ বেশ ছেলে সুকান্ত—এসব লোকে বলে। আমার চোখে সুকান্ত পরিচিত সব ক'টি পুরুষ থেকে আলাদা, কারণ সে নারীকে সম্মান দিতে জানে; ব্যবহার করতে শেখেনি, ভালবাসতে চায়। সুকান্তকে বললাম, 'বিয়ের পর তো ছ'মাস পার হল, এখনও ঝগড়া শুরু হয়নি শুনলাম। বউয়ের সব কিছু এখনও ভাল'? শান্ত হাসল সুকান্ত, —'ভাল আর মন্দ কাকে বলি মাসি? এই দেখো না, দিন আর রাত্রি, দু'টো প্যারালাল প্রাকৃতিক ব্যাপার কাউকে রিজেক্ট করার উপায় নেই, কোনওটাকে খারাপও বলা যায় না। মানুষও তো প্রাকৃতিক প্রোডাক্ট, বলো?'

সুকান্তর মতো দার্শনিক ব্যক্তিত্ব আরও দেখেছি; কিন্তু ওর বউ ফুলের মতো আমূল পবিত্র নারী দ্বিতীয় দেখিনি। একমাত্র সেই কারণে আমি ফুলের খুব কাছে থাকতে চাই। ফুলের শরীরের সুগন্ধই আমার ক্ষিপ্ত জীবনের সবচেয়ে বড় ওষুধ। প্রশ্ন করেছিলাম, 'মেয়েছেলে মানে তো মাংস, এক ফোঁটা না বিকিয়ে এতটা বড় হতে পারলে কেমন করে?' আমি জানি সমস্ত মেয়ে ভাল করে কিশোরী হয়ে ওঠার আগে থেকেই খামচানি খেতে থাকে পুরুষ-নখের।

আত্মীয়, অনাত্মীয়, পরিচিত, অপরিচিত, ঘরের, রাস্তার পুরুষেরা কতরকম মুখোশে, কৌশলে, জবরদস্তিতে মেয়েদের শরীরকে অপবিত্র করতে থাকে, ভোগ করতে থাকে একেবারে কুঁড়ি অবস্থা থেকে; মনকে ভরে দেয় ঘৃণায়, আতঙ্কে, শোকে। কিন্তু ফুলের দেহ-মন হস্তান্তরিত না হয়ে একেবারে ফার্স্টহ্যান্ড পৌঁছে গেছে সুকান্তর মতো স্বামীর কোলে। পৃথিবীতে এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা আর কী হতে পারে! ফুলের চেয়ে অনেকটা বড় তিন তিনটে দিদি মিলে এ অঘটন ঘটাতে পেরেছে যারা প্রত্যেকেই পুরুষ-হাতের চটকা খেতে খেতে শৈশব থেকে যৌবনে পৌঁছে চরম বিতৃষ্ণায় অবিবাহিত থেকে গেছে।

সুকান্ত অফিসে থাকলে আমি ফুলের সঙ্গে বাজারে বা ফ্লাওয়ার শো-তে যাই। দিদিদের দুর্গ ছেড়ে এ শহরে এসে মাসির দুর্গ পেয়ে ফুল যেন বেঁচে গেছে। বেল বাজলে গ্যাস অফ করে দৌড়ে আসি; কোনও পুরুষ আগন্তুক নয় তো!

এ এক অদ্ভুত অবসেশন। অন্তত একজন পবিত্র নারী। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার বয়স্ক জীবনে আর অন্য কিছু নেই। আজীবন ব্যবহৃত, আমার ক্ষতবিক্ষত শরীরের জ্বালা ফুলের কাছাকাছি এলেই জুড়িয়ে যায়। অতএব ফুলকে রক্ষা করাই এখন আমার অপমানিত নারীজীবনের একমাত্র সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি ফুলের শাড়িতে এমব্রয়ডারি করছিলাম, সুকান্ত এসে বলল, 'মাসি, মিডল ইস্ট-এ চাকরি নিলাম।' ফুল মরে গেছে বললেও আমার আঙুলে এত জোরে সূচ ফুটে যেত না। —'আর দেশ খুঁজে পেলে না? ওখানে তো শুনি মেয়ে চালানের ফলাও ব্যবসা।' —'ওমান সেরকম জায়গা নয় মাসি। খুবই ভদ্র আর শান্ত দেশ।' —'তোমার নিজের ডায়লগটা মনে আছে তো সুকান্ত? মানুষ প্রাকৃতিক জীব।'

দূর দেশ থেকে রোজই প্রায় ফোন আসে ফুলের। 'তুমি বৃথাই এত ভয় পেয়েছিলে মাসি। এখানকার পুরুষরা মেয়েদের দিকে তাকায়ই না। দরকার হলে অনেকগুলো বিয়ে করে। কিন্তু পরের মেয়ে বউ নিয়ে ঢলাঢলির রেওয়াজ নেই। খুব ফেইথফুল।' —'সাবধানের মার নেই ফুল। ওরা হয়ত নিজেদের মেয়ে সম্পর্কে ফেইথফুল, কিন্তু ইন্ডিয়ান মেয়ে' —'মাসি, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ওদের ব্যবহার খুব ভাল। দুবাই-টুবাই-এর মতো নয়।'

কিছুদিন যাবার পর খবর নিলাম—'ফুল, একলা একলা বাইরে বেড়ানো শুরু করেছ কি? সাবধান।' —'মাসি তুমি বৃথা ভয় পাচ্ছ। এখানে ইভটিজমের বালাই নেই। বাজারের ওপর ফ্ল্যাট। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সময় কাটাই, কোনওদিন কোনওরকম ছ্যাঁচড়াপনা চোখে পড়েনি।' —'আমাদের জামসেদপুরেও এখন ক্রাইম কমে গেছে ফুল। নতুন এস.পি ড. কুমার পিটিয়ে ঠান্ডা করে রেখেছে শহর।' —'এস পি ডাক্তার?' 'হ্যাঁ আগে ডাক্তার ছিলেন। দিল্লিতে ওঁর বউকে দুষ্কৃতীরা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আজ অবধি হদিশ মেলেনি। ড. কুমার ডাক্তারি ছেড়ে এই লাইনে এলেন।

যেমনি সিনসিয়ার, তেমনি দুঃসাহসী। আসলে একদম মরিয়া। এখন এলে তুমি সন্ধের পরও একলা বের হতে পারবে।'

—'উঃ কতদিন তোমাদের দেখিনি। দেশের জন্য বড্ড মন খারাপ হয় মাসি। কে জানে আর কোনওদিন ফেরা হবে কি না দেশে।'

একলা জীবনে কেবল দুশ্চিন্তার জঞ্জাল। কাজে ব্যস্ত সুকান্ত একটি নারীর পবিত্রতা রক্ষা করতে পারবে কত দিন! নোংরা ছোঁওয়া মুছে ফেলার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, চোখের জলে, শাওয়ারের জলে ভিজে ভিজে নিমুনিয়া বাধিয়ে ফেলবে কি কোনও দিন ফুল? সুকান্তর সাধ্য আছে কি হীরার চেয়ে মূল্যবান নারীমাংসকে ভালবাসার সেফভল্টে আজীবন ভরে রাখবার? বিদেশ বিভুঁইয়ে নানা রকম বিপদ কল্পনা করে করে আমার হৃদপিণ্ড আতঙ্কে ধড়ফড় করে। ফুল কত নরম, কত অসহায়, কত অক্ষম সে কথা সুকান্ত বোঝে কি ঠিকঠাক? আমি বারে বারে তাড়া লাগাই—'সুকান্ত আর কত দিন বিদেশে থাকবে?' খবর নিই—'ফুল, কেমন আছ? আগের মতো আছ তো? তোমার কাছেই পড়ে থাকে আমার প্রাণ।' হাসতে হাসতে ফুল বলে, 'মাসি, রূপকথার মতো কারও প্রাণ সত্যিই কি কখনও অন্যখানে থাকে? টিয়াপাখি বা ভোমরার মধ্যে?' গম্ভীরভাবে বলি, 'আমার থাকে। ফুলের মধ্যে।'

ফুল জানে না আমার প্রাণটা সত্যিই বেঁচে আছে ফুলের আমূল পবিত্র অস্তিত্বে। ফুল জানে না আমার মরুভূমির মতো জীবনটাতে ফুল এক বিন্দু ওয়েসিস। একদিন ফুল নতুন খবর দিল—'মাসি, ওদের কারখানার মালিক শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে পরিচয় হল।' —'অ্যা? গিয়েছিলে নাকি ওদের বাড়িতে?' —'না, না। সুকান্ত কতবার বলেছে ওদের মালিকের বাড়িতে নেমন্তন্ন, আমি যাইনি। ও একলা যায়। মাসকটে শপিং করতে গিয়েছিলাম। উনি সেখানে এসেছিলেন। খানদানি ওমানিদের চেহারা, ব্যবহার সবই দেখবার মতো, শেখবার মতো।' —'তুমি তো বলো ওখানকার সব মানুষই দারুণ সুন্দর, ভীষণ ভদ্র।' —'শেখ আবদুল্লাহর জবাব নেই। সাংঘাতিক হ্যান্ডসাম। আর কী যে ভদ্র, অমায়িক, বিনয়ী তুমি না দেখলে কল্পনাও করতে পারবে না।' —'ওদের দেশের পুরুষ মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা না করাই ভাল।' —'এ দেশের পুরুষ মানুষরা মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টাও করে না মাসি। নেমন্তন্ন বাড়িতে মেয়ে আর পুরুষের আলাদা বসার ঘর থাকে। এই দেখ না শেখ আবদুল্লাহ কতক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প করলেন, আমার সঙ্গে চোখ মেলালেন কেবল দু'বার। শুরুতে আর শেষে সালামের সময়। কথা বললেন একবার; ওঁদের বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ জানালেন। ব্যাস।' —'ওদের তো খুব কালো কালো বড় বড় চোখ হয়, তা দৃষ্টিটা কেমন?' —'মাসি, যেন একবার তাকিয়েই পুরোটা দেখে নিলেন আমার।' —'তোমার মতো সুন্দরীর সবটুকু দেখে নেবার জন্য যে কোনও পুরুষ মানুষেরই দৃষ্টি হাইভোল্টেজ হয়ে যাবে।' —'না না কেমন অন্যরকম দৃষ্টি। আমি ঠিক এক্সপ্রেস করতে পারছি না।' হঠাৎ যেন ফুল চিন্তা শুরু করল। বেশ খানিকটা সময় থেমে বলল, 'ঠিক এরকম দৃষ্টি আমি আগে কখনও দেখিনি।'

আমার বুকে ইস্তিরির ছ্যাঁকা। ঘুমের ওষুধেও সে ছ্যাঁকার যন্ত্রণা কমে না। আমি সারারাত ছটফট করলাম। পরের দিন ফোন করলাম সুকান্তকে। 'ওমানে গিয়ে কত স্মার্ট হল তোমার বউ?' —'কই আর। একেবারে গাঁইয়া, রাম ভিতু। অফিসিয়াল পার্টিগুলোতে পর্যন্ত যেতে চায় না।' —'ভাল।' —'কী যে বল মাসি। পাল্কির ভিতরে বসে গঙ্গায় ডুব দেওয়া এইটিনথ সেঞ্চুরির মাল কি টু থাউজেন্ডেও চলে?' আমি একটু স্বস্তি বোধ করলাম বটে কিন্তু ফুলের বর্ণনা পুরনো অম্বলের মতো চেপে বসেছে—'বাদামের মতো রঙ, কলো-ঘন চুল আর গোঁফ, চোখে যেন কাজল আর আইল্যাশ...'।

ফুলকে সাবধান করে দিলাম—'ফুল, সুন্দর পুরুষ মানেই বজ্জাত।' আবার একদিন বললাম, 'পুরুষ মানুষদের প্রশংসায় কখনও বিশ্বাস করবে না। ওটা হল মেয়ে পটাবার ট্যাকটিকস।' —'আচ্ছা মাসি, তুমি সব সময় একই বিষয় নিয়ে কথা বলো কেন?' —'তার কারণ পবিত্রতা মেয়েদের জীবনের মস্ত সম্পদ। শরীরের পবিত্রতার কাজটা তো আসলে মনে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ ছুঁয়ে দিলে গা ঘিন ঘিন করে আবার ভালবাসা থাকলে ছোঁওয়াকে যেন মন্দিরের মতো শুদ্ধ লাগে। নর্দমার মতো বাঁচা যে কী কষ্টের সে তুমি বুঝবে না ফুল। আমি চাই মন্দিরের মতো বেঁচে থাকো।'

—'তাহলে মাসি প্রেমের ক্ষেত্রে শরীর অপবিত্র হয় না, এটা তুমি মানো।'

—'ফুল, শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে আরও দেখা হয়েছে?' ফুল হেসে কুটিপাটি—'তুমি যে কী ভাব মাসি।' —'ফুল, পুরুষের ভালবাসা খুঁজে বেড়িয়ে কত নারী বার বার বরবাদ হয়েও শেখে না। নারী হল পৃথিবীর সবচেয়ে লোভনীয় মাংস। চিবিয়ে, চুষে, চেটেপুটে, নিঃশেষে খেয়ে এঁটোপাতা, ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে চলে যাবার পুরুষে গিজ গিজ করছে দুনিয়া। এর জন্য পুরুষের ওপর রাগ করে বা ঘেন্না করে লাভ নেই। পুরুষকে অমনই করেই গড়েছে প্রকৃতি। অতএব

ধর্ষিতা যদি না হতে চাও তবে প্রেমে পড়ার অ্যাডভেঞ্চারে মোটে যেও না। বিবাহিত জীবনে বোর হয়ে গেলেও নয়।' 'মাসি নিশ্চিন্ত থাকো। কেউ আমায় ছুঁলে আমি বাঁচব না।' —'মরবার শক্তি খুব কম মানুষেরই থাকে।'

ফুলের পবিত্রতা আমার জীবনে আতঙ্কের চাপ বাড়িয়ে চলেছে। ফুল পিকনিকে গেলেও আমি ভয় পাই—'কারা গিয়েছিল? অফিসের লোক? শেখ আবদুল্লাহ?' একলা বিছানায় দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝরাতে ফোন বাজিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিই ওদের দ্বৈত-বিছানার গরম আরামকে। কোনওদিন বা ওদের ডিস্টার্ব করব না প্রতিজ্ঞা করে ঘুমের ক্ষতিকর বড়ি খেয়ে নিই বেশি মাত্রায়।

ফুল জানাল, 'আগামী মাসে দেশে যাচ্ছি। সুকান্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।' খবর শুনে আমি রোজ ফোন করতে লাগলাম—'খুব সাবধানে থাকবে এ ক'টা দিন। কোথাও বের হবে না।'... 'দুধ আর নারকেল খাবে, মেয়ে স্ট্রং হবে।' ফুল হাসল—'শুনতে জানো মাসি? এতটা ফার্স্ট স্টেজে সোনগ্রাফিতেও ধরা পড়ে না মেয়ে না ছেলে।' —'আমি জানি মেয়ে হবে। পৃথিবীতে পবিত্রতার ধারা থেমে যেতে পারে না।' —'আমার মেয়ে যে আমার মতো হবে তার কি ঠিক আছে?' —'তোমার মতো নয়, আমার মতো নয়। আমরা নিজেদের রক্ষা করতে শিখিনি। পরবর্তীদের তৈরি করার দায় তোমাদের। জন্মের আগে থেকেই মেয়েকে প্রস্তুত করো। রোজ তাকে বলো—নির্ভীক হও, শক্তিময়ী হও। নিজের পবিত্রতাকে নিজে রক্ষা করতে শেখো। তবে তো স্বাধীন হবে নারীজাতি।' আজীবন ধর্ষিত অপমানিত নারীজীবনের কঠিন যন্ত্রণাকে কীভাবে অনুভব করাব আমূল পবিত্র ফুলকে, আমি ভেবে পাই না।

কেন বুঝতে পারছি না, ফুল ভীষণ অধৈর্য হয়ে পড়ছে। থেকে থেকেই বলে, 'মাসি দেশে ফিরবার দিনটা আসছে না মনে হচ্ছে। আমার ভীষণ ভয় করছে।' —'ফের ভয়? তোমাকে বলেছি না মায়ের পেটে থাকতে থাকতেই শিশুর মনে সংস্কার তৈরি হতে থাকে। এখন ভয় পেলে চলবে না। তাহলে মেয়েও ভিতু হবে। খুব সাহসি মেয়ের জন্ম দিতে হবে তোমাকে, যে নিজেকে নিজে রক্ষা করতে জানবে। রক্ষার জন্য কোনও দিদির, মাসির, সুকান্তর প্রয়োজন হবে না।'

—'সুকান্তর দরকার নেই বোল না মাসি। ওকে ছাড়া আমি একদিনও বাঁচবার কথা ভাবতেও পারি না।' আমি সুকান্তকে একদিন বললাম, 'ফুল বড় বেশি তোমার ওপর ডিপেনডেন্ট। তুমি ওকে একটু স্বাবলম্বী হতে শেখাও না কেন?' —'ও তো কখনও একলা কিছু করতে শেখেনি মাসি। এখন তো সব সময়ই আঁকড়ে থাকতে চায় আমাকে। খালি বলে 'ভয় করছে' '।

দেশে রওনা হবার আগের দিন শেখ আবদুল্লাহ-র বাড়িতে নিমন্ত্রণ। 'চলেই তো যাচ্ছে তোমার ওয়াইফ। আমার বিবিদের সঙ্গে পরিচয়ই হল না। এবারও যেন একলা এসো না, ওয়াইফকে নিয়েই এসো।' নিমন্ত্রণের সঙ্গে আরও জুড়ে দিল শেখ আবদুল্লাহ—বউকে পৌঁছে এসেই প্রোমশন। সুকান্তর কাছে খবর শুনেই আমি সগর্বে পরিচিত মহলে বলতে শুরু করলাম, কারখানার মালিক সুকান্তকে কত ভালবাসে, শিগগির প্রোমশন হচ্ছে, শেখ আবদুল্লাহ নিজের বাড়িতে বারে বারে নেমন্তন্ন করে ইত্যাদি। এখন আর শেখ আবদুল্লাহ সম্পর্কে আমার মনে ভয় নেই। ব্যর্থ কোনও প্রেমকাহিনির জন্ম হবার নয় এখন।

আজকাল ঘুমের ওষুধ ছাড়াই আমার ঘুম আসে। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম ফুলের শরীর থেকে হুহু করে পবিত্রতার সুগন্ধ বয়ে আসছে তারপর সেই গন্ধ জমে একটি শিশু তৈরি হল যার মুখ ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে ঢাকা। আমি যেই হাত দিয়ে পাঁপড়িগুলো টেনে খুলবার চেষ্টা করেছি অমনি ভীষণ জোরে কেঁদে উঠল শিশু। আমার ঘুম ভেঙে গেছে। তবু কান্না থামছে না কেন? অল্প পরে ঠাওর করতে পারলাম শিশুর কান্না নয়, টেলিফোন বেজে চলেছে। 'হ্যালো' —'মাসি—' এ কি সুকান্তর স্বর? স্বর নয়, আর্তনাদও নয়। এমন অদ্ভুত আওয়াজ আমি জীবনে শুনিনি।

সুকান্ত আর ফুল শেখের বাড়ির সামনে পৌঁছতেই ওমানি-প্রথা অনুযায়ী একজন বোরখা পরা মহিলা ফুলের হাত ধরে সাদরে নিয়ে গেল জেনানা মহলে। পর্দার আড়ালে তার অদৃশ্য হবার পর অন্য দিকের ঘরে পর্দা খুলল। স্বয়ং শেখ আবদুল্লাহ অন্তরঙ্গ হয়ে প্রায় জড়িয়ে সুকান্তকে নিয়ে গেল পুরুষদের রাজকীয় বৈঠকখানায়। খানদানি সৌজন্যে আর মূল্যবান বিচিত্র খাবারদাবারে সুকান্ত অভিভূত হয়ে গেল। বার বার মনে হল ভাগ্যে ফুলকে ধরে আনা গেছে। ও তো আসতে চাইছিল না। এখানকার রইসদের ব্যাপার স্যাপার দেখে ফুল কতটা মুগ্ধ হচ্ছে তা জানবার জন্য সুকান্তর মন অধীর। কিন্তু দেখা করার উপায় নেই। খাবার পরেও শেখ ছাড়তে চাইছে না। কারখানার মালিকের এতটা আগ্রহ উপেক্ষা করা সহজ নয়। এই জন্যই তো সুকান্তকে অফিসে অনেকেই ঈর্ষা করে।

একে একে অন্য সব নিমন্ত্রিত বাড়ি গেলে শেখের হাত ছাড়িয়ে সুকান্ত উঠে দাঁড়াল। 'আর দেরি করা যাবে না। মাফ করবেন। কাল সকালে দেশে রওনা হতে হবে। আমার ওয়াইফকে ডাকার ব্যবস্থা করুন প্লিজ।' দূত ফিরে এসে

অম্লান বদনে জানাল—'ও ঘরের জেনানারা সকলেই চলে গেছেন।' —'অসম্ভব! ঘরের ভিতরে দেখুন, নিশ্চয়ই আপনাদের মহিলাদের সঙ্গে...।'

অবশেষে মরিয়া, ঘামে সপসপে সুকান্ত শেখের প্রায় পায়ে ধরে অনুনয় করতে লাগল—'বাথরুমগুলো খুঁজে দেখা হোক। ওর শরীর ভাল নয়, বাথরুমে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।'

বলির পশুর চেয়ে অসহায় সুকান্তর হাত পা ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে। নিজের প্রাণটা দেওয়া তার পক্ষে এর চেয়ে ঢের সহজ ছিল বোধহয়। 'ফু-ল ফুল—' তার আর্ত চিৎকারে চারদিক কেঁপে উঠল। ফুল শুনতে পেল না তবু। সে পর্দার আড়ালেই রয়ে গেল। এক সময় পুলিশ এল। শেখ জবানবন্দি দিল—'আমি ওর বিবিকে দেখিনি। সুকান্তকে একলা ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওর বিবি আদপেই এসেছিল নাকি?' বাড়ির সকলেই হাঁ করে থেকে জানাল সুকান্তর বিবিকে কেউই চেনে না, সে যে এসেছিল কী করে বোঝা যাবে। সুকান্ত বার বার বলে যেতে লাগল, 'আমার বউ এই বাড়ির মহিলার সঙ্গে ওই ঘরে ঢুকেছে।' বাড়ির সব মহিলাকে ডাকা হল। 'কার সঙ্গে সে গেছে শনাক্ত করুন।' সারি সারি বোরখার দিকে ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে সুকান্ত প্রায় কেঁদে ফেলল, 'বিশ্বাস করুন আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে এসেছিল। সে একা কোথাও যেতে পারে না। সে ভীষণ ভিতু। ভয়েতেই হয়ত সে এতক্ষণে মরে গেছে। দোহাই খোদার, তাকে খুঁজে দিন।' পুলিশ চোখ লাল করে বলল, 'আচ্ছা বেয়াদব তো! বউকে আনইনি আর এখান থেকে বউ যোগাড় করার ফন্দি আঁটছ?'

দূর বিদেশে, ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন ধর্মী প্রশাসনের কাছে কী-বা আশা করতে পারে সুকান্ত। তবু পাগলের মতো যুদ্ধ চালাবার চেষ্টায় কেবলই ক্ষতবিক্ষত হতে হতে এক সময় একেবারে শান্ত হয়ে গেল সে। ওমানিরা বলতে লাগল, 'লোকটা বউকে আনেইনি। দেখগে যাও ওর বউ বহাল তবিয়তে দেশেই আছে। শেখকে চাপ দিয়ে এ হল টাকা আদায়ের ফন্দি।' ভারতীয়দের মধ্যেও কেউ কেউ বলল, 'এদেশে বিরাট দামে মেয়ে বিক্রি হয়। ও ব্যাটা টাকার লোভে নিজেই ষড়যন্ত্র করে বউ পাচার করেছে। বিয়ের ফাঁদে ফেলে মেয়ে বিক্রি তো হয়েই থাকে।'

দেশে ফিরে অবধি সুকান্ত আর কথা বলে না। ঠুঁটো জগন্নাথের মতো কেবল এক জোড়া বিস্ফারিত, ফ্যালফেলে চোখ মেলে বসে থাকে। ও তো চিরকালই জানত কেউ কখনও কাউকে রক্ষা করতে পারে না। সে জানা চরমে পৌঁছলে কি মানুষ এই রকম হয়ে যায়? ও বলত, 'মাসি প্রকৃতির নিয়মে সব কিছু হয়ে চলেছে।' প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর! আমার ভিতরটায় তাণ্ডব শুরু হয়েছে। আমার কি কিছুই করার নেই? সুকান্তর মতো ঠুঁটো জগন্নাথ হতে পারব না আমি। আমি কেবল চোখ নই। আমার হাত আছে, পা আছে, মন আছে। ফুলের ভিতরে যে ভ্রূণের খবর আমি শুনেছিলাম তাকে কি কোনও মতেই বাঁচানোর চেষ্টাটুকু পর্যন্ত করা যায় না? পবিত্রতার ধারাকে রক্ষা করার কোনও পথই নেই? অকালে মরে যাওয়াই কি তার নিয়তি?।

আমি সুকান্তর প্রাকৃতিক দেহকে ঝাঁকিয়ে বলি, 'সুকান্ত ওঠো, গাছ-পাথরের স্মৃতি নেই। মানুষের স্মৃতি আছে।' সুকান্ত কিছুতেই আর ওঠেনি। আমি সেই স্মৃতিকে সম্বল করে উঠে দাঁড়াই। ভীরু, পবিত্র নরম ফুলের স্মৃতি আমাকে এক বিন্দু বসতে দেয় না এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে দেয় না, ফুলকে আমরা কেবল রক্ষাই করতে চেয়েছিলাম; আত্মরক্ষা বা আত্মহত্যার উপযুক্ত স্বাবলম্বী করিনি। তাকে কেবল নারীমাত্র করে রেখেছি। অবশেষে গাছ-পাথরের মতো সুকান্তকে ফেলে আমি হাজির হই জামসেদপুর উইমেন্স কলেজে। শিক্ষিকা খাতায় নতুন নাম লেখা হয় ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০০৯। অবাক প্রশ্ন কানে এল—'নামটাকে খামকা কলম বুলিয়ে মোটা করেছেন কেন?' ওরা জানে না, এ কেবল সই নয়, এ হল শপথ। এ কোনও তারিখ নয়, ভবিষ্যতের ভিত। নারী নয়, মানবী গড়তে হবে। একমাত্র সেইটুকুই আমার বাঁচার রসদ।

ক্লাসে এসে সাজগোজ করা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেবদের দিকে চেয়ে নাম জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম। কী বলল তারা খেয়াল করতে পারছিলাম না, কেবলই যেন শুনেছিলাম 'কৃষ্ণকলি...কৃষ্ণকলি।' না, কিছুতেই নয়, ওদের কাজল-লেপা হরিণ চোখের দিকে চেয়ে শপথে শান দিলাম, ওদের জানতেই হবে ওরা কেবল প্রাকৃতিক নারী মাত্র নয়, তার চেয়ে ঢের ঢের বড়।

বাংলা থিয়েটারের একটি অধ্যায় : প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি

সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে বাংলা থিয়েটারের রূপ ও রীতির সংক্ষিপ্ত সমীক্ষণ আমাদের এই আলোচনার বিষয়। সেই সময়ের নাট্যক্ষেত্রে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির ছবি আমরা এখানে দেখে নিতে পারি।

সময়টা হল ১৯১২ সাল। বাংলা থিয়েটারে অন্ধকার নেমে এল। নটগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রয়াত হলেন। একথা অনস্বীকার্য যে পরিচালক ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে বাংলা থিয়েটারের মঞ্চভিত্তি যেমন দৃঢ় হতে পেরেছে, তেমনই নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্য যে-সব নাটক পেয়েছে সেগুলি একদিকে মঞ্চকে বাঁচিয়েছে এবং অপরদিকে বাংলা নাটক রচনার একটি বিশেষ ধারা সৃষ্টি করেছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক কাহিনি অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র নাটক লিখেছেন। ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন ও অপেরাধর্মী নাটকের রচনায় তাঁর লেখনী সঞ্চালিত হয়েছে। আদর্শবাদ ও নীতিবোধে সঞ্জীবিত গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি দর্শকদের হৃদয়কে জয় করেছিল এবং তাঁদের চেতনাকে উন্নীত করতেও সাহায্য জুগিয়েছিল। তাঁর মৃত্যু বাংলা মঞ্চক্ষেত্রে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করে।

এক বছর পরে ১৯১৩ সালে আর এক নাট্যসারথি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনাবসান হয়। কবিতা ও গান রচনায় সিদ্ধহস্ত দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা রঙ্গমঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকের বিপুল সম্ভারে। পেশাদার মঞ্চে তাঁর লেখা প্রহসনগুলি অভিনন্দিত হয়েছিল প্রবল উচ্ছ্বাসে। ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে তিনি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর পৌরাণিক নাটক জনচিত্তজয়ের স্মারক হয়ে রয়েছে। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবং নতুন নাট্যভাবনায় প্রাণিত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি চরিত্রচিত্রণ, নাট্যিকগঠন ও সাংগীতিক সম্পদের জন্য বিশিষ্ট। দর্শকমনোরঞ্জনে ও শিল্পশোভনতার উপাদানে চিহ্নিত দ্বিজেন্দ্রনাট্য বাংলা রঙ্গমঞ্চকে বাড়তি জোর দিয়েছিল।

ওই দু'জন প্রতিভাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী নাট্যস্রষ্টার অভাবে বাংলা পেশাদার রঙ্গালয়ে যখন গভীর সংকট চলছিল তখন সেই দুঃসময়ে আরও এক বিপর্যয় ঘটল। ১৯১৬ সালে নট, নাট্যকার ও পরিচালক অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অকাল মৃত্যু হয়। ১৯১২ থেকে ১৯১৬-র মধ্যে এই তিনটি মৃত্যু বাংলা থিয়েটারের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়।

উল্লিখিত পর্বকাল পেরিয়ে বিশ শতকের চল্লিশ দশকের সূচনা পর্যন্ত বাংলার মঞ্চে অনেক উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রযোজনা ঘটে, তবে সেই সময়ে মঞ্চের প্রয়োজনে যত নাটক লেখা হয়েছে, নাট্যসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তত নাটক রচিত হয়নি। বিশের দশকে বাংলা থিয়েটারে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যুগ ও স্টার থিয়েটারের মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের অধ্যায় শুরু হয়। তখনকার অধিকাংশ নাট্যপ্রযোজনায় অভিনয় ও প্রয়োগের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রথাগত মঞ্চাভিনয়ের উপযুক্ত করে নাটকের টেক্সটগুলি রচিত হত। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। অল্পসংখ্যক নাটকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের লক্ষণ দেখা যেত।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী যে-সব নাটকের প্রযোজনায় বেশি মাত্রায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন সেগুলি মোটামুটিভাবে পূর্বের সার্থক নাট্যকারদের রচনা। এই তালিকায় রয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান' ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রঘুবীর'। এছাড়াও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর লেখা নতুন নাটক 'সীতা' প্রযোজনার গুণে এবং সাহিত্যমূল্যের জোরে দর্শকদের সমাদর লাভ করেছিল। শিশিরকুমারের প্রয়োগকুশলতা ও অভিনয়দক্ষতা এই প্রযোজনাটিতে বিশেষভাবে ভাস্বর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকের মঞ্চায়নে এবং তাঁর ও শরৎচন্দ্রের কাহিনি-নির্ভর কিছু নাট্যপ্রযোজনায় ও অভিনয়ে নাট্যাচার্য স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত নতুন নাটক 'নরনারায়ণ' ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'দিগ্‌বিজয়ী' শিশিরকুমারের প্রযোজনাদীপ্ত আরও দু'টি নাট্যনিবেদন। বহু নতুন নাট্যকারের নাটক নাট্যাচার্যের নির্দেশে ও অভিনয়ে প্রশংসিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু সেইসব নাটকের সাহিত্যমূল্য তেমনভাবে প্রমাণিত হতে পারেনি। শিশিরকুমারের প্রযোজনার পরে তাদের পাদপ্রদীপের আলোয় আর দেখাও যায়নি।

গিরিশযুগেই 'বভ্রুবাহন' নাটকের মাধ্যমে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি পৌরাণিক নাটক গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালে অভিনীত হয়। অত্যন্ত জনপ্রিয় 'আলিবাবা' নাটকেরও স্রষ্টা ক্ষীরোদপ্রসাদ। গিরিশ-পরবর্তী যুগে শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত ও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রণীত 'আলমগীর' ও 'নরনারায়ণ'-এর মঞ্চসাফল্য বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'নরনারায়ণ' নাটকের সাহিত্যগুণও স্বীকৃত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে নট, নাট্যকার ও নাট্যনিয়ন্ত্রক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতি ঘটে। প্রথমদিকে তিনি ইংরাজ নাট্যকার কনগ্রিভ, শেরিডান ইত্যাদির নাট্যসাহিত্য থেকে চয়ন করে সেগুলির ছায়া-অবলম্বনে কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নিজস্ব নাট্যরচনার বিকাশ ঘটে বিশ শতকের বিশের দশকে। 'অযোধ্যার বেগম', 'কর্ণার্জুন' ও 'ইরানের রাণী' রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ১৯২৩ সালে তাঁর পৌরাণিক নাটক 'কর্ণার্জুন' স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায়। সুপ্রযোজনার গুণে এই নাটক প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সে যুগের বাংলা মঞ্চের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অপরেশচন্দ্রের নাট্যকৃতির অভিমুখ বিশেষভাবে সঞ্চালিত ছিল।

আলোচ্য সময়ে পুরনো দিনের নাট্যকার অমৃতলাল বসু কয়েক বছর জীবিত ছিলেন। এই পর্যায়ে তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'ব্যাপিকা বিদায়'—যেটি কালোত্তীর্ণ রচনা হিসাবে স্বীকৃতি দাবি করতে পারে। বিশ শতকের ষাটের দশকে ও তার পরবর্তী সময়েও 'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠী সবিতাব্রত দত্তের নির্দেশনায় এ নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে দর্শকদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছে। এই নাটকের সাহিত্যমূল্যও মান্যতা পেয়েছে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পের নাট্যরূপ বাংলার মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। সেগুলি হয়ত তেমন বাণিজ্যিক সাফল্য পায়নি। কিন্তু পেশাদার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথকে বরণ করার প্রশ্নে ও মহৎ শিল্প সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আগ্রহের নিদর্শন হিসাবে তাদের তাৎপর্য অম্লান হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাট্য অভিনয়ের ক্ষেত্রে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও আর্ট থিয়েটারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরৎচন্দ্রের অনেক কাহিনির নাট্যরূপ ওই সময়ে মঞ্চস্থ হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি নাটক চল্লিশের দশকের সূচনায় অভিনীত হয়। সেই সময় আরও কয়েকজন কাহিনিকারের গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে নাট্য প্রযোজনার প্রয়াস হয়েছিল। কিন্তু পেশাদার মঞ্চগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে বিনোদনপ্রিয় দর্শকদের চিত্তজয়ী নাট্যাভিনয়কেই তখন অগ্রাধিকার দিতে হত।

আলোচ্য কালপর্বে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর নাট্যকর্মের প্রসঙ্গ উল্লেখ্য। বিশের দশকে তাঁর লেখা 'সীতা' নাটক শিশিরকুমারের একটি বিখ্যাত প্রযোজনা। কয়েকটি সফল সামাজিক নাটকের লেখক এবং শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা যোগেশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর অগ্রবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি নিজে কৃতী অভিনেতা ছিলেন এবং মঞ্চকে ভাল বুঝতেন।

সেই সময়ে দু'জন নাট্যকার মন্মথ রায় ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আবির্ভাব ঘটে। এঁরা পেশাদার মঞ্চকে সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ বেশকটি নাটক উপহার দিয়েছেন। মন্মথ রায় বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক হিসাবে সুখ্যাত। ১৯২৪ সালে 'মুক্তির ডাক' একাঙ্ক নাটক রচনা করে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্য ও বাংলা নাট্যমঞ্চের পক্ষে একটি জরুরি কর্তব্য সম্পাদন করেন। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে তাঁর রচিত কয়েকটি নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি কিছু গভীর ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। 'কারাগার' মন্মথ রায়ের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী নাটক, যেটিতে রূপকের দ্যোতনা দেশের পরাধীনতার কালে দর্শকদের মানসলোকে তীব্র প্রভাব ফেলেছিল। ইংরাজ শাসককুল এটির অভিনয় নিষিদ্ধ করে যে আদেশনামা জারি করেছিল তার বয়ানের মূল অংশ এরকম : '*Karagar* by Manmatha Ray M.A., ...is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established by law in British India'।

মন্মথ রায়ের 'অশোক' একটি আদর্শ ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে বিবেচিত হয়। দেশের স্বাধীনতার পরে আরও নাটক রচনা করে তাঁর খ্যাতির সীমানাকে তিনি বাড়িয়েছিলেন। নাট্যকার মন্মথ রায়ের কৃতি সম্বন্ধে তাঁর দুই উত্তরসূরি নাট্যকারের মন্তব্য উদ্ধৃত করা এখানে সংগত :

বিজন ভট্টাচার্য বলেন : 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে মন্মথ রায়ের অবদান বহুবিচিত্র—জাতীয় জীবনে নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে এক দুর্লভ সম্পদ। ১৯৩০ সালে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ 'কারাগার' নাটকটি পৌরাণিক হয়েও আধুনিক। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্বাধীনতা কাহিনী 'মীরকাশিম' নাটক সার্থক।... তাঁর পৌরাণিক থেকে আধুনিক নাট্যরচনায় পরিচয় অসামান্য।'

মন্মথ রায়ের প্রতি উৎপল দত্তের শ্রদ্ধা নিবেদন : 'এভাবে নবনাট্য আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে আর কেউ পেরেছেন

বলে জানা নেই।...ঐতিহাসিক নাটকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আপনার 'অশোক'। আপনার নাটকেই দেখলাম প্রকৃত নাটক ইতিহাসের একটা যুগকে ধরার চেষ্টা করে। তৎকালীন আচার, ব্যবহার, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি প্রভৃতিকে প্রতিফলিত করে।' (২১-১-৫৭)

গত শতকে বিশের দশকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর তেইশটির মতো নাটক অভিনীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের কয়েকটি কাহিনির নাট্যরূপও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনায় তিনি ছিলেন দক্ষ। তাঁর মঞ্চসফল নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'আবুল হাসান', 'ধাত্রী পান্না', 'দশের দাবী', 'স্বামী-স্ত্রী', 'প্রলয়', 'তটিনীর বিচার', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'ভারতবর্ষ' ও 'নার্সিংহোম'। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের উপজীব্য হল দেশানুরাগ ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ। চরিত্রচিত্রণে এবং নাটকের সার্বিক গঠনে তিনি দর্শকজনচিত্তজয়ী মডেলকে অনেকাংশেই অনুসরণ করেছেন। সাংবাদিক থেকে নাট্যকার হয়েছিলেন শচীন্দ্রনাথ। তাই সংবাদের সাময়িকতার সঙ্গে সাহিত্যের শর্তের মিশ্রণে তাঁর নাটকগুলি আকর্ষক হয়েছে। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এগুলি মূলত মঞ্চমুখী নাটক। শচীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও নাট্যরচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

তিরিশের দশকের শেষদিকে মহেন্দ্র গুপ্ত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক লেখা শুরু করেন। স্টার থিয়েটারে তাঁর নাটকগুলি একাদিক্রমে এক দশকেরও কিছু বেশি সময়ে অভিনীত হয়। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির দীর্ঘ তালিকার মধ্যে আছে 'উত্তরা', 'চক্রধারী', 'গঙ্গাবতরণ', 'ঊষাহরণ', 'শ্রীদুর্গা'। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভাবিত তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির কয়েকটি হল 'রণজিৎ সিংহ', 'রাণী ভবানী', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'টিপু সুলতান'। মহেন্দ্র গুপ্তের সামাজিক নাটক 'কঙ্কাবতীর ঘাট'ও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। যদিও এটিতে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার'-এর কিছুটা প্রভাব লক্ষ করা যায়। মহেন্দ্র গুপ্তের নাটকগুলি দর্শকদের তাৎক্ষণিক ভাবে আকর্ষণ করত, কিন্তু এগুলি তার বেশি তেমন কোনও অন্তর্গত সম্পদের দাবি রাখতে পারেনি।

দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বন্দ্ব, জটিলতা এবং পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে নাটক লিখেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। তাঁর 'মেঘমুক্তি', 'মাটির ঘর', 'বিশ বছর আগে', 'মালা রায়' ও 'রক্তের ডাক' পেশাদার মঞ্চের প্রয়োজনকে পূরণ করতে পেরেছিল। পরবর্তীকালেও তাঁর নাট্যরচনা অবিরত থেকেছে। বিধায়ক ভট্টাচার্যকে অত্যন্ত যথার্থ কারণেই 'মধুসংলাপী' বলা হয়।

দেবনারায়ণ গুপ্ত উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা হিসাবে অধিক খ্যাত। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'র নাট্যরূপ দান করে চল্লিশের দশকে তিনি মঞ্চ-মনস্কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে অনেক কাহিনির নাট্যরূপ দিয়েছেন ও কয়েকটি মৌলিক নাটক রচনা করেছেন।

আলোচ্য পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে জলধর চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অয়স্কান্ত বক্সির নাম আমাদের মনে রাখতেই হয়। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা নাট্যরচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি ছাড়াও বনফুল, মনোজ বসু ও প্রমথনাথ বিশী নাটক লিখেছেন এবং সফল হয়েছেন। এঁদের নাট্যকর্মগুলির সাহিত্যমূল্যের বিশ্লেষণ স্বতন্ত্রভাবে করা যেতে পারে, যেহেতু এঁরা পেশাদার মঞ্চের নিয়মিত নাট্যকার ছিলেন না।

কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য যাঁরা নাটক রচনা করেছেন তাঁরা প্রধানত দর্শকদের চাহিদা পূরণ করতে চেয়েছেন এবং অনেকেই সফল হয়েছেন। তিরিশের দশকের শেষ থেকে চল্লিশের দশকের সূচনাকালের প্রযোজনাগুলি ক্রমশ পৌনঃপুনিকতার শিকার হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময়ে থিয়েটারে মন্দা দেখা দেয়। উপযুক্ত নাটকের অভাবে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপে রঙ্গালয়গুলি গভীর সংকটে পড়ে। যুদ্ধের জন্য মাঝে কিছুদিন মঞ্চগুলি বন্ধও থাকে। তারপর আবার সেগুলি খোলে। কিন্তু গতানুগতিক ধারার পুরনো আকৃতি ও প্রকৃতির নাটক দর্শকদের টানতে পারে না। গণনাট্য সংঘের প্রবর্তনায় নতুন কালের নাটকের আবির্ভাব ঘটে। 'ল্যাবরেটারি', 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটক অভিনন্দিত হয়। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম বাংলা নাট্যইতিহাসের গৌরব বৃদ্ধি করে। চল্লিশের দশকের শেষ পর্ব থেকে বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। দেশের স্বাধীনতার পরে পেশাদার মঞ্চগুলি তাদের নাট্যপ্রয়োজনাগুলির রীতি-পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনে নজর দেয়। সেটি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

নাটক আদৌ সাহিত্য কি না সে প্রসঙ্গে বর্তমানে বিতর্ক মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। এই বিতর্ক দীর্ঘায়িত হবে অথবা অমীমাংসিত থাকবে। তবু যাঁরা বিশ্বাস করেন যে যথার্থ নাটক মঞ্চের প্রয়োজন মিটিয়েও সাহিত্যের শর্ত পূরণ করার অধিকারী তাঁরা বলবেন দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে

বাংলা মঞ্চে মূলত মঞ্চানুগ নাটকই বেশি হয়েছে। সাহিত্যরসে উত্তীর্ণ নাটক তেমন গুরুত্ব পায়নি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং পরে তারাশঙ্করের রচনা মঞ্চায়িত হলেও তাঁরা ওই সময়ের পেশাদার মঞ্চের নাট্যকার হিসাবে মূল অবস্থানে ছিলেন না। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে, পুরোপুরি সাহিত্যগুণসম্পন্ন নাটক নিয়মিত অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমাদের পেশাদার মঞ্চে কখনওই তেমন গুরুত্ব পায়নি।

আলোচ্য কালপর্বে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে যে-সব প্রতিভাবান ও প্রতিভাময়ী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের কেন্দ্র করেই নাট্য প্রযোজনাগুলির আয়োজন হত। তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি : শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী, নীহারবালা দেবী, কঙ্কাবতী দেবী, সরযূবালা দেবী ও শান্তি গুপ্তা। এঁদের অভিনয় দক্ষতাই দর্শকদের মুগ্ধ করত। তারই সঙ্গে আঙ্গিকের কাজ এবং কখনও কিছু চমক দেখতে দর্শকরা পছন্দ করতেন। এইসব পছন্দই ছিল প্রযোজনাগুলির চালিকাশক্তি। সাহিত্যের স্বাদ দর্শকরা যদি উপযুক্ত ভাবে পেতেন তাহলে মঞ্চ ও দর্শকদের সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন ঘটত।

প্রতিষ্ঠিত কাহিনিকারদের গল্প-উপন্যাসকে আশ্রয় করে নাট্যনিবেদনের প্রয়াস পেশাদার থিয়েটারের প্রথম যুগ থেকে অর্থাৎ উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকেই শুরু হয়েছিল। সেই ধারা দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়েও যে অব্যাহত ছিল, সেকথা আমরা আগেই বিবৃত করেছি। কিন্তু সেখানে মঞ্চ রূপায়ণের ক্ষেত্রে অভিনয়ের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। সাহিত্যকেন্দ্রিকতার সঙ্গে অভিনয় কৃতিত্বের ঐক্যবন্ধন ঘটানোর উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেওয়া হয়নি। নাট্যকে মঞ্চস্থিত চলমান সাহিত্য হিসাবে উপস্থাপনের ব্যাপারে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় তেমন গুরুত্ব দেয়নি। নাট্যাভিনয়ে মঞ্চের অর্থাৎ স্টেজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেই টেক্সটের ভূমিকাকে মূল্য দেওয়া সমীচীন। নাট্য নির্ভর করে তার নাট্যিক বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, অভিনয় ও সুমিতিযুক্ত সংহত কাঠামো নির্মাণের ওপর। এগুলির যে কোনও একটির অভাবে নাট্য প্রযোজনায় অপূর্ণতা থাকে। এই অপূর্ণতার লাঘব হওয়া সব সময়েই কাঙ্ক্ষিত। তবে আমাদের এই আলোচনার নির্দিষ্ট কালপর্বে বাংলা থিয়েটার যা দিয়েছে তারও বিশেষ মূল্য আছে। উৎকৃষ্ট অভিনয় ও নানা অভিনব আঙ্গিকে সমৃদ্ধ অনেক নাট্য প্রযোজনা সেকালের নাট্যমোদীদের তৃপ্তি দিয়েছে।

চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

১। প্রকাশস্থান—৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলকাতা—৭০০ ০১৩

২। প্রকাশের ব্যবধানকাল—ত্রৈমাসিক

৩। মুদ্রক—নীরা রহমান, জাতীয়তা—ভারতীয়,
ঠিকানা—৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলকাতা—৭০০ ০১৩

৪। প্রকাশক—নীরা রহমান, জাতীয়তা—ভারতীয়

৫। সম্পাদক—আবদুর রাউফ, জাতীয়তা—ভারতীয়

৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা—নীরা রহমান।
ঠিকানা—৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলকাতা—৭০০ ০১৩

আমি নীরা রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে উল্লিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

নীরা রহমান
স্বাক্ষর

আদিবাসী সমস্যা বলে কিছু নেই

সুমন্ত সেন

আজ থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে নিয়মিত সাঁওতাল পরগণার একটি শহরে যেতাম। দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্তে ভাড়া নেওয়া ছিল সাবেক পূর্ববাংলার এক জমিদারের বাড়ি যা দেখাশোনা করতেন স্থানীয় এক বাঙালি ভদ্রলোক। জায়গাটি আদিবাসী অধ্যুষিত বলে পরিচিত হলেও তাদের দেখা মিলত খুবই কম। বাড়ির চৌকিদার ছিল বিহারি মুসলমান, টাঙা বা সাইকেল রিকশাও চালাত তারা। দোকানপাটের মালিক প্রায় সবই বাঙালি। আদিবাসীরা ছিল আশপাশের গ্রামে, সামান্য চাষের কাজ করে বা হাঁস মুরগি পালন করে তাদের দিন চলত। হাটের দিনে দেখা যেত আদিবাসী মেয়েরা মুরগি বিক্রি করতে চলেছে, যদি পথে কোনও বাঙালিবাবু কিনে নিতেন তাহলে তারা যেন বেঁচে যেত, পয়সা যতই কম পাক না কেন। তাদের দেখে নিজভূমে পরবাসী এই কথাটা থেকে থেকেই মাথায় আসত, মনে হত এদের অবস্থা ফিরাতে হলে এই সম্প্রদায়ের নেতাদেরই গদিতে বসানো দরকার। পৃথক ঝাড়খণ্ড আন্দোলন তখন মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিচ্ছে।

এর বেশ কয়েকবছর পর সাংবাদিকের চাকরিসূত্রে পাটনায় বেশ ক'বছর কাটাতে হয়েছিল। সেখানে আদিবাসী রাজনৈতিক নেতাদের দেখেছিলাম। এক চেহারা ছাড়া তাঁদের সঙ্গে অন্য নেতাদের কোনও তফাত ছিল না—না পোশাকে, না স্বভাবে না চরিত্রে। কিছুতেই মেলাতে পারতাম না তাঁদের সঙ্গে সেই আগে উল্লেখ করা শহরটির আশেপাশের মানুষদের। ধীরে ধীরে বুঝলাম জাতিগত ঐক্য যতই থাকুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একটা বিরাট তফাত তৈরি করে দিয়েছে। সমাজের অন্য অংশের মতো এক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক বৈষম্যই আসল সমস্যা, শ্রেণিগত বিভেদের সামনে জাতিগত একতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। পৃথক ঝাড়খণ্ড আন্দোলন তখন জোর কদমে চলছে। ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার নেতারা দেখাচ্ছেন পৃথক রাজ্য হলে রাঁচি, গিরিডি, হাজারিবাগ, কোডারমায় গরিব আদিবাসীদের জীবনে রাতারাতি ভোল পালটে যাবে। পাটনার বিহারি সাংবাদিকরা হাসতেন। বলতেন, 'ইয়ে লোগ গরিবসে মজাক কর রহা হ্যায়।'

ঠিকই বলতেন। ঝাড়খণ্ড গঠনের পর আদিবাসী জনসাধারণের অবস্থা একটুও বদলায়নি, আদিবাসী রাজনীতিকেরা ফুলেফেঁপে উঠেছেন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের আমলে ঘুষ নেওয়া সাংসদ থেকে শুরু করে আজকের মধু কোঁড়া—এঁরা সকলেই পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির জলজ্যান্ত প্রমাণ! এঁদের সঙ্গে অবশ্যই আছেন সংবাদে শিরোনাম না হওয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্য মাথারাও। এটা না হওয়াই হত আশ্চর্যের, কারণ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়ী ঠিকাদারদের সঙ্গে ওঠা বসা করে এঁরা যে সংস্কৃতিকে নিজেদের করে নিয়েছেন, তার সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির কোনও মিল নেই। সবক্ষেত্রেই এই হয়। গরিব আঁকড়ে ধরে থাকে তার ধর্মবিশ্বাস, আমির নীতিকথার ধার ধারে না। তাহলে আদিবাসীরাই বা আলাদা হবে কেন? আজকাল যাঁরা আদিবাসী উন্নয়ন নিয়ে এত চিন্তিত তাঁদের বোঝা উচিত আদিবাসী অনুন্নয়ন জাতিগত কারণে নয়, শ্রেণিগত কারণে। শ্রেণিবিভাজনের কথা উঠলেই অবশ্য অস্বস্তি মাথাচাড়া দেয়, তার চেয়ে জাতির প্রশ্ন খাড়া করে তা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা অনেক বেশি সুবিধাজনক। তবে সময় ধীরে হলেও পালটাতে শুরু করে। গরিব আদিবাসীদের চোখও মনে হয় খুলছে। আর সে কারণেই বোধহয় সদ্য হয়ে যাওয়া নির্বাচনে ভোটের হার বেশ কম। এই ভোটকেন্দ্রে না যাওয়া কি শুধুই মাওবাদীদের ভয়ে? মনে হয় না। শিবু সোরেনের সঙ্গে বাবুলাল মারান্ডি, বাবুলাল মারান্ডির সঙ্গে অর্জুন মুন্ডার যে প্রকাশ্য খাওয়াখাওয়ি তা তো গরিব মানুষ চোখের সামনে দেখেছেন আর এও বুঝেছেন এর সঙ্গে তাদের বাস্তবজীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় বুঝেছেন জাতিগত ঐক্যের ডাক একটি ফাঁপা আওয়াজ, কারণ নাহলে পাটনার দিকুদের আমলে তাঁদের যে অবস্থা ছিল তা এখন নিজ নেতাদের শাসনে আরও খারাপ হল কেন? শুধু জাতির কারণে ঐক্য কোনও জায়গাতেই কাজের কথা নয়, আসল কথা হল যাঁদের হাতে ক্ষমতা, তাঁদের শ্রেণিগত অবস্থান কী? ঝাড়খণ্ড বা ছত্তিশগড় দু'রাজ্যেই ক্ষমতা ভোগ করে আসলে যে শ্রেণি তারা

লুটেপুটে খাওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসী। দু'জায়গার মধ্যে যদি কিছু তফাত থাকে তা হল মাত্রার।

আদিবাসী বা উপজাতিদের ভিন্ন জীবনধারাকে অবলম্বন করে সাম্রাজ্যবাদ চেষ্টা করেছিল নিজেদের সহায়ক হিসাবে একটি পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে রাখতে। একাজে এগিয়ে এসেছিল সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম স্তম্ভ খ্রিস্টান চার্চ। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেমন নাগাল্যান্ড বা মিজোরাম বা খাসিয়া পাহাড়ে চার্চ যতটা সাফল্য পায়, সমতলে ততটা নয়। যার একটা কারণ হয়ত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসার, যা উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি অঞ্চলে ততটা ছিল না। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পরেও নেতারা এই আদিবাসীদের পৃথক গোষ্ঠী হিসাবেই রেখে দিলেন বা তাঁদের নেতাদের টোপ দিয়ে কিনে নিলেন। যেমন দক্ষিণ বিহারের জয়পাল সিং। অন্যরা টোপ গিললেন না কিন্তু বুঝলেন জাতিগত ঐক্যের আওয়াজ তুলে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা সম্ভব যাতে নেতাদের আখের গোছানোর কাজটা সহজ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, সময় বোধহয় এসেছে সংরক্ষণ নীতির দিকে নতুন করে নজর দেওয়ার। তবে যেখানে প্রকৃত সার্বিক উন্নয়নের পথে হাঁটার কোনও চেষ্টা বা ইচ্ছা নেই সেখানে সংরক্ষণ নামের 'ললিপপ' রাখা ছাড়া শাসকদের আর উপায়ই বা কী?

উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে আর একবার তাকানো যাক। ছোট রাজ্য ত্রিপুরা। সেখানেও জাতিগত প্রশ্ন তুলে অশান্তি বাধানোর চেষ্টা কম হয়নি এবং সেই চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হয়েছিল। ভিত্তি সেখানে ছিল সেই সঙ্গে গরমপন্থী লড়াকু আন্দোলনের ঐতিহ্য। যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল রাজ্যের আদিবাসীদের ছোট ছোট পাহাড় অঞ্চলে, এই ঐতিহ্যের সামনে বিভেদকামীরা দাঁড়াতে পারেনি। ঝাড়খণ্ডে সেই আন্দোলনও কখনও গড়ে ওঠেনি। ত্রিপুরায় অবশ্য আরেকটি ব্যাপার আছে আর তা হল ত্রিপুরি উপজাতিদের অনেকটা এগিয়ে থাকার কারণে তাঁদের খানিকটা সরিয়ে রেখেছে জামাতিয়া, হালাম, রিয়াং এইসব উপজাতি গোষ্ঠী থেকে। তবে তাতেও খুব একটা সুবিধা হত না যদি না শ্রেণিচেতনা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি তীব্র হত, যে-চেতনা আদিবাসীদের জাতিবিদ্বেষের পথে হাঁটতে দেয়নি প্রাথমিক বিহ্বলতা সত্ত্বেও।

আদিবাসী নেতারাই নাকি আদিবাসীদের সংস্কৃতি রক্ষায় সক্ষম। তাই যদি হয় তাহলে এই নেতাদের একাংশ ভারতীয় জনতা পার্টিতে নাম লিখিয়েছেন কেন, যে-দলের উদ্দেশ্য হিন্দুত্ব কায়েম করা, যে-হিন্দুধর্মের সঙ্গে আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। আদিবাসীদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা যদি অন্যায় কাজ হয় তাহলে তাদের হিন্দু দেবদেবীদের পুজো করতে বলাও তো অন্যায়। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে অন্তত আদিবাসীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে কিছুটা লাভবান হয়েছিল কিন্তু হিন্দু হয়ে তাদের কোন লাভটা হবে! লাভের কড়ি গুনতে ভোটের সময় দল আর আদিবাসী নেতারাই জাতভাইদের এই কাজে সাহায্য করছেন।

আদিবাসী সমস্যা বলে কিছু নেই, গরিব আদিবাসীদের যে সমস্যা সে সমস্যা ভারতজুড়ে সব গরিব মানুষেরই। এই সরল সত্য মাথায় না রাখলে তাদের বা দেশের কোনও উপকার হবে না। সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা যতই আলোচনা ও বিশ্লেষণে মগ্ন থাকুন সবই হবে নিষ্ফল।

এই দেশ এই পরিবেশ

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

একুশ শতককে পরিবেশ ভাবনার শতক হিসাবে চিহ্নিত করার কথা অনেক বিশিষ্ট মানুষই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছেন। অনেকের ধারণা একুশ শতকে যুদ্ধের অন্যান্য কারণের মধ্যে জলের অধিকার নিয়ে যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল। একদিকে উপকূল এলাকার লোনা জলে ভরে যাওয়ার আশঙ্কায় পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ দিন গুনছেন। আর ঠিক সেই সময় মিষ্টি জলের চাহিদা মেটাতে যুদ্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছে। বড় কঠিন সময়। এরকম একটি কঠিন সময়ে ভারতের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে পরিবেশ বিষয়ক আইনগুলি প্রণীত হলেও তা মূলত নিয়ন্ত্রক আইন। কখনওই সামগ্রিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সুসংহত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ ভারতবর্ষে হয়নি। বর্তমানে ভারতের কয়েকটি পরিবেশ সমস্যার দিকে একটু নজর দিলে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা অনেক সহজ হবে।

১৯৮৬ সালে ভারতবর্ষের সর্ব বৃহৎ নদী গঙ্গার শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল কিন্তু ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনার ব্যর্থতা উপলব্ধি করে 'গঙ্গা

উপত্যকা কর্তৃপক্ষ' নামক একটি নতুন সংস্থার জন্ম দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তার সভাপতি এবং রাজ্যস্তরে মুখ্যমন্ত্রীদের নেতৃত্বে প্রত্যেক রাজ্যে 'গঙ্গা উপত্যকা কর্তৃপক্ষ 'তৈরি করা হবে। গঙ্গার গঙ্গাপ্রাপ্তি রোধ করার আবার একটি সরকারি প্রচেষ্টা।

- ভারতবর্ষের বিস্তৃত সমুদ্র-উপকূলের জীববৈচিত্র সংরক্ষণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৯১ সালে একটি আইন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণি সমুদ্র-উপকূলে জীববৈচিত্র ধ্বংস করে হোটেল নির্মাণের কাজ অব্যাহত আছে। এই অবস্থা কেবলমাত্র মন্দারমণিতে ঘটেছে তা নয়, ভারতের বিভিন্ন সমুদ্র-উপকূলে কৃত্রিম উপায়ে চিংড়ি মাছের চাষ বা নিয়মনীতি না মেনে হোটেল গড়ে তোলার আয়োজন সর্বজনবিদিত।
- ভারতবর্ষের বিভিন্ন বড় বড় শহরে যানদূষণের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও কেবলমাত্র বিচারবিভাগের আনুকূল্যে কিছু কিছু শহরে যানদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক সমস্যার নিরিখে তা অকিঞ্চিৎকর।
- বিগত কালিপুজোর রাতে সমস্ত বড় বড় শহরে শব্দদানবের তাণ্ডবে মানুষ অতিষ্ঠ হয়েছে। হাসপাতালে শয্যাশায়ী রুগিরাও তার থেকে পরিত্রাণ পায়নি। হাসপাতালের নার্সিং দিদিমণিরা কানে তুলো দিয়ে রুগির সেবায় ব্যস্ত থেকেছেন।
- স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দূষণের তাণ্ডব অব্যাহত আছে। মাঠের ফসল কালো হয়ে যাচ্ছে, সর্বগ্রাসী দূষণ কারখানার সংলগ্ন গ্রামগুলিকে গ্রাস করছে।
- পাথর খাদান বা ইঁটখোলায় শ্রমিকদের পেশাগত রোগে আক্রান্তের ঘটনা প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে এবং বেশিরভাগ আদিবাসী মানুষই লাঞ্ছিত, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত।
- রেলগাড়ির ধাক্কায় হাতির মৃত্যু বা খাদ্যের অভাবে লোকালয়ে প্রবেশ করে বন্য জন্তুর চরম পরিণতি আর নতুন কোনও ঘটনা নয়।

ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্যোগের চিত্রায়ণে উপরোক্ত ঘটনাগুলি কেবলমাত্র বিস্তৃত সমস্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ মাত্র। ১৯৭২সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রথম আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তাঁর মতানুযায়ী, দারিদ্র পরিবেশের অন্যতম শত্রু। প্রয়াত নেত্রীর এই উক্তি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পরিবেশ বিষয়ে ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়ন। আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী পৃথিবীর বুকে দু'শো কোটি মানুষ প্রয়োজনীয় পানীয় জলের অভাবে মৃত্যুকে কাছে ডেকে নিচ্ছে। এই দু'শো কোটি মানুষই এশিয়া বা আফ্রিকার। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার একটি অংশ এই দু'শো কোটি জল না পাওয়া মানুষের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৯৭২ সালের পর অনেক সময় পার হয়ে গেছে। অর্থনীতিবিদরা ভারতবর্ষের অর্থনীতির উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্লাঘা অনুভব করছেন। এমনকী সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর অন্যতম একশো জন ধনী ব্যক্তির নামের মধ্যে ভারতবর্ষের বেশ কয়েকজন শিল্পপতির নাম লেখা হয়ে গেছে। তাতে অনেকেই উৎফুল্ল। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষুধার সূচকের যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে ভারতবর্ষের নাম অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে ওপরের সারিতে আছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের কয়েক কোটি মানুষ ক্ষুধার জগতে বাস করেন, দিনান্তে দু'মুঠোও খেতে পান না। ভারতের মাটিতে ক্ষুধার সাম্রাজ্য আজও বিস্তৃতভাবে কায়েম আছে।

পঞ্চদশ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমপক্ষে ৭০ কোটি মানুষ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন স্থানে লাইনে দাঁড়িয়ে আগামীদিনের ভারতের শাসককুলকে নির্বাচিত করেছেন। ভারতবর্ষের মসনদে বসার জন্য কয়েক হাজার প্রার্থী ভোটযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকেই স্বপ্নের ফেরিওয়ালা—অসংখ্য প্রতিশ্রুতি। একটি কথা সবাই বলছেন বা বলবেন, 'আমরা জনগণের সঙ্গে ছিলাম, জনগণের সঙ্গে আছি ও থাকব'। অতীতেও যাঁরা ভারতের মসনদে বসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে একই কথা বলেছেন। কিন্তু ভারতের প্রান্তিক মানুষের দুঃখ অব্যাহত। ক্রমাগত পুঁজি তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে। আর তার সুফল চলে গেছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে এবং অগণিত জনগণ বাধ্যতামূলক লাঞ্ছিত দূষিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছেন। ভারতের উন্নতির সোপানে বা ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র দূরীকরণ ও পরিবেশ সুরক্ষা প্রকৃত অর্থে আজও ব্রাত্য থেকে গেছে।

একবিংশ শতাব্দী পরিবেশগত সংকটের শতাব্দী হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু ভারতবর্ষ এই সংকটের মোকাবিলায় কতটা সতর্ক এটা নিয়ে প্রশ্ন বিভিন্ন স্তরে আলোচিত হলেও সেটা এমন মাত্রা গ্রহণ করেনি যা আগামীদিনে রাজনীতিবিদদের দেশ চালানোর পরিকল্পনাতে যোগ্য স্থান পায়। পৃথিবীর দশটি নদী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য শুকিয়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। যে-দশটি নদীকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে দু'টি নদী ভারতে অবস্থিত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত

ভারতের নদীগুলিকে সজীব রাখার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়নি। দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের জন্য যে ব্যাপক পরিমাণে বর্জ্য তৈরি হচ্ছে তারও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও সর্বভারতীয় নীতি নির্ধারিত হয়নি। দ্রুত ক্ষীয়মাণ কয়লা ও তেল আগামী দিনে যে ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করবে তার মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেই।

গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলি দেশের উৎপাদিকা শক্তির নীতি নির্ধারণ করেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বিশ্বাসযোগ্য রক্ষাকর্তা হিসাবে কাজ করেন। সুতরাং, রাজনৈতিক দলগুলির দেশ পরিচালনা কর্মসূচিতে পরিবেশবান্ধব নীতির অনুসরণ ছাড়া পরিবেশ বিষয়ক আইন কখনওই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। কিছু কিছু পরিবেশ বিষয়ক আইন কার্যকরী করতে গেলেও রাজনীতি প্রাঙ্গণের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাই অনেক সময় তাঁদের অস্থিরতা প্রকাশ করেন। তখনই থমকে যায় পরিবেশ আইনের কার্যকারিতা।

পঞ্চদশ লোকসভার নির্বাচনের পরে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেছেন এমনকী কলকাতার রাজপথের বাচ্চাদেরও ওই একই কারণে স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান এক নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে। পরিবেশের সুচারু সংরক্ষণ আগামী দিনের অনিবার্য বার্তা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, 'নতুন কাল মানুষের কাছে নতুন অর্ঘ্য দাবি করে, যারা যোগান বন্ধ করে দেয় তারা বরখাস্ত হয়'।

উপাখ্যানমালা

অনিন্দ্য রুদ্র

সারা জীবন কত ভাল বই-ই তো আমরা পড়ি; তবু এক একটা বই যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তখন সেই বইয়ের চরিত্রগুলো ছাপার অক্ষর থেকে উঠে এসে একেবারে রক্তমাংসের জ্যান্ত-মানুষ হয়ে ওঠে। আমাদের রোজকার রাস্তা হাঁটায় তখন তারা পাশে থাকে, আলো দেয়, পিঠে হাত রাখে—আমাদের সুখদুঃখগুলোও তাদের সঙ্গে আমরা ভাগ করে নিতে পারি।

এই রকমই একটা বইয়ের কথা আজকাল খুব মনে পড়ে। বইটির নাম উপাখ্যানমালা। এটি একটি গল্পের সংকলন। লেখক বিমল কর।

বাংলা ভাষার সিরিয়াস পাঠকদের কাছে বিমল করকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার পড়ে না। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তিনি এমন একটি মহীরুহ, যাঁকে এড়িয়ে গিয়ে কোনও আলোচনাই বোধহয় সম্পূর্ণ হয় না। অনুভবী পাঠকদের তিনি খুবই কাছের মানুষ। সারাজীবন এমন বহু সার্থক ছোটগল্প তিনি লিখেছেন যা শুধু বাংলা ভাষা কেন বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, আজকে যাঁরা দাপিয়ে গদ্য লিখছেন তাঁদের অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন গুরুর মতো। প্রায় একার উদ্যোগে ছোটগল্পের একটা চমৎকার কাগজ চালাতেন দীর্ঘদিন। কিন্তু এই বইয়ের গল্পগুলো বিমল করের অন্য গল্প থেকে একটা আলাদা মেজাজের। এদের প্রত্যেকটিরই একটি বিশেষ চরিত্র আছে। প্রত্যেকটি গল্পই অ্যালিগরিকাল অর্থাৎ প্রতীকধর্মী। প্রত্যেকটি গল্পেরই একটি নিজস্ব মেসেজ আছে এবং সেই মেসেজটাকে তুলে ধরার জন্যই গল্পগুলো লেখা। অথচ সোজাসুজি কোথাও কিন্তু সেই মেসেজটা বলা নেই। গল্পগুলোর বাইরের চেহারাও অত্যন্ত আকর্ষণীয়, টানটান। ফলে কেবলমাত্র গল্পর টানেই গল্পগুলো পড়া হয়ে যায় এবং তার পরেই ঘটে সেই আশ্চর্য ঘটনা—গল্পটার ভেতরের চেহারা, তার ইনার টেকসট পাঠকের সামনে যেন উন্মোচিত হয়ে ওঠে। তখন পাঠক বুঝতে পারেন যে ঠিক কোথায়, কোন সত্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লেখক এতক্ষণ কথা বলেছেন। এই উন্মোচনটা যে একবারে ঘটে তাও নয়—প্রত্যেকবার পাঠের মধ্য দিয়ে গল্পগুলোর নতুন নতুন অর্থ, তাৎপর্য পাঠকের সামনে ফুটে উঠতে থাকে এবং এর ভেতর লুকিয়ে থাকা প্রতীকগুলোরও আমরা যেন নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যকে খুঁজে পাই।

আসলে জীবন সম্বন্ধে, আমাদের এই বেঁচে থাকা নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু প্রশ্ন আছে। এই বেঁচে থাকা কেন, কিসের জন্য? শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছবার জন্য আমাদের এই অবিরাম রাস্তা হাঁটা? সত্য কী? অসত্যই বা কোনটা? প্রেম কী? ভালবাসা কী? ঠিক, ভুল, ন্যায় অন্যায় এসেবরইবা মাপকাঠি কী? এই বইটির গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে লেখক যেন আমাদের সকলের হয়ে এইসব প্রশ্নগুলোরই উত্তর খুঁজেছেন। ফলে আপাতদৃষ্টিতে এই সহজ সরল

গল্পগুলোর মধ্যে এক গভীর ও শাশ্বত জীবনবোধ প্রোথিত হয়ে আছে। গল্পগুলো আমাদেরকেও যেন এই প্রশ্নগুলোর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমাদের নিজেদেরকেও নিজেদের গভীরে ঢুকতে, ইন্ট্রোস্পেকশন করতে বাধ্য করে।

অথচ আশ্চর্য হল, এত গভীর জীবনজিজ্ঞাসা সম্পৃক্ত হয়ে থাকা সত্ত্বেও কোথাও গল্পের নির্মিতি এতটুকু জটিল হয়ে ওঠেনি। ভাষা কোথাও গুরুভার নয়—পড়তে গিয়ে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না, ঠোক্কর লাগে না, কখনও মনে হয় না তত্ত্বকথা পড়ছি। বরং এক চমৎকার সোজা সরল গল্প পড়ারই অভিজ্ঞতা হয়। যাঁরা বিমল করকে খুঁটিয়ে পড়েন তাঁরা জানেন বিমল করের লেখায় ডিটেলসের ব্যবহার থাকে চমকে দেওয়ার মতো। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় না। আমরা যেন সিনেমা দেখার মতো করে সিচুয়েশনের মধ্যে প্রবেশ করি, চরিত্রগুলোর সঙ্গে অতিমাত্রায় ইনভলভ হয়ে যাই আর এইভাবেই আস্তে আস্তে একটু একটু করে ঢুকে পড়ি সেই কাঙ্ক্ষিত আত্মজিজ্ঞাসায়।

এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় দেশ পত্রিকায়, ১৯৯০-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১-র এপ্রিল—এই পাঁচ মাসে। উল্লেখের যেটা সেটা হল এই গল্পগুলো লেখার পরই বিমল কর গল্প লেখা ছেড়ে দেন। বহুদিন ধরে তিনি ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলেন এরকম একটি বই লেখার এবং যখন তিনি বইটি লিখে উঠলেন তখন তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়েছে। বোধহয় এটাই স্বাভাবিক। কেননা একটা গোটা জীবনকে তার সমস্ত ডাইমেনশনকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়ার পরিণত প্রাজ্ঞতায় না পৌঁছলে এরকম লেখা লিখে ওঠা সম্ভব নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই বইটিকে তাঁর সারাজীবনের লেখালিখির সামগ্রিক প্রকাশ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

বইটিতে মোট পাঁচটি গল্প আছে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি দিক নিয়ে। প্রত্যেকটিই স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এবং আলাদাভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আমি শুধু একটি গল্পের কথা বলব।

বইয়ের প্রথম গল্পটির নাম 'সত্যদাস'। রঘুনাথ বলে একটা লোক গ্রামের দিকে একটা ছোট মুদির দোকান চালায়। খুবই অভাবী মানুষ। ভাঙাচোরা কোনওরকমে চলা একটা দোকান আর তার পেছনে মাথা গোঁজার এক টুকরো জায়গা—এইটুকুই মাত্র সম্বল। সংসারটিও ছোট—সে আর তার স্ত্রী, এই দুটিমাত্র প্রাণী—ছেলেমেয়ে নেই। হয়ত আর হবেও না। যদিও শীতের সময়, তবুও সকাল থেকেই সেদিন অবিরাম বৃষ্টি পড়ে চলছে। সন্ধ্যের মুখে রঘুনাথ ভাবছে এবার দোকান বন্ধ করবে এই সময় একজন লোক এসে হাজির। তার নাম সত্য দাস। মাঝ বয়সি, ভবঘুরে মানুষ গাঁয়েগঞ্জে ঘুরে ফিরে কবিরাজি ওষুধপত্র, জড়িবুটি বিক্রি করে। লোকটি আরাম করে বসে চিঁড়ে মুড়ি খেল, রঘুনাথ এই গরিব লোকটার কাছ থেকে পয়সা নিতে চাইছিল না তবু জোর করে খাবারের দামও দিল। তার পর পড়ল জ্বরে, সারাগায়ে প্রবল কাঁপুনি। রঘুনাথ ভাবল এই অসুস্থ জোরো শরীরে এখন রাতবিরেতে লোকটা কোথায়ই বা যায় এই বৃষ্টিবাদলার দিনে। ফলে তাকে রাতটুকু দোকানঘরে থাকতে দিল। পরের দিন সকালে রোদ উঠল। মানুষটাও সুস্থ হয়ে চলে গেল। তখন দেখা গেল সে একটি থলি ফেলে গেছে যাতে আছে খাঁটি সোনার তৈরি ছ'ছ'টি মোহর আর দু'টি অদ্ভুত দেখতে আংটি—একটি সাদা আর একটি কালো। রঘুনাথ ভাবল লোকটি বোধহয় ভুল করে ফেলে গেছে। যেকোনওদিন আসবে তার থলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এত দামি জিনিস বলে কথা। কিন্তু একদিন গেল, দু'দিন গেল লোকটির আর দেখা নেই। এইভাবে বহুদিন কেটে গেল। এদিকে রঘুনাথের দোকানও যেন আর চলে না—অভাব যেন সর্বগ্রাসী। একদিকে প্রবল দারিদ্র আর অন্যদিকে বিপুল ঐশ্বর্য যা আসলে অন্য লোকের সম্পত্তি। রঘুনাথ প্রবল দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে একদিন হেরে গেল। ক'দিনই বা আর অপেক্ষা করা যায়? লোকটা যে মরেটরে যায়নি তাই বা কে বলতে পারে। নাহলে এত দামি জিনিস ফেলে রেখে কেউ চলে যায়, ফলে থলির মোহর, আংটি এসবই একটা একটা করে একদিন বিক্রি করে ফেলল। সেই টাকায় তার অবস্থা ফিরল, দোকানপত্র বাড়িঘর ঝাঁ চকচকে হল—সে এখন ধনী ব্যবসায়ী, সম্পন্ন গৃহস্থ।

এই সময়েই একদিন আবার সত্যদাস এসে উপস্থিত।

রঘুনাথ আর তার স্ত্রী দু'জনেই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে এই বুঝি সত্যদাস তার মোহরের কথা তুলবে, প্রশ্ন করবে সেদিনের সেই গরিব দোকানির আজকের এই সচ্ছল ব্যবসায়ীতে পালটে যাওয়ার রহস্য কোথায়। কিন্তু সত্যদাস সেসব কিছুই বলে না। খুবই সহজ, স্বাভাবিক অমায়িক ব্যবহার তার। আগের বারের মতোই রাতটুকু কাটায় রঘুনাথের কাছে। পরের দিন সকালে যখন সে চলে যাচ্ছে, তখন আর থাকতে না পেরে রঘুনাথ তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি এখানে কিছু ফেলে গিয়েছিল আগের বার।

এরপরের অংশটা আমি মূল বই থেকে তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।

' 'সত্যদাস তাকিয়ে থাকল। পাতা যেন আর পড়ে না চোখের। শেষে একটু আশ্চর্য হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। চোখ দুটিতেও হাসি লাগল। 'কেন বাবু?'

'কি ফেলে গিয়েছিলে?'

এদিক ওদিক তাকাল সত্যদাস। তারপর আকাশের দিকে। মাথা তুলে আকাশের দিকটা দেখাল। 'উনি জানেন'।

'উনি? বিধাতা পুরুষ'?

উনি দিনমণি, দিনটি উনি সাথে করে নিয়ে এলেন। উনি অস্ত গেলে আঁধার। রাত্রিটি আসবে। এটি দিন, ওটি রাত। ইনি আলো, উনি আঁধার। বাবু শাস্ত্রে বলে দিন রাতের এই মিথুন অনন্ত কালের। একটি সাদায় আলোয় ভরা, অন্যটি কালোয় আঁধারে কৃষ্ণবর্ণ। এই দুটিরও চক্ষু আছে।'

রঘুনাথ চমকে উঠল। সত্যদাসের রেখে যাওয়া আংটি দুটির কথা মনে পড়ল। সাদা আর কালো। দুটির মূল্য ছিল। রঘুনাথ যে বেচে দিয়েছে দু'টি পাথরই। অদ্ভুত এক আতঙ্ক অনুভব করছিল রঘুনাথ। বলতে যাচ্ছিল, তুমি তো ছ'টি মোহরও ফেলে গিয়েছিলে—!

রঘুনাথের মনের কথা যেন বুঝে ফেলেছিল সত্যদাস। কিংবা নিজেই সে মোহরের কথা বলত। মুখের ওপর থেকে কুয়াশার ভিজে ভাবটা মুছে নিতে নিতে সত্যদাস বলল, 'বাবু ওই দিন আর রাতটি অনন্তকাল ধরে মিথুন করছে। আর আমাদের ধরণাটিকে ঘিরে ধরে নৃত্য করে চলেছে ছ'টি ঋতু। দিন-রাত আর ঋতুর অগোচরে কিছু থাকে না মশায়। পাপ নয়, লোভ নয়, অন্যায় অধর্ম কোনওটিই নয়। এরা সবই দেখে, এদের চক্ষুটির কথা আমরা যেন ভুলে থাকি বাবু। আমাদের সকল দুষ্কর্মই এঁরা দেখেন। ...আমি মুখ্যুসুখ্য মানুষ। ধর্মকথা আমার মুখে মানায় না। ...আপনার দুঃখটি আমি বুঝলাম। আসি মশায়।' সত্যদাস আবার নমস্কার জানাল জোর করে। তারপর চলে গেল।

রঘুনাথ দাঁড়িয়ে থাকল স্তব্ধ হয়ে। কুয়াশার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ধর্মপুরের সত্যদাস যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। রঘুনাথের চক্ষু দু'টি জলে ভরে উঠেছে তখন।'

কেন জানি না বিমল করের এই বইটি আজকাল তত আলোচনা হয় না। অথচ হওয়া উচিত ছিল—বিশেষত এই অস্থির, ভাঙাচোরা, মূল্যবোধহীন সময়ে। অনেকে আছেন যাঁরা খুঁজে খুঁজে ভাল বই পড়েন, তাঁরা এই বইটি পড়ে দেখতে পারেন। বইটির প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স।

না-বলা কথা

মঞ্জু মৈত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণনগরে থাকতে আর একটা ঘটনার কথা বলি। কৃষ্ণনগর থেকে কল্যাণীর দিকে যেতে 'সিমুরালি' বলে একটা জায়গা আছে। কলকাতার 'অভিনেত্রী সংঘে'-র নাটক হবে সেখানে। সৌমিত্র চ্যাটার্জি, অনুপকুমার আরও সব নামিদামি শিল্পী আসবে। আমরা ও এস.-পি.র পরিবার নিমন্ত্রিত অতিথি। আমার স্বামী প্রধান অতিথি আর এস.-পি. নিমন্ত্রিত অতিথি। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেল কিন্তু নাটক শুরু হল না। নাটকের দলের যাঁরা আগে এসেছেন তাঁরা দর্শকদের জানালেন যে তাঁদের ক'জন মূল অভিনেতা তখনও এসে পৌঁছয়নি। তাই একটু দেরি হচ্ছে। কিন্তু দর্শক কতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকবে? ক্রমশ উত্তেজনা বাড়তে শুরু করল। এবং পরিণতিতে চারদিক থেকে ইটপাটকেল ছোঁড়া শুরু হল। কর্তাদের তো রিক্রিয়েশন মাথায় উঠল। তাঁরা মঞ্চে উঠে জনতাকে শান্ত হতে অনুরোধ করতে লাগলেন ও ইটপাটকেল খেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত লাঠি চার্জ করা হল। নাটকের পুরো দল যখন উপস্থিত হল তখন জানা গেল ওদের একটা গাড়ি রাস্তায় খারাপ হয়ে যাওয়াতে এই বিভ্রাট। সৌমিত্র চ্যাটার্জি কথা দিলেন যে ওঁরা আবার এসে নাটক মঞ্চস্থ করবেন। কথা তাঁরা রেখেছিলেন। এই রকম কত স্মৃতি যে পেছনে ফেলে এসেছি! কত গুণীজনের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হয়েছে।

এরপর উনি বদলি হলেন বর্ধমান জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে। ১৯৭৪ সাল। পুরনো দিনের বাংলো, কয়েক বিঘে জমির ওপর। এখানেও নীচে অফিস, ওপরে থাকা। সামনে পুকুর, দু'পাশে প্রচুর জমি, মাঝখানে পায়ে-চলা রাস্তা বাংলো যাওয়ার। নানা ধরনের ফলের গাছ ইত্যাদি। পরিবেশ দেখে মন ভরে যায়। সব সময় সেন্ট্রিগার্ড পাহারায় রয়েছে। কিন্তু শুনলাম বিষাক্ত সাপ আছে এখানে এবং এদের অবাধ

চলাফেরা, কাউকে ভয় পায় না। আর পাবেই বা কেন? ওরাই তো বাংলোর আদিবাসিন্দা। শোনা কথা, যখন বিদেশি সাহেবরা রাজত্ব করেছে তখন এয়ারকন্ডিশন মেশিন তো ছিল না, তাই এই জাতীয় বাংলোয় বেসমেন্টে জল ভরা থাকত। খানিকটা চৌবাচ্চার ধরন আর কি। এতে ঠান্ডা থাকে পরিবেশ। সাহেবরা চলে যাওয়ার পর এই চৌবাচ্চায় আর জল থাকত না। ওগুলো হয়ে দাঁড়াল নানা জাতের সাপেদের আবাসস্থল। পরে অবশ্য এই চৌবাচ্চা বন্ধ করে দেওয়া হয় কিন্তু তাতেও সাপের আনাগোনা বিশেষ কমেনি। শোনা যায় একজন মালি ও তার বাবা মারাও গেছে সাপের কামড়ে। সন্ধের পর বাগানে কেউ যেত না। এক তলাতেও খুব সতর্ক হয়ে যেতে হত। বাগান ভর্তি উইয়ের ঢিবি ছিল। সেগুলো নাকি সাপের বাসা।

একবার সাপুড়েদের ডাকা হল। ওরা দু'জন এল। আমার বরাবরই সাপের ভয়। আমি দোতলার বারান্দায় আর নীচে সাপুড়েরা। ওরা বাঁশি বাজাচ্ছে আর কী একটা ছড়িয়ে দিচ্ছে। অবাক কান্ড! দলে দলে সাপেরা বেরিয়ে আসতে লাগল। কত রকমের সাপ! অদ্ভুত ব্যাপার, কোনও কোনও সাপেদের সাপুড়েরা চলে যেতে বলল। আমি লক্ষ করলাম হাত পা নেড়ে, মুখ দিয়ে কী সব শব্দ-টব্দ করে এই কাণ্ড ঘটাল। এদের নাকি দরকার নেই সাপুড়েদের। কারণ এদের বিষ নেই। আরও একটি সাপ, নামটা মনে নেই, মাথায় নাকি সিঁদুর লাগানো, তাই তাদেরও চলে যেতে বলল হাত তুলে নমস্কার করে। এত রকমের সাপ ভাবাই যায় না। সব নাম মনে নেই, যেমন—চন্দ্রবোড়া, কালকেউটে, পদ্ম-গোখরো ইত্যাদি। সবই বিষাক্ত সাপ। সাপুড়েরা তো বেজায় খুশি? এত বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত সাপ পেল, তার ওপর টাকা পেল। কথা দিয়ে গেল ওরা আবার আসবে এবং এই বাড়ি থেকে সাপ নিঃশেষ করে দেবে। তবে হ্যাঁ, বাস্তুসাপ ওরা ধরবে না। সব মিলিয়ে আট ঝুড়ি সাপ ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন পুলিশ-সুপার। সেখানেও সেই একই ব্যাপার। আসলে পুরনো দিনের বাড়ি, বড় বাগান, জঙ্গল, সাপ তো থাকবেই। কিন্তু একদিন পুলিশ সুপারের স্ত্রীকে সাপে কামড়াল। একটা মাধবীলতা গাছ লতিয়ে বারান্দায় এসেছিল। একটা সাপ হয়ত সেই লতা বেয়ে ওপরে এসেছে। ভদ্রমহিলা রাতে আলো না জ্বালিয়ে বাথরুমে গিয়েছিলেন। বাথরুমে যাবার সময় মনে হল কী একটা কামড়াল পায়ে। আলো জ্বালতেই দেখলেন কালো কুচকুচে একটা 'বেন্ডেড ক্রেট' সাপ দ্রুত গতিতে চলে গেল। উনি ছুটে গিয়ে স্বামীকে ঘুম থেকে তুললেন। হাঁক-ডাক শুরু হল। আরদালি, পিওনরা ছুটে এল। ভদ্রমহিলার পায়ে শক্ত করে দড়ি বেঁধে দেওয়া হল। যাতে বিষ ওপরে উঠতে না পারে। আমরা খবর পেয়ে ছুটে গেলাম। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল সঙ্গে সঙ্গে। যাবার সময় মহিলা আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'আমাকে একটা ভাল শাড়ি বার করে দাও, আর সিঁদুর আলতা লাগিয়ে দাও। ভাল হয়ে ফিরে তো আর আসব না!' আমি হাসব না কাঁদব বুঝে উঠতে পারছি না। কি অবস্থায় কি কথা! এদিকে হাসপাতালে অ্যান্টিস্নেক ভেনাম ইঞ্জেকশন ছিল না। সবাই চারিদিকে যোগাযোগ করে ইঞ্জেকশন আনিয়ে ভদ্রমহিলাকে সে যাত্রায় বাঁচানো হল।

সাপের গল্প তো অনেক হল এবার ভূতের গল্প, মাঝে মাঝে নাকি বাংলোয় ভূত দেখা যায় ও ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যায়। কোনও এক সময় নাকি এক সাহেব তার প্রিয় ঘোড়াকে গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করে মেরেছিল। কারণ ঘোড়াটা তার সাহেবকে যথাযথ সম্মান দেখায়নি। সেই ঘোড়ার ডাকও নাকি শোনা যায়। যাইহোক আমার দুর্ভাগ্য আমি কিছু দেখিওনি আর ঘোড়ার ডাকও শুনিনি।

সাপ খোপ, ভূতের গল্প, বিশাল বাংলোর নীরবতা এসবের মধ্যে ছোট দুটো বাচ্চা নিয়ে থেকেছি। যখন ঝড় উঠত গাছপালায় ছাওয়া পরিবেশটা কেমন একটা ভয়ের আশঙ্কা ছড়াত। এই বাংলোতে অন্যান্য লোকের মধ্যে একজন মুসলমান পিওন ছিল। নাম ছিল 'হায়াত'। কর্তা যখন ট্যুরে যেতেন ও বলত, 'মা নিশ্চিন্তে থাকুন আপনি, আমি রাতে বাংলোয় শুয়ে আছি কোনও ভয় নেই।'

এইভাবে চলছিল। একদিন আমি ঠিক করলাম চারপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে চাষ করা হবে। চাষির সঙ্গে ব্যবস্থা করে নানা ফসল ফলানো শুরু হল। মুরগি পুষলাম। খরগোস, পায়রা এসব নিয়ে বেশ একটা জমিদারি মেজাজে দিন কাটছিল। বাচ্চারা খরগোস আর পায়রা নিয়ে বেশ মজা করত। ওদের সময় বেশ কাটত। কোথা দিয়ে দিন যে কেটে যেত জানি না। ডি. এম-এর স্ত্রী বলে আমি হলাম জেলার ফার্স্টলেডি। বুঝতেই পারছেন সম্মানের বহরটা! মনে পড়ে মেয়েকে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করতে গিয়েছি। কোনও সাজগোজ নেই। সাধারণভাবেই গিয়েছি। এমনকী নিজের পরিচয় পর্যন্ত কাউকে দিইনি। ভর্তি হবার পর ঠিকানা জানতে পেরে প্রিন্সিপাল অবাক হলেন এবং বললেন আমি আগে পরিচয় কেন দিইনি। এখন হলে অবশ্য আগেই ফলাও করে দিতাম নিজের পরিচয়। যেমন আর পাঁচজন করে। কিন্তু তখন নিজেকে জাহির করার কোনও চিন্তাই ছিল না। তাই ভাবি যুগের সঙ্গে সব কিছু কত

পালটায়। কোথায় গেল সে সব দিন? কোথায় বা সেই সব মানুষেরা?

আবার বাংলোর প্রসঙ্গে আসি। এইসব বাংলো সাধারণত নীলকুঠি সাহেবদের ছিল। সেই সময় হাতি ঘোড়া যেসব ঘরে থাকত, পরবর্তীকালে সেগুলোই হল ধোপা মালি পিওনদের থাকার জায়গা। সেবার বাংলোতে যে ধোপা থাকে তার মেয়ের বিয়ে। আমাদের নিমন্ত্রণ। মেয়ে আশীর্বাদ করে খেয়ে আসতে হবে। এটা তাদের বড় আশা, এমনকী আমাদের বাসন নিয়ে যাবে যাতে করে আমাদের খাবার পরিবেশন করা হবে। এই ব্যবস্থায় আমি রাজি হলাম না। জানালাম অন্যান্য অতিথিকে যেমন কলাপাতায় খাওয়ানো হবে আমরাও সেভাবে খাব। এতে ওদের যে কী আনন্দ হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কর্তা যখন ট্যুরে যেতেন, মাঝে মাঝে আমিও তার সঙ্গী হতাম। তিনি তাঁর কাজে ব্যস্ত থাকতেন, আর আমি আমার মতো ঘুরে বেড়াতাম। সেবার পুরুলিয়ার একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামটার নাম মনে নেই। কখনও হেঁটে, কখনও বা জিপে গ্রামটা ঘুরেছি। ওই গ্রামে ইলেকট্রিক পৌঁছয়নি, প্রাইমারি স্কুলও নেই। সবাই খুব গরিব। মাথা গোঁজার মতো একটা ছাউনি আছে মাত্র। সন্ধের আগেই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে সবাই। কারণ কেরোসিন তেল কেনার পয়সা নেই ওদের। এই গ্রামটির বৈশিষ্ট্য হল এখানে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ বছরের সবাই পাথর ভাঙার কাজ করে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। মজুরি কত পায়, সময়মতো পায় কি না, জানি না। ছোট ছোট শিশুদের এত পরিশ্রম করতে দেখে খুব কষ্ট হল। ওদের শৈশব কী তাই ওরা জানল না। স্কুলে যাবে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে, বাবা-মার কাছে আবদার করবে, বায়না করবে খেলনা কিনে দেওয়ার জন্য, কচি হাতে পুতুল খেলবে—সে সব থেকে ওরা বঞ্চিত। ওরা শুধু যুদ্ধ করে। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ।

এমনই একটি বাচ্চার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করলাম। তার নাম জিজ্ঞেস করায় সে কোনও জবাব দিল না। একইভাবে পাথর ভাঙতে থাকল। ব্যাগ খুঁজে একটা চকলেট তার হাতে দিলাম। তখন সে নামটা বলল কিন্তু চোখ তুলে নয়। প্রথমে ভাবলাম লজ্জায় চোখ তুলছে না। পরে বুঝলাম তা নয়, চোখ তুললে যে তার হাতে পাথর-ভাঙার হাতুড়ি এসে পড়বে। কিরকম মেশিন হয়ে গেছে ওরা। ওদের মনও কি পাথর হয়ে গেছে? তার মা পাশে বসে পাথর ভাঙছিল, তাকে বললাম, 'এতটুকু শিশুকে দিয়ে এত কঠিন কাজ কেন করাচ্ছেন'। উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মা বললেন, 'স্কুলে পাঠিয়ে কী হবে? অফিসার হবে? চাকরি করবে? কে দেবে তাকে চাকরি? পার্টির লোকেরা তো অনেক বড় বড় কথা বলে, করে কি কেউ কিছু? তার চেয়ে এই ভাল, দু'জনে মিলে খাটি, দুটো চাল ফুটিয়ে খাই। যদি আরও দু'চারটা সন্তান থাকত তবে আরও বেশি রোজগার হত। বাপটা তো অকালেই মরে গেল।'

আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে নয়। ঘটনাটা খুব প্রাসঙ্গিক। বন্ধুদের সঙ্গে একবার গিয়েছিলাম কেরালাতে বেড়াতে। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন কেরালিয়ান। তাদের পৈতৃক বাড়ি গ্রামে। নানা রকম ফলের গাছ সেখানে। সবাই মিলে গ্রামটা ঘুরতে বেড়ালাম। ঘুরছি আর ডাব খাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে ডাবের শাঁসও। কী স্বাদ! হঠাৎ দেখলাম একটা লরির টায়ারে বসা একটি বাচ্চাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারই বয়সি তার বন্ধুরা। টায়ারে দড়ি বাঁধা, সেই দড়ি ধরে ওরা টানছে। আমি হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি তোমাদের খেলা? বুঝলাম ভাষাটা বোঝেনি। তখন কেরালিয়ান বন্ধু ওদের ভাষায় প্রশ্ন করল। উত্তর শুনে তো অবাক। ওই বাচ্চাটাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পোলিওর জন্য ও হাঁটতে পারে না। অথচ ও পড়াশোনায় খুব ভাল। তাই বন্ধুরা ওকে রোজ এইভাবে স্কুলে নিয়ে যায়। স্কুল চলাকালীন বাইরে অপেক্ষা করে। স্কুল শেষ হলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে ওই টায়ারে করে। স্কুলের মাইনে ওর লাগে না, কারণ ও পড়াশোনায় সত্যিই ভাল। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! পুরুলিয়ার গ্রামে পাথরের খাদানে বাচ্চা পাথর ভাঙছে আর কেরালার গ্রামে পোলিও আক্রান্ত বাচ্চাকে টায়ারে বসিয়ে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা।

আবার ফিরে আসি বর্ধমানে ডি.-এম-সাহেবের বাংলোয়। জেলায় ডি.-এম. থাকাকালীন প্রায়ই গেটের বাইরে শোনা যেত শ্লোগান—ডি.-এম.-এর কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। নানা কারণে বিক্ষোভ লেগে থাকত। এবং এই শ্লোগানটা খুব কমন ছিল। ডি. এম.-এর বাড়ির গেটে এই শ্লোগান দেওয়ার কারণ হল যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেই বিক্ষোভের স্মারকলিপি হাতে হাতে দিতে হয়। এটাই নিয়ম। একদিন দেখি আমার মেয়ে, বয়স তখন চার বছর, হাতে একটা ছোট লাঠি নিয়ে বাবার গ্রাউন্ড ফ্লোরের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে শ্লোগান দিচ্ছে 'ডি. এম.-এর কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।' আমি এই দৃশ্য দেখে হেসে মরি। পিওনরাও হাসছে।

জেলাশাসকদের নিয়ে গল্পের শেষ নেই। কর্তার কাছে শুনেছি এই বর্ধমানেই একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা ১৯৬৭-৬৮ সালে। সেই সময় কলেজের দুটি ছাত্র দুর্ঘটনায় মারা যান, জি.টি. রোডের ওপর ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায়। প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয় এবং ছাত্ররা দাবি করে জেলাশাসককে

পায়ে হেঁটে দুর্ঘটনাস্থলে আসতে হবে এবং মালা দিয়ে মৃত ছাত্রদের শ্রদ্ধা জানাতে হবে। ওই জেলাশাসক তাই করেছিলেন।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। মহকুমা, জেলা বা সদরে থাকার সময় ডি.এ. ছিল সাহেবদের সাত টাকা আর পিওনদের দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা। উনি যখন ট্যুরে যেতেন বা আমিও হয়ত কখনও সঙ্গে গিয়েছি, আমাদের সঙ্গে একটা ট্যুর-বাস্কেট থাকত। তাতে চাল, তেল, নুন, আটা, ডাল, ইত্যাদি থাকত। শুধু কাঁচা বাজারটাই স্থানীয়ভাবে কেনা হত। কারণটা বলি, ওই ডি.এ-র টাকায়, মানে দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সায় তো আর পেট ভরে তিনবার খাওয়া যায় না। তাই এই ঢালা রান্না হত সবার জন্য। সবাই মিলে একই খাবার খাওয়া হত। এটা একটা অলিখিত নিয়ম ছিল। এই নিয়মটা ছিল সম্পূর্ণ নিজেদের তৈরি। সব জেলা অফিসাররা তাই করতেন। এখন তো কত মাইনে বেড়েছে, ডি.এ বেড়েছে। জানতে ইচ্ছে করে জেলা অফিসাররা এখনও কি ওই অলিখিত নিয়ম চালু রেখেছেন? অর্থাৎ সঙ্গের পিওন, ড্রাইভার, বডিগার্ড যারা থাকে, তাদের সুবিধের কথা ভেবে ওই জাতীয় কিছু কি করেন? আমরা তো এও চিন্তা করতাম, ওরা শোবে কোথায় এবং কীভাবে।

ক্রমে ক্রমে মহকুমা, জেলার পাট চুকিয়ে কলকাতায় এলাম। না, টুকরো টুকরো মজার কিছু গল্প না বললে জেলার কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। তিনটি টুকরো ছবি, তিনটিই ভূতকে নিয়ে।

১৯৬৯ সাল। কর্তা তখন সিউড়িতে আগেই বলেছি। একবার ঠিক হল সিউড়ি বনাম বহরমপুর ফুটবল ম্যাচ হবে। আমিও সঙ্গী হলাম। আমরা সার্কিট হাউসে উঠেছি। বিশাল সার্কিট হাউস। এতবড় যে কেমন একটা গা ছম ছম করে। শোনা কথা অতিরিক্ত জেলাশাসকের বাংলো ছিল 'অ্যাডমিরাল ওয়ার্ডসন'-এর, আর সার্কিট হাউস ছিল লর্ড ক্লাইভের। এই দুটো বাংলোর মাঝে বিশাল কোর্টইয়ার্ড। সেখানে সাহেবরা নাকি নিয়মিত টেনিস খেলতেন। আমরা সার্কিট হাউসে ছিলাম দু'দিন। একদিন হয়েছে কি, আমরা সবাই ওই এ.-ডি.-এম. বাংলোতে বসে আড্ডা দিচ্ছি, গান করছি, হঠাৎ লাইট গেল নিভে। আবছা অন্ধকারে মনে হল কে যেন একটু তফাতে সাদা একটা চাদর গায়ে দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। গান-টান তো মাথায় উঠল। বোধহয় একটা মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল। সেই হালকা আলোয় মনে হল আমাদের মধ্যে কে একজন নেই। তিনি আর কেউ নন বহরমপুরের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ভয়ে প্রায় কাঁপুনি ধরছে। ঠিক তখনই কে যেন আমাদের মধ্যেই বলে উঠল 'গট আপ কেস'। আমার কর্তা এবং আর ক'জন হাসতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে লাইট ফিরে এল। পুরো ব্যাপারটা ছিল শুধুমাত্র ভয় পাওয়ানোর ছক।

এরকম আরেকটি ঘটনা কৃষ্ণনগরে। আমার কর্তা ডি.-এম. তখন কলকাতায় গেছেন কাজে। এ.-ডি.-এম. ছিলেন মিজোরামের এক মহিলা। তিনি সন্ধেবেলায় আমাদের বাংলোতে এলেন। গল্প করছি লম্বা বারান্দায় বসে। খাবার ঘর ও রান্নাঘর বারান্দার অপরদিকে। সেখানে একটা সাদা কালো রঙের পর্দা ঝুলছে। হঠাৎ লোডশেডিং। রান্না ঘরে হ্যারিকেন জ্বালানোই থাকত লোডশেডিং-এর ভয়ে। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় আর বাতাসের সঙ্গে সাদা-কালো পর্দার দুলুনি—কেমন যেন একটা অশুভ সংকেত। এ.-ডি.-এম. মহিলা হঠাৎই চিৎকার করে উঠলেন। 'ভূত ভূত'। চিৎকার শুনে পিওন আরদালিরা এসে হাজির। ওদের রান্নাঘরের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ওইখানেই ভূত'। আমিও প্রথমে খানিকটা হতচকিত হই। কিন্তু কালো-সাদা পর্দার দুলুনিটা টের পেতেই হাসতে থাকি আর বলতে থাকি 'ভূত নয়, পর্দা'।

এবার কলকাতা। সি. এম. ডি. এ.-র সেক্রেটারি হয়ে কর্তা যোগ দিলেন ১৯৭৬ সালে, এখন যা কে. এম. ডি. এ.। সি. এম. ডি.এ.-কে মজা করে লোকে বলত 'কাটছে মাটি দেখবি আয়'। সি. এম. ডি. এ. ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে লোন পেত মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট-এর জন্য। এই সময় আমার কর্তা প্রথম বিদেশে গেলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চার মাসের একটা কোর্স করতে। ফিরে এসে যোগ দেন কলকাতা কর্পোরেশনে কমিশনার হয়ে। কত পুরনো অফিস। কী বিশাল বাড়ি! কত স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ি। কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এর প্রতিটি দেওয়ালে! নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই বাড়িতে চিফ-এক্সিকিউটিভ অফিসার হয়ে কাজ করে গেছেন। এই অফিসে একটা বিশাল টেবিল আছে, যা ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেক অফিসারদের মতো আমার স্বামীও এই টেবিলে বসে কাজ করেছেন। ভাবতেই বেশ গর্ব অনুভব করি। আশা করি নেতাজির স্মৃতিবিজড়িত সেই টেবিলটা এখনও কর্পোরেশন অফিসে আছে।

এই সময়কার আরও দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা মনে পড়ে। ৭৮ সালে বন্যার যে রূপ দেখা গিয়েছিল তা নিশ্চয় সবার মনে আছে। কলকাতা জলে ভাসছে। যানবাহন সবই প্রায় বন্ধ। টেলিফোন কাজ করছে না। বাজার বন্ধ। এক কথায় সবাই বাড়িতে বন্দি। দিন তিনেকের মতো এই অবস্থা ছিল। এরই মধ্যে কর্তা অফিসে যেতেন ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি করে আর ফিরতেন গভীর রাতে জল ভেঙে।

পশ্চিমবঙ্গে তখন ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার। ২৪ ঘণ্টা স্ট্রাইক ডাকা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তো বাড়ি বসে থাকা চলবে না। অফিসে ওঁকে যেতেই হবে। ঠিক করলেন আগের দিন অফিস-ফেরত বাড়ি এসে, সেই রাতেই আবার ফিরে যাবেন অফিসে। তাই করলেন—সঙ্গে পাউরুটি, বিস্কুট, চাল, ডাল, চা ইত্যাদি নিয়ে রাতে নেতাজির ব্যবহৃত সেই টেবিলে শুয়ে ছিলেন আর চৌকিদারের হাতের রান্না খেয়ে অফিস করেছিলেন। আরও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। শ্রীমতী অপর্ণা সেন আমাদের খুবই বন্ধু। '৩৬ চৌরঙ্গি লেন' ছবিটির শ্যুটিং চলছিল। হঠাৎ একদিন ফোন করে অনুরোধ করলেন যে তিনি রাত বারোটায় নিউ মার্কেটের 'নাহোম' পেস্ট্রির দোকানে শ্যুটিং করতে চান। দিনের বেলা ভিড় ও গন্ডগোল হবার সম্ভবনা, তাই এই অনুরোধ। মনে আছে কর্তা নিউমার্কেট রাতে খুলে রাখার অর্ডার দিলেন এবং সারারাত ধরে শ্যুটিং হয়েছিল নিউ মার্কেটে।

১৯৮১ সালে আমার স্বামী বদলি হয়ে এলেন দিল্লিতে মানে কেন্দ্রে। এই শহরে পা দিয়ে বেশ গর্ব অনুভব করলাম। কত কাহিনি জড়িয়ে আছে এই শহরের সঙ্গে। প্রথম একমাস থাকলাম 'বঙ্গভবন'-এ। দিল্লিতে প্রত্যেকটি রাজ্যের এরকম রাজ্য-অতিথিশালা আছে। অফিসাররা যখন পোস্টিং-এ বা কাজে আসেন তখন সেখানে ওঠেন ও পরে অন্যত্র কোয়ার্টার পেয়ে চলে যান। আমরাও একমাস পরে চলে যাই ট্রানজিট অ্যাকমডেশনে। ট্রানজিট অ্যাকমডেশন বলতে বোঝায় একটা শোবার ঘর, একটা বসবার ঘর, আর রান্না ঘর, আর বাথরুম। প্রথম প্রথম কান্না পেত। এত ছোট জায়গা যে মানিয়ে নিতে বেশ কষ্ট হত। তাছাড়া গাড়ি নেই, হয় হাঁটা না হয় বাসে বা স্কুটারে চড়া। সেই সময় দিল্লিতে বাসে চড়াটা যে কী মুশকিল ছিল—এক কথায় প্রায় অসম্ভব। কারণ স্টপে বাস ঠিকমতো দাঁড়াত না। স্টপ ঠিক জানা না থাকলে আরও সমস্যা, বিশেষ করে মহিলাদের এবং বাচ্চাদের। ভদ্র ব্যবহার আশা করা যেত না কন্ডাক্টরের কাছে, এমনকী সহযাত্রীদের সাহায্যও পাওয়া যেত না। কলকাতায় বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা যাদের, সেখানে যা সুবিধা, তা এখান ভাবতেও পারা যেত না। একে তো অপরিচিত জায়গা, তারপর বাচ্চারা ছোট, সাহায্য করার কেউ নেই। এমনকী বাচ্চারা স্কুল ফেরত দুধের লাইনে দাঁড়িয়ে দুধ আনত। তাদের বয়সটাই বা কী ছিল! একজনের পাঁচ, আর একজনের নয়। সব মিলিয়ে এক কথায় যাকে বলে নাকানি চোবানি খাওয়া। এক এক সময় মনে হয়েছে এ কোথায় এসে পড়লাম! বছর খানেকের মধ্যেই কর্তা হাউসিং মিনিস্ট্রিতে ডিরেক্টর হয়ে জয়েন করলেন। অবশেষে ঠিকঠাক বাড়ি পাওয়া গেল। সমস্যা কিছুটা কমল। কিন্তু সমস্যা তো শুধু ছোট বাড়ি নয়। আরও কত রকম। হিন্দি ভাষায় ততটা দক্ষতা ছিল না, এমনকী ঠিক করে বলতেও পারতাম না। বুঝতেও পারতাম না। এটা একটা বাধা হয়ে উঠল। কাজের লোকেদের ঠিকমতো পরিচালনা করতে অসুবিধে হত। এরপর আছে আবহাওয়া। এখানে শীতকালে যেমন শীত, গরমকালে তেমনই গরম। যার ফলে হিটার ও কুলার দুটোরই দরকার হত। অনভ্যস্ত, তাই কুলারে জল ঢালতে ভুলে যেতাম। হিটার নিয়ে ছিল আর এক দুশ্চিন্তা। ছেলেটা ছোট এবং দুষ্টু, যদি হাত দিয়ে ফেলে! তবে একটা জিনিস খুব ভাল লাগত। এখানে কাজের সময় সবাই মন দিয়ে কাজ করে। আর ছুটির দিনে আনন্দ করে। এমনকী বাড়ির কাজের লোকেরাও। এখানে ছিল প্রচণ্ড জলকষ্ট। দেখতাম সবাই কীভাবে জল রেশন করে খরচা করে। ক্রমে নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। রাষ্ট্রভাষাও আয়ত্ত করলাম।

কর্তারা বাসে করে অফিস যেতেন, এর আগে কোথাও কখনও যা করতে হয়নি। আসলে সে সময় কারওর জন্যই গাড়ি ছিল না। এমনকী সেক্রেটারিদের জন্যও নয়। তবে নানা কায়দা করে গাড়ির ব্যবস্থা করতে হত। যেমন কনফিডেন্সিয়াল ফাইল চালাচালি করতে হবে অর্থাৎ এক অফিস থেকে অন্য অফিসে যাবে, তখন গাড়ি পাওয়া যাবে। কারণ বাসে তো কনফিডেন্সিয়াল ফাইল যেতে পারে না! এইভাবেই গাড়ির সুযোগ কেউ কেউ নিয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী এর একটা সুব্যবস্থা করেন। জয়েন্ট-সেক্রেটারি ও ঊর্ধ্বতন অফিসারদের মাইনের সঙ্গে ডি. এ. জুড়ে দেন আর গাড়ির ব্যবস্থা করেন। এখন তো শুনেছি ডাইরেক্টর লেভেলে গেলেই সবাই গাড়ি পান।

ওঁর একজন সহকর্মী মজা করে আমাকে বলেছিলেন, 'আমার ব্যাংকে কত টাকা আছে আমি নিজেই জানি না, জানে আমার পি. এ.।' কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চাকরিতে দায়িত্ব যত বাড়তে থাকে এবং উন্নতি হতে থাকে ব্যক্তিগত কাজ করার সময় ততই কমে যায় বা থাকেও না। এর ফলে এদের ব্যক্তিগত কাজগুলো পি. এ.-কে বা সি. এ.-কে অনেকটা সামলাতে হয়। এখানে একটা ছোট ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। মাসের শেষ। হাত প্রায় খালি। ওঁকে সময় মতো বলতেও পারিনি টাকার কথা। তাই ভাবলাম অনেক তো কাগজ জমে গেছে, বিক্রি করে দিই। এক দু'দিনের খরচ চালিয়ে নেব। পুরনো কাগজ কেনে এমন একজনকে ডেকেছি। সেদিনটা ছিল ছুটির দিন। কর্তা ফাইলে ডুবে আছেন। টের পেলেন কাগজ বিক্রি করছি। ভয়ানক

খেপে গেলেন। বললেন, 'তোমার হাত খালি থাক, পেপার বিক্রি করে সংসার চালাতে হবে না আর তাছাড়া তোমার পয়সায় তো এই কাগজগুলো কেনা হয়নি। তাহলে বিক্রি করার অধিকার তোমাকে কে দিল? সরকারের পয়সায় কেনা কাগজ অফিসে ফেরত চলে যাবে।' অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কত ছোট ঘটনা অথচ তার গভীরতা কত! এরকম কত নিয়মই যে আমাদের মেনে চলতে হয়েছে।

এবার বলি আমার প্রথম বিদেশ যাওয়ার অভিজ্ঞতা। ১৯৮৩ সাল। আমার স্বামী ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্ট নিয়ে চলে যান থাইল্যান্ডে, মানে ব্যাংককে। এক মাসের জন্য যাওয়া। আমি বাচ্চাদের নিয়ে দিল্লিতে। ঠিক হল বাচ্চাদের কলকাতার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আমি দশ দিনের জন্য ব্যাংককে যাব। তাই হল। এলাম ব্যাংককে। সেই সময় বেশির ভাগ লোকই ইংরেজি বোঝে না বা বলতেও পারে না। শুধু ইংরেজি সংখ্যাগুলো বোঝে। তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করাটা একটা বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ইশারা বা অভিনয় করে কাজ চলত। বেশ মজাও লাগত আবার ঝামেলাও কম নয়। ওখানে দেখলাম অফিস, বাজার, স্কুল ইত্যাদি সব খুলে যায় সকাল সাতটায় আর বন্ধ হয় বিকেল পাঁচটায়, সিনেমা হল বাদে। আরও দেখলাম মেয়েরা বাসও চালায় আবার টিকিটও কাটে। বাস যতক্ষণ চলবে ওদের ডিউটিও ততক্ষণ। অবাক হয়ে দেখেছি আর ভেবেছি না জানি কত ক্রাইম হয় এই দেশে।! মেয়েদের এই রকম রাতবিরেতে যাওয়া আসা এবং কাজ করা! কিন্তু পরে জানলাম সেক্স এখানে এত খোলামেলা যে কেউ এই ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামায় না। সকালে কর্তা অফিসে চলে গেলে আমি নিজের মতো হেঁটে হেঁটে উইন্ডো-শপিং করতাম অথবা কখনও কিছু কিনতাম। কিন্তু তার জন্য অনেক কসরত করতে হত। ওই যে বললাম—মূকাভিনয় এবং ইশারা! একটা সুবিধেও ছিল সেটা হল কোনও জিনিস দর করে কেনা যেত না এবং সেই কারণেই বেশি কথা বলার দরকার হত না। ছুটির দিনে বেরিয়ে যেতাম দূরের দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে। 'ব্রিজ অন দ্য রিভার কোয়াই' দেখে মনটা ভীষণ মুষড়ে গিয়েছিল। কত যুদ্ধবন্দিদের দিয়ে তৈরি যে এই ব্রিজ ভাবাই যায় না। স্লিপিং বুদ্ধ, সেও দেখলাম। কী সুন্দর! একদিন বেশ একটা মজার কাণ্ড হল। সকালে বেরিয়েছি একা এবং শাড়িপরা। রাস্তা পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে, সিগনাল না দেখে, ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়েছি। আমরা তো নিয়ম শৃঙ্খলার ধার ধারি না তাই সেই অভ্যাসটা যাবে কোথায়! রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে গাড়ির হর্ন বাজতে শুরু করল। আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভাবছি কী করব? আবার পেছন দিকের ফুটপাতে উঠে পড়ব না রাস্তার ওপারে চলে যাব? এইসব ভাবছি যখন তখন দেখি দু'তিনজন ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। মনে মনে ভাবলাম—এই রে, এবার বোধহয় নিয়ম ভাঙার জন্য আমাকে জেলে যেতে হবে। কত জরিমানা দিতে হবে কে জানে? আমার প্রায় চোখ ফেটে জল আসছে। খুব অসহায় লাগছে। কর্তা অফিসে। কিন্তু ভগবান সহায় হলেন। সেই ভদ্রলোকেরা হাত তুলে নমস্কার করে আমাকে অনুরোধ করলেন রাস্তা পার হওয়ার জন্য। ইংরেজিতে যা বললেন তার সারমর্ম হল যে আমি গৌতম বুদ্ধর দেশের লোক, তাই আমাকে তারা সম্মান জানাচ্ছে। প্রশ্ন করি, 'কী করে বুঝলেন আমি গৌতম বুদ্ধর দেশের লোক?' উত্তরে জানাল আমার শাড়িপরা ও মাথায় সিঁদুর দেখে ওরা বুঝেছে। শাড়িপরার কত মর্যাদা ভাবুন! হেটেলে ফিরে ভাবলাম আমরা গৌতমবুদ্ধ সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি। অথচ এঁরা? গৌতমবুদ্ধ সম্পর্কে কী গভীর শ্রদ্ধা এঁদের। ভারতবর্ষ আমার দেশ—এই পরিচয়ই ওদের কাছে যথেষ্ট। এরপর অবশ্য বহুবার বিদেশে গিয়েছি। তখন আর কোনও রিসক নিইনি। আগে থেকেই নিয়মকানুন জেনে তা পালন করেছি।

প্রবাসে বন্ধুরাই আত্মীয় ও আপনজন। কেন বললাম একথা? একটু খুলেই বলি। আমার শাশুড়ি মারা গেলেন। মা মারা গেছেন খবরটা হঠাৎ পাওয়ায় আমরা দু'জনেই খুব বিভ্রান্ত। ওঁকে সেই রাতেই যেতে হবে কলকাতা, অথচ ঘরে সে রকম টাকা পয়সা নেই। বন্ধুরা খবর পাওয়া মাত্রই যার বাড়িতে যা ছিল তাই নিয়ে এগিয়ে এল। বিশেষ কোটায় কর্তা টিকিট জোগাড় করে চলে গেলেন কলকাতায়। আমি একা পড়ে গেলাম। অনেক কাজ। ঘরবাড়ি ব্যবস্থা করা, বাচ্চাদের স্কুলের ছুটির ব্যবস্থা, ট্রেনের টিকিট জোগাড় করা সব তো এক দু'দিনের মধ্যেই করতে হবে। এগিয়ে এল বন্ধুরা।

এই সময়কার আর একটা ঘটনা না বললেই নয়। লয়ালিটির কথা। কর্তার পি. এস., মানে পার্সোনাল সেক্রেটারি ছিলেন জাতে শিখ। শাশুড়ি-মায়ের শ্রাদ্ধের দিন ছিল প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যেদিন হত্যা করা হয় সেই দিন। সবাই জানেন কী বিপর্যয় নেমে এসেছিল সেসব দিনে। মনে পড়ে শ্রাদ্ধের দিন দূর থেকে যেসব আত্মীয়রা এসেছিলেন প্রত্যেককে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়। ট্রেন, প্লেন, বাজার, অফিস সবই বন্ধ ছিল বা অচল ছিল বলা যায় বেশ কিছুদিন। এরই মধ্যে প্রথম যেদিন ট্রেন চলা শুরু হল সেদিনই আমরা ফিরে আসি দিল্লিতে। আমি আগেই বলেছি ওঁর পি. এস. ছিলেন শিখ। সে সময় শিখদের খুব ভয়ে ও সাবধানে চলাফেরা করতে হত। কারণটা তো সবাই

জানে। ওই শিখ পি. এস স্টেশনে এলেন আমাদের নিতে। কী রিসক! কর্তা তো চটেই গেলেন। কিন্তু পি. এস বললেন, 'সাহেব, মাতাজি গুজর গিয়া ওউর ম্যায় না আউ আপ লোগোঁকো লেনে কে লিয়ে, ইয়ে, কভি হো সকতা?' নিজের বিপদ হতে পারে জেনেও সে যে ভদ্রতা বা সৌজন্য সেদিন দেখাল তা কি কখনও ভোলা যায়?

কর্তার পাঁচ বছরের সময়সীমা শেষ হল। আবার ফিরে এলাম কলকাতায়। 'পাঁচ বছর' ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারি কাজে দিল্লিতে আসেন, তাঁদের সাধারণত পাঁচ বছর থাকতে হয়। এরপর ফিরে যেতে হয় যাঁর যাঁর রাজ্যে 'কুলিঙ অফ' করার জন্য। আবার ফিরে আসতে পারেন সেন্টারে। অবশ্য অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি হলে পাঁচ বছরের সময়সীমাটা আর থাকে না। কলকাতায় ফিরে এসে নির্ধারিত সরকারি ফ্ল্যাটে উঠলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে অনেকগুলো কোয়ার্টার। আই. এ. এস. অফিসার ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা থাকেন এখানে। দিল্লি থেকে ফিরে এসে ভেবেছিলাম কী জানি কী রকম লাগবে! ক্রমশ ভাল লাগতে শুরু করল। এ যেন এক একান্নবর্তী পরিবার। সত্যিই তো তাই, আমরা যে একটা আলাদা গোষ্ঠী। একে অপরের সুখে দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়েছি পরম আত্মীয়ের মতো। তবে হ্যাঁ ভিন্ন মত বা অসন্তুষ্টি কি ছিল না? সেও ছিল কিন্তু সে সব কেউ বড় করে দেখেনি। এখনকার মতো আত্মকেন্দ্রিক ছিল না কেউ। হয়ত পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং তথাকথিত গ্লোবালাইজেশনের আড়ালে কনজিউমারিজম-এর তীব্র অনুপ্রবেশ মানুষকে লোভী, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর করে তুলেছে। আজকের জগতটাকে চিনতে বেশ কষ্ট হয়। বুঝতে চেষ্টা করেও পারি না।

কর্তা আবার দিল্লিতে ফিরলেন আরও বড় দায়িত্ব নিয়ে। বাচ্চারাও বড় হয়ে গেছে। তারাও তাদের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। কর্তা কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন। আমি হয়ে গেলাম একা। এই সময় আমি নিজেকে ডুবিয়ে দিই গানের জগতে। বিয়ের আগে আমি ক্ল্যাসিক্যাল গানের নিয়মিত চর্চা করতাম। মাঝে কিছুদিন গানের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। সংসারের দায়িত্বে ডুবে ছিলাম। এখন অনেক হালকা। তাই নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম গানের মধ্যে। আমার পরম বন্ধু আমার গান। একটু একটু করে ডাক আসতে লাগল নানা জায়গা থেকে। এক অন্য পরিচিতি হল—আমি হলাম বেতারশিল্পী, দূরদর্শনশিল্পী এবং একই সঙ্গে মঞ্চশিল্পী। বেশ কিছুদিন সক্রিয় ছিলাম এইসব নিয়ে। গানের মধ্যে শান্তি পেয়েছি। ভগবানকে যেন কাছে পেয়েছি।

কর্তা রিটায়ার করার পর আমাদের মানে গিন্নিদের সেই দাপট তো আর থাকে না। আবার ইচ্ছেগুলোও বিসর্জন দিতে পারি না। একটা সংকট। মনে আছে কিশোরী আমনকারের অনুষ্ঠান শুনতে যাওয়ার কথা। এত ইচ্ছে কিন্তু পাশ কই? কে দেবে পাশ? আজকে চেয়ারটা তো আর নেই তাই পাশও আর নেই। অথচ একটা সময় কতজনকে পাশ দিয়েছি অনুষ্ঠান শোনার বা দেখার জন্য তার হিসাব নেই। তবে হ্যাঁ জুনিয়র অফিসারের স্ত্রীরা মাঝে মাঝে পাশ পাঠায় তাদের সুবিধে মতো। এটাই বা কি কম!

হঠাৎ একটা মজার গল্প মনে পড়ে গেল। বলেই ফেলি। কর্তা তখন জয়েন্ট-সেক্রেটারি স্টিল মিনিস্ট্রিতে। ওঁকে রাউরকেল্লা যেতে হবে প্ল্যান্ট পরিদর্শনে। আমিও সঙ্গ নিলাম। রাউরকেল্লায় আগে কখনও যাইনি। আশেপাশে দেখার অনেক জায়গা আছে। সারান্ডা ফরেস্ট, কিরিবুরু, মেঘাতিবুরু এইসব আর কি! ভারী সুন্দর সে সব জায়গা! উনি সারাদিন কাজে ব্যস্ত আর আমি এখানে ওখানে ঘুরছি। আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে ওখানকার অফিসারদের গিন্নিরা। একটা জঙ্গলে গিয়েছি। পিকনিক মতো হল। দেখলাম এলাকাটা কাঁঠালগাছে ভর্তি। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'ইস কত এঁচোড়, কেউ খায় না এখানে? দিল্লিতে এসব ভাবাই যায় না।' এরপর যা শুনলাম তাতে এটাই বুঝলাম যে কাঁঠালগাছ প্রত্যেক বাড়িতেই আছে এবং খেয়ে খেয়ে এদের কাঁঠালের নাম শুনলেই ওয়াক আসে। এর পরেই এই কাঁঠাল আমার ঘাড়ে চাপল। সেই ঘটনাটা বলতেই হবে। ফেরার সময় রাউরকেল্লা স্টেশনে এসেছি। কর্তার সঙ্গে প্ল্যান্টের সিনিয়র অফিসাররা। হঠাৎ একটা লোকের উদয় হল। একটা বিরাট বোঝা টানতে টানতে সে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সে আমার কাছে এসে থামল এবং বলল যে মেমসাহেবরা এই কাঁঠাল আমাকে ভেট পাঠিয়েছে। যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে সবাই উৎসুকভাবে এই দৃশ্য দেখছেন আর মুচকি মুচকি হাসছেন। কর্তা ব্যাপারটা আঁচ করলেন। তারপর আমার কাছে এসে বললেন, 'দিল্লিতে হয় তুমি যাবে না হয় কাঁঠাল যাবে।' শেষপর্যন্ত—আমিই দিল্লি গিয়েছিলাম, কাঁঠাল নয়।

আই. এ. এস. অফিসার গিন্নিদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে অল ইন্ডিয়া আই. এ. এস ওয়াইভ্স অ্যাসোসিয়েশন নামে। পশ্চিমবাংলাতেও আছে। এই সংগঠন খুব সক্রিয়। মাঝে মাঝে কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিই। এইভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখি। এই তো সেদিনের কথা। তখন আমরা কলকাতায়। আয়রন সাইড রোডের কোয়ার্টারে থাকি। সংগঠনের সবাই মিলে ঠিক করা হল টাকা তুলতে হবে,

কোনও দুঃস্থ সংস্থাকে সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু কীভাবে? অনেক আলোচনার পর ঠিক হল টাকা তোলা হবে কোনও নতুন সিনেমার প্রিমিয়ার-শো করে। প্রধান অতিথি করা হবে সত্যজিৎ রায়কে। শুরু হল কাজ। আমার থেকে সিনিয়র একজন মেম্বার ও আমি গেলাম সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় ওঁর স্ত্রী দেখা করতে দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। সত্যজিৎবাবু আমাদের কথা শুনতে পেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু শারীরিক কারণে প্রধান অতিথি হতে পারবেন না জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। দেখলাম কী বিশাল ব্যক্তিত্ব! উনি ছাড়াই সিনেমাটির প্রিমিয়ার করেছিলাম। তাতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমাদের অনুরোধ তাঁরা রাখেন। আমাদের অর্থ-উপার্জনও ভালই হয়।

এই সময় সোস্যাল সার্ভিস করার ইচ্ছেটা প্রবল হয়। বেশ কয়েক বছর ভারত স্কাউট ও গাইড সংস্থার সঙ্গে কাজ করি যুগ্ম-সম্পাদক হয়ে। এখানে যোগ দিয়ে বেশ আনন্দ পেয়েছি। মূলত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ দেখতাম। কিন্তু আমাদের ট্রেনিং দিতে হয়েছে, সেমিনার করতে হয়েছে। শুধু তাই নয় গাইডদের সঙ্গে হাসপাতালে, বৃদ্ধাশ্রমে কাজ করতে হয়েছে। সাগর মেলাতেও যেতে হয়েছে সেবামূলক কাজে। এই সংগঠনে এসে এবং গাইডদের ট্রেনিং দেখে মনে হয়েছে যে প্রত্যেকটি মেয়ের স্কুলে গার্লস গাইড আবশ্যিক হওয়া উচিত। স্বেচ্ছায়ও এই ট্রেনিং নেওয়া উচিত সব মেয়েদের। ট্রেনিং প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করে তোলে। অল্প টাকায় অল্প জিনিসের মধ্যে কী করে জীবননির্বাহ করতে হয় সেই ট্রেনিং-ও এর অঙ্গ। আমার প্রশাসনিক ক্ষমতা ও পরিচিতির পরিধি বেশি হওয়াতে কর্পোরেশন স্কুলগুলোতে গাইড আবশ্যিক করেছিলাম। এই সোস্যাল সার্ভিসে আমার যুক্ত থাকার আর কিছু না-বলা কথা শোনালে বোধ হয় ভাল হয়। তখন দিল্লিতে একটি এন. জি. ওর অনুরোধে এক বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলাম গান করতে। আসলে সঙ্গ দেওয়া, সেটাই উদ্দেশ্য। আমার গান শোনার পর ওঁরা খুব উত্তেজিত। বয়স মোটামুটি সবারই ৭০-৯০-এর মধ্যে। ওরা বললেন, 'আমরাও গান শোনাব'। ৮২ বছরের এক বৃদ্ধ, কী বলব যুবক? তাই বোধ হয় বলা উচিত কারণ গান গাইলেন অথচ গলা কাঁপল না, একবারও সুর এদিক ওদিক হল না। তার সঙ্গে সেতারে সঙ্গত করলেন আর এক বৃদ্ধ যার বয়স নব্বই ছুঁই ছুঁই। ভাল লাগল এটা জেনে যে, এঁরা কারওর ওপর নির্ভরশীল নয়। এঁদের সারা জীবনের অর্জিত অর্থ এই বৃদ্ধাশ্রমে জমা রেখেছেন এবং তার থেকেই সবরকম খরচ চলে। প্রত্যেকের ঘরে টিভি, আছে কমিউনিটি হল, সপ্তাহে দু'বার করে ডাক্তার আসেন। এক কথায় 'তোফা' আছেন।

পৃথিবী বর্ণময়, তার অংশভাক আমি। এখনও আমার সামনে বিস্তৃত পথ। পথ চলাটা আনন্দে ভরিয়ে তুলতে হবে। কী হয়নি, কোথায় কোথায় অভাব, আরও পাবার আশা—আর নয়। সংসারের ঘেরাটোপে আবদ্ধ জীবনটা ছোট হতে হতে আরও ছোট হতে চায়। না, এখনই সময় দিন যাপনের গ্লানির উর্ধ্বে উঠে আমার আগামী পৃথিবীটাকে সাদরে গ্রহণ করব। সাজাব যতনে আমার দিনগুলো।

(শেষ)

সমাজমনস্ক চিন্তাবিদ ভাষাচার্য

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরল সংখ্যক মনীষীরই উপাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো জীবিতকালেই প্রবাদপুরুষ হয়ে ওঠার সৌভাগ্য মেলে! এর অন্যতম নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপম উপন্যাসের ইন্টেলেকচ্যুয়াল নায়ক 'অমিট রে'-এর শিলং-এ দেওদার বৃক্ষের ছায়ায় বসে সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব পড়া। তাঁর বহুমুখী জ্ঞানচর্চার জন্য কবিগুরু তাঁকে 'লিপিবাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারত ও বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জাভা-বালিদ্বীপ ভ্রমণের সময়ে ভ্রমণসঙ্গী করবেন—এতে আর আশ্চর্যের কী? কেবল রবীন্দ্রনাথই তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন না, সমসাময়িক কালের দেশি-বিদেশি সর্বোচ্চ বিদ্বৎ-সমাজ দ্বারাও সুনীতিকুমার বারবার নন্দিত হয়েছিলেন।

তবে এসব সর্বজনবিদিত গুণাবলি ছাড়াও সুনীতিকুমারের ব্যক্তিত্বের অপর একটি দিগন্ত ছিল—সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশা এবং তাদের সঙ্গে একাত্ম হবার অসাধারণ গুণ। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান প্রতিবেদকের সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়াছাড়া ভাবে সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যার কথা এই প্রসঙ্গে একটু বর্ণনা করার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন। প্রথম যৌবনে ইংরাজি সাহিত্যিক আলডুস হাক্সলের দুটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছিলাম। তবে তাঁর নামের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বাঙালি সাহিত্যিকদেরই নানা ধরনের বানান ব্যবহার করতে দেখে গ্রন্থ প্রকাশকালে বিভ্রান্ত হয়ে প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের পরামর্শে কর্মভূমি ঝাড়খণ্ড থেকে তাঁকে পত্রাঘাত করি। আমার মতো অতি সাধারণ জিজ্ঞাসুর পত্রের উত্তর তাঁর মতো কর্মব্যস্ত পণ্ডিতের কাছ থেকে পাব কি না এই সংশয়ে যখন দোলাচলচিত্ত, তখন চমৎকার হস্তলিপির এক পোস্টকার্ডে তিনি আমার সংশয় মোচন করলেন। নামের প্রতিবর্ণীকরণ কেন এইভাবে করা হয়েছে তার বিজ্ঞানসম্মত কারণও দু'চার কথায় আমার মতো আদার ব্যাপারীকেও জানিয়েছিলেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে যখন কর্মসূত্রে কলকাতার বাসিন্দা, প্রকাশন প্রতিষ্ঠান মিত্র ও ঘোষ-এর সাহিত্যিক আড্ডায় প্রমথনাথ বিশী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, কালিদাস রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে মাঝে মাঝে সুনীতিকুমারকেও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার ও তাঁদের অন্তরঙ্গ আলাপচারি সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রবণের সৌভাগ্য হত।

তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটল খুব সম্ভব ১৯৭২ খ্রি. বা তার পরের বৎসর। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিবাদী সাহিত্যিক সলঝনৎসিনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'গুলাগ আর্কিপেলেগো'-তে তখন সোভিয়েট সমাজের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার ও মানবাধিকারবিরোধী বিধি-ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করার ফলে দেশ-বিদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনার ঝড় তুলেছে। গ্রন্থটি সম্বন্ধে দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা মাসিক 'কথা সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে সোভিয়েট রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওই রাষ্ট্রেরই কৌশলী প্রচারে সমগ্র বিশ্বে যেসব অতিকথা প্রচলিত হয়েছিল, ইতিপূর্বেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাক্ষ্যপ্রমাণসহ সেসব অতিকথার খণ্ডনকারীদের নামের উল্লেখও তাতে ছিল। হঠাৎ কাকাবাবু, অর্থাৎ 'কথা সাহিত্যে'—এর সম্পাদক গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের ফোন পেলাম। তার সারমর্ম আমার লেখাটি ভাল লাগায় সুনীতিবাবু কাকাবাবুকে ফোন করে লেখকের ঠিকানা নিয়েছেন এবং আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমি হাঁ-হাঁ করে উঠতে কাকাবাবু বললেন, তিনি সুনীতিবাবুকে বলেছেন যে আমিই তাঁর কাছে যাব। সে সময়ে সুনীতিবাবু জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে ন্যাশনাল লাইব্রেরির মূলগৃহের বাইরে একটি বাড়িতে বসে নিয়মিত কাজ-কর্ম করতেন।

নির্ধারিত দিনে যথাসময়ে তাঁর দপ্তরে উপনীত হলাম এবং বলাবাহুল্য 'কলোসাস' সদৃশ এক পণ্ডিতের সান্নিধ্যে প্রাকৃতজনের মতো দুরু দুরু বক্ষে। কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেক পর যখন তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম তখন জ্ঞানের পূতসলিলে অবগাহনের আনন্দনঘন প্রশান্তি আর তৃপ্তি। কী

ঔদার্য ও স্নেহে তিনি এক অসমবয়স্ক ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে তাঁর নখের যোগ্য নয় এমন এক সমাজসেবক ও সাহিত্য যশঃপ্রার্থীকে আপন করে নিয়েছিলেন। এমন রসাল আলাপচারি তাঁর যে তাঁকে বাক্-বাচস্পতি আখ্যা দিতে কোনও দ্বিধা নেই। সোভিয়েট ব্যবস্থা থেকে শুরু করে মার্কসীয় জীবনদর্শন, তাঁর ওদেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সেখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস এবং আরও কত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাঁর অবাধ বিচরণ। কেবল বর্তমানের প্রাপ্তিই নয়। মনে প্রচ্ছন্ন গর্ব ও প্রসন্নতা তাঁর বাসগৃহ বিখ্যাত 'সুধর্মা'-তেও আরও মন খুলে গল্প করার জন্য আমন্ত্রণ জানানোতে। গ্রন্থ আর গ্রন্থ। দোতলার বিশাল ঘরের ছাদ-ছোঁয়া র‍্যাকে সাজানো অসংখ্য পুস্তকের মধ্যে জ্ঞানতাপসের সান্নিধ্যে বসে বহু বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রসমধুর নাগরিক রসিকতারও স্বাদ পাবার সৌভাগ্য একাধিকবার হয়েছিল। তবে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কর্মসূত্রে পাটনা চলে যাওয়ায় সেই সুযোগ আর জোটেনি। পাটনাতে থাকতে থাকতেই ইন্দ্রপতনের খবর শুনে দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছিলাম। কিন্তু সেসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের স্মৃতিচারণ মধুর হলেও আর নয়।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে সুনীতিকুমারের কোনও রচনা একালের বাঙালি পাঠকদের কাছে সহজলভ্য নয়। তাঁর বিখ্যাত ODBL বা Origin and Development of the Bengali Language অথবা তাঁর বৈশিষ্ট্যের বিষয় বঙ্গভাষা-লিপি-সাহিত্যের বিবরণের কথা বলা হচ্ছে না। এসব বিষয়ে, বিশেষজ্ঞ গবেষকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অথবা নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার রয়েছে। আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য সাধারণ পাঠকবর্গ, যাদের রুচি পণ্ডিত সুনীতিকুমারের চোখে দৃষ্ট তাঁর কাল এবং দেশ-বিদেশের মানুষ এবং তাঁদের শিল্প সংস্কৃতির রসসমৃদ্ধ চিত্রণ। তাঁর দৃষ্টিতে বঙ্গদেশের প্রাচীন ও সমসাময়িক মনীষী ও তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদবর্গের কথা। এছাড়া তাঁর মতো এক বিদগ্ধ মনীষীর দ্বারা দেশজ ও বিদেশের ইতিহাস ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যায়ন। কারণ তাঁর বৈশিষ্ট্যের বিষয়সমূহ ছাড়াও এসব বিষয়েও একদা সুনীতিকুমারের লেখনী বহুপ্রসবিনী ছিল এবং তাবৎ উচ্চ শ্রেণির বাংলা পত্র-পত্রিকা ছাড়াও সমসাময়িক অভিজাত বঙ্গভাষার গ্রন্থপ্রকাশকেরা সেসব সমাদরে প্রকাশ করেছিলেন।

॥২॥

সৌভাগ্যের কথা তাঁর রচনাসমূহের একটি সাম্প্রতিক প্রতিনিধিস্থানীয় সংকলন (নির্বাচিত রচনা সংকলন) প্রকাশিত হওয়ায় আধুনিক ও ভবিষ্যৎকালেরও সুরুচিসম্পন্ন বাঙালি পাঠকের সেই অভাব বহুলাংশে দূর হয়েছে মনে হয়।

পাঁচ পৃষ্ঠার 'প্রণতি' অর্থাৎ সংকলক ও সম্পাদক অধ্যাপকের ভূমিকাসহ মোট ২৮৩ পৃষ্ঠার সুমুদ্রিত ও শোভন সংকলন। বারিদবাবুর সংক্ষিপ্ত ভূমিকার দুটি বৈশিষ্ট্য মনে দাগ কাটে। সুনীতিকুমারের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। সব দেশের সব যুগের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন গবেষকদের মতোই সুনীতিকুমারকেও যে অন্ধবিশ্বাসীদের ইনকিউজিশ্যন-এর সম্মুখীন হতে হয় তার বর্তমানে বিস্মৃত ঘটনা হল—পূর্বদেশের রামায়ণে রাম ও সীতার পারস্পরিক সম্বন্ধ সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর এই তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য তাঁর ওপর মানসিক উৎপীড়ন। দুঃখ কেবল এইটুকুই যে এই মনীষীর ওপর উৎপীড়নকারীরা ছিলেন সমসাময়িক বাঙালি সমাজেরই।

তাঁর পূজনীয় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি চিঠির ফোটোকপি দ্বারা সূচনা করে মোট ২৯টি প্রবন্ধকে ছয়টি বিষয়ানুসারী ভাগে বিভক্ত করে রচনাগুলিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বিষয়গুলির উল্লেখ করলেই সংকলনটির বিভিন্ন মাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে। আপনকথা, ভাষা ও সাহিত্য, ব্যক্তি প্রসঙ্গ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভ্রমণ ও শেষের পাতা—এই পর্যায়ে আচার্য সুনীতিকুমারের রচনাগুলি বিন্যস্ত। এই প্রসঙ্গে সংকলক ও সম্পাদকের দায়িত্ববোধেরও বিশেষ প্রশংসা করতে হয় মুদ্রিত প্রবন্ধসমূহের প্রথম প্রকাশ সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিস্তারিত তথ্যদানের জন্য। আরও প্রশংসনীয় রচনাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সম্বন্ধে পূরক এবং কোথাও কোথাও অদ্যতন তথ্যঋদ্ধ পাদটীকাগুলি। এদের মধ্যে দু'টির বিশেষ উল্লেখ করা দরকার সম্পাদকের ভূমিকা উপলব্ধি করার জন্য। ১০৭ পৃষ্ঠায় 'ব্যাকরণকার রামমোহন' রচনায় (প্রথম প্রকাশ ১৩৭৩ সন) সুনীতিকুমার রামমোহনকে মাতৃভাষায় প্রথম ব্যাকরণকাররূপে চিহ্নিত করেন। কিন্তু সম্পাদকের পাদটীকায় জানা যাচ্ছে যে, অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় পরে আবিষ্কার করেন যে, সম্ভবত ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই কোনও সময়ে বাঙালি পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার একাজ করে যান যা সুনীতিকুমারের উক্ত প্রবন্ধ রচনাকালে অজ্ঞাত ছিল। অনুরূপভাবে ১২৩ পৃষ্ঠায় যে কোনও কারণেই হোক, 'বাঙলা সাহিত্যের গোড়ার দিককার কথা' প্রবন্ধের মুদ্রিত পাণ্ডুলিপিতে সম্পাদক চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে

পেলেও পাদটীকায় সংশোধন করে দিয়েছেন যে এটা ১৪৮৬ খিস্টাব্দ হবে।

সুনীতিকুমারের বিশেষ বীক্ষণের ক্ষেত্র 'ভাষা ও সাহিত্য' সম্পর্কিত রচনার সংখ্যা স্বভাবতই সংকলনে সর্বাধিক। নিজ কালে ভাষাচার্য এ সম্বন্ধে প্রায় শেষ কথা ছিলেন বলে তার সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনার পরিবর্তে কেবল তাদের শীর্ষক-এর উল্লেখ করা হচ্ছে এইজন্য যাতে সাধারণ পাঠক এই ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণের বিস্তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারেন। তবে ঐতিহাসিক পরম্পরার জন্য রসিকদের এই এগারোটি রচনার রসাস্বাদন করতেই হবে। রচনাগুলি হল : বাঙলা ভাষার কুলজি, বাঙলা ভাষার বিদেশী শব্দ, বাঙলা উচ্চারণ শিক্ষা, বাঙলা অক্ষরে ইংরাজি নাম ও শব্দ, বাঙলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, স্বরসংগতি অপিনিহিতি অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি, বাঙলা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব্দ সঙ্কলন, ব্যাকরণকার রামমোহন, বাঙলা সাহিত্যের গোড়ার দিককার কথা, সদুক্তিকর্ণামৃত ও বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, আরব্য-রজনী। শেষের প্রবন্ধ অর্থাৎ 'আরব্য-রজনী' বা মূল আরবি ভাষার 'অলফ্ লয়লহ্ ওঅলয়লহ'-এর সুদীর্ঘকালের নানা দেশের চিত্তাকর্ষক ও আরবি ভাবে ও ভাষায় রূপান্তরিত সংকলনের দীর্ঘ ইতিহাস ও আলোচনায় ভারতীয় পাঠক এই তথ্যের পরিচয় পেয়ে হর্ষ বোধ করবেন যে এদেশের 'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্রে'র কাহিনিও তাতে স্থান পেয়েছে।

নির্বিশেষ পাঠককুলের পক্ষে আকর্ষণীয় বাকি সমস্ত রচনার মধ্যে 'ব্যক্তি প্রসঙ্গ'-এর অন্তর্ভুক্ত ছয়টি রচনাই বিশেষ উল্লেখনীয়। আধুনিক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা, তথা নারীস্বাধীনতার পুরোধা বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গের উপসংহারে সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের যে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন তা বাঙালির মনে যত অনুরণন তোলে তার ততই মঙ্গল

> '...দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব—এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।'

এই পর্যায়ের সমান গুরুত্বপূর্ণ 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলা ভাষা' 'ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ' রচনা দু'টির কথা বাদ দিলে মানবীয় সংবেদনায় ওতপ্রোত, চিত্রশিল্পীর নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত শরৎচন্দ্র, শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও একালে প্রায় বিস্মৃত মার্জিত রস-সাহিত্যিক তাঁর ছাত্র এবং বন্ধুস্থানীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। কেবল সাহিত্যেই নয়, বাস্তব জীবনেও শরৎচন্দ্র ছিলেন দরদি। সেই দরদি ব্যক্তিরই অপর মানুষের কাছে অকারণ আঘাত পেয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে বিষ পানের সত্যকাহিনি শুনিয়েছেন সুনীতিকুমার তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে। এক নারীর পদস্খলনের ঘটনার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী দরদ কথাকারের অসহায় প্রশ্ন, তবে কি আমরা ভুলপথে চলেছি? তাঁর সহপাঠী ও সুহৃদ নট শিশিরকুমার এক নিদারুণ পারিবারিক বিপর্যয়ের পরিণামে স্ত্রীকে হারিয়ে এমন আত্মসঙ্কোচনশীল অভিমানী ব্যক্তিত্বের কারাগারে বন্দি হন যে নাট্যপরিচালক রূপে দেশ-বিদেশে খ্যাতি পেলেও বৃহত্তর সমাজ প্রায়শ তাঁকে ভুল বুঝত। নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে খদ্দরধারী রবি মৈত্র অভুক্ত অবস্থায় দরিদ্রতমদের সেবায় সদা-সর্বদা নিবেদিত-প্রাণ থাকার মধ্যেই যেন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে বাঙালি পাঠককে দিয়ে গেছেন বহু কবিতা ও অন্যবিধ রচনাসহ 'থার্ড ক্লাস' ও 'মানময়ী গার্লস স্কুল'-এর মতো পরিশীলিত রঙ্গরসের গল্পগ্রন্থ ও নাটক। শেষেরটি তো বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।

বক্তব্যের আকার ইতিমধ্যেই দীর্ঘায়তন হয়ে পড়ায় 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি', পর্যায়ের রচনাপাঁচটি যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের কথা বাদ দিয়ে অপরাপর পর্যায় থেকে স্বৈরাচারীর মতো কয়েকটি বেছে নিয়ে তাদের বিশেষ উল্লেখ করা হচ্ছে। সর্বশেষ 'যত মত তত পথ' প্রবন্ধটির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহনশীলতা অথবা বহুত্ববাদী মানবীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার অনুসরণে নামকরণ। বহুত্বের সৃষ্টি নিত্য পরিবর্তনশীল কালের ধর্ম। আবার বিভেদের মাঝে একত্ব-উপলব্ধি এ-ও সুসংস্কৃত মনের ধর্ম। হিন্দু বা ভারতীয় শিক্ষায় চিরকালই যে এই সত্য ক্রিয়াশীল ছিল তার একাধিক পুরাতন শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপনা করেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এক শ্রেণির শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে নূতনের আকর্ষণে পুরাতন সব কিছুকে অস্বীকার করে বিশ্বমানবিকতার প্রতি অতিমাত্রায় ঝোঁক দিয়ে denationalised বা স্বাজাত্য বর্জিত এবং সঙ্গে সঙ্গে deracine বা মূলোৎখাত হয়ে পড়া এবং সেকিউলারিজমের নামে ঈশ্বরে বিশ্বাসবিহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তা যে 'পরিধির মোহে, centre বা কেন্দ্র, যাঁতার খোঁটা বা নাভিকে ভুললে সোনা ফেলে

আঁচলে গিরা দেওয়া হবে'—এই ভয়ও তিনি ব্যক্ত করেছেন। উপসংহারে বলেছেন, 'আমার নিজের একটা কিছু থাকলে তবেই তো তার সঙ্গে আর কিছু মেলাতে পারবো' (পৃ: ২৮১ ও ২৮৩)। মনীষী-চিন্তকের বক্তব্যের সঙ্গে সাধারণত ঐকমত্য ব্যক্ত করেও স্বাধীনতার ঠিক পরপরই কিছু কিছু মানসিক উৎকেন্দ্রিকতা লক্ষ করা গেলেও তার জন্য 'সেকিউলারিজিম'-এর মতো একটি ইঙ্গিতগর্ভ সম্ভাবনাপূর্ণ শব্দের প্রতি ভাষাচার্যের এমন অপ্রসন্নতা সম্ভবত কোনও সাময়িক আঘাতজনিত মনোকষ্টের কারণ।

সুনীতিকুমারের 'রসে-বশে' অধিষ্ঠিত মানসিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সংকলনের 'আপনকথা' ও 'ভ্রমণ' পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য তিনটি হল 'আমার ছেলেবেলার কথা', 'শৈশব স্মৃতি' ও ভ্রমণ পর্বে 'কাবুলীওয়ালা সহযাত্রী'। স্মৃতি সততই সুখের বিশেষ তা যদি লেখকের পক্ষে বাল্য ও শৈশবকালের হয়। আর একালের বঙ্গভাষী পাঠকদের পক্ষে, যখন স্মৃতিচারণের কাল হল ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার শেষ দশক, যখন শহরে অধিকাংশই কাঁচা বাড়ি ও গোলপাতার ছাউনি, কলের জল নেই। মোটর গাড়ি বা বিদ্যুৎচালিত ট্রাম-গাড়ির অস্তিত্ব নেই, যান বলতে পদযুগল অথবা ধনীদের পক্ষে পাল্কি-ডুলি কিংবা দ্রুত গমনের জন্য অশ্বযান। পিতৃদেব মাসিক ৪০ টাকা আয়ের মধ্যবিত্ত কেরানি হলেও তাঁর পিতা-মাতা এবং স্ত্রী ও ছয়টি সন্তানসহ বৃহৎ সংসার। তবে বাঙালির প্রধান খাদ্য চাল আড়াই টাকা মণ এবং ডালের দামও অনুরূপ। একালের পাঠক মূর্ছা যাবেন না, সুনীতিকুমারের পিতামহ বংশধরদের সুস্থ রাখার জন্য নিত্য গরমভাতে 'খুব খানিকটা ঘি খাওয়ানোর' ব্যবস্থা রেখেছিলেন যার মণ তখন ৩২ টাকা। বলাবাহুল্য, সুনীতিকুমার সেই ঘিয়ের মর্যাদা রেখেছিলেন জীবনের সায়াহ্ন অবধি প্রায় মল্লবীরের মতো স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আর মেধা? স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে নয় বৎসর বয়সেই মায়ের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়েছিলেন ও মায়ের সেই তৃপ্তিমণ্ডিত মুখচ্ছবির প্রেরণায় পরে আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সুনীতিকুমারের বর্ণনা একাধারে ইতিহাস ও কাব্য।

গয়া থেকে কলকাতায় পরের দিন সকালেই কাজের তাগিদে ফেরার জন্য অতীব জনাকীর্ণ রেলগাড়ির যে তৃতীয় শ্রেণির কামরায় প্রায় জোর করেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত সুনীতিকুমার উঠে পড়লেন তার দখলকারী একদল কাবুলি জবরদস্তি করে আর কাউকে সেযাবত তাতে উঠতে দেয়নি। বাঙালির এমত স্পর্ধা দেখে যখন পাঠানদল তাঁকে প্রায় দৈহিক নিগ্রহের উপক্রম করেছে তখন অধ্যাপক প্রবরের প্রাণ-মান বাঁচাল তাঁর ফারসি ভাষা ও আফগানিস্তানের ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতির জ্ঞান। প্রধানত পুস্তভাষী কাবুলিদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফারসি চর্চা সমাদরের বিষয়। সুতরাং অচিরাৎ আলিমের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি নিরুপদ্রবে কেবল নিদ্রার সুযোগ পেলেন না, যে কয়জন ফারসিনবিশ তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁদের দৌলতে বেশ আসর জমিয়ে অন্যবিধ সাংস্কৃতিক আলোচনাসহ কাবুলিওয়ালার গানও (হ্যাঁ, তাঁর বায়নামতো একেবারে, খুশহাল খাঁ খট্টক-এর পুস্ত গজলও) যথাস্থানে তারিফের 'ওয়াহ্' 'ওয়াহ্' ধ্বনি উচ্চারণ করে এক রাতের মধ্যে একান্ত আপন হয়ে গেলেন। একজন পাঠান তো এতটা প্রসন্ন হয়ে উঠল যে তাঁর প্রতি নির্ভরতা দেখাতে তাদের হিসাব রক্ষকের পদ দিয়ে কাবুলিদের কামরায় সফররত বাঙালির প্রতি অন্য ভারতীয় যাত্রীদের সন্দেহ নিরসনের দায়িত্বও বুক ঠুকে নিয়ে নিল। বঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতির সৌভাগ্য, অধ্যাপকপ্রবরকে শেষমেশ 'কাবুলী ব্যাঙ্ক'-এর হিসাবনবিশ আর হতে হয়নি।

বিশ্ববীক্ষার মানসঋদ্ধ কীর্তি-কাহিনি শ্রবণ করলেও একালের সুরুচিসম্পন্ন বাঙালি পাঠকের কাছে তাঁর রচনা সহজলভ্য ছিল না। সংকলক-সম্পাদক ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে পুনরপি ধন্যবাদ যে অনন্য পণ্ডিতের বিভিন্ন স্বাদের রচনার এই সুমুদ্রিত ও সুশোভন সংকলন উচিত মূল্যে তাঁরা একালের পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ গ্রন্থ যে বহু সমাদৃত হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নির্বাচিত রচনা সংকলন; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়— সংকলক ও সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ/মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩/২৫০.০০।

নদী ও নারী : নদীমাতৃক বাংলাদেশের এক মানবিক উপাখ্যান

প্রসাদরঞ্জন রায়

আলোচিত বইটি প্রয়াত অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের একমাত্র উপন্যাস। এটি প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে চলে গিয়েছিল। সুবর্ণরেখা বইটি পুনঃপ্রকাশ করে গুণীজনের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'পূর্বভাষ' নামে একটি তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি সুন্দর মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। তিনিও সাহিত্যপ্রেমীদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বাস্তবে কেবল এই উপন্যাসটি নয়, হুমায়ুন কবিরের মতন উদারচেতা, শিক্ষিত, মনস্বী মানুষও কেমন করে জানি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছেন। তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কুমারপুর গ্রামে এক শিক্ষিত ও সম্পন্ন পরিবারে। তাঁর পিতা প্রয়াত কবিরউদ্দিন আহমেদ ও পিতামহ দু'জনেই উদার ও স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। দু'জনেই ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে খান বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন। জেলা থেকে সাফল্যের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়তে আসেন প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরাজি সাহিত্যের ডাকসাইটে ছাত্র, তিনি বি এ ও এম এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে ১৯২৮ সালে অক্সফোর্ডে পড়তে যান। ১৯৩১ সালে সাফল্যের সঙ্গে 'মডার্ন গ্রেটস' বিষয়ে পাঠক্রম শেষ করে দেশে ফেরেন। ইতিমধ্যেই কবি হিসাবে তাঁর কিছুটা নামডাক হয়। ১৯৩২ সালে তিনি নবগঠিত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন, পরের বছর আসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজনীতিতে যোগ দেন ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিতে (১৯৩৭-৪৭)। কৃষক ও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিয়ে তিনি বরাবরই সরব ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সচিব হিসাবে কাজ করেন এবং প্রবেশ করেন কংগ্রেস রাজনীতিতে। মৌলানা আজাদ যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, তখন তিনি যুগ্ম শিক্ষাউপদেষ্টা, শিক্ষাসচিব ও ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সভাপতি রূপে কাজ করেন। মৌলানা আজাদের বিখ্যাত বই *India Wins Freedom* তাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশ পায়। ১৯৫৬ সালে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন ও ১৯৫৭ সাল থেকে আমৃত্যু ছিলেন বসিরহাটের সাংসদ। এর মধ্যে দু'বার তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন, বিভিন্ন সময়ে ছিলেন অসামরিক বিমান চলাচল, বিজ্ঞান ও গবেষণা এবং সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রী। শেষ জীবনে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বাংলা কংগ্রেস দল গঠন করেন। পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পিছনে তাঁর অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৯ সালের ১৮ই অগস্ট তাঁর প্রয়াণ হয় আকস্মিক হৃদ-বৈকল্যে, অপেক্ষাকৃত কম বয়সে। ত্রিশ বছরের ওপর সরাসরি রাজনীতিচর্চা করলেও লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয়নি। বাগ্মী হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল এবং অক্সফোর্ডে হার্বার্ট স্পেন্সার বক্তৃতামালায় আইনস্টাইন ও বারট্রান্ড রাসেল বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু রোমান্টিক কবি হিসাবে—*স্বপ্নসাধ* (১৯২৮), *সাথী* (১৯৩০) ও *অষ্টাদশী* (১৯৩৮) কাব্যগ্রন্থ দিয়ে। তিনি উর্দু থেকে *মুসাদ্দাস-এ-হালি* বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯৩৯ সাল থেকে আমৃত্যু সম্পাদনা করেছেন *চতুরঙ্গ* পত্রিকা। এর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর *Men and Rivers* (১৯৪৫), যার সামান্য পরিবর্তিত রূপ এই *নদী ও নারী* উপন্যাস। এটি তাঁর একমাত্র উপন্যাস। এরপরে ১৯৫৮ সালে *Green and Gold* নামে তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন অনেক—ইংরাজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য *Kant on Philosophy in General* (১৯৩৫), *Immanuel Kant* (১৯৩৬), *Poetry, Monads and Society* (১৯৪১), *শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব* (১৯৪২), *মোসলেম রাজনীতি* (১৯৪৩), *বাংলার কাব্য* (১৯৪৫), *Rabindranath Tagore* (১৯৪৫), *The Indian Heritage* (১৯৪৬-৬০), *মার্ক্সবাদ* (১৯৫১), *নয়া ভারতের শিক্ষা* (১৯৫৫), *Education in India* (১৯৫৬), *শিক্ষক ও শিক্ষার্থী* (১৯৫৭), *Science, Democracy and Islam* (১৯৫৫), *Mirza Abu Talib Khan* (১৯৬১), *Delhi-Washington-Moscow* (১৯৬৪), *The Bengali Novel* (১৯৬৮), *Education For Tomorrow* (১৯৬৮), *Minorities in a Democracy* (১৯৬৯) প্রভৃতি। অথচ সামগ্রিক বিচারে দার্শনিক, কবি, লেখক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক এই মানুষটিকে নিয়ে 'পর্যালোচনা পশ্চিমবাংলায় তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে'।

গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গটি আলোচ্য বইয়ের পূর্বভাষে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুন্দরভাবে করে গেছেন। বইটির রচনাকাল নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি আছে, প্রথম সংস্করণে প্রকাশনা-কাল উল্লেখ করা হয়নি, পরে কোথাও ১৯৪৫ আবার কোথাওবা

১৯৫২ উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত তথ্য-প্রমাণ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে যে *Men and Rivers* প্রথম প্রকাশ করেন হিন্দ কিতাব্‌স ১৯৪৫ সালে। এর বছর পাঁচেক বাদে ১৩৫৭ সনে (ইং ১৯৫০-৫১) *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় দুই কিস্তিতে *নদী ও নারী* উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটি *পদ্মা* নামে প্রকাশিত হয়, বর্তমান গ্রন্থে খণ্ডটির নাম *নজু মিয়া*। ১৯৫২ সালে ওরিয়েন্ট লংম্যান *নদী ও নারী* সম্পূর্ণ উপন্যাসটি প্রকাশ করেন। প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই বুদ্ধদেব বসু *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় এর সমালোচনা প্রকাশ করেন। এ বইটি পরবর্তীকালে তেমন সুলভ ছিল না। ২০০১ সালে বাংলাদেশ থেকে মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ্ সম্পাদিত *উষালোকে* পত্রিকায় এই উপন্যাসটি নিয়ে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তখন সম্পূর্ণ উপন্যাসটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। ২০০৯ সালে সুবর্ণরেখা প্রকাশ করেন এই নতুন পুনর্মুদ্রণ। আজ আমরা ভুলেই গিয়েছি যে ১৯৬৫ সালে ঢাকা থেকে সাদেক খানের পরিচালনায় *নদী ও নারী* চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। তা যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে *নদী ও নারী Men and Rivers* বইয়ের ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নয়, স্থানে স্থানে যথেষ্ট পরিবর্ধন করা হয়েছে। নামেও পরিবর্তন ঘটেছে।

বলা হয়েছে *Men and Rivers* 'যেন আবহমান প্রকৃতির বিরুদ্ধে সর্বকালীন মানুষের সংগ্রামের কাহিনী' কিন্তু '*নদী ও নারী* তার অধিকন্তু'। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন '*নদী আর নারী* তো বাংলা সাহিত্যে তুল্য শব্দই। প্রকৃতি-স্বভাবা নারীর 'মোহ' থেকে কর্মব্রতী মানুষকে দূরে থাকতে হয়। নদীর সঙ্গে লড়ে ছিনিয়ে নিতে হয় জীবন-কণা। আর কুমারী মাটিকে চষে শস্যবতী করে তুলতে হয়। তার জন্য লাগে পুরুষের প্রবল কর্মোদ্যম।' নদী বলতে এখানে অবশ্যই পদ্মা আর পদ্মাপারের চরের জমিতে মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনিই এর উপজীব্য। পদ্মানদী-কেন্দ্রিক আরেকটি উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি*-তে কুবের মাঝদরিয়ায় তার হৃদয়ের শুশ্রূষা পেয়েছিল, কিন্তু *নদী ও নারী* ভিন্ন ধর্মের উপন্যাস। নারীর ভূমিকা কাহিনিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আহত হৃদয় নিয়ে নায়ক মালেক নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে নদীপথ ধরেই। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমালোচনায় লিখেছিলেন এই উপন্যাসের পদ্মা 'বর্ষায় প্রখর, শরতে সুন্দর, কালবৈশাখীর চরের সন্ধ্যায় ভয়াল, অপমৃত্যুর আধার, প্রাণের পালয়িত্রী—আবার সুদীর্ঘ অনাবৃষ্টির পরে হঠাৎ বর্ষণে বন্যাস্ফীতা সর্বগ্রাসিনী'। তাই তো পদ্মা 'কীর্তিনাশা'। হুমায়ুন কবিরের নিজের ভাষাও নদী বর্ণনায় অনবদ্য। তাঁর জন্ম ফরিদপুরে আর ফরিদপুর জেলার পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মা। তাছাড়াও শীতলক্ষ্যা, কুমার, আড়িয়াল খাঁ, বরাসোন প্রভৃতি নদী আছে সে জেলায় আর চর ভদ্রাসন, চর ঝাউকান্তা, ডিক্রির চর, চর মাধবদিয়া প্রভৃতি মৌজার নাম সেখানে নদীচরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। সুতরাং পদ্মা নদী ও চরের জীবনযাত্রার ব্যক্তিগত জ্ঞান লেখকের ছিল বলেই মনে হয়। অন্যদিকে পদ্মা নদীকে ঘিরে জীবনের আবর্ত খুব স্পষ্ট ভাবে ধরা দিলেও এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি—আয়েষা, আমিনা, কুলসুম ও নুরু কিছুটা আবছায়ায় রয়ে গেছে। তাদের মনের কথা সব সময় ধরা পড়েনি।

কাহিনির শুরু প্রথম খণ্ডে, যার নাম *নজু মিয়া*। নজু মিয়াই এই পর্বের নায়ক। কাহিনি শুরু হবারও আগে একদিন নজু মিয়া কিশোর বয়সে মাতব্বর রহিম বখ্‌সের সঙ্গে জমিজমার খোঁজে ভিন দেশে পাড়ি দিয়েছিল, পদ্মাকে দেখে তার মনে হয়েছিল যেন 'সমুন্দর'। রহিম বখ্‌সের নেতৃত্বে তারা বহু পরিশ্রমে সেই পদ্মার চর হাসিল করে সেখানে সোনার ফসল ফলায়। নজু মিয়া আর তার দোস্ত আসগর ছিল সেই দলে। মাঝের কাহিনি তখনও অজানা। যখন উপন্যাসের শুরু, তখন নজু মিয়া সেই পত্তনের পঞ্চায়েত আর তার প্রাণের বন্ধু আসগর তার দুশমন। মা আয়েষা আর মাতৃহারা ছেলে মালেককে নিয়ে তার সংসার। বাইরে নজু মিয়া কঠিন-কঠোর, কিন্তু পুত্র-অন্ত প্রাণ তার। কাহিনির সূত্রপাত এই মালেকের বঁড়শি দিয়ে এক কুমীর গাঁথা নিয়ে। নতুন চর উঠেছে, তা হাসিল করতে যেতে নজু উদগ্রীব কিন্তু সেই চরের এক অংশ দখল করল তার দুশমন আসগর। দু'জনের ঝগড়া-বিবাদ হল না বটে, দু'জনেই মনে মনে যেন ফুঁসছে। শুধু নজুর কানে ভাসছে ধূলদির হাটে ফকিরের শেষ কথাগুলি—'হায় বেওকুফ নজু, দোস্তকে দুশমন বানালি আর এখন জীবনের শেষ পাড়ি দেওয়ার সময় আবার নতুন ঝগড়া ফ্যাসাদ! ঈশান কোণে ঝড়ের রেখা, নদীর জল দুলছে, তুফানে নৌকো মাতালের মতন টলছে, বাজপাখির মতন অন্ধকার মেঘের ছোঁ—সে বিপদের দিনে কে তোমাকে বাঁচাবে? যাও যাও, সব ঝুট, দুদিনের দুনিয়া, দুদিনের জিন্দেগি, আর তাই নিয়ে এত ঝগড়া ফ্যাসাদ। এত কাজিয়া। রহম কর আল্লা...'। কাজে হলও তাই। বসির, ইদ্রিস, রমজানকে নিয়ে বৈশাখে নৌকোয় পাড়ি দিল নজু, উদ্দেশ্য চরের জমি থেকে টাকা আদায়। তখন বৈশাখ মাস—'যৌবনের শেষে পাঁজরার হাড়ের মতো এখানে ওখানে চর জেগে উঠেছে। পালিশ করা ইস্পাতের মতো আকাশ, পালিশ করা ইস্পাতের মতো নদীর জল।' এতো ভাদ্র মাসের ভরা নদী নয়, নিতান্তই শীর্ণা। তবু হঠাৎ হাওয়া উঠল, কালো

মেঘে ভরে গেল আকাশ, হাল ভেঙে পাল ছিঁড়ে নৌকোটিকে গ্রাস করল পদ্মার জল। তারপর সব শান্ত হয়ে এল। এখানেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম *আসগর*। আসগরেরই এতে মুখ্য ভূমিকা। নজু মিয়ার মৃত্যু সংবাদের সাতদিনের মধ্যেই নদীর ধারে দেখা গেল তার মা আয়েষার মৃতদেহ। মালেকের বাড়ি হয়ে উঠল হতশ্রী। সাধ্যমতন তার দেখাশোনা করত কাজের লোক বসির যে সেই মৃত্যুপথযাত্রীদের সঙ্গে থেকেও কেমন করে জানি ফিরে এসেছে আর যুবতী কুলসুম। প্রচুর জমিজমার মালিক হয়েও মালেক তখন এতিম (অনাথ)। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা-ঝগড়াঝাঁটি করে মালেক বড় হচ্ছে। তখন তার নতুন বন্ধু জুটে গেল এক ফুটফুটে মেয়ে নুরু। শুনল সে আসগার মিয়ার মেয়ে। সে তো আশ্চর্য! আসগরের যে বউ আছে তাই কেউ জানত না। নজুর মৃত্যুর পর আসগর তখন গ্রামের পঞ্চায়েত। বসির আর কুলসুমের খুব চিন্তা কেমন করে মালেকের সম্পত্তি রক্ষা করা যায়। শেষে বসির আসগর মিয়ার কাছেই যায় নাবালকের সম্পত্তির তদারকের জন্য। আসগর সহজে রাজি হয়নি, গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করেই এ দায়িত্ব নেয় সে। ততদিনে মালেক-নুরুর ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে, আসগরের বাড়িতে মালেকের অবাধ প্রবেশাধিকার। নুরুর মা আমিনাকে সে ডাকে 'চাচী-আম্মা', তিনিও মালেককে কোলে তুলে নিলেন। তিনি বেহেস্তের হুরি-পরীর মতন সুন্দরী। এই সুখের সময় হঠাৎ এল আকাল। পর পর তিন বছর বৃষ্টির দেখা নেই, মাঠ ফুটি-ফাটা। সবাই যেন শুকিয়ে মরছে। আবার যখন বৃষ্টি নামল, চারদিন টানা প্রবণ বর্ষণ—'রাক্ষসী পদ্মা ছুটে এল গাঁয়ের মধ্যে', সর্বগ্রাসী বন্যায় গ্রামের শেষ চিহ্নটিও মুছে গেছে। আসগর আর তার স্ত্রী আমিনা এবার ভেঙে পড়ল। বছর পনেরোর মালেক তাদের সাহস জোগায়।

তৃতীয় খণ্ডের নাম *নুরু ও মালেক*। মালেকের উৎসাহেই আসগর পাড়ি দিল পদ্মা-মেঘনার মোহনায় বিয়ানচরে। নতুন করে জমি হাসিল করে নতুন জীবন গড়ে তুলবে। কিন্তু এ ধাক্কা সামলাতে পারেনি আমিনা বিবি। সেখানে নতুন বসতের ধারেই তাকে গোর দেওয়া হল। মালেক আর বৃদ্ধ আসগরের পরিশ্রমে সে চরেও সোনা ফলল। মালেকের তখন পূর্ণ যৌবন, নুরুও পনেরোয় পা দিয়েছে। আসগর মিয়া আবার দশ গাঁয়ের সর্দার। মালেক-নুরুর সম্পর্কও আরও গভীর হয়ে উঠেছে। মালেক ভাবে আল্লা মেহেরবান! হঠাৎ একদিন মালেক নদী থেকে আর ফিরল না। সারা গ্রামে বিষাদের ছায়া। অনেকদিন পরে জেলে নৌকোয় ফিরল মালেক। শোনা গেল তার রোমাঞ্চকর কাহিনি। কুখ্যাত মগ জলদস্যু মংপোর হাতে বন্দি হয়েছিল সে। মংপো তাকে মারেনি, কিছুটা ভালই বেসেছিল। ঝড়-তুফানে একদিন তাদের জাহাজ ধাক্কা খায় কূলে। তখন জেলেরা তাকে উদ্ধার করে। বিয়ানচরে উৎসব লেগে গেল। তোলপাড় মালেক আর নুরুর মনেও—'প্রথম প্রেমের সোনার আলোকে তাদের পৃথিবী ভরপুর—বিরহের কালরাত্রি অবসান হয়ে সে আনন্দ আরও উপছে পড়ছে'। কিন্তু তাদের শাদির প্রশ্নে আসগর মিয়া যেন নির্বিকার। শেষে সরাসরি অস্বীকার করে বসল। মালেক জানতে চায়, এ কি নজু মিয়ার ওপর প্রতিশোধ? তখন আসগর তাদের নিয়ে যায় আমিনা বিবির কবরে। রুদ্ধ কণ্ঠে জানায় তারা ভাইবোন। আসগরের মামাতো বোন ছিল আমিনা। ছেলে বয়স থেকে দু'জনের ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু আসগরের বিষয় সম্পত্তি ছিল না বলে মামিমা জোর করে নজুর সঙ্গে তার শাদি দেয়। সেই রুদ্ধ আক্রোশে আসগর হয়ে দাঁড়ায় নজু মিয়ার দুশমন। কিন্তু নজুর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। মালেকের জন্মের পর আমিনাকে তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দেয় নজু। সহায়-সম্বলহীনা আমিনাকে শাদি করে আসগর। কিন্তু ব্যাপারটা গোপন থাকে। আমিনাকে গ্রামেও আনেনি সে, ভিন গ্রামেই নুরুর জন্ম। নজুর মৃত্যুর পর তাদের নিয়ে আসে গ্রামে। সমস্ত ঘটনা শুনে নুরু ও মালেক স্তম্ভিত। কিন্তু মালেক আর ঘরে ফিরল না, বলে গেল 'আমিও নদীর মানুষ—বালুচরে ঘর আমিও বাঁধব'। নিরুদ্দেশের টানে 'তারার আলোয় পথ খুঁজে সে কোন নবপ্রভাতের সন্ধানে চলে গেছে কে জানে?'

উষালোকে পত্রিকার ওই বিশেষ সংখ্যায় জাফর আহমেদ রশিদ একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন 'এ উপন্যাস যখন লিখিত হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে, সেটা বাঙালি মুসলমানের জন্য একটি ক্রান্তিকালই বটে। আবার সম্ভাবনার কালও।' এ উপন্যাসে অবশ্য বাঙালি মুসলমানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা স্থানই পায়নি। আসলে মূল চরিত্র সবাই তো বাঙালি মুসলমান কৃষক। একথাও মনে করা যেতে পারে যে যারা নদীচরে নিত্য জীবনসংগ্রামে লিপ্ত, তাদের রাজনীতির সময় কোথায়? সেইসঙ্গে লেখক অক্লেশে ব্যবহার করেছেন দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত 'মুসলমানী বাংলা'—'সুবহে ফজরের প্রথম অনিশ্চিত আলোক', 'হাজার শোকর আল্লাতালার', 'মৌলুদ শরীফের বন্দোবস্ত', 'গায়েবী মানুষ—মনের কথা জানতে পারে', 'আমরা খোদার বান্দা', 'রহম কর আল্লা', 'দহলিজ বেছানো', 'কোরান তেলাওয়াতের পরে ওয়াজ', 'জিয়াফত', 'এসব কথা শুনলেও গোনাহ হয়', 'খোদার কাছে মোনাজাত করেছি' বা 'আল্লার রহমে তোর কোলে ছেলে আসবে'। কিন্তু এত

স্বাভাবিকভাবে এসব শব্দ বা বাক্যাংশ প্রয়োগ করা হয়েছে যে পাঠকের একটু হোঁচট লাগে না, মানে বুঝতে কোথাও আটকায় না। বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পদ্মাপারের জীবনের কাহিনি পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই শব্দচয়ন। সেইসঙ্গে সুনিপুণ প্রয়োগ হয়েছে গ্রাম্য প্রবাদ-প্রবচন বা ছড়ার। কুমিরডাঙ্গা খেলায় এ বাংলায় বলা হয় 'ও কুমির তোর জলকে নেমেছি', পূর্ব বাংলার ছেলেরা অক্লেশে বলছে 'এতটুকু পানি/ঝপর ঝানি। এ গাঙে কুমির নাই/ঝাপুর ঝুপুর নেয়ে যাই'। আবার এ বাংলায় বৃষ্টি থামানোর ছড়া 'যা বৃষ্টি ধরে যা/ লেবুর পাতায় করমচা' আর ওই বাংলায় আকালের দিনে বৃষ্টি নামানোর ছড়া 'কচুর পাতার হলদি/বৃষ্টি নাম জলদি' অথবা 'কচুর পাতায় করমচা/আয় বৃষ্টি নেমে যা'।

বুদ্ধদেব বসুর মতে এটি ঠিক উপন্যাস নয়, 'উপাখ্যান বা ক্রনিক্‌লস জাতীয়'। তবে স্বীকার করতেই হবে যে নিপুণ চিত্রকল্পের প্রয়োগে তিনি পদ্মাপারের জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সব মিলিয়ে এটি 'শরৎ আলোয় ফুটে ওঠা এক অনাবিল কমলকলিকা'। ভাবতে গর্ব হয় যে *চতুরঙ্গ* পত্রিকার প্রাণপুরুষ হুমায়ুন কবিরের প্রায়বিস্মৃত এই বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হবে তাঁরই পত্রিকায়। সেইসঙ্গে লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় সমালোচকের অক্ষমতা, কারণ ৫৮ বছর আগে এই পত্রিকায় এই বইয়ের সমালোচনা করেছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু! এই লেখাটি যতটা সমালোচনা, তার চেয়ে বেশি এক মহান স্রষ্টার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি!

নদী ও নারী—হুমায়ুন কবীর/প্রথম প্রকাশ : ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৫২/পুনর্মুদ্রণ : সুবর্ণরেখা, ২০০৯, কলকাতা-৯/ ১৫০.০০

ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে সংঘর্ষ ও সমন্বয়

আমজাদ হোসেন

আলোচ্য গ্রন্থটি ভূয়োদর্শী, স্থিতপ্রজ্ঞ ও বিশিষ্ট গান্ধীভাবুক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঠারোটি বিদগ্ধ ও মননশীল প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলির কেন্দ্রীয় বিষয় ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। এই বিষয়টিকে সম্যক বিচার ও বিশ্লেষণ করার জন্য উপলক্ষ হিসাবে লেখক বেছে নিয়েছেন কখনও তাঁর পঠিত বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনা, কখনও কোনও ব্যক্তির স্মৃতিচারণ বা মূল্যায়ন, কখনও ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ-এর পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচনা, কখনও বা কার্গিল যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির বা গুজরাত দাঙ্গার মতো ঘটনার সমীক্ষা। সবশেষে 'গান্ধীজি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' নিয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধও আছে।

স্বাধীনতা-উত্তর গণতন্ত্রী ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক লেখকের বিবেচ্য হলেও বিষয়টিকে তিনি ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিতে রেখেই বিশদে আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি তাঁর প্রথম প্রবন্ধে ('হিন্দু মুসলমান : সমন্বয়-সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে') ভারতের ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী পাঠান ও মোগল শাসকদের আমলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে কীভাবে একটি সমন্বয় প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল হয়েছিল, তার ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থের তথ্যের ভিত্তিতে। প্রথমে তিনি অধ্যাপক মুজফ্‌ফর আলমের গবেষণা-পত্রের বিষয় উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক আলম দেখিয়েছেন যে জিয়া-উদ-দীন বরনী 'ফতোয়া জাহানদারি' নামে শরিয়তের যে কট্টরভাষ্য নির্মাণ করেছিলেন, তা তখনকার সুলতানরা সর্বদা মেনে চলতেন না। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে বিপুল সংখ্যক অমুসলিমদের দেশ ভারতবর্ষে সুশাসন ও প্রজাদের মঙ্গলের জন্য স্থানীয় ঐতিহ্যকে গ্রহণ করা দরকার; তাঁরা হিন্দুদের রাজদরবারে উচ্চপদ দিতেন এবং ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরকরণের কোনও প্রয়াস করেননি। তেমনই বাবর, আকবর থেকে জাহাঙ্গির-শাহজাহানের মতো মোগল সম্রাটরা নাসির-উদ-দীন তুসির 'আখলাখ' (নীতিশাস্ত্র)-এর উদার ও আদর্শবাদী ভাষ্য অনুসরণ করে প্রজাশাসন করতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত, গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানসাধক তুসির গ্রন্থটি ছিল আদি ইসলামের নির্দেশ, পরবর্তী ইসলামি ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ও গ্রিক দার্শনিকদের রাজ্যশাসন পদ্ধতি সংক্রান্ত নির্দেশাবলির সমন্বয়। এই গ্রন্থটি মোগল শাসকদের নীতি-নির্ধারক হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থের প্রভাবেই মোগল সম্রাটরা অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করতেন। এমনকী ঔরঙ্গজেবের সময়েও পৌত্তলিকদের ধর্মাচরণে

প্রত্যক্ষ ভাবে বাধা দেওয়া হত না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফরাসি পরিব্রাজক বের্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে। লেখক মুজফ্‌ফর আলমের গবেষণাপত্রের নামটি উল্লেখ করেননি। অধ্যাপক আলম ২০০৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'The Languages of Political Islam in India 1200-1800' নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

এই দীর্ঘ সময়পর্বে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় যে সর্বাঙ্গীন হয়নি, এটাও সত্য। এর অন্যতম কারণ হিসাবে মুসলমান শাসকদের দ্বারা হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন, ধ্বংস ও অপবিত্রকরণকে নির্দেশ করা হয়। এই ঐতিহাসিক স্মৃতিই কখনও কখনও অতিরঞ্জিত হয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে চলেছে। এই স্পর্শকাতর বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য লেখক এই প্রবন্ধে রিচার্ড এম ইটন রচিত 'Temple Destruction and Indo-Muslim States' নামে একটি প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছেন। ইটন পাঠান ও মোগল আমলের ৮০টি প্রধান মন্দির লুণ্ঠন বা ধ্বংসের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ধর্মীয় ঘৃণাবশত নয়, বরং সামরিক বা রাজনৈতিক কারণে, যুদ্ধপ্রক্রিয়া বা কোনও মিত্র, করদ রাজা বা বিশ্বস্ত কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি বা বিদ্রোহ দমনের অংশ হিসাবে সেই জায়গার মন্দির ধ্বংসের ঘটনা ঘটে। ইটন দেখিয়েছেন যে এই প্রথাটি ভারতে মুসলমানদের আগমনের পূর্বেও চালু ছিল, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন নির্বিশেষে সব শাসকরাই শত্রুপক্ষের মনোবল ধ্বংস করার জন্য বা পরাজিত শাসকের বৈধতার অবসানের জন্য সেই রাজবংশের উপাস্য দেবতার বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংস করতেন। শৈলেশবাবু নিজেও হিন্দু মারাঠা বর্গিদের হাতে ধনরত্নের লোভে বাংলার হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংসের উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ করতে পারি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত রোমিলা থাপার ও হরবংশ মুখিয়া 'Communalism and the Writing of Indian History' নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকায় সম্পদের লোভে হিন্দু রাজাদের হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কথা আলোচনা করেছেন। রোমিলা থাপার উল্লেখ করেছেন যে কল্‌হন তাঁর 'রাজতরঙ্গিনী'তে লিখেছেন কাশ্মীরের রাজা হর্ষ 'দেবোৎপাটননায়ক' নামে মন্দির লুণ্ঠনের জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। বস্তুত, কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষের মতো শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণ যদি মন্দির ধ্বংসের কারণ হত, তাহলে রিচার্ড ইটনের মতে দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী এই আটশো বছরে কোনও মন্দির অক্ষত থাকত না। রাজনীতির প্রভাবমুক্ত ছিল বলে খাজুরাহোর মতো অনেক মন্দির কখনও আক্রান্ত হয়নি। তাছাড়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হলে ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূরীভূত হলে মুসলিম শাসকরা মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন, অনুগত প্রজাদের মন্দির নির্মাণে বাধা দেননি। রাজনৈতিক কারণে শাসকরা স্বধর্মী বা বিধর্মী সব প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেছেন, তাদের ধর্মস্থান ধ্বংস করেছেন। তাই মন্দির ধ্বংসকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবার শেষ হওয়া উচিত।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখক আরও কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা করে দাক্ষিণাত্যে ও মারাঠা সাম্রাজ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সমন্বয়ের উদাহরণ দিয়েছেন। অধ্যাপিকা সিনথিয়া ট্যালবট মধ্যযুগের লোকায়ত তেলেগু ভাষায় রচিত 'প্রতাপরুদ্র চরিত্রমু' গ্রন্থ সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে মুসলিম অভিযানকারীর হাতে এক বীর তেলেগু সেনাপতিসহ রাজা প্রতাপরুদ্র পরাজিত হলেও বিধর্মীদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ নেই। বিজয়ীদের দেবতার অবতার এই ভূমিরই একজন বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ফিলিপ বি. ওয়াগোনের তামিলনাড়ুর তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থ ও দেববিগ্রহ-মানবীর প্রেমকাহিনি, তামিল ভাষায় রচিত 'কোইল ওলুগু' গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে কীভাবে দাক্ষিণাত্যের সমাজে ইসলামি প্রভাব প্রসারিত হয়েছে। গ্রন্থগুলিতে যেমন মুসলিম বিদ্বেষ নেই, তেমনই বিজয়নগর সাম্রাজ্যে সুলতানি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে, সরকারি নথিপত্রে তালপত্রের বদলে কাগজেকলমে লেখা চালু হয়েছে অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গের বদলে মুসলমানি ধরনে জোব্বা ও টুপি পরার রেওয়াজ হয়েছে। 'কোইল ওলুগু' গ্রন্থে মুসলমান সুলতান কন্যা দেবীত্বে উপনীত হয়ে দেবতা পেরুমলের তুর্কি প্রেমিকাদেবীর স্বীকৃতি পেয়েছেন। অন্যদিকে মারাঠা ইতিহাসবিশেষজ্ঞ স্টুয়ার্ট গর্ডন দেখিয়েছেন বুরহানপুরে মারাঠা প্রশাসন অনেক মুসলমান ফকির ও সাধকদের ভাতা দিত। মুসলিম সেনাপতি ও রাজস্ব কর্মচারীদের মোগল শাসক প্রদত্ত নিষ্কর জমি সাধারণ ভাবে কেড়ে নিলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাই, কূপ, মাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষরোপনাদি কাজের জন্য এই দান মারাঠা শাসকরা বজায় রেখেছিলেন। তাঁদের সেনাবাহিনীতেও অনেক মুসলমান ছিলেন। এইভাবেই বহু ধর্ম ভাষা সংস্কৃতির দেশে হিন্দু-মুসলমান মিলিত ভাবেই থেকেছেন।

তাঁর পরবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক আরও কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ড. নজরুল ইসলাম রচিত 'বাংলায় হিন্দু-

মুসলমান সম্পর্ক' (বাঙালি হিন্দু-মুসলমান : সমন্বয় ও দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে), আবদুর রাউফের দু'টি গ্রন্থ 'স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে পশ্চিমবাংলার মুসলমান' ও 'গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু সমস্যা' ও জয়া চ্যাটার্জির 'বেঙ্গল ডিভাইডেড : হিন্দু কমিউনালইজম অ্যান্ড পার্টিশন ১৯৩২-১৯৪৭'। এইসব গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে কোনও কোনও ক্ষেত্রে লেখক ভিন্নমত পোষণ করেছেন। যেমন ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ড. নজরুল ইসলাম মন্তব্য করেছেন যে, বাংলা অখণ্ড থাকলে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবেও সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, এই কারণে 'হিন্দু মহাসভা এমনকি কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবেও অবিভক্ত বাংলাকে সমর্থন করতে পারেনি।' এ বিষয়ে শৈলেশবাবু মন্তব্য করেছেন যে 'কোনোরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এরকম গুরুতর অভিযোগ করা অনুচিত হয়েছে।' (পৃ. ৫৯) জয়া চ্যাটার্জির 'বেঙ্গল ডিভাইডেড' এবং তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'The Spoils of Partition : Bengal and India, 1947-1967' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিপুল পরিমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণ তো উপস্থিত করা হয়েছে। তাছাড়া বাঙালি তথা ভারতীয় মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ হিসাবে শৈলেশবাবু বিভিন্ন প্রবন্ধে যেসব কারণ নির্দিষ্ট করেছেন তা হল প্রধানত ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও অসম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন, মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা (১৯০৬), ১৯০৯ সালে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, আইনসভায় মুসলমানদের জন্য সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসন বরাদ্দ। তাছাড়া স্যার সৈয়দ আহমেদের মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষায় অংশগ্রহণ, ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা ও কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার পরামর্শকেও তিনি তীব্র আক্রমণ করেছেন। এসব বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

অধ্যাপক আবদুল বারিসাহেবের সততা ও উদারতার স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে শৈলেশবাবুর তরুণ বয়সের কৃচ্ছ্রসাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। গুজরাতের গণসংহার আলোচনা করার সময় দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের সদর্থক ভূমিকা ও ভারতের সুশীল সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ, উজ্জ্বল, প্রেরণাদায়ী ভূমিকার কথা স্মরণ করে তিনি আশান্বিত হয়েছেন। সর্বশেষ নিবন্ধে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে গান্ধীর 'সংবেদনশীল সহনশীলতার...পন্থার' প্রতি তাঁর আস্থা ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন এই পন্থার 'থেকে অধিকতর কার্যকরী অপর কোনও উপায়ের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে গান্ধীর পথকে উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।'

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু যেমন মূল্যবান ও গভীর চিন্তাউদ্রেককারী, প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তেমনই প্রকাশক উচ্চ গুণমান প্রদর্শন করেছেন এবং এ জন্য সকল পাঠকের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

গণতন্ত্রী ভারতে হিন্দু-মুসলমান—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা/২৯০.০০।

তরুণ নাট্যকর্মীদের কাজে লাগবে

সত্য ভাদুড়ি

সুমিতা চক্রবর্তীর আলোচ্য বইটি নাটক ও নাট্য-বিষয়ক। ছ'টি প্রবন্ধ এখানে সংকলিত হয়েছে। মূলত ঝোঁকটা পড়েছে গ্রিক ট্র্যাজেডির ওপর। প্রথম লেখাটির শিরোনাম, 'নাটক ও প্রতিবাদ'। এর এক জায়গায় 'From the very beginning of my theatre-work, we have tried to put revolution in a historical perspective' উৎপল কথিত এই উক্তিকে কেন্দ্রে রেখে দেশ-বিদেশে নাটকের মাধ্যমে যুগে যুগে কীভাবে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা মেলে এ প্রবন্ধে। কিন্তু শেক্সপিয়র সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, 'শেক্সপিয়র-এর মহত্ত্ব কোনও শ্রেণিচেতনার পথ ধরে বিকশিত হয়নি। তাঁর শিল্পীমনকে আলোড়িত করেছিল মানুষ—বিচিত্র মানুষ। মানুষের সুখ-দুঃখের আশ্চর্য রূপ যেমন দেখেছেন, অনুভব করেছেন, তেমনই প্রকাশ করেছেন।... শেক্সপিয়র মানুষকে সাধারণত স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বরূপে দেখেছেন, কচিৎ দেখেছেন শ্রেণি হিসেবে।' শেক্সপিয়র সম্পর্কে শ্রীমতী চক্রবর্তীর এই বিশ্লেষণ উৎপল দত্ত মানতেন না। মানতেন যে না, তার ব্যাখ্যা আমরা পাই শ্রীদত্ত লিখিত, 'শেক্সপিয়রের সমাজ চেতনা' বইটিতে।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে লেখিকার অভিমত, 'গিরিশচন্দ্র ১৯০৫ সালের আগে পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে আদৌ কিছু ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। উপরন্তু রানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ষাট বছর পূর্তিতে 'হীরক জুবিলী' (১৮৯৭) এবং রানির মৃত্যুতে 'অশ্রুধারা' (১৯০১) নামে গীতিনাট্য লিখেছিলেন।... তাঁর 'সৎনাম' নাটকে দেশের স্বাধীনতার কামনার প্রকাশ আছে। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে কুৎসা থাকায় এই নাটকটির অভিনয় মুসলমান সম্প্রদায় জোর করে বন্ধ করে দেন। তখন মুসলিম লিগ (১৯০৬) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলমানেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করেছেন তাঁদের দাবি-দাওয়া নিয়ে'। হিন্দু মুসলমানের মিলিত এই দেশে গিরিশের জাতীয়তাবাদ যে শুধুমাত্র হিন্দুদের পক্ষেই শেষমেশ ওকালতি করে গেছে এ বিষয়ে শ্রীমতী চক্রবর্তীর স্পষ্ট উচ্চারণ সময়ের প্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'ট্র্যাজেডির নায়ক আর ট্র্যাজেডির তত্ত্ব'। তৃতীয় প্রবন্ধ 'নাটকের কোরাস'। এই দু'টি প্রবন্ধ পাঠ করার পর মনে হল, লেখিকা নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি বড় একটা মেলে দিতে পারেননি। বরং বিপরীতে একথা বলা যায়, শ্রীমতী চক্রবর্তী এক্ষেত্রে 'যাহাই পড়িয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন'। ফলে, লেখা দু'টি নতুন করে আমাদের জিজ্ঞাসু করে তুলল না। চতুর্থ প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে এই বইয়ের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির নাম, 'জীবন ট্র্যাজেডির সপ্তকন্যা।' মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকটি কেন্দ্রে রেখে, টড থেকে মধুসূদন এখানে বীজরূপ কথাটা গ্রহণ করেছিলেন বা বর্জন করেছিলেন, তার তুলনামূলক আলোচনা সবিস্তারে করে, তিনি একথা জানান, 'মধুসূদন 'এমিলিয়া গ্যালোটি' বা লেসিং-এর নাম করেননি কোথাও। টড-এর গ্রন্থেও কোনও উল্লেখ নেই। তবু নাটকটি পড়লে মনে হতে পারে মধুসূদন এটি পড়েছিলেন। হয়তো কৃষ্ণকুমারী নাটকের পরিকল্পনায় এমিলিয়া গ্যালোটি-র কিছু চিহ্নও আছে। প্রথমত জগৎ সিংহের বিলাসবতীর মতোই প্রিন্স-এর এক রক্ষিতার চরিত্র কাউন্টেস অরসিনা (*Countess Orisina*)। এই নাটকে অরসিনার কিছুটা সক্রিয়তাও আছে। দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণকুমারী নাটকে এক সুন্দরীর চিত্রদর্শনে কৃষ্ণকুমারীর ছবি ভেবে প্রলুব্ধ হয়েছে জগৎ সিংহ। লেসিং এর নাটকে এক চিত্রকর সুন্দরী এমিলিয়ার ছবি দেখিয়েছে প্রিন্সকে। সেই ছবি দেখে এমিলিয়াকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে প্রিন্স। তবে দু'টি নাটকের গঠনে, ভাবকল্পনায় এমিলিয়া আর মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য আছে সেকথাও জানাতে আমাদের ভোলেননি। তুলনামূলক এই আলোচনায় উঠে এসেছে বিশ্বসাহিত্যের একাধিক নারীচরিত্র। যেমন ইউরিপিদেস-এর অলিস এ ইফিগেনেইয়ার কথা উঠে এসেছে। উঠে এসেছে বাইবেলের জেপ্‌থাহ্ কন্যার কথা। উঠে এসেছে রোমক ইতিহাস থেকে ভার্জিনিয়ার কথা। তেমনই উঠে এসেছে ইমিলিয়ার কথা। প্রবন্ধটির উপসংহার টেনেছেন শ্রীমতী চক্রবর্তী এ ভাষায়, 'পিতার নির্দেশে বা ইচ্ছায় বা পিতার হাতে কন্যার মৃত্যু—এই বীজ-কাহিনি মাঝে মাঝেই নানা রূপে দেখা দিয়েছে বিশ্বসাহিত্যে। এক একটি বীজ-রূপ নিয়ে রচিত হয়েছে একাধিক কাব্য, নাটক এবং ওপেরা। ইফিগেনেইয়া আর ভার্জিনিয়া বহু ভাষা-মাধ্যমের শিল্প-রূপবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে ঘুরে ঘুরে। আমরা এখানে বাংলা ভাষায় লেখা 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর প্রাসঙ্গিকতায় বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি সুপরিচিত নিদর্শনের উল্লেখ করলাম। মানুষের গড়া সভ্যতার বিবর্তনে নারীর অবস্থান চিরকালই অত্যন্ত জটিল। নারীর শরীর যে নারীরই শরীর; এবং জোর করে সে শরীর ভোগ করা, সে শরীরকে গর্ভ ধারণে বাধ্য করা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব নয়—এই প্রাকৃত সত্যের কারণে নারীর উপর অধিকার বিস্তার করবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বহুকাল ধরে চালু আছে। তা দিয়েও এক একটা যুগের সভ্যতাকে কিছুটা চেনা যায়।'

একটু গভীরভাবে ভাবলে, আজকের সমাজেও তাঁর এই কথাকে সত্যি কি মিথ্যা বলে আমরা প্রমাণ করতে পারি। এছাড়া, এই সংকলনে আছে আরও একটি ভাল লেখা। লেখাটির নাম 'করিতায় নাটক'। কবিতায় কীভাবে নাটকীয়তা ধরা পড়ে, তার সুন্দর বিশ্লেষণ মেলে এই প্রবন্ধে। এখানে এক জায়গায় প্রবন্ধকার বলেছেন, 'যিনি রোমান্টিক লিরিক কবিতার রচয়িতা তাঁকেও অতিক্রান্ত হতে হয় জীবন-নাট্যের প্রতিকূলতার অভিঘাত। সেই পক্ষ আর প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব যখন ভাবাবেগের ভাষায় নয়, ঘটনা-নিবিড় দৃশ্যমালায় রূপায়িত হয় কবিতায়, তখন সেই কবিতা নাট্যরূপেরই বিশেষ ধরনের অবয়ব হয়ে ওঠে। ধরা যাক বহু ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ সোনার তরী'। অবশ্য এখানে শুধু রবীন্দ্রনাথকেই সম্বল করেননি তিনি। আলোচনায় এনেছেন অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশকে, যিনি নাটক না লিখলেও নাটকের দিকে মোড় নেওয়া সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন একটি প্রবন্ধে, 'বাংলা কবিতার আধুনিক সময় যদি তা দান না করতে পারে ভবিষ্যৎকালে (খুব দেরি না করেও) দীর্ঘ কবিতা ও শ্লেষে লিখিত মহা কবিতা আসতে পারে; এবং কবিতায় নাট্য'। (বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ : 'চতুরঙ্গ' আশ্বিন ১৩৫৭ ব.) এঁদের একাধিক

কবিতা উল্লেখ করে প্রবন্ধকার এখানে দেখিয়েছেন ওইসব কবিতায় কোথায় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে নাট্যগুণ। তুলনামূলক এ লেখাটি তরুণ নাট্যকারদের ঋদ্ধ করবে বলে বিশ্বাস।

অবশ্য, সুমিতা চক্রবর্তী বইটির নাম রেখেছেন, 'নাট্যকলায় জীবন-শিল্প'। এ কি চলতি হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার ফলশ্রুতি। জীবনমুখী গানের অনুপ্রেরণায় এ নাম। কারণ নাটককলা কখনওই কি মৃত শিল্পের প্রকাশ ঘটিয়েছে! না, তা আমাদের জানা নেই। আর একটা কথা, শ্রীমতী চক্রবর্তীর বইটিতে এক জায়গায় লেখা হয়েছে নাটক মাত্রেই গণনাট্য। একা একা নাটক গড়ে ওঠার উপায় নেই। অন্তত দু'জন অভিনেতা চাই—নাটককার ছাড়াও।

আজকের দিনে এমন কথা নিঃসন্দেহে রক্ষণশীলতার পরিচয় বহন করে। দেশ-বিদেশে কি আমরা একক অভিনয় দেখিনি। আসলে একজন অভিনেতা ও একজন দর্শক হলেই নাট্যক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে বইটি স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত। যেমন তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন, 'লিখিত ও পঠিত হবার মধ্য দিয়ে যেখানে উপভোগ্যতার পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে উপন্যাস, ছোটোগল্প এবং এ-যুগের কাব্য ও কবিতা—নাটকের ক্ষেত্রে তার উপভোগ্যতার পূর্ণতার মাত্রা উপলব্ধ হয় মঞ্চে—উপস্থাপনার ভিত্তিতে। মঞ্চের ইতিহাস না জেনে, অভিনয়ের দিকটি সম্পর্কে অনবহিত থেকে নাটকের রস সম্পূর্ণভাবে অনুভূত হয় না—কথাটি সকলেরই জানা এবং অবিতর্কিত।' বিষয়টা যখন নিজেই বলছেন, অবিতর্কিত, তাহলে আবার কেন অন্যত্র লিখলেন, নাটকের 'রসাস্বাদন সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তাকে দেখি মঞ্চে অভিনীত হতে—এই অভিমত বহুল প্রচারিত। তবু কথাটা ঠিক যেন মনে হয় না।' তবে ছোটখাটো এ সমস্ত বিভ্রান্তিকর মন্তব্য এড়িয়ে গিয়ে, সামগ্রিকতার নিরিখে বলতেই হয় আলোচ্য বইটি জিজ্ঞাসু তরুণ নাটকর্মীদের কাজে লাগবে।

নাট্যকলায় জীবন-শিল্প—সুমিতা চক্রবর্তী/প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কল-৭৩/৭০.০০।

চলচ্চিত্রকথা ও আত্মকথা

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আলোচনার জন্যে দু'টি গ্রন্থ। একটির শিরোনাম—'দেশ বিদেশের চলচ্চিত্র'; লেখক মেঘ মুখোপাধ্যায়। আর একটির শিরোনাম—'ধূসর অ্যালবাম'। লেখক দীপক কর।

মেঘ মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃত পরিচয় হল তিনি একজন প্রথম শ্রেণির কবি। একাধিক কবিতার বইয়ের রচয়িতা। নিজের কবিতায় জীবনকে তিনি খুব অন্তর্লীনভাবে দেখতে চেষ্টা করেন। কবিতা রচনা ছাড়াও মেঘের দ্বিতীয় বিশেষ মনোযোগ হল সিনেমা। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের অধিকর্তা হিসাবে জানি দেশ-বিদেশের সমান্তরাল সিনেমা বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসুক এই যুবক গত এক যুগ ধরে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের নিয়মিত দর্শক।

বস্তুত, আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ বিদেশি ছবি সম্বন্ধে আলোচনার মূল অনুপ্রেরণা হল নানা বছরের কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব।

মেঘের গ্রন্থটি দু'টি পর্বে বিভক্ত। 'বিদেশি ছবি' এবং 'দেশি ছবি'। নন্দিতা দাস পরিচালিত 'ফিরাক' ছবিটি তো পুরোপুরি ভারতীয় ছবি। তা হলে সেটি 'বিদেশি ছবি' পর্বে অন্তর্ভুক্ত হয় কীভাবে? এমনকী কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবেও তো ছবিটি ইন্ডিয়ান প্যানোরামাভুক্ত ছিল।

কবি বলেই হয়ত মেঘের প্রবন্ধের ভাষা খুবই আবেগময়; কিন্তু কখনওই তা বল্গাহীন নয়; এবং সচেতনভাবে যুক্তি-তর্কের অনুসারী।

'গুডবাই লেনিন' ছবিটি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল এবং বেশ বিতর্কও তুলেছিল। সমাজতন্ত্র কিংবা লেনিনের চিন্তায় সমাজতন্ত্র বিষয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছিল ছবিটি। লেখকও তাঁর রচনায় যে প্রশ্ন তুলেছেন তা প্রাসঙ্গিক : 'কৌতুকের ছলে ছবিটি রচনা করলেও উলফগাঙ্‌ বেকের কিন্তু কয়েকটি কঠিন প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন।'

'একটি তরুণীর জীবনের বিপন্নতা আর ভয়াবহ পরিণতির' কাহিনি নিয়ে Franco De Pefia-র গায়ে কাঁটা দেওয়া ছবি 'Your name is Justine' বিষয়ে লেখকের বিশদ রচনাটি অতীব সুখপাঠ্য। আছে 'হিটলারের জীবনের শেষের দিনগুলি' নিয়ে নির্মিত 'ডাউনফল' চলচ্চিত্র বিষয়ে

একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। আর্জেন্টিনার প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্রকার ফারনানদো সোলানাস লেখকের ভাষায়—'চলচ্চিত্রের কবি—প্রতিবাদী দার্শনিক'। স্পেনের আর এক দিকপাল চলচ্চিত্রকার কার্লো সাউরা স্পেনের লোকসংগীত আর লোকনৃত্য অবলম্বনে 'ইবেরিয়া' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন, সে বিষয়ে লেখকের মতামত সঠিক : 'এই রকম ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ আর সমস্ত চেতনা প্রখর হয়ে ওঠে!'

'দেশি' পর্বের প্রবন্ধগুলিও চিন্তার উদ্রেককারী। সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিক-পরবর্তী বাংলা সিনেমার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখক এক পূর্ণাঙ্গ মতামত পরিবেশন করতে চেয়েছেন। মৃণাল সেন আর ছবি করছেন না বলে তিনি অভিমানী উষ্মাও প্রকাশ করেছেন। তবে সত্যজিৎ পরিচালিত 'গণশত্রু' ছবিটি দেখে যে তাঁর 'অতৃপ্তি' থেকে যায়; এটি তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত মতামত হতে পারে। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও মৃণাল সেন পরিচালিত কয়েকটি পরিচিত ছবিরও ভাবনাঋদ্ধ আলোচনা আছে।

শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের বিষয়ে রচিত প্রবন্ধসংগ্রহ আজকাল প্রায় চোখেই পড়ে না। বিদেশি ভাষার কথা বলছি না। আমি বাংলা ভাষায় এরকম বইয়ের দুর্লভতার কথা বলছি। আশা করব মেঘ মুখোপাধ্যায়-কৃত এই উচ্চমানের প্রবন্ধগ্রন্থটি প্রকৃত চলচ্চিত্রমোদীদের কাছে সমাদৃত হবে।

একজন প্রবীণ কবি হিসাবে দীপক কর আমাদের কাছে খুবই পরিচিত নাম। শুধু কবি কেন, সম্পাদক হিসাবেও তো তাঁর নাম সর্বজনবিদিত। মেদিনীপুর থেকে প্রায়-নিয়মিত প্রকাশিত 'ধানসিড়ি' কবিতা-পত্রিকায় লেখেননি এরকম কবি পশ্চিমবঙ্গে ক'জন আছেন?

'ধূসর অ্যালবাম' গ্রন্থটি এই কবির স্মৃতিচারণমূলক গদ্যের পরিচ্ছন্ন সংকলন। দীপক আজীবন কবিতার সঙ্গেই শোওয়া-বসা করেছেন, এখনও করেন; গদ্য তিনি খুব একটা লেখেন না। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তিনি কিছু মার্জিত এবং বিদগ্ধ গদ্যের নমুনা রেখেছেন। তাঁর স্বর কখনওই উচ্চকিত নয়। নিবেদনের ভঙ্গিতে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর শৈশবের, বিশেষত দেশভাগের আগে ঢাকায় সেই রমণীয় দিনগুলির; তারপর দেশবিভাগের পর এদেশে আসার, খড়গপুরে তাঁর যৌবন অতিবাহিত করার ও নানা সতীর্থের সঙ্গে সাহিত্যচর্চার অভিজ্ঞতার কথা। কবির গদ্য বিষয়ে সর্বদাই পাঠকের অতিরিক্ত কৌতূহল থাকে। দীপকবাবুর কবিত্বের স্পর্শ তাঁর গদ্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। গদ্য যেন তাঁর কলমে সেতারের মিড়। পাঠক মুগ্ধ হবেন, রসবোধে আপ্লুত হবেন, পড়তে পড়তে বুঁদ হয়ে যাবেন।

'শৈশবের চালচিত্র' গদ্যটি থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা কঠিন :

> 'ঢাকার বাজারে মাছ ওজনে বিক্রি হত না। হত ভাগা হিসেবে। কইমাছ আবার বাইশ (২২টা) হিসেবে। ডিম হালি (৪টা) হিসেবে। কাচকিমাছ আর টাকামাছ (নদীর পমফ্রেট)-এর স্বাদ জিভ থেকে কবে উধাও। আর সেই ঢেঁকিশাক (এক জাতের ফার্ন) সিম্পলি ডিলিশাস্। না, আর না। বাঙালের খাবার গপ্পে রাত কাবার।'

পূর্ণেন্দু পত্রী বিশেষ কাছের মানুষ ছিলেন দীপকের। ওঁর বিষয়ে দু'টি স্মৃতিমূলক গদ্য আছে এই গ্রন্থে। দীপক লিখেছেন—'পূর্ণেন্দু পত্রীর কথা বলতে গেলে এককথায় বলতে হয়—তিনি ছিলেন a man of multiple dimensions—বহুধা বিচ্ছুরিত এক হীরকখণ্ড।' শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধেও মজার স্মৃতিচারণ আছে—

> 'একবার আনন্দবাজার-এ সুনীলদার ঘরে বসে কথা বলছি ওঁর সঙ্গে। শক্তিদা এসে হাজির। আমাকে দেখে-ই, 'তোর কবিতা আছে সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করি, 'কেন?' 'বলিস না, নীচে কয়েকটি ছেলে বসে আছে আমার কবিতার জন্যে। কবিতা না-দিলে বেরুতে পারব না। তোর কবিতা থাকলে দে। তোর নামটা কেটে আমার নাম বসিয়ে দেব।'

গ্রন্থের শেষে 'লেখমালা' সিরিজে টুকরো গদ্যগুলি যেন লেখকের রোজনামচা। এক একটি সূক্ষ্ম কবিতার মতন। হাত দিলেই যেন কেঁপে উঠবে এরকমই রসসিক্ত তাদের গঠন। এখানেই দীপকের বিলাপ : 'সন্তোষদা আজ নেই!' ছোটো পত্র-পত্রিকাগুলি হারাল তাদের এক উজ্জ্বল সহৃদয় পাঠককে। ছোটো পত্র-পত্রিকা তিনি কত ভালোবাসতেন, যত্ন নিয়ে পড়তেন,......'। দীপকবাবু আপনি আরও গদ্য লিখুন। আমরা তৃপ্ত হই।

দেশ বিদেশের চলচ্চিত্র—মেঘ মুখোপাধ্যায়/সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা-৯/৭৫.০০

ধূসর অ্যালবাম—দীপক কর/বাকপ্রতিমা, কলকাতা-৯/৫০.০০

অম্লান দত্ত : চিন্তা এবং কর্মের সমন্বয়ের বিরল নজির

আমরা যারা চতুরঙ্গ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত তাদের অত্যন্ত আপনজন অম্লান দত্ত সম্প্রতি ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর। তাই এই মৃত্যুকে আকস্মিক বলা যায় না। তবু মৃত্যুমাত্রেই বেদনাদায়ক, বিশেষ করে তেমন মানুষের মৃত্যু যিনি এই সংসারে তাঁর উপস্থিতিকে কখনই নিরর্থক হয়ে উঠতে দেননি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মানুষের কল্যাণমুখী কর্মে এবং ভাবনায় সক্রিয় ছিলেন। যে কোনও জিজ্ঞাসুকে সত্যসন্ধানের সূত্র নির্দেশ করা ছিল তাঁর নিরন্তর কর্মসাধনা। বিষয়টাকে তিনি এভাবেই দেখতেন। তবে এটাকে তিনি আদৌ জ্ঞান বিতরণের কর্ম হিসাবে গণ্য করেননি। যাঁকে সত্যসন্ধানের সূত্র নির্দেশ করতেন তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজের অনুসন্ধিৎসাকেও সক্রিয় রাখতেন। এভাবেই কর্ম এবং ভাবনার একটা মেলবন্ধন ঘটত তাঁর সাধনায়। তাঁর বোধি সমৃদ্ধতর হয়ে উঠত এবং যে কোনও জিজ্ঞাসু সেই বোধির সংস্পর্শে এসে নিরন্তর উপকৃত হত। তাঁর প্রয়াণে এই প্রক্রিয়াটি থেমে গেল। এটাই আমাদের বেদনার মূল কারণ।

বস্তুত তাঁর ব্যক্তিত্বে জ্ঞান এবং কর্মের যেরকম সমন্বয় ঘটেছিল তার তুলনা বিরল। এই সমন্বয়সাধনের মূলে ছিল তাঁর সার্বিক কল্যাণচেতনা। বিশ্বসংসারের যাবতীয় কল্যাণ-এষণার সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক সংযোগ। নিজেকে তিনি দায়বদ্ধ মনে করতেন। কোনও এক আলাপচারিতায় কথাটা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, 'আমার ধারণা যতক্ষণ বেঁচে আছি সমাজের জন্য ভাবা কি কাজ করা দরকার, যখন তা পারব না তখন কোন অধিকারে সমাজের অন্ন ধ্বংস করব, যতক্ষণ বাঁচছি সমাজ থেকে নিচ্ছি তা কেবলই নিয়ে যাব কিছু দিতে পারব না—এটা ভাবলেই খারাপ লাগে।' (অম্লান দত্ত : ব্যক্তিত্ব ও সমাজভাবনা, পৃ. ২৪৩) তাঁর বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার মধ্যেও অন্তর্নিহিত থাকত সমাজকে কিছু দেখার তাগিদ। তাই অর্জিত জ্ঞান দিয়ে সমাজমানসকে প্রভাবিত করার প্রয়াস তিনি জারি রাখতেন নিরন্তর। তাই মানুষ যেখানে কথা শুনতে চায় তেমন যে কোনও অনুষ্ঠানে কিংবা আয়োজনে অংশগ্রহণে তাঁর কোনও ক্লান্তি ছিল না। একদা জনৈক বামমার্গী বিদ্বজ্জন কথাপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ তির্যক ভঙ্গিতে আমাকে বলেছিলেন, ছোট বড় যে কোনও অনুষ্ঠানে তা গ্রামে কিংবা শহরে যেখানেই হোক না কেন, অম্লান দত্তকে পেতে হলে আপনার লাগবে শুধু একটা বাহন। বলার ভঙ্গি যেমনই হোক, কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। যেখানে আলোচনার সুযোগ আছে তেমন অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কোনও অনিবার্য কারণ না থাকলে অম্লান দত্ত সাধারণত নিরাশ করতেন না। কারণ, আলোচনা মানেই নিজের উপলব্ধির কথা বলতে পারা। তিনি মনে করতেন, এই ধরনের অনুষ্ঠানের শ্রোতা কিংবা আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলতে পারার সুযোগের মাধ্যমেই তাঁর উপলব্ধি আরও স্বচ্ছ এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। এইভাবে তাঁর জ্ঞানার্জন এবং কর্মপ্রয়াস ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকত।

তাই নিছক জ্ঞান বিতরণের মোহ তাঁকে কোনওকালেই পেয়ে বসেনি। শেখবার মন, অর্জিত জ্ঞানকেও আরও নানা দিক থেকে যাচাই করে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ঔৎসুক্য সদা জাগ্রত থাকত। তিনি জানতেন এভাবে জ্ঞানার্জন এবং কর্মপ্রয়াসের সাধনায় নির্মোহ হতে না পারলে অভীষ্টের দিকে বেশি দূর এগনো যায় না। তাই সংসারে যত রকমের মোহ থাকতে পারে তার সবগুলিকেই তিনি প্রায় জয় করেছিলেন। যে কারণে সত্য উচ্চারণে তিনি ছিলেন নির্ভীক, কেউ অসন্তুষ্ট কিংবা রোষান্বিত হবে কি না তা নিয়ে তাঁর কোনও পরোয়া ছিল না। কোনও স্বার্থবুদ্ধির পিছুটান না থাকায় তাঁর কথা এবং কাজে কোনও ফারাক থাকত না।

প্রসঙ্গক্রমে চতুরঙ্গ সম্পাদক হিসাবে একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করাই যায়। একবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের ওপর তাঁর পর পর তিনটি বক্তৃতা দেওয়ার খবর আগাম জানতে পেরে চতুরঙ্গ পত্রিকার আসন্নপ্রকাশ সংখ্যাটিতে ওই বিষয়ের ওপর তাঁকে একটি লেখা দিতে অনুরোধ করি। এভাবে

অনুরোধের কারণ, আগে থেকে কোনও বিষয় বলে অনুরোধ করলে সাধারণত তিনি লিখতে সম্মত হতেন না। বলতেন, 'ওই বিষয়ে আমার এখন লিখতে ইচ্ছে করছে না'। তাই যে-বিষয় নিয়ে সেই মুহূর্তে তিনি ভাবছেন তার আগাম খবর নিয়ে তারপর লিখতে বলতাম। তখন তিনি সহজেই রাজি হতেন। এভাবে চতুরঙ্গে তাঁর অনেক অমূল্য প্রবন্ধ ছাপার সুযোগ আমার হয়েছে। এমনও হয়েছে তিনি নিজেই কোনও বিষয় নিয়ে লিখে আমি ছাপব কি না জানতে চেয়েছেন। তাঁর মতো ভুবনবিখ্যাত মানুষের এধরনের প্রস্তাব শুনে হতবাক হয়ে যেতাম। তাই যে কথা বলছিলাম, আমার অনুরোধ শোনামাত্র ওই বক্তৃতা সিরিজের প্রথম বক্তৃতাটি তিনি চতুরঙ্গে দেওয়ার জন্য সম্মত হয়ে গেলেন। তারপরেই দেখা গেল তাঁর এই বক্তৃতা সিরিজ ছাপার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপের 'দেশ' পত্রিকা এগিয়ে এসেছে। তিনি কিন্তু ওই সিরিজের প্রথম বক্তৃতাটি কিছুতেই তাঁদের দিলেন না। সেটি চতুরঙ্গ পত্রিকাতেই ছাপা হল। 'দেশ' পত্রিকায় বেরল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বক্তৃতা। অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই বুঝবেন, কতখানি নির্মোহ হলে কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রক্ষায় এতখানি আপসহীন হওয়া সম্ভব হয়। অম্লান দত্তের সত্যানুসন্ধিৎসা নির্মোহ না হলে, তাঁর কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য না থাকলে তাঁর অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি, যা আপাতদৃষ্টিতে কখনও কখনও রূঢ় বলেও মনে হত, আমরা এতখানি আকর্ষণ এবং অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অনুভব করতাম না।

আবদুর রাউফ

২৫ ফেব্রুয়ারি '১০

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা এখনও যাঁরা দেননি, যথাশীঘ্র তাঁদের তা মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া সম্ভব নয়, তাই গ্রাহকদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার আবেদন। গ্রাহকচাঁদার মেয়াদ ফুরনোর পরও অনেককে আমরা নিয়মিত পত্রিকা পাঠিয়ে যাচ্ছি।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর খরচ সমেত ১৬০ টাকা। বিদেশবাসী গ্রাহকদের চাঁদা US $ 15। "CHATURANGA" নামে স্থানীয় গ্রাহকরা চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাতে পারেন। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়। কলকাতার গ্রাহকরা কুরিয়ার-যোগে পত্রিকা পাবেন। কলকাতার বাইরের গ্রাহকরা কুরিয়ার-যোগে পত্রিকা পেতে চাইলে অতিরিক্ত কিছু খরচ দিতে হবে।

পত্রিকা দপ্তর খোলা থাকে মঙ্গল আর শুক্রবার বিকাল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা আটটা। কোনও লেখা জমা দেওয়ার পর সিদ্ধান্ত জানতে ছ'মাস অপেক্ষা করতে হবে। ফোন : ৯১-৩৩-২২১৫-১৮৩৪

পঞ্চদশ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের স্মরণীয় প্রাপ্তি

মেঘ মুখোপাধ্যায়

নাৎসি হত্যালীলার বীভৎসতা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ইওরোপকে। বিশ্বকে। মুসোলিনি হিটলার আর ফ্রাঙ্কো মিলে যা করে গেছে, যে-ক্ষতি করে গেছে পৃথিবীর, তারপর মানুষের আর নিস্তার নেই। মানুষ কাটাছেঁড়া করে চলেছে সেই ভয়ঙ্কর সময়কে। নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে অনুসন্ধান থেকে। অনেক খুঁটিনাটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্ব এড়িয়ে যাওয়া নানা প্রসঙ্গ, নানা সত্য উঠে আসছে শিল্পী সাংবাদিক সমাজবিজ্ঞানীদের অদম্য কৌতূহল থেকে। কেঁপে উঠছে সারা জগৎ। এতটাই ভয়াবহ ছিল সেই অন্ধকারময় সময়? নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা যে কোন অতলে পৌঁছেছিল সেদিন তা নিয়ে ছ'দশক পরে নির্মিত হয়েছে ইওরোপের নানা দেশে একগুচ্ছ চলচ্চিত্র, তার কয়েকটি আমরা দেখতে পেলাম পঞ্চদশ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে। 'The Boy in the Striped Pyjamas'—এরকম একটি সত্তাকে আমূল নাড়িয়ে দেওয়া ছবি। এবারের উৎসবের উদ্‌বোধনী ছবি।

একটি বিপথগামী চূড়ান্ত উন্মাদ মতাদর্শ আর তার অন্ধ সমর্থকেরা যখন তাদের দেশ রাষ্ট্র বা সমাজের কিছু মানুষকে 'অপর' জ্ঞানে শারীরিকভাবে নিকেশ করে দিতে চায় দুনিয়া থেকে, এই 'অপরদের' অস্তিত্ব তাদের সাম্রাজ্যবিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, নিরুপদ্রব হয় না তাদের মতাদর্শের বিজয়যাত্রা, কঠিন শপথ নিয়ে তারা একের পর এক হত্যার উল্লাসে মেতে অন্ধ আবেগে এগিয়ে চলে সভ্যতাকে-সংস্কৃতিকে পিছন দিকে ঠেলে ফেলে, একের হত্যা তখন চেহারা নেয় গণহত্যার, বিপুল নরসংহারের। গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা বিশেষ জনজাতিকে মুছে ফেলার নিজস্ব রাজনীতি। নাৎসিবাদ ছিল সেরকম একটি। সেই রাজনীতির এক চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল ইহুদি নিধনে।

ইহুদি নিধনযজ্ঞের প্রত্যক্ষতা থেকে দূরে অথচ এই বীভৎস উন্মাদনার গা ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে ছবিটি। যেন ব্যাপক সুসংগঠিত নরসংহারের কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল না পরিচালকের। এমন এক নিপুণ শিল্পকৌশল নিয়ে এগিয়েছেন তিনি। এক কড়া প্রকৃতির কর্তব্যনিষ্ঠ কেরিয়ারমুখী নাৎসি অফিসার-পিতার শিশুপুত্রের অসহায়তা আর পিতার চাকরির চাপে শিশুটির জীবনে নেমে আসা নিরানন্দের ছবিই তৈরি করছিলেন পরিচালক, ধাপে ধাপে, নানা ডিটেল্‌সে, মনে হচ্ছিল যেন এই নিয়েই একটা চলচ্চিত্র দেখতে বসেছি আমরা, যেন এর বেশি কিছু দেখতে হবে না আমাদের এমন নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু ছবিটা এক সময় এই সীমাটা পেরিয়ে গিয়ে এক হাড়হিম করা পরিণামের মুখে ছুঁড়ে দিল আমাদের!

পদোন্নতি পেয়ে এক নাৎসি অফিসারকে বার্লিনের উচ্ছল জীবন ফেলে চলে আসতে হল শহর থেকে দূরে এক গ্রামাঞ্চলে। অবশ্যই সঙ্গে আনতে হল তাঁর পরিবারকে—স্ত্রী, এক কন্যা আর ব্রুনো নামের আট বছর বয়সি এক পুত্রকে নিয়ে সুখের সংসার। চারদিক শুনশান নির্জনতার মধ্যে একটি বড়সড় বাড়িতে শুরু হল তাদের নতুন জীবন। বাড়িটা কেমন পোড়ো ধরনের, রয়েছে অযত্নের বাগান। একটা অদ্ভুত ধরনের লোক কাজ করে পরিচারকের। বাড়ির একাংশে ব্রুনোর বাবার অফিস। বার্লিনের ব্যস্ত রাস্তায় দু'হাত ছড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ব্রুনোর খেলে বেড়ানোর দৃশ্যে শুরু হয়েছিল ছবি। তার বিপরীতে এই নির্জনতা, তাও আবার কেমন যেন সন্দেহজনক, প্রশান্তিদায়ক নয়—দমচাপা পরিবেশ, উর্দিপরা নানা স্তরের অফিসারদের নিঃশব্দ আনাগোনা আর ব্রুনোর বাবার কঠিনতর হয়ে পড়া গাম্ভীর্য আট বছরের শিশুটির বুকে হাঁফ ধরিয়ে দেয়। দিদির সঙ্গে তার তেমন ভাব নেই; দিদি থাকে নিজেকে নিয়েই; হিটলারের উপাসিকা সে। মা-ও সংসার নিয়ে, দূরের শহরে বাজার করতে যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। যদিও মা যে এই জীবন ঠিক মেনে নিতে পারছে না তার ইঙ্গিত মেলে। বাড়ির বা বাগানের যেখানে সেখানে যেতে পারে না ব্রুনো, নিষেধের বেড়াজাল। সে মাথাকুটে বেড়ায় দেয়ালে। একদিন হঠাৎ সে একটা জানালার কাঁচের শার্সি দিয়ে লক্ষ করল দূরে একটা বাড়ি—কিছু যেন লোকচলাচল। এটা তার বাবার জানতে দেরি হল না আর সঙ্গে সঙ্গে জানলাটার ওপর আড়াআড়ি কাঠ লাগিয়ে পেরেক

পিটে বন্ধ করে দেওয়া হল। ব্রুনো ঠিক বুঝল না কেন এমন ঘটল। কেন বন্ধ করতে হল জানালাটা, কী এমন সে দেখে ফেলেছে! কী তার দেখা চলবে না!

পরিচারক লোকটা আর রান্নাঘরের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও সে বাধা পায়। পরিচারকের পায়ে যেন কিছু হয়েছে, ভালভাবে হাঁটতে পারছে না, পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা কয়েদিদের মতো হাঁটাচলা। বাড়িটার বদ্ধ পরিবেশ আর ব্রুনোর নিরানন্দময় জীবনের ছবি এঁকেছেন পরিচালক সযত্ন দক্ষতায়। একটা অদ্ভুত জগৎ। শিশুর বেড়ে ওঠার পক্ষে ক্ষতিকর, শিশুমনের বিস্তারের প্রতিকূল, বিকৃত এক পরিবেশ আমাদের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। দূরের কোথাও একটা বাড়ির মাথার চিমনি দিয়ে আকাশে কালো ধোঁয়া ওঠে, বাড়িটা আমরা দেখতে পাই না, মাঝে মাঝে আকাশ কলুষিত করা ধোঁয়া দেখতে পাই। এইটুকুই পরিচালক আমাদের দেখান। এই বিদঘুটে বাড়িটা আর হতশ্রী বাগান ছাড়িয়ে ব্রুনো বেরিয়ে পড়ার নানা মতলব করে। ফাঁক খোঁজে। বাগানে একটা দরজা পেয়ে যায়। দরজাটায় খিল আঁটা নেই, ভেজানো রয়েছে। সেটা খুলে সে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টায় থাকে, কয়েকবার প্রহরীদের কারও চোখে ধরা পড়ে যায়, কিন্তু একবার সফল হয়। দরজা পেরিয়ে সে এসে পড়ে বাড়ির পিছনে একটা জঙ্গল মতো জায়গায়। ব্রুনো গাছপালার ভিতর দিয়ে খোলা আকাশের তলে দৌড়তে থাকে মুক্তির খোঁজে। দু'হাত ছড়িয়ে ফড়িংয়ের মতো ডানা মেলে উড়ে যায়, ভেসে যায়। কিন্তু বেশি দূর নয়। একজায়গায় ধাক্কা খায় তারকাঁটায়। জঙ্গলের শেষে কারা তারকাঁটার বেড়া লাগিয়েছে। কৌতূহলে সে বেড়ার গায়ে এসে দাঁড়ায়, দেখে তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা একটা আলাদা জগৎ রয়েছে ওদিকে।

কিছু ঘরবাড়ি অস্থায়ী ধরনের, কিছু ডোরাকাটা পোশাক পরা লোক চলাচল করছে আর তার সামনে বসে আছে তারই বয়সি একটি ছেলে তারকাঁটার বেড়ার ওপারে—ছেলেটার অদূরে একটা ময়লা ফেলার ছোট ঠেলাগাড়ি। ছেলেটা যেন লুকিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। ব্রুনো ভাব করতে চায় ছেলেটার সঙ্গে, ছেলেটা প্রথমে চায় না কিন্তু পরে দু'জনের বন্ধুত্ব হয়ে যায়, অসম জগতের দু'জন সমবয়সি শিশুর এই বন্ধুত্ব পরস্পরের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ পরতে পরতে খুলে ধরেছেন পরিচালক। ছেলেটার প্রতি ব্রুনোর কৌতূহল বেড়ে চলে। সে সবাইকে লুকিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে যায়। ওর জন্য লুকিয়ে খাবার নিয়ে যায়। ওকে তৃপ্তি করে খেতে দেখে নিজে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

এভাবেই চলছিল। এবার ব্রুনোর আগ্রহ জন্মাল স্মুয়েলের মতো পোশাক পরতে আর ওর জগৎটাকে দেখতে, জগৎটার ভিতর ঢুকতে। কিন্তু তারকাঁটার বাধা টপকে ওরা মিলবে কি করে? শিশুদের তো উদ্ভাবনী বুদ্ধির অন্ত নেই। তারকাঁটার নিচের মাটি বেলচা দিয়ে খুবলে খুবলে তুলে একটা বাচ্চা গলার পরিমাণ গর্ত বানিয়ে নেয় ব্রুনো, তারপর শরীরটাকে নুইয়ে ভাঁজ করে কসরৎ করে ঢুকে যায় স্মুয়েলের জগতে। স্মুয়েল দু'টো পোশাক পরে এসেছিল সেদিন, একটা ছেড়ে দেয় আর নিজেরটা খুলে রেখে ব্রুনো পরে নেয় সেটা। ডোরাকাটা বন্দিশালার পোশাক পরা দুটো শিশু এবার দৌড়তে থাকে ওই জগৎটার ভিতরে। ওদের অনুসরণ করে আমরা দেখি যে এটা আসলে একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। ইহুদিদের গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মারার জন্য এটা একটা বধ্যশালা। ওরা দৌড়তে দৌড়তে এক সময় এমন একটা হলের মধ্যে ঢুকে যায় যেখান থেকে সেই মুহূর্তে একদল বন্দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গ্যাস চেম্বারের দিকে। ব্রুনোর আর বেরনোর উপায় থাকে না। সে-ও এখন এই মৃত্যুপথযাত্রীদের একজন হয়ে গিয়েছে। নির্বোধ বিস্ময়ে সেও এগিয়ে চলেছে ভিড়ের মধ্যে নাৎসি জল্লাদদের কড়া পাহারায়।

আর তার বাবাই কি না এই বধ্যশালার জল্লাদবাহিনীর সর্দার!

ততক্ষণে বাড়িতে টনক নড়েছে। মা খুঁজে পাচ্ছে না ব্রুনোকে। দিদি-মা বাড়িতে বাগানে আঁতিপাতি করে খুঁজেও যখন পেল না, খবর দিল বাবাকে। বাবা তখন অফিসঘরে অন্য সর্দারদের সঙ্গে গভীর পরামর্শে ব্যস্ত। কত নিপুণভাবে ইহুদিদের নিকেশ করা যায়, কীভাবে তার অধীনে থাকা এই বধ্যশালা নিধনের নতুন উৎকর্ষ গড়বে, সেই নিয়েই সম্ভবত পরিকল্পনা রচনা চলছিল। তিনি দৌড়ে বেরলেন। খোঁজ খোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গল পেরিয়ে সবাই তারকাঁটার ধারে যেখানে খোঁদল খোঁড়া, বেলচা পড়ে, ব্রুনোর পোশাক পড়ে, সেখানে এসে পৌঁছে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না কী ঘটেছে। ব্রুনোর মা আর দিদি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে। ব্রুনোর বাবা তার অফিসার সর্দারদের নিয়ে ছুটে তখন পৌঁছে গিয়েছে বধ্যশালার ভিতরে। ছেলেকে খুঁজে ফিরছে। নানা হলে হানা দিচ্ছে। কিন্তু কোথায় ব্রুনো? এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামে। অঝোর বর্ষণে সব ঝাপসা। আকাশও কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে চরাচর। জল্লাদসর্দার কিছু করে উঠতে পারার আগেই কর্তব্যনিষ্ঠ সুদক্ষ হত্যাকারীর দল তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে

মানুষগুলিকে গ্যাস চেম্বারে পুরে ফেলে শেষবারের মতো সব ঠিকঠাক আছে দেখে নিয়ে লৌহদরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে গ্যাস প্রবেশের যন্ত্র চালু করে দিয়েছে।

অসহায় এক পিতা, নাৎসি জল্লাদ, সেই বন্ধ দরজার এদিকে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্রুনো শেষ হয়, ছবি শেষ হয়। নিধনকারী তার নিজ সন্তানকেই রক্ষা করতে পারে না।

ছবিটা আসলে কার? ব্রুনোর, না ব্রুনোর বাবার? আর দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে যে ইহুদি শিশুটি সেই স্মুয়েল, ছবিটা কি তবে তার? ছবিটাকে তিল তিল করে গড়ে তোলায়, কাহিনি বর্ণনার ভাষায়, চলচ্চিত্র ভাষার নিজস্বতায়, দেখানোর বিশেষ চলচ্চিত্র-আঙ্গিকে, আর শেষ পর্যন্ত এই পরিণামে পৌঁছে দিয়ে পরিচালক তার শিল্পের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু গভীর জীবনবোধ না থাকলে এই শিল্পদৃষ্টি অর্জন করা যায় না। একটি নিটোল ছোটগল্পের মতো ছবিটির গঠনশৈলি। চেকভ্‌ ও হেনরি বা মঁপাসার গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। ছবিটার অভিঘাত এত তীব্র যে প্রেক্ষাগৃহ থেকে নিশ্চুপ বেরিয়ে আসতে হয় ঘাড় হেঁটে করে। কেন? নাৎসি জল্লাদ ব্রুনোর বাবাই নয়, আমরা কেউ ওই নিষ্পাপ শিশু ব্রুনোকে বাঁচাতে পারলাম না। নিজেকেও কেমন হত্যাকারী মনে হয়। যেন আমারও কিছু দায় থেকে গেছে ওই মৃত্যুতে। এমন সব ঘটনা ঘটেছিল তবে নাৎসি জমানায়? এমন কত ঘটনায় ভর্তি নাৎসি ইতিহাস। বড় ইতিহাসের ভিতর কত ছোট ছোট ইতিহাস। ধ্বংসকারীরও ঘর পুড়ে যাওয়ার ঘটনা। নাৎসি-ইতিহাসের আর তার ভয়ংকরতার এক ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা দিল এই ছবি।

পাঠকের মতামত

বর্ষ ৬৭ সংখ্যা ৪ চতুরঙ্গে প্রকাশিত সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির অন্তর্গত 'সার্বিক যুক্তিশীল মানুষ হয় না' প্রবন্ধে ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাস্কালের যে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখাটির সূত্রপাত করেছেন সেই প্রসঙ্গে ওই লেখকেরই একটি বহুবিখ্যাত উক্তি স্মরণে পত্র। অষ্টাদশ শতকের পাশ্চাত্য সাহিত্যের মূলমন্ত্র যখন যুক্তি, এই যুক্তিই যখন সে যুগের লেখককুলের একমাত্র আরাধ্য দেবতা,তখন পাস্কালের 'The brain does not know that the heart has its reason to' অর্থাৎ 'বৌদ্ধিক যুক্তিই একমেবাদ্বিতীয়ম নয়, হার্দিক যুক্তিও গ্রাহ্য' উক্তিটিও উল্লেখযোগ্য। কল্পনা বিষয়টি অষ্টাদশ শতাব্দীর পশ্চিমী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে ছিল কাব্যসাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয়। তাঁদের সব কল্পনা হল অলসমনের স্বপ্নবিলাস তাই তাকে ফ্যান্সি রূপে গণ্য করেন। কল্পনা সম্পর্কিত অষ্টাদশ শতকের পণ্ডিতবর্গের এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ১৯ শতকের প্রথম দশকের ইংরেজ রোমান্টিকরা যে কাব্য সৃষ্টি করেন তা হল অতি উচ্চস্তরীয় কল্পনাসমৃদ্ধ এবং যা আজও বিশ্বের সাহিত্যভাণ্ডারে উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কিটস, কোলরিজ প্রমুখ সর্বপ্রথম দর্শালেন যে ১৮ শতকের সমালোচকেরা যাকে অলস স্বপ্ন বলে অভিহিত করেছিলেন তা মূলত ইমাজিনেশন। এবং সেই চিন্তাশীলরা যে ভেবেছিলেন সার্বিক সৃষ্টি মাত্রই বৌদ্ধিক যুক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। তার যথার্থতা নেই। কল্পনা বা মন যা হৃদয়জাত তার প্রকাশনাই সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার আসল রহস্য।

অশোক মৈত্র
হাওড়া-৬

সাউথ অব পার্ক স্ট্রিটে
একমাত্র বাঙালি রেস্তোরাঁ

পারিজাত

অপেক্ষাকৃত ন্যায্য মূল্যে এখানে পাওয়া যায়

মাছ ও মাংসের বিচিত্র উপাদেয় খাদ্যসম্ভার

বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতে মাত্র

কয়েক সেকেন্ডের পথ

থিয়েটার রোড ও

চৌরঙ্গি রোডের

সংযোগস্থল।

With Best Compliments From

J. BOSECK & CO. (P) Ltd.

15/7 JAWAHARLAL NEHRU ROAD

KOLKATA–700 013

THE BHUBANDHAR TEA CO. LTD.

14/2, CLIVE ROW
KOLKATA–700 001
PHONE : 247-7583 / 7346
FAX : 22812310

Producers of :

Bhubandhar & Amranagar Brands

+ GARDEN FRESH + PREMIUM QUALITY
+ MORE CUPS + STRONG LIQUORING

CTC. TEAS FROM ASSAM

AKSHAYA PĀTRA
Unlimited food for education
Vision Statement
No child in India shall be deprived of education because of hunger
The world's largest NGO-run school meal program
Mid-day meals distributed everyday
Karnataka 5,24,589
Rajasthan 1,85,608
Gujarat 75,000
Orissa 60,685
Uttar Pradesh 96,847
Chhattisgarh 2,800
Total 9,45,529
The program is secular, inclusive and non-discriminating as it is provided only in Government schools that already have a secular policy for admission.
For more details and to support feeding of children, contact:
The Akshaya Patra Foundation
H K Hill, Chord Road, Bangalore 560 010
Ph: 080-2347 1956 / 2357 8622
Fax: 080-2357 8626
E-mail: infodesk@akshayapatra.org
www.akshayapatra.org
Feeding a hungry child is not charity, it's our social responsibility
Supported by Infinity Infotech Parks Ltd www.infinityitpark.com

The symbol of trust™
Since 1932

আপনার আস্থা আমাদের গর্ব

৭৭ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা । ৫ কোটি গ্রাহক । ১৪৭ টি পরিষেবা কেন্দ্র । হাজার হাজার স্মার্ট গাইড । ফাইনান্সিয়াল সুপারমার্কেট

৭৭ বছরেরও বেশি দিন ধরে ঘরে ঘরে পিয়ারলেস'কে করে তুলেছি একটি নির্ভরযোগ্য নাম

পিয়ারলেসে আমরা আপনাকে সব থেকে ভালভাবে বুঝি। বুঝি প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া আপনার চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খার কথা। সেই জন্যই আমরা নিয়ে এসেছি আপনার একান্ত নিজস্ব ফাইনান্সিয়াল সুপারমার্কেট, পিয়ারলেস স্মার্ট মানি। প্রথম সারির আন্তর্জাতিক ফাইনান্সিয়াল ব্র্যান্ডগুলির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে আমরা নিবেদন করছি বিভিন্ন প্রোডাক্টের বিস্তৃত সম্ভার – সঞ্চয়, জীবন বিমা, সাধারণ বিমা এবং মিউচুয়াল ফান্ড। পরিষেবায় পিয়ারলেস এবং তার সাবসিডিয়ারি'গুলি।

Peerless™
SMART MONEY
আপনার ফাইনান্সিয়াল সুপারমার্কেট
সঞ্চয় • জীবন বিমা • সাধারণ বিমা • মিউচুয়াল ফান্ড

(Life/General Insurance policies are distributed through Peerless Developers Limited, a wholly owned subsidiary of the Peerless General Finance and Investment Co. Ltd. (PGFI), as the Corporate Agent of Max New York Life Insurance Co. Ltd. and Iffco-Tokio General Insurance Co. Ltd. duly regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority. Peerless Smart Money is a service trade-mark of PGFI. Insurance is a subject matter of solicitation. Mutual Fund investments are subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing.)

The Peerless General Finance & Investment Company Limited, Peerless Bhawan, 3 Esplanade East Kolkata 700 069 Ph: 033 22483247, Website: www.peerless.co.in, sms 'smart' to 575756. Call toll-free helpline 1800 345 1932

Peerless™
Smart Financial Solutions

S050.2009

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ৩-৪ মাঘ-চৈত্র ১৪১৬

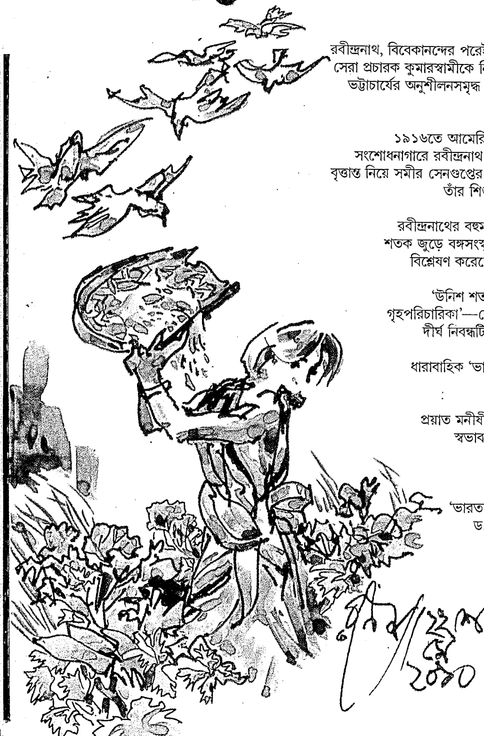

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের পরেই বিশ্বে ভারত ভাবনার অন্যতম সেরা প্রচারক কুমারস্বামীকে নিয়ে শিল্প-ইতিহাসবেত্তা অশোক ভট্টাচার্যের অনুশীলনসমৃদ্ধ দীর্ঘ প্রবন্ধ 'আনন্দ কুমারস্বামী : জীবন ও সাধনা'।

১৯১৬তে আমেরিকার শিশু দরদি ফ্লয়েড স্টারের সংশোধনাগারে রবীন্দ্রনাথ দু'দিন যাপন করেছিলেন। সেই বৃত্তান্ত নিয়ে সমীর সেনগুপ্তের তথ্যবহুল নিবন্ধ 'ফ্লয়েড স্টার : তাঁর শিশু সংশোধনাগার ও রবীন্দ্রনাথ'।

রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক হয়ে ওঠার পিছনে উনিশ শতক জুড়ে বঙ্গসংস্কৃতির উপাদান বৈচিত্রের বহুস্তর বিশ্লেষণ করেছেন ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়।

'উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রলোকের চোখে গৃহপরিচারিকা'—কৌতূহলোদ্দীপক, গবেষণামূলক দীর্ঘ নিবন্ধটি লিখেছেন ড. সুমিতা চক্রবর্তী।

ধারাবাহিক 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়'—এবার আকর্ষণীয় শেষ কিস্তি।

প্রয়াত মনীষী অম্লান দত্তের বিশেষ মানসিক স্বভাবটিকে চিহ্নিত করেছেন মননধর্মী প্রাবন্ধিক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়।

'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' এবং 'ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর' বই দু'টি নিয়ে ড. স্বপন মজুমদারের আলোচনা।

অমর মিত্র-র ছোটগল্প।

With Best Compliments

from :

M. N. DASTUR & COMPANY (P) LTD,

CONSULTING ENGINEERS

KOLKATA, MUMBAI, NEW DELHI, CHENNAI,
BHUBANESWAR, BANGALORE

NEW TOWN OR SANTINIKETAN

THE SAME MARK OF EXCELLENCE IN EVERY HOME

Excellence is writ large on each home that Bengal DCL builds. Be it at the 'Shree', 'Uttara', 'Malancha' Complexes and 'Rabi Rashmi Abasan' at New Town, Kolkata or the 'Kheya Garden Homes' at Santiniketan.

It's because Bengal DCL draws upon the world-class engineering and management resources of the Development Consultants Group - recognized worldwide for its excellence in executing hundreds of projects in India and abroad.

Bengal DCL's commitment to high quality is reflected in the design and construction of every home - conceived for the comfort, safety and privacy of your family. In clean, green and protected surroundings. With every amenity you need for happy and peaceful living.

A few apartments still available at Uttara & Malancha

Bengal DCL Housing Development Co. Ltd.
(A Joint Enterprise of West Bengal Housing Board and DC Properties Ltd.)
DC House, Block - DG, No. 4 (Second Floor)
Sector II, Salt Lake City, Kolkata - 700 091
Phone : (91) (33) 4000 - 3307
Email : support@bengaldcl.com; Website : www.bengaldcl.com

With Best Compliments From

Cookme®

Spicemakers since 1846

KRISHNA CHANDRA DUTTA (SPICE) PVT LTD

235, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,
KOLKATA-700 007
PHONE : (033) 22598703-8693-8695
FAX: (033) 22598432
MAIL : cookme@vsnl.net
WEB : www.kcdspices.com

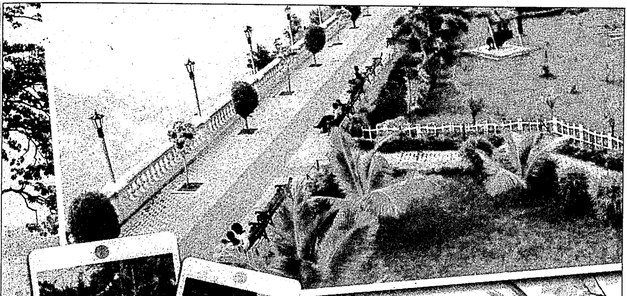

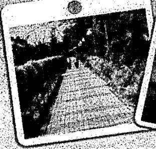

KMDA

committed to environmentally sustainable development

KMDA shares the concerns of the world about the real and complex dangers that threaten our environment, specially the urban environ.

Ganga Action Plan

Development of the Hooghly Water front has been an important agenda for Kolkata Metropolitan Development Authority since the 1980's. As a first step KMDA completed the Millennium Park in 1999 - the first river park of its kind in the eastern region. As a continuum to the river front development programme, KMDA has undertaken beautification programmes along both banks of the river Hooghly in 6 Municipal Towns along with restoration of 17 Ghats. The river has again become the centre of social life in these areas.

Electric Crematoria

Burning of dead bodies in wood pyres invites many ecological hazards. The existing system of burning consumes (about 160 kg. of wood for cremation of one body) a lot of wood and produces ash which ultimately goes to the Ganga. KMDA has set up 8 Electric Crematorias in different Municipal Towns thus saving lakhs of trees.

Solid Waste Management

Huge quantities of solid waste are generated due to rapid expansion in urbanization, industrialization, agricultural production and construction activities. The per capita waste generation varies from 200 gr. to 600 gr. per day depending on the size of the city. KMDA has taken up initiatives for setting up Kolkata Solid Waste Management Project in six municipalities viz, Uttarpara, Konnagar, Rishra, Serampore, Baidyabati and Champdani on the western bank of the river Hooghly, 10 Municipalities in the Engineering Procurement Contract (EPC) mode and 13 ULBs in the Public Private Partnership (PPP) mode.

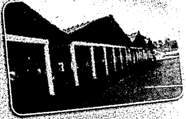

KMDA's vision is to provide sustained and improved quality of life through basic urban services in an inclusive manner.

CMDA Kolkata Metropolitan Development Authority

www.kmdaonline.org www.cmdaonline.com

With

Best Compliments From

❋❋❋

❋❋

❋

A

Well

Wisher

ওদের হত্যা আমাদের আত্মহত্যা !

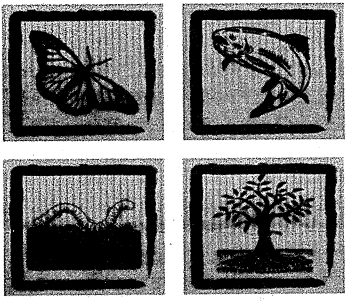

- ✓ একটি গাছ প্রাণকে টিকিয়ে রাখে।
- ✓ এফুল ওফুল করে প্রজাপতি গাছে ফল ধরিয়ে দেয়।
- ✓ কেঁচো চাষীর বন্ধুই, আমাদের বন্ধুও বটে।
- ✓ মাছেরা জলাশয়কে অনেক ভালো করে তোলে।

এইভাবে জীবন শৃঙ্খল বেঁচে থাকে।

আরও দেরী হবার আগেই বন্ধ করুন

• মাটি দূষণ • জল দূষণ • বায়ু দূষণ

জীব বৈচিত্র্যকে বাঁচান, পৃথিবীকে বাঁচতে দিন, নিজে বাঁচুন।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

(পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

With Best Compliments from :

JOONKTOLLEE TEA & INDUSTRIES LIMITED

(An ISO 22000 : 2005 Certified Company)

REGD. OFFICE :
21, STRAND ROAD
KOLKATA-700 001
Ph : 2230 9601–04 (4 LINES)
FAX : (033) 2230 2105
E-mail : info@joonktolleetea.in

SOUTH INDIA REGIONAL OFFICE :
"COWCOODY CHAMBERS"
234-A, RACE COURSE ROAD
COIMBATORE-641018 (TAMIL NADU)
Ph : (0422) 2220961
FAX : (0422) 2220003
E-mail : joonktollee@eth.net

Subsidiary Company : The Cochin Malabar Estates & Industries Ltd.
39/4946-A, Ground Floor, NGO Union Office Building,
Pallimukku, Kochi-682 016

PRODUCERS OF QUALITY CTC/ORTHODOX/GREEN TEAS FROM UPPER ASSAM & WESTERN GHATS AND COFFEE FROM KODAGU.

- THE GOLDEN LEAF INDIA AWARDS – 2010
- BEST NATIONAL SUPPLIER OF INDIA COFFEE TO ILLYCAFFEE 2008
- "THE GOLDEN LEAF INDIA – AWARD" 2007
- "THE GOLDEN LEAF INDIA AWARDS-YEAR 2005"
- "CERTIFICATE OF MERIT FOR THE YEAR 2004" AT THE FLAVOUR OF INDIA
- INDIA COFFEE QUALITY PRIZE FOR "ESPRESSO" 2005
- THE FINE CUP AWARD 2004 INSTITUTED BY COFFEE BOARD-INDIA

আপনার প্রতিটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী পদক্ষেপ যেমন : বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী যন্ত্র ব্যবহার, অপ্রয়োজনে সুইচ বন্ধ করে রাখা, আপনার বিদ্যুৎ বিলের বোঝা যেমন কমাবে, পাশাপাশি যৎসামান্য হলেও প্রাকৃতিক সম্পদকেও রক্ষা করবে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন

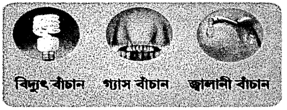

বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে, নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করুন :

- টিউব লাইট/সিলিং ফ্যান/রেফ্রিজারেটর/এয়ার কন্ডিশনার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র ক্রয়ের পুর্বে বিইই স্টার লেবেল দেখে নেবেন - যত বেশি স্টার তত বেশি সাশ্রয়।
- সাধারণ বাল্ব-এর পরিবর্তে সিএফএল (কম্প্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প) ব্যবহার করুন। দেখবেন ৭৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে এবং সাধারণ বাল্বের তুলনায় দশগুণ বেশি জ্বলবে।
- সাধারণ টিউব লাইটের পরিবর্তে বিইই স্টার লেবেলযুক্ত টি৫ টিউব লাইট ব্যবহার করুন। আপনি ৩০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারবেন।
- ধুলো বা নোংরা লাগা টিউব লাইট এবং বাল্ব থেকে আলোর প্রতিফলন ঘটে কম এবং টিউব লাইট ও ল্যাম্পের গায়ে যে ধুলো জমে তা আলোর প্রতিফলন ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেয়।
- সাধারণ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক চোকের পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক চোক্ ব্যবহার করুন। তাতে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বিদ্যুৎ খরচ কম হবে।
- হালকা সুইচের ব্যবহার সবচেয়ে ভাল বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উপায়। অপ্রয়োজনে আলোর সুইচ বন্ধ রাখুন।
- এয়ার কন্ডিশনার মেশিনকে ২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশিতে (৭১.৫ ডিগ্রি ফারহেনহাইট) চালু রাখলে ৩ থেকে ৫ শতাংশ কম বিদ্যুৎ খরচ হবে। কম খরচে বেশি আরাম পেতে ঘরের এয়ার কন্ডিশনারের থার্মোস্ট্যাটকে ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (৭৭.৫ ডিগ্রি ফারহেনহাইট) এ চালু রাখুন।
- ওয়াটার হিটারের তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি থেকে হ্রাস করে ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বজায় রাখলে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১৮ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।
- কম্পিউটর, মনিটর এবং কপিয়ার ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন না থাকলে সেক্ষেত্রে স্লিপ মোডে রেখে দিন। অন্ততঃ ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ খরচ বাঁচবে।
- কৃষি কাজে অধিক কার্যক্ষমতা সম্পন্ন বিইই স্টার লেবেলযুক্ত পাম্প ব্যবহার করুন। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপযুক্ত শোধন এবং জল সরবরাহ নিশ্চিত করুন।

WBSEDCL
বিদ্যুতের সাথে, প্রগতির পথে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)
- পশ্চিমবঙ্গে শক্তি সংরক্ষণ কর্মসূচী রূপায়ণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা

With Best Compliments From

J. BOSECK & CO. (P) Ltd.

15/7 JAWAHARLAL NEHRU ROAD
KOLKATA–700 013

সাউথ অব পার্ক স্ট্রিটে
একমাত্র বাঙালি রেস্তোরাঁ

পারিজাত

অপেক্ষাকৃত ন্যায্য মূল্যে এখানে পাওয়া যায়
মাছ ও মাংসের বিচিত্র উপাদেয় খাদ্যসম্ভার
বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতে মাত্র
কয়েক সেকেন্ডের পথ থিয়েটার রোড ও
চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থল।

With Best Compliments from :

M/s. BALLAVPUR PAPER MFG. LTD.

THE LARGEST KRAFT PAPER PRODUCING UNIT IN EASTERN INDIA AT RANIGUNJ TO PRODUCE 120 TON PER DAY HIGH B.F. KRAFT PAPER ALONG WITH 3.5 M.W. CAPTIVE POWER PLANT.

REGISTERED OFFICE :

801, Central Plaza, 2/6, Sarat Bose Road, Kolkata – 700 020.
Phone : (91) (033) 2485 8510/8559, Tele-Fax : (91) (033) 2485 8513.

ADMINISTRATIVE & SALES OFFICE :

Sukhsagar Building, Ground Floor, 2/5, Sarat Bose Road, Kolkata – 700 020.
Phone : (91) (033) 2419 0647/0711, Tele-Fax : (91) (033) 2419-0710.

WORKS :

Village, Ballavpur, P.O. Ranigunj, Distt. Burdwan (W.B.), Pin – 713 323
Phone : (0341) 2443006, Fax : 0341 2443105.

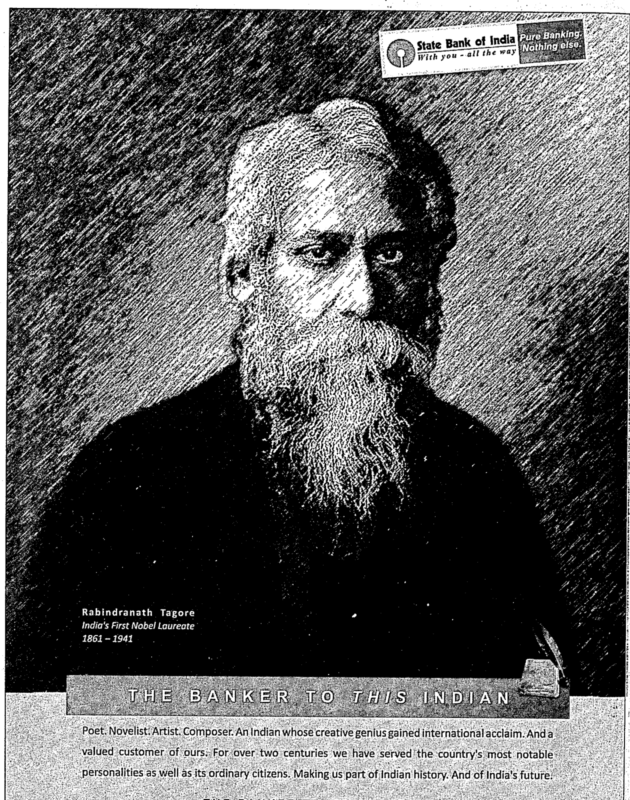

State Bank of India
With you - all the way
Pure Banking. Nothing else.
Rabindranath Tagore
India's First Nobel Laureate
1861 – 1941
THE BANKER TO THIS INDIAN
Poet. Novelist. Artist. Composer. An Indian whose creative genius gained international acclaim. And a valued customer of ours. For over two centuries we have served the country's most notable personalities as well as its ordinary citizens. Making us part of Indian history. And of India's future.
THE BANKER TO EVERY INDIAN
Visit us at www.statebankofindia.com | Call toll free 1800-11-22-11
INTER PUBLICITY/SBI/ENG-01/09-10

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ৩-৪

মাঘ-চৈত্র ১৪১৬

প্রবন্ধ

- আনন্দ কুমারস্বামী : জীবন ও সাধনা — অশোক ভট্টাচার্য — ২০৫
- ফ্লয়েড স্টার : তাঁর শিশু-সংশোধনাগার ও রবীন্দ্রনাথ — সমীর সেনগুপ্ত — ২২০
- রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বঙ্গীয় প্রেক্ষিত — শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় — ২২৬
- উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের চোখে গৃহ-পরিচারিকা — সুমিতা চক্রবর্তী — ২৩১
- সুস্থির শান্ত সংযত প্রত্যয়ী অম্লান দত্ত — অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় — ২৫১

কবিতা ২৪৩-২৫০

- শান্তি সিংহ ❖ রিমি দে ❖ পার্থপ্রতিম মজুমদার
- তাপস রায় ❖ বিশ্বনাথ গরাই ❖ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
- অজয় নাগ ❖ গৌতম ঘোষদস্তিদার

ছোটগল্প

- কেউ না কেউ খুঁজে নেবে — অমর মিত্র — ২৫৪

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

- ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত — ২৫৮

গ্রন্থসমালোচনা ২৭৮-২৯৮

- স্বপন মজুমদার ❖ ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ❖ প্রসাদরঞ্জন রায়
- সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত ❖ শান্তি সিংহ ❖ রাহুল পুরকায়স্থ

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

- 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' পড়ে মনে এল — অলকনন্দা দাশগুপ্ত প্যাটেল — ২৯৯
- হাবিব তনবির স্মরণে — ৩০০
- ওমানের অভিজ্ঞতা — মীনাক্ষী — ৩০১
- বাতাস জল আকাশ আলো — মেঘ মুখোপাধ্যায় — ৩০৩

স্মরণে

- কুমার রায়—এক সজ্জন নাট্য-অভিভাবক — কুন্তল মুখোপাধ্যায় — ৩০৮

চলচ্চিত্রসমালোচনা

- সুইট রাশ — ৩১০

সম্পাদক : আবদুর রাউফ

শিল্পপরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদনা সহকারী : মেঘ মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী

শঙ্খ ঘোষ

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

রণেন আয়ন দত্ত

তুষার তালুকদার

মূল্য : ৪০ ডাকে : ৬০

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ক্রান্তি প্রেস ৩৭ রিপন স্ট্রিট,

কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

অক্ষর বিন্যাসে ক্রান্তি প্রেস ● ৩৭ রিপন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬

দূরভাষ ২২১৫-১৮৩৪

Producers of Quality Tea

With tea estates located in the premium growing areas of Assam, B&A teas have earned a reputation in India and abroad for its quality. Our teas will continue to be one of the finest and most sought after in India and abroad.

B & A LIMITED

Kolkata Office

113 Park Street
Kolkata – 700 016.
Phone No. 2217-6815
2245-7389

Regd. Office

Mahatma Gandhi Road
Jorhat – 785 001.
Phone No. (0376) 2304673
(0376) 2304267

আনন্দ কুমারস্বামী : জীবন ও সাধনা

অশোক ভট্টাচার্য

ভারততাত্ত্বিক ও ভারতীয় কলাশিল্পের এক শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা আনন্দ কুমারস্বামীর নাম আজকের বাঙালি সুধীসমাজে পরিচিত নয়। অথচ গত শতাব্দের প্রথমার্ধে তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারত-ভাবনার সব থেকে বড় প্রচারক। এই মনীষীর আবেগ, অনুসন্ধিৎসা, মননশীল বিশ্লেষণ ও সুবিস্তৃত বিদ্যা আমাদের পরম্পরাগত সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প ও ধর্মের সুগভীর পরিচয় পূর্বে ও পশ্চিমে প্রসারিত করে দিয়েছিল। তাঁর বিপুল রচনাবলি ও সাংগঠনিক উদ্যম তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সাক্ষ্য বহন করে। এই নিবন্ধের অবতারণা আজকের পাঠকসমাজের কাছে তাঁর সেই উদ্যম ও সাধনার কথা সাধ্যমতো তুলে ধরতে।

আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর জন্ম ২২ আগস্ট ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে, বর্তমান শ্রীলঙ্কা বা তৎকালীন সিংহলের কলম্বো শহরে। তিনি ছিলেন সিংহলে বসবাসকারী এক তামিল খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান। জন্মসূত্রে তিনি সৌভাগ্যশালী। কেননা তাঁদের পরিবারটি ছিল সিংহলে ইংরাজি শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত পরিবারগুলির অন্যতম। তাঁর পিতা স্যার মুতু কুমারস্বামী ছিলেন অতীব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুক্তমনা মানুষ—পেশায় কলম্বোর অগ্রগণ্য আইনজীবী; তাঁকে বলা হত, 'দি লায়ন অব মেট্রোপলিটান বার'। সেইসঙ্গে তিনি তাঁর পিতার মতোই ছিলেন ইংরাজ শাসনাধীন আইনসভার সদস্য। স্যার মুতু কিন্তু ইংরাজ শাসনের সুফলগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়েও তাঁর স্বাদেশিক সংস্কৃতি বা আভিজাত্যকে বর্জন করেননি। বরং তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে স্বদেশের সভ্যতার মিলন—যেমন চেয়েছিলেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সন্তানেরা তাঁদের ভাবনায় ও কর্মে। স্যার মুতুর অধ্যয়ন শুধুমাত্র আইন সংক্রান্ত গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহৎ সাহিত্য পাঠ করতেন, পাঠ করতেন ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদিও। তিনি পালি ভাষা থেকে বৌদ্ধ গ্রন্থ ও তামিল ভাষা থেকে নাটক ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ইংরাজি ভাষায় তিনি ছিলেন সাবলীল এবং আইনসভার এক শ্রেষ্ঠ বক্তা। অন্যায় কোনও আইনে সম্মত হননি। যেমন অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সিংহলে ইংল্যান্ডের চার্চকে সমৃদ্ধ করার প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন।

স্যার মুতু প্রথম ইংল্যান্ডে যান ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সেখানকার উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা আদৃত হল। তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করে প্রথম এশিয়াবাসী হিসাবে ইংল্যান্ডে আইন ব্যবসার সুযোগও লাভ করলেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় তিনি সিংহলের আইনসভায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও বিদ্যাবত্তার জন্য লন্ডনের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করলেন। তারই ফলশ্রুতিতে তিনি প্রথম এশিয়াবাসী হিসাবে নাইটহুড-এ ভূষিত হন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় ডিস্‌রেলির। ডিস্‌রেলি তাঁকে মডেল করেই 'কুসিনারা' নামক উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কারণে সেটা আর সম্পূর্ণ হয়নি। এই দ্বিতীয়বারের ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময়েই স্যার মুতু তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে যোগ্য জীবনসঙ্গিনী হিসাবে কেন্টের এক ভদ্র ইংরাজ পরিবারের কন্যা এলিজাবেথ বিবিকে বিবাহ করেন। বিবাহের আগে থেকেই এলিজাবেথ ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, বিশেষ করে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিকতার দিকে। তখনও পর্যন্ত কোনও এশিয়ান ব্যক্তির সঙ্গে ইংরাজ নারীর বিবাহ প্রচলিত হয়নি। তবু এই বিবাহ ক্যান্টারবেরির বিশপ যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

১৮৭৬ সালে স্যার মুতু সস্ত্রীক দেশে ফিরে এসে কলম্বোয় একটি ম্যানসনে বসবাস শুরু করেন। পরের বছর জন্মগ্রহণ করেন আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী। তাঁর মধ্যনাম 'কেন্টিশ' মায়ের সূত্রেই পাওয়া। দু'বছর পর এলিজাবেথ পুত্রসন্তান নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। ঠিক হয় কিছুদিনের মধ্যেই স্যার মুতু তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন। সেখানে তাঁর বন্ধুরা অপেক্ষা করছিলেন, এমনকী ডিস্‌রেলি আশা করেছিলেন তিনি ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের সদস্য হবেন। কিন্তু যে-দিন তাঁর ইংল্যান্ডে যাত্রা করার কথা সেই ৪ঠা মে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অকালে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়। তখন আনন্দর বয়স মাত্র দু' বছর।

স্যার মুতুর মৃত্যুর পর এলিজাবেথ কেন্টেই থেকে যান। সেখানে একটি কটেজ নিয়ে তাঁর অবিবাহিত দিদির সঙ্গে আনন্দকে বড় করে তোলেন। আনন্দ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহলে তাঁর শ্রোতাদের কাছে পিতামাতার স্মৃতিচারণ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন : 'তিরিশ বছর আগে আমার পিতা ছিলেন সিংহলের এক অগ্রগণ্য তামিল। আপনাদের অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন যে তিনি খুবই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়েছিলেন। সে সময় আমাদের প্রয়োজন ছিল পরিবর্তিত এক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া; এবং প্রমাণ করা যে আমরা পাশ্চাত্য মানুষদের সঙ্গে তাদের শিক্ষাক্ষেত্রেও সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারি। আমার সন্দেহ নেই, তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তবে (আমার জ্ঞাতি ভাই শ্রীঅরুণাচলম ও শ্রীরমননাথের মতোই, যাঁরা একদিন তাঁর পথেই হেঁটেছিলেন) তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অতিক্রম করে স্বদেশি আদর্শ ও প্রাচ্যের পরম্পরাকে, যার সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সংরক্ষণ ও পোষণ করতেন। এটা তাই স্বাভাবিক যে তাঁর পুত্র সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমার মার সম্পর্কে জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে তামিলদের প্রতি তাঁর ছিল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা; তিনি আশা করেছিলেন পিতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ ইংরাজ ও তামিলদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে।'

কেন্টে আনন্দ মা ও মাসির কাছে বারো বছর পর্যন্ত বাড়িতেই বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। তারপর তাঁকে ভর্তি করা হয় উইক্লিফ (Wycliffe) কলেজে। স্কুলে আনন্দ জীববিজ্ঞান ও ভূবিদ্যার প্রতি বিশেষ আগ্রহী হন। গ্লোউসেস্টারশায়ারে, স্কুলের কাছাকাছি, নানা জায়গায় অনুসন্ধান করে তিনি শতাধিক ফসিল আবিষ্কার করেন। সে বিষয়ে স্কুলের পত্রিকাতেই তাঁর প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এইভাবে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তাঁর গবেষণার সূত্রপাত। কৃতী ছাত্র আনন্দ, স্কুলের বিজ্ঞান ক্লাবে বক্তৃতা করেছেন, সাহিত্য সভার আলোচনাতেও অংশ নিয়েছেন। সেই সঙ্গে সহপাঠীদের মতোই খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, বিশেষ করে নিউ টেস্টামেন্টের কাহিনি ও বাণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে।

স্কুলের পাঠ শেষ করে আনন্দ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি হন। ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্সসহ কলেজ থেকে তিনি প্রথম শ্রেণিতে বিজ্ঞানে স্নাতক হন। তারপর দেখা যায় তিনি তিন বছর পর ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ইউনিভার্সিটি কলেজের ফেলো মনোনীত হয়েছেন। অন্তর্বর্তী তিন বছর তিনি নিজের খরচে সিংহলে গিয়ে সেখানকার খনিজ সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং তার ফলাফল গবেষণাপত্র লিখে প্রকাশ করেছেন। তাঁর আবিষ্কার সিংহলের ব্রিটিশ প্রশাসনকে 'মিনারোলজিক্যাল সার্ভে অব সিলোন' প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে; এবং আনন্দ কুমারস্বামীকেই করা হয় তার প্রথম অধিকর্তা।

॥২॥

'মিনারোলজিক্যাল সার্ভে অব সিলোন'-এর অধিকর্তা হিসাবে কাজ করার জন্য তিনি তাঁর বাসস্থান হিসাবে বেছে

নেন সিংহলের শেষ স্বাধীন রাজ্য ক্যান্ডির রাজধানী শহরকে। ক্যান্ডির অবস্থান সিংহলের মধ্যবর্তী মালভূমি অঞ্চলে। ক্যান্ডি শহরের কাছে একটি বাংলো নিয়ে, সদ্য বিবাহিত ইংরাজ রমণী ইথেল মেরি (প্যাট্রিজ) সহ তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ইথেল ছিলেন গুণী মহিলা। তিনি ভাল ফোটোগ্রাফার ছিলেন—কুমারস্বামীর প্রথম কলাশিল্প বিষয়ক গ্রন্থে তাঁর তোলা সিংহলের কারুশিল্পের অনেক ছবি মুদ্রিত হয়েছে। তাছাড়া, কুমারস্বামী যখন তাঁর কাজে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন, তখন তিনি পরম্পরাগত সিংহলি এম্‌ব্রোয়েডারি করতেন, সে-বিষয়ে স্থানীয় মেয়েদের শিক্ষা দিতেন, পাশাপাশি ইংরাজিতে প্রাচীন তামিল গ্রন্থের ওপর নিবন্ধ লিখতেন।

ভূবিজ্ঞানী হিসাবে তখন কুমারস্বামী গ্রাম-গ্রামান্তরে, পর্বতে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন—কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও গরুর গাড়িতে। এই নিরীক্ষামূলক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি মাইকা, গ্রাফাইট প্রমুখ মূল্যবান খনিজ আবিষ্কার করেন। সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন পরপর চার বছর প্রকাশিত সার্ভের রিপোর্টে এবং পৃথক বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক নিবন্ধে। এইসব রিপোর্ট ও গবেষণামূলক পত্রগুলি সমন্বিত করে যে গবেষণা গ্রন্থ তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন, তা-ই তাঁকে ডি.এস্.সি উপাধিতে ভূষিত করে। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্কানুসারে প্রথম, কারণ তিনিই প্রথম সিংহলি যিনি এই ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছিলেন। ভূবিজ্ঞানী হিসাবে কুমারস্বামীর মৌলিক কাজ হল 'থোরিয়ানাইট' (theorianite) নামক একটি নতুন খনিজ পদার্থের আবিষ্কার।

দেশের নানা স্থানে পাহাড়ে-প্রান্তরে খনিজ সম্পদ অন্বেষণের সময় কুমারস্বামী সিংহলি গ্রাম-সমাজের মানুষজনের কাছাকাছি পৌঁছে যান, সন্ধান পান বংশানুক্রমে কর্মরত কারুশিল্পীদের, পরিচিত হন তাঁদের শিল্পকর্ম ও করণকৌশলের সঙ্গেও। তাঁর সংবেদনশীল শিল্পীমন সিংহলের কারুশিল্পকে নতুনভাবে আবিষ্কার করল। বিশেষ করে লন্ডনে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের সময় ইংল্যান্ডের প্রি-রাফেলাইট আন্দোলন ও উইলিয়াম মরিশের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তিনি জাতীয় জীবনে কারুশিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। স্বদেশে সেই শিল্পধারা ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের ফলে, মেশিনজাত ব্যবহারিক জিনিসের প্রাদুর্ভাবে কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছে তা দেখে তিনি বিচলিত হন।

এখানে আনন্দ কুমারস্বামীর সমকালীন সিংহলকে বোঝার জন্য ঐতিহাসিক কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্তমান শ্রীলঙ্কা এবং পূর্বতন সিংহল, ভৌগোলিক অবস্থানে ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণের একটি বড় দ্বীপ। এই দ্বীপের ইতিহাস ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিম অধিবাসীদের কথা বাদ দিলে প্রথম যে সভ্য মানুষের আগমন ঘটেছিল, তাঁরা ছিলেন গুজরাট অঞ্চলের অধিবাসী—সমুদ্রপথে তাঁরা শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে দক্ষিণ ভারতে অনুসৃত স্থবিরবাদী বা থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম সিংহলে প্রসারিত হয়। এঁদের জনবসতি প্রধানত দ্বীপের দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্যভাগে। খ্রিস্টীয়কাল থেকে দক্ষিণ ভারতের তামিলরা দ্বীপের দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে। সপ্তম-অষ্টম থেকে নবম-দশম শতককালে তামিলরা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের দ্বারা ভারতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তা সিংহলবাসী তামিলদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তখন থেকে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মই সিংহলবাসীদের প্রধান অনুসৃত ধর্ম। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে ইউরোপের বাণিজ্য তরী সিংহলের উপকূলে পৌঁছতে শুরু করে। প্রথম আসেন পর্তুগিজ বণিকরা এবং তাঁরা ক্যান্ডির রাজাদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি করে মশলা ও অন্যান্য দ্রব্য ইউরোপের বাজারের জন্য নিতে থাকেন। এই পর্তুগিজরা ক্রমে সমুদ্রকূলবর্তী কয়েকটি বন্দরকে অধিকার করে তাঁদের উপনিবেশ স্থাপন করেন। পর্তুগিজ ধর্মযাজকদের মাধ্যমে ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার ঘটে সিংহলে। পর্তুগিজদের পর আসেন ডাচরা। এঁদেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক বাণিজ্য। তাই পর্তুগিজ বা ডাচরা সিংহলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। তাঁদের আমলে ক্যান্ডি ছিল স্বাধীন রাজ্য, সেই রাজ্যের সমাজ-অর্থনীতির ধারাও থেকেছে অব্যাহত। এই অবস্থার এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন দেখা দিল অষ্টাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে, ইংরাজদের আবির্ভাবের পর। ইতিপূর্বে পর্তুগিজ ও ডাচেরা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বাস ও বিবাহাদি করে সামাজিকভাবে মিশে গিয়েছিলেন। তার ফলেই খ্রিস্টধর্ম দেশবাসীর মধ্যে স্থায়ী আসন করে নিতে পারে। ডাচেরা রোমান আইন প্রবর্তন করে প্রশাসনিক কাজকে উন্নত করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশের চরিত্র হল একেবারেই অন্য ধরনের। তাঁরা কেউই স্থায়ী বাসিন্দা হলেন না, প্রকৃত অর্থে কোনও সামাজিক সম্পর্কও স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে গড়ে তুললেন না। তাঁরা আচার-ব্যবহারে বরং বোঝালেন তাঁরা উন্নততর

সাদা-চামড়ার মানুষ। সিংহলের কোনও কিছুর প্রতিই তাঁদের শ্রদ্ধা বা মমতা দেখালেন না। সিংহলের প্রতি তাঁদের মনোভাব হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত এক উজ্জ্বল শিরোমণি। তাঁদের প্রশাসন ক্রমশ বন্দর অঞ্চল ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহলের কেন্দ্রস্থিত স্বাধীন ক্যান্ডি রাজ্যও তাঁরা অধিকার করে নিলেন। বণিক ইংরাজ একদিকে মশলার পাশাপাশি সিংহলে উৎপাদিত চা, কফি ও রবার ইউরোপে চালান করতে থাকল। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের মিলে ও কারখানায় তৈরি বস্ত্র ও অন্যান্য দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্তু সিংহলের বাজারে সস্তায় বেচতে থাকল। ফলে সিংহলের তাঁত বস্ত্র ও অন্যান্য কারুকাজ তার বাজার হারাল—যেমন ঘটেছে ভারতে। ইংরাজ প্রশাসন ক্রমে ক্রমে সর্বত্রগামী ও সর্বব্যাপী হয়ে উঠলে গ্রাম-সমাজের স্বাভাবিক জীবনধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। সিংহলে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন হলে, শিক্ষিত মানুষ ইংরাজদের বশংবদ ও তাঁদের আচার-আচরণের অনুকরণকারী হয়ে উঠল।

স্বদেশের এই অবস্থা আনন্দ কুমারস্বামীকে বিচলিত করেছিল। তিনি নিজে ইংরাজ জননীর সন্তান, ইংল্যান্ডে থেকে ইংরাজি ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাঁর ধর্মও খ্রিস্টধর্ম। ফলে ইংরাজদের গুণাবলি সম্পর্কে, তাঁদের চরিত্রের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাই স্বদেশে সেই সভ্যতার বিকৃত প্রতিফলন এবং দেশবাসীর দ্বারা তার অন্ধ অনুকরণ তাঁকে মর্মাহত করেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি আত্মকথনমূলক প্রবন্ধে তাঁর নিজের উপলব্ধির কাহিনি বর্ণনা করেছেন। 'Borrowed Plumes' নামক এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর কাহিনিতে লিখছেন : তখন তিনি কাজের সূত্রে দূরের এক গ্রামে গ্রাম-প্রধানের অতিথি হয়ে আছেন। সকালে ঘোরাঘুরি করে প্রতিদিন প্রাতঃরাশ সেরে বিশ্রাম নেন। গ্রামটি ছিল রত্নপুর থেকে সেতুবন্ধের দিকে তীর্থযাত্রীদের পথের ধারে। তিনি একদিন সেই পথে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গী হয়ে দেখলেন, দূরের আর কাছের নানা বয়সের নারী-পুরুষ বহু মানুষ পথ ধরে এগিয়ে চলেছে...তাদের কেউ কেউ মানত মেনে হাত ও হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে পথ কেটে চলেছে। আর একদিন তিনি গ্রাম-প্রধানের বাড়ির সামনে বসে আছেন, তাঁর সেই তীর্থপথযাত্রার কথা মনে এল। সকালটি ছিল মনোরম। কাছের একটা খেতে কর্মরত কৃষকদের গান তাঁর কানে আসছে—মূল গায়েন বৃদ্ধ এক কৃষক, সে তার ভাঙা কাঁপা-কাঁপা গলায় সরল মন্ত্রের মতো গানের কলিগুলো ধরিয়ে দিচ্ছে। সে-দিনের সেই প্রশান্ত সকালটিতে তাঁর মন এক অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই শান্ত পরিবেশে মনে মনে নিজেকেই তিনি অভিনন্দিত করলেন। কিন্তু তখনই ঘটল ছন্দপতন। তিনি দেখলেন এক সিংহলি রমণী তার সন্তানকে নিয়ে পথ ধরে চলেছে—ইউরোপিয়ান আদপের পোশাক পরে। তাদের পোশাক নোংরা ধুলিধূসর। অথচ, তাঁর নিজের বর্ণনায়, 'They were not paupers of the village as might be supposed, but thought rather well of themselves, and were looked up to, as wearing European dress. They were the local converts to a foreign religion and a foreign dress, equally unnatural and equally misunderstood. And there with came before my mind all I had seen in the last two years of the ruins of native life and manners before advancing civilization; ...And I knew it to be a part of what is happening all the world over, the continual destruction of national character and individuality and art'...। এরপরেই তাঁর মনে হল : 'How different it might be if we Ceylones were bolder and more independent, not afraid to stand on our own legs, and not ashamed of our nationalities. Why do we not meet the wave of civilization on equal terms? Our eastern civilization was here 2000 years ago; shall its spirit be broken before the new commercialism of the west? ...Sometimes I think the eastern spirit is not dead, but sleeping and may yet play a great part in the world's spiritual life.'

এই প্রত্যয়, এই উপলব্ধি আনন্দ কুমারস্বামীকে এক নতুন পথের যাত্রী করল। তিনি তাঁর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র 'খনিজ সম্পদ' থেকে সরিয়ে 'মানব সম্পদ' অভিমুখী করলেন। তাঁর কাছে দেশবাসীর এই সাংস্কৃতিক বিপর্যয় প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। কারণ তিনি ইংরাজদের পরিবেশে প্রকৃত ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। জাফনায় তিনি তাঁর শ্রোতাদের সে-সময় বলেও ছিলেন : 'I believe it is difficult for any of us, who has not actually been brought up in England, to realise the hopeless, inadequacy of our attempts at imitation; to Engishmen the absurdity is obvious, but to us it is not revealed. Coming presently to the East and starting from the ordinary English point of view, I have been struck.'

স্বদেশবাসীর এই দাসসুলভ অনুকরণপ্রিয়তা আনন্দ কুমারস্বামীকে ব্যথিত করেছিল। তাঁর কাম্য ছিল প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্য সভ্যতার সার্থক মিলন—উভয়ের গুণাবলির সমন্বয়ে এক মহত্তর মানবসভ্যতা। যেমন ভাবনা ছিল রবীন্দ্রনাথের। সেই পথে এগতে গেলে, তাঁর মনে হয়েছে, প্রথম প্রয়োজন সিংহলবাসীর মধ্যে আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করা। আর সেই কাজেই তিনি ব্রতী হলেন বছর কয়েক।

॥৩॥

আনন্দ কুমারস্বামী মিনারোলজিকাল সার্ভের কাজের সূত্রে সিংহলের গ্রাম-গ্রামান্তরে পাহাড়ে-অরণ্যে ঘুরে ঘুরে গ্রাম-জীবন, গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আচার-আচরণ, কারুশিল্প ও চারুশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর নিজস্ব প্রবণতায় শিল্পীদের করণকৌশল ও পরম্পরাগত শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও জ্ঞাত হন। এইসব অভিজ্ঞতা আর শিক্ষাই তাঁকে বিংশ শতাব্দের প্রথম দশকের মাঝামাঝি কয়েক বছরে এক প্রতিষ্ঠিত ভূবৈজ্ঞানিকের জীবন ছেড়ে শিল্প-ঐতিহাসিকের অনিশ্চিত জীবনের দিকে নিয়ে যায়। তিনি তাঁর প্রথম শিল্পকলা বিষয়ক নিবন্ধটি লিখেছিলেন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আর ওই বছরেই The Ceylon Observer পত্রিকায় লেখেন 'An open letter to Kandyan Chiefs'। এই চিঠিতে ক্যান্ডি শহরের অদূরের গ্রামের একদা সমৃদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পকলার যে অবক্ষয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তার বর্ণনা দেন। একদা কারুশিল্প তৈরির যে অননুকরণীয় দক্ষতার অধিকারী ছিলেন গ্রামের শিল্পীরা, তাঁরা কীভাবে ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবজাত কল-কারখানায় তৈরি প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের আমদানিতে বাজার হারিয়ে তা হারিয়ে ফেলছেন, সেকথা সবিস্তারে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। বলেন, সেইসব কারুশিল্প এখন শুধু সরকারি ও ব্যক্তিগত সংগ্রহালয়ে নিদর্শন হয়ে আছে মাত্র। অনুরূপ অপর একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, শুধু কারুশিল্পই নয়, সিংহলের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, গৌরবগাথা, সাহিত্য ও সংগীতও অবহেলিত হচ্ছে। পরিবর্তে দেশে পঠিত হচ্ছে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, গীত হচ্ছে পাশ্চাত্য সংগীত।

দেশের এই সাংস্কৃতিক বিপর্যয়কে প্রতিহত করতে, দেশে স্বদেশি ভাবনাকে সঞ্চারিত করতে কুমারস্বামী তাঁর সহকর্মী কিছু সংখ্যক বিদেশি ও দেশি সুশিক্ষিত মানুষকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন The Ceylonese Reform Society। এই সোসাইটির মুখপত্রের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সেই সংখ্যায় ছাপা হয় সোসাইটির ঘোষণাপত্র (manifesto) ও সদস্যদের নামের তালিকার শীর্ষে সভাপতি হিসাবে কুমারস্বামীর নাম। ঘোষণাপত্রের মূল কথাগুলি নীচে দেওয়া হল।

ঘোষণাপত্রের শুরুতেই বলা হয়েছে সোসাইটির উদ্দেশ্য সিংহলিদের সামাজিক আচার-আচরণ ও শিক্ষাদীক্ষার সংস্কারসাধন। ইংরাজ শাসনের ফলে দেশের মানুষদের মধ্যে ইউরোপীয় আচার-আচরণ, যা দেশের পরিবেশ ও আবহাওয়ার অনুপোযোগী, অন্ধভাবে অনুকরণের যে অভ্যাস তার বিরুদ্ধে সোসাইটি জনমত গঠন করবে। এই অবিবেচনাপ্রসূত অনুকরণের ফলে প্রাচ্যের দেশগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলছে, মানবসভ্যতার বিকাশে তাদের সভ্যতার যে মূল্য তাও সেইসঙ্গে হারিয়ে ফেলছে। অথচ এই অনুকরণ কোনও ভাবেই পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণাবলি আহরণে সহায়ক হচ্ছে না। অন্যদিকে প্রচলিত শিক্ষায় পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার ফলে প্রাচ্য সভ্যতার উৎকর্ষতার দিকগুলি হচ্ছে অবহেলিত। নারী-পুরুষ সকলে স্বাভাবিক পরম্পরাগত জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। শিক্ষিত দেশবাসীর অধিকাংশই বুঝছেন না যে অন্য আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা ইউরোপীয় জাতিগুলির সভ্যতাকে সম্যকভাবে আয়ত্ত করা কত দুঃসাধ্য। তাই সোসাইটি সচেষ্ট হবে সিংহলে বসবাসকারী প্রাচ্যের জাতিগুলিকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধে ঐক্যবদ্ধ করে প্রাচ্য সভ্যতার ধারায় তাদের উন্নত হয়ে ওঠার জন্য অনুপ্রাণিত করা। সেইসঙ্গে পাশ্চাত্যের গুণাবলিকেও আয়ত্ত করায় সচেষ্ট হওয়া।

যে কাজগুলি আপাতত করণীয় তা হল সকলের মধ্যে সহনশীলতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করা। আর পরিচ্ছদ হিসাবে পরম্পরাগত দেশি পোশাক পরিধান করা—বিশেষত আনুষ্ঠানিক সমাবেশগুলিতে। খাদ্য হিসাবে অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও স্বাভাবিক বিবেচনায় প্রাচ্য অভ্যাসে নিরামিশ আহার গ্রহণ করা। আর মরদেহ সৎকারে দাহকর্মের প্রচলিত দেশীয় অভ্যাস অবলম্বন করা—কেননা সেটাই সবথেকে স্বাস্থ্যকর ও বাস্তবসম্মত। সোসাইটি অবগত যে পোশাক, খাদ্য ও ভাষা সভ্যতার বহিরঙ্গের লক্ষণমাত্র, তবু সে সচেষ্ট হবে স্বদেশি ভাবনায় পরম্পরাগত অভ্যাসগুলিকে অনুসরণ করার পক্ষে জনমত গঠনে।

ঘোষণাপত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিভাবকদের প্রতি আবেদন করা হয়েছে তাঁরা যেন মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়গুলিকে চাপ দেন। মাতৃভাষা হিসাবে সিংহলি ও তামিল ভাষা ও তার অতিরিক্ত পালি ও সংস্কৃত ভাষাচর্চার মাধ্যমে প্রাচ্য সভ্যতার উপযোগী শিক্ষা প্রসারে সোসাইটি সচেষ্ট থাকবে—একথাও বলা হয়েছে। অবশ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নততর বিষয়গুলির

প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রয়োজনও স্বীকৃত হয়েছে। সোসাইটি দেশীয় শিল্পকর্ম, বিশেষত কারুকর্ম ও বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনে উদগ্রীব হবে। স্থানীয় কুম্ভকারদের তৈরি মাটির বাসনপত্রের বাজার তৈরিতে সচেষ্ট থাকবে। কারণ, পশ্চিমের কারখানায় তৈরি তৈজসপত্র অপেক্ষা মাটির পাত্রগুলিই দেশের পরিবেশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ধর্মের বিষয়ে সোসাইটি থাকবে উদার।

উপরোক্ত ঘোষণাপত্র অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে The Ceylon Social Reform Society গঠিত হয়েছিল স্বদেশি জীবনচর্যার প্রতি দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য। সোসাইটির স্বদেশি আন্দোলন ছিল একান্তই সামাজিক। তার বিরুদ্ধতা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি নয়, তার অন্ধ নির্বোধ অনুকরণের প্রতি। তাই মহারানি ভিক্টোরিয়ার ব্রিটিশ শাসনের স্থিতিস্থাপকতার পরিবেশে বেশ কয়েকজন ইংরাজ সুধী মানুষও এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলন ছিল বাস্তব পরিস্থিতির পরিপন্থী। কারণ সে-সময় আর্থিক কারণে ব্রিটিশ অধীনস্ত সরকারি ও বেসরকারি চাকরির জন্য এবং ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ইংরাজি ভাষা জানা ছিল আবশ্যিক। আর ইংরাজদের সঙ্গে ওঠাবসার প্রয়োজনে তাদের আচার-আচরণ অনুযায়ী চলাও ছিল অভিপ্রেত। তাই এই সোসাইটি সিংহলের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সাড়া তুললেও বৃহত্তর সমাজকে কাছে টানতে ব্যর্থ হল। কুমারস্বামীর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে তাঁদের আন্দোলনের সময় আসেনি, আর সেই কারণে এই আন্দোলন স্থায়ী হবে না। কয়েক বছর প্রকাশের পর সোসাইটির মুখপত্র *'The Ceylon National Review'*-ও বন্ধ হয়ে গেল। তবে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েও কুমারস্বামী এই পত্রিকায় নিয়মিত নিবন্ধ লিখেছেন, পুস্তক-সমালোচনা করেছেন।

এই আন্দোলন ব্যক্তি কুমারস্বামীকে তাঁর সারা জীবনের সাধনক্ষেত্রটিকে বেছে নিতে সাহায্য করেছে। আর ঐতিহাসিক বিচারে বলা যায় সেইসঙ্গে সিংহলের শিক্ষিত সমাজে স্বদেশি ভাবনার বীজ রোপন করে। এই স্বদেশি ভাবনাই কালক্রমে স্বরাজ ও স্বাধীনতা অর্জনের পথে সিংহলিদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

॥ ৪ ॥

বিংশ শতাব্দের প্রথম দশকের দু'টি বছর—১৯০৫-০৭ কুমারস্বামী তাঁর যৌবনের উদ্দীপনায় একই সঙ্গে অনেকগুলি কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই দু'বছরের মধ্যে তিনি মিনারোলজিকাল সার্ভে অব সিলোন-এর জন্য তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্টটি তৈরি করেন। এই সার্ভের সূত্রেই সিংহলের গ্রাম-গ্রামান্তরে ভ্রমণের সময় তাঁর সুযোগ হয় দেশজ অলঙ্কার, মৃৎপাত্র, ধাতুনির্মিত নানা বস্তু, তাঁতে বোনা নকশা-সমন্বিত বস্ত্রাদি, এমনকী ব্রোঞ্জের মূর্তি সংগ্রহ করা। এইসব কারুকর্ম ও কারুশিল্পীদের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে তখন প্রস্তুত করে চলেছেন তাঁর সিংহলি শিল্পকলা বিষয়ক প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনার জন্য। নিজস্ব ব্যক্তিগত সংগ্রহ গড়ে তোলার পাশাপাশি তখন তিনি কলম্বোর সরকারি সংগ্রহশালার জন্যও শিল্পবস্তু কিনে দিচ্ছেন, আয়োজন করছেন সিংহলি কারুশিল্পের প্রদর্শনীর। সেই প্রদর্শনীতে দর্শকরা শুধু কারুশিল্পকে নয়, সমবেত কারুশিল্পীদের করণকৌশল ও সৃজনপ্রণালী দেখারও সুযোগ পেলেন। এই প্রদর্শনীর জন্য তিনি যে হ্যান্ডবুকটি লিখেছিলেন তাতে কারুশিল্পী ও কারুশিল্প সমান গুরুত্বে আলোচিত হয়। কারুশিল্প আলোচনার প্রাথমিক এই প্রয়াসে কুমারস্বামীর শিল্প বিচারের বিশেষ পদ্ধতির সূত্রপাত লক্ষ করা যেতে পারে। সুধীসমাজকে দেশজ পরম্পরাগত শিল্পকলা, বিশেষ করে তার কারুশিল্প সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তিনি এসময় 'ল্যান্টার্ন ইলাস্ট্রেসন' সহযোগে বক্তৃতাও দিচ্ছেন। এমন এক প্রচারপত্রে দেখা যায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর ক্যান্ডি শহরের টাউন হলে তিনি ভাষণ দিচ্ছেন—বিষয় ক্যান্ডিয়ান কারুশিল্প। আলোচ্য সূচিতে রয়েছে, মৃৎপাত্র, লোহা থেকে স্টিল তৈরির পদ্ধতি, তাঁতশিল্প ও এমব্রোয়েডারি—যার মধ্যে রয়েছে নৃত্যশিল্পীদের পোশাক। এই বক্তৃতার পরিধি ও অনুপুঙ্খতা থেকে বোঝা যায় তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় কীভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের পথে নিজেকে একজন সার্থক শিল্প-ঐতিহাসিক হিসাবে গড়ে তুলছেন।

সিংহলের প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পকলার মর্মানুসন্ধানের পথ ধরে স্বাভাবিকভাবেই কুমারস্বামী পৌঁছে যান ভারত শিল্পকলার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। তারও সূত্রপাত যে এই দু'বছরে তার প্রমাণ পাওয়া যায় কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ইন্টারন্যাশনাল ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে যোগ দিয়ে ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ক প্রবন্ধপাঠে। তিনি যে বিষয়টি আলোচনা করেছিলেন তা হল 'The Influence of Greek on Indian Art'। ইউরোপীয় শিল্প-ঐতিহাসিকরা মনে করতেন গ্রিস ও রোমের অনুবর্তনকারী গান্ধার শিল্পের প্রভাবেই ভারতীয় ভাস্কর্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। এই প্রচলিত মতের যথার্থতা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছিলেন কুমারস্বামী। এক আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্‌দের সমাবেশে এমন

একটি গবেষণাপত্র পেশ করার আগে তাঁর যে প্রস্তুতিপর্ব, তা তাঁর ব্যস্ত সেই বিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যভাগেই। অথচ তিনি তখন সিলোন রিফর্ম সোসাইটির মুখপত্রে নিবন্ধ লিখছেন, লিখছেন পুস্তক-সমালোচনাও। সিংহলের উত্তর উপকূলের জাফনা শহরে প্রতিষ্ঠা করছেন সোসাইটির শাখা।

পরবর্তীকালে কুমারস্বামী যখন তাঁর খ্যাতির মধ্য গগনে, এবং যখন তাঁর লেখালেখির ব্যস্ততার অন্ত নেই, তখনও দেখা যায় জনশিক্ষার জন্য, ভারতীয় শিল্পকলাকে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি আমেরিকায় রেডিও ব্রডকাস্টিং করার সময় বের করে নিচ্ছেন। সিংহলের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনে, স্বদেশের মানুষকে তার পরম্পরাগত শিল্প-ঐতিহ্যের সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে, অনেক অনেক লেখা এবং বক্তৃতা দেওয়ার যে অভ্যাস তিনি অর্জন করেছিলেন আমেরিকার জীবনেও তা তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল আমেরিকার খ্যাত-অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে, মিউজিয়ামে ও সমিতিতে আয়োজিত সভায় নিয়মিত বক্তৃতা করে যাওয়া। সম্ভব হয়েছিল এক অভাবনীয় সংখ্যার গবেষণাপত্র ও বহু গ্রন্থ প্রকাশ করা।

নানা কাজের মধ্যে কুমারস্বামীর মনোযোগ ক্রমশই নিবিষ্ট হল শিল্পকলার প্রতি—বিশেষ করে তার দেশকাল নির্ভর ইতিহাসের প্রতি। এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ দেখতে পাওয়া গেছে সিংহলি শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহে, সে-সম্পর্কে নিবন্ধ রচনায় ও বক্তৃতা দেওয়ায়। এসব কিছুই ছিল তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা সম্পর্কিত গ্রন্থ *The Mediaeval Sinhalese Art* রচনার প্রস্তুতির অঙ্গ। এই গ্রন্থের তাঁর মনোমতো সুচারু প্রকাশন সম্ভব ছিল না ক্যান্ডি বা কলম্বো শহরের ছাপাখানায়। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বছর পাঁচেক পর যাত্রা করলেন ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে—১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়াতেই। তাঁর এই সিংহল ছেড়ে ইংল্যান্ডকে কার্যক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেওয়ার আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সিংহলি সমাজের যে সংস্কারসাধনে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন, তা সেই সমাজের কিছু সংখ্যক সুধীজনকে আকৃষ্ট করলেও অধিকাংশ সিংহলিদের মধ্যে তা সঞ্চারিত হয়নি। তাই এই সামাজিক ও স্বদেশি আন্দোলন অপেক্ষা তাঁর আকর্ষণ ও অভিনিবেশ শিল্পকলার দিকে নিবিষ্ট হল। এই ক'বছর সিংহলি শিল্পকলার অনুধাবনের সূত্রেই তাঁর দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয় সেই শিল্পকলার উৎস ও অনুপ্রেরণা ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি। আর ভারতীয় শিল্পকলার সার্থক চর্চা যে সিংহলে থেকে সম্ভব নয় তাও তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনি আরও বুঝেছিলেন ভারতীয় শিল্পকলাকে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে ভারতেও তার যথার্থ মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব হবে না। কারণ ভারতও ঔপনিবেশিক ইংরাজি শিক্ষায় আচ্ছন্ন। তাই তিনি নিজেকে শিল্পকলাচর্চায় সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনে, নিজের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিলেন তাঁর আবাল্য পরিচিত ইংল্যান্ডকে। অবশ্য ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে তিনি তাঁর প্রথম ভারত পরিভ্রমণ সেরে নিলেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হলেন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায়।

॥৫॥

আনন্দ কুমারস্বামী ইংল্যান্ডে পৌঁছন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায়। লন্ডনে না থেকে তিনি তাঁর বাসস্থান নির্বাচন করেন শেক্সপিয়ারখ্যাত স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন-এর নিকটবর্তী গ্রাম ব্রড ক্যাম্‌পডেনকে। দু'-এক বছর আগে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল এক সম্পত্তির মালিক হন। তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় গ্রামের এক সুপ্রশস্ত জমিদার ভবন কিনে নেওয়া। বাড়িটির কেন্দ্রে ছিল টিউডর শৈলীতে নির্মিত একটি চ্যাপেল—আর তারই নামে বাড়ির নাম 'নরম্যান চ্যাপেল'। ব্রড ক্যাম্‌পডেনের পাশের গ্রাম চিপিং ক্যাম্‌পডেনে থাকতেন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত স্থপতি চার্লস রবার্ট অ্যাসবি (C. R. Ashbee)। উইলিয়াম মরিশের একনিষ্ঠ অনুগামী আদর্শবাদী অ্যাসবি পরম্পরাগত কারুশিল্পীদের একটি গিল্ড ও একটি কারুশিল্প শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করতেন। কুমারস্বামী তাঁর বাড়ির সংস্কারের দায়িত্ব দেন অ্যাসবিকে এবং তিনি তা সম্পূর্ণ করেন তাঁর গিল্ডের সহকর্মীদের সাহায্যে। কাজে তৃপ্ত হয়ে বাড়িটি সম্পর্কে অ্যাসবি *The International Studio for 1907*-তে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে তিনি নরম্যান চ্যাপেলকে কেবল ইংল্যান্ডের এক শ্রেষ্ঠ বাসভবন বলে উল্লেখ করলেন না, সেইসঙ্গে বাড়ির মালিক কুমারস্বামীর ব্যক্তিত্ব, রুচি ও শিল্পবোধেরও ভূয়সী প্রশংসা করলেন। লিখলেন, বাড়িটিকে অলংকৃত করা হয়েছে সিংহল থেকে আনা ধাতুর নানান কারুকার্য দিয়ে। সজ্জিত করা হয়েছে সিংহল ও ভারতের কারুকর্মে ও শিল্পনির্দশনে। এইসব প্রাচ্য দেশীয় সাজসজ্জায় বাড়িটি আশ্চর্যজনকভাবে মানিয়ে গেছে। তিনি আরও লিখলেন, বাড়িটি যিনি কিনেছেন ভাগ্যক্রমে তাঁর রুচি রক্ষণশীল।

অ্যাসবির সঙ্গে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা কুমারস্বামীকে সে-সময় নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তার প্রধান কারণ দু'জনেই ছিলেন একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ—যে-দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা লাভ

করেছিলেন উইলিয়াম মরিশের কাছ থেকে। কুমারস্বামীর সঙ্গে উইলিয়াম মরিশের সাক্ষাৎ হয়নি, কারণ তাঁর জীবনাবসান হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তিনি যে তাঁর লন্ডন কলেজে অধ্যয়নের সময় মরিশের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। মরিশের আন্দোলন ও ভাবনা ছিল ইংল্যান্ডের যে যন্ত্রশিল্প-বিপ্লবজাত প্রতিকূল পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে দেশের পরম্পরাগত কারুশিল্প ও শিল্পীদের ধারাকে অব্যাহত রাখার পক্ষে। এক্ষেত্রে তিনি জেশুয়া রেনল্ডের পরবর্তী প্রজন্মের সবথেকে প্রভাবশালী চারুশিল্পবেত্তা জন রাস্কিনের সহানুভূতির দ্বারা সমর্থিত হয়েছিলেন। এই ভাবনা ইংল্যান্ডে ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ কয়েক দশক বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া তুলেছিল। কুমারস্বামী এই ভাবনা সঙ্গে নিয়েই অধ্যয়ন শেষে সিংহলে ফেরেন। সিংহলে তিনি যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন এবং দেশীয় কারুশিল্পকে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করায় প্রয়াসী হন, তা মরিশেরই পথ ধরে।

কুমারস্বামী তাঁর জীবনে দেখা যায় দু'জন মানুষের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রথমজন তাঁর পিতা স্যার মুতু। পিতার কাছ থেকে তিনি অর্জন করেছিলেন স্বাধীনচিত্ততা ও স্বাধীনতার আদর্শ। আর উইলিয়াম মরিশের ভাবনা ও উদ্যোগের মধ্যে তিনি খুঁজে পান তাঁর জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যকে। অথচ, ভাবলে অবাক হতে হয়, এ দু'জনের কারওরই সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। স্যার মুতু যে তাঁর জ্ঞানোদয়ের আগেই, তাঁর মাত্র দু'বছর বয়সকালেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর সিংহলের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কুমারস্বামী যখন ইংল্যান্ডে বসবাসের জন্য ফিরে এলেন, তার প্রায় এক দশক আগেই ঘটে গেছে মরিশের জীবনাবসান। ইতিপূর্বে এই নিবন্ধে স্যার মুতুর উজ্জ্বল জীবনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবেই উইলিয়াম মরিশের কথা আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

উইলিয়াম মরিশ (১৮৩৪-৯৬) ঊনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের ইংল্যান্ডের সাংস্কৃতিক জগতের এক ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর ভাবনা ও কার্যকলাপের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে জানতে হবে তাঁর কালের প্রেক্ষাপট, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের যন্ত্রনির্ভর শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তীকালের ইংরাজ সমাজ-সংস্কৃতির অবস্থা। শুধু ইংল্যান্ডের নয়, প্রায় সারা বিশ্বের ইতিহাসে শিল্প-বিপ্লব প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই বিপ্লব মধ্যযুগ থেকে সেই দেশকে আধুনিক যুগের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। সে কারণে শিল্প-বিপ্লব, তার কার্যকারণ ও চরিত্র বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপের দেশগুলি বাণিজ্যতরী নিয়ে এশিয়া ও আমেরিকার নানা দেশের উপকূলে হাজির হতে থাকে। উদ্দেশ্য বাণিজ্য। কিন্তু দেখা যায় সেই বাণিজ্যের সূত্র ধরে তারা দেশে দেশে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করে ও ক্রমে তাদের অধিকার কায়েম করে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতায় স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড ও ফ্রান্সের বণিকদের হারিয়ে ইংরাজ বণিকরাই সবচেয়ে বড় ঔপনিবেশিক শক্তি হয়ে দেখা দিল। ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশে অসম বাণিজ্য ও লুণ্ঠন করে তারা বিপুল ধনসম্পত্তি অর্জন করল। সেই অর্থে দেশে ফিরে জমিদারি কিনে তারা হল অভিজাত। সেইসঙ্গে চাষ-আবাদে আনল বিরাট পরিবর্তন। ক্ষুদ্র চাষিদের জমি ছলে-বলে ক্রয় করে, বিস্তৃত চাষের জমি ঘিরে নিয়ে, অধিক মূলধন ও নতুন যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন অনেক বাড়িয়ে মুনাফা বাড়াল। এই অর্থবলেই একদা-বণিক ইংরাজ খনির মালিক হয়ে লোহা ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপন করল। সুতি ও বস্ত্রের মিল প্রতিষ্ঠা করে সস্তার কাপড় বেচে গ্রামের তাঁতশিল্পকে করল ধ্বংস। এই ভাবে জমি ও কাজ-হারা কৃষক এবং বেকার কারুশিল্পীদের পেল মজুরের সস্তা যোগান হিসাবে। অল্প মজুরিতে বেশি খাটিয়ে মুনাফার পাহাড় করে বাড়িয়ে তুলল কলকারখানা। নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধে সৈনিকদের প্রয়োজনীয় পোশাক-আশাক ও অস্ত্রসরবরাহ তাদের ব্যবসাকে ফাঁপিয়ে তুলল। অন্যদিকে, গ্রামের সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বনির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিপর্যস্ত হল। কারখানা আর চাষের জমির প্রয়োজনে ইংল্যান্ডের অরণ্যের ওপরও হাত পড়ল। গোচারণভূমিও হয়ে গেল অধিকৃত। ইংল্যান্ড তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নতুন ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলে, ধনিকশ্রেণির অদূরদর্শী লোভের কারণে, অনেকটাই হারাল। বরং পরিবর্তে দেখা দিল কারখানা-মিল-খনি-গুদাম আর শ্রমিক ব্যারাকে গড়ে ওঠা ধুলো ও ধোঁয়ায় মলিন শিল্পনগরীগুলি—মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের ম্যাঞ্চেস্টার, ল্যাঙ্কাশায়ার, শেফিল্ড, লিভারপুল, লিডস প্রমুখ। প্রকৃতির এই বিপর্যয়েই অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় রোমান্টিক ইংরাজ কবিরা লিখলেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম ও পুরনো মানবিক মূল্যবোধের কবিতা। ইংরাজি সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেলেন কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ,

বায়রন, শেলি ও কিটস। এঁদের মধ্যে বায়রন ও শেলি শোষিত শ্রমিকদের দুর্দশায় তাঁদের কথাও বললেন সহমর্মিতায়। শেলি এগলেন আরও অনেকখানি। তিনি নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজের দু'টি পরস্পরবিরোধী শ্রেণি পুঁজিপতি-মালিক ও সর্বহারা শোষিত শ্রমজীবীদের সামাজিক অবস্থান বুঝলেন। কবিতায় ও নিবন্ধে শ্রমিকদের ডাক দিলেন শোষণের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হতে। সমাজে পরিবর্তন এনে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায়। তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রের এক অগ্রদূত। কার্ল মার্কসের ভাষায় '...he was essentially a revolutionist and would always have been one of the advanced guard of socialism'।

এক শতাব্দকাল পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, কবি ও শিল্পী উইলিয়ম মরিশ হন সমাজভাবনায় শেলির যোগ্য উত্তরাধিকারী। শিল্পপতি ও বণিকগোষ্ঠীর যে অর্থলোলুপতা, মজুরদের প্রতি যে নির্দয় পীড়ন শেলিকে বিচলিত করেছিল, তা মরিশের সময়েও ছিল অব্যাহত। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের গ্রামীণ কারুশিল্পের বিপর্যয় তাঁর মতো অনেক ইংরাজ শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। তাই দেখা যায়, কলা-সমালোচক ও ঐতিহাসিক জন রাস্কিন (১৮১৯-১৯০০) এই নতুন সংস্কৃতিবর্জিত মুনাফাবাজ ধনিক সমাজের বিরোধী। তিনি অলাভজনক ব্যবসায় উদ্যোগী হচ্ছেন, এগিয়ে আসছেন শ্রমিকদের শিক্ষাদানে। তাই যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রভাবশালী ইতালির রক্ষণশীল ও গতানুগতিক শিল্পধারার অনুবর্তনের প্রতিবাদে প্রি-রাফেলাইট গোষ্ঠী গড়ে উঠছে, তাকেও সমর্থন জানাচ্ছেন রাস্কিন। এই প্রি-রাফেলাইট গোষ্ঠীর শিল্পীরা ছিলেন দেশের কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং সংরক্ষণের প্রতি দায়বদ্ধ, আর এই আন্দোলনে গোষ্ঠীর শিল্পীদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নেন মরিশ।

মরিশ যন্ত্রনির্ভর শিল্প-বিপ্লব সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন শুধু তার গ্রামীণ কারুশিল্পের ধ্বংসসাধকের ভূমিকার জন্য নয়। তার যে কুৎসিত অর্থলোলুপতা, মজুরদের প্রতি যে অমানুষিক শোষণ তা তিনি মেনে নিতে পারেননি। একজন সৃজনশীল কবি ও শিল্পী হিসাবে এই নতুন বুর্জোয়া শক্তির প্রতিবাদী হন তিনি। শেলির মতোই তিনি বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন সমাজতন্ত্রে। দেখা যায় কারুশিল্পকে উজ্জীবিত করতে, শ্রমজীবী মানুষদের শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে তিনি পুস্তিকার পর পুস্তিকা লিখছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন ইংল্যান্ডের নানা অঞ্চলে। সংগঠন গড়ে কারুশিল্পকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হচ্ছেন, আবার শ্রমিকদের নৈশবিদ্যালয়ে ক্লাশ নিচ্ছেন। তাঁর এই কাজে সহযোগী শিল্পীরাও এগিয়ে আসছেন কেউ কেউ।

মরিশের কারুশিল্পধারা রক্ষার ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন চার্লস অ্যাসবি। মরিশের জীবনাবসানের পরও তাঁর কর্মধারা অব্যাহত রাখেন অ্যাসবি তাঁর চিপিং ক্যাম্পডেনে প্রতিষ্ঠিত কারুশিল্পীদের গিল্ড পরিচালনা করে, শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। আর অ্যাসবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কুমারস্বামীও সমানভাবেই মরিশের ভাবনার অংশীদার হয়ে ওঠেন।

॥৬॥

ব্রড ক্যাম্পডেনে কুমারস্বামীর প্রশস্ত 'নরম্যান চ্যাপেল' ভবনটি নানা কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই ভবনে তাঁর শিল্প-সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার তো ছিলই, সেইসঙ্গে ব্যবস্থা ছিল আলোচনা সভার আয়োজনেরও। একটি সুমুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্র থেকে জানা যায় এসময় কোনও এক শনিবারের সন্ধ্যায় নরম্যান চ্যাপেলের গ্রন্থাগারে এক বক্তা হান্স ক্রিশ্চান অ্যান্ডারসন সম্পর্কে আলোচনা করবেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের একটি ছাপা কার্ডে কুমারস্বামী তাঁর বন্ধুদের আমন্ত্রণ করছেন সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে এক চা-পার্টিতে মিলিত হবার জন্য। সেদিন সন্ধ্যায় নিবেদিতা বক্তৃতা দেবেন 'The Life of Indian Women in Relation to Religion, Education and Nationalism' সম্বন্ধে। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতা তখন ভারতে তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে। বন্দিত্ব এড়াতেই তিনি ইংল্যান্ডে ইংরাজদের উদার পরিবেশে তাঁর কার্যকলাপ চালাতে গিয়েছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম উদগাতা এই মহীয়সী আইরিশ নারীর বক্তৃতা শুনতে হাজির হয়েছিলেন অ্যাসবির বন্ধুবান্ধবরা, যাঁরা ছিলেন মরিশের ভাবনা ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সমর্থক ছিলেন মরিশের আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্‌ট সার্কেলের। এখানে উল্লেখ্য যে ভারত সম্পর্কে মরিশের উদ্বেগ ছিল। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতের কারুশিল্পকে রক্ষা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান।

ব্রড ক্যাম্পডেনের 'নরম্যান চ্যাপেল' ভবনটিতে আরও এক তাৎপর্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র করেন কুমারস্বামী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী উইলিয়াম মরিশ ছাপাখানার মুদ্রণকে শিল্পকর্মের পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—নাম কেল্‌মস্কট প্রেস (Kelmscott Press)। এই প্রেস থেকে তিনি চসারের রচনা সংগ্রহের এমন এক শোভন সংস্করণ প্রকাশ করেন, যা ব্রিটিশ ছাপাখানার

ইতিহাসে দিক্‌নির্দেশক হিসাবে স্বীকৃত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রেসটি অ্যাসবি তার গিল্ডের পক্ষ থেকে কিনে নেন, এবং গিল্ডের ঠিকানা অনুসারে নাম দেন এসেক্স হাউস প্রেস। এসেক্স হাউস থেকে গিল্ড যখন চিপিং ক্যাম্‌পডেনে স্থানান্তরিত হয়, তখন প্রেসটিও সেখানে চলে আসে। অ্যাসবির তত্ত্বাবধানে এই প্রেসে, মরিশের প্রেসকর্মীদের সাহায্যে, অ্যাসবিও কয়েকটি মহামূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যার অন্যতম হল একটি রাজকীয় প্রকাশন—*Prayer Book of Kind Edward VII*। এই প্রেস প্রসঙ্গে অ্যাসবি লিখেছেন যে, তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করে ইংল্যান্ডের অন্যান্য প্রেসও সুচারু মুদ্রণে উদ্যোগী হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মন্দার বাজারে অ্যাসবির এই প্রেসটি হস্তান্তরিত হয়ে আসে আনন্দ কুমারস্বামীর 'নরমান চ্যাপেলে'। আর এই প্রেস থেকেই, মরিশের হাতে তৈরি প্রেসকর্মীর নৈপুণ্য ও কুশলতায় প্রকাশিত হয় কুমারস্বামীর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *The Mediaeval Sinhalese Art*—যার প্রস্তুতি তিনি শুরু করেছিলেন প্রায় এক দশক কাল আগে, সিংহলে থাকার সময়। এই বইটির মুখবন্ধে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কুমারস্বামী লিখছেন : 'This book has been printed by hand upon the press used by William Morris for printing *The Kelmscott Chacer*. The printing carried on in the Norman Chapel at Broad Campden, has occupied some fifteen months. I cannot help seeing in these very facts an illustration of the way in which the East and West may together be united in an endeavour to restore the true Art of living which has for so long been neglected by humanity.' মুখবন্ধে আরও উল্লিখিত হয়েছে যে গ্রন্থটি ছাপা হয় মাত্র ৪২৫ কপি।

কুমারস্বামীর কারু ও চারুশিল্প সম্পর্কিত আলোচনা কিন্তু সিংহল ও ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সে-সময় ব্রড ক্যাম্‌পডেনের একদা-মরিশের প্রেস থেকে যেসব পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন তার একটি হল *Domestic Handicraft and Culture*। এই প্রবন্ধের বিষয় ইংল্যান্ডের হস্তশিল্প, কিন্তু তাকে অবলম্বন করে এতে 'সংস্কৃতি'-র সংজ্ঞা নির্ধারণেও ব্রতী হয়েছেন তিনি। তিনি তাতে লিখেছেন : 'Culture includes a view of life essentially balanced, where real and false values are not confused; also, I think, a certain knowledge or interest in things which are not directly utilitarian, that is to say, which do not merely give pleasure to the senses or confirm a prejudice...'

আর একটি পুস্তিকায় তিনি আলোচনা করেছেন ভারতীয় কারুশিল্পীদের কথা। এই ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *The Indian Craftsman* নামক পুস্তিকার ভূমিকায় চার্লস অ্যাসবি লিখছেন : 'There has come over Western civilization, in the last 25 years, a green sickness, a disbelief, an unrest; it is not despodency, for in the finer minds it takes the form of an intense spiritual hopefulness; but it takes the form also of a profound disbelief in the value of material conditions of modern progress.'। কুমারস্বামীর নিজের ভাবনা আর অ্যাসবির এই ভাবনাকে আলাদা করা যায় না। কারণ দেখা যায়, কুমারস্বামী এই modern progress-এর material conditions যা দিনে দিনে আরও প্রকট হয়ে উঠতে থাকে তার বিরুদ্ধে অনলস প্রচার করে গেছেন। তিনিও ধনবাদী সমাজের প্রতিবাদী হয়েছেন—সমাজতান্ত্রিক ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমাজভাবনা ও মরিশের ভাবনার মধ্যে পার্থক্য ছিল। মরিশের ভাবনা ও আন্দোলনে গুরুত্ব পেয়েছে একদিকে যেমন মধ্যযুগের ইংল্যান্ডের কারুশিল্পের অবক্ষয়, অন্যদিকে কলকারখানা মিলে কর্মরত শ্রমিকদের নিপীড়িত শোষিত অবস্থা। তাই তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুধু এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতারই নয়, একজন দায়বদ্ধ সমাজতান্ত্রিক নেতারও। কুমারস্বামীর প্রতিবাদ ছিল মূলত সাংস্কৃতিক। ধনতান্ত্রিক বিকাশে যেভাবে পরম্পরাগত জাতীয় শিল্পকলাগুলির ভিত ধসে যাচ্ছে, তার প্রতিই ছিল তাঁর উদ্বেগ ও ভাবনা। সেই শিল্পধারাকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। তবে জাতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলা রক্ষার পূর্বশর্ত যে স্বদেশি ভাবনা ও স্বরাজ অর্জন—সে বিষয়ে তাঁর কোনও সংশয় ছিল না।

॥৭॥

সিংহলি শিল্পকলার আদর্শ, শৈলী ও অন্তর্নিহিত তত্ত্বের উৎসসন্ধানের পথ ধরেই আনন্দ কুমারস্বামী ভারত ভূখণ্ডের শিল্পকলাকে তার তাৎপর্য ও রীতি-পদ্ধতিতে জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তিনি সচেতন ছিলেন তাঁর নিজস্ব তামিল ঐতিহ্য সম্পর্কে। ভারত অন্বেষণ তাই তাঁর ক্ষেত্রে নিজের শিকড় সন্ধানও বলা যায়। তিনি প্রথম ভারতে এসেছিলেন, সিংহল ছেড়ে ইংল্যান্ড যাবার পথে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে। কিন্তু দেখা যায় পরবর্তী কয়েক বছর ইংল্যান্ড তাঁর বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও বারবার তিনি ভারত ভ্রমণে আসছেন। দক্ষিণ থেকে উত্তরে, উত্তর থেকে পশ্চিমে ঘুরে ঘুরে ভারতের মহান শিল্পকীর্তিগুলি দেখছেন, ছবি তুলছেন, সংগ্রহ করছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের অযত্নে ছড়িয়ে

থাকা শিল্পনির্দশনসমূহ। সেইসঙ্গে তিনি পরিচিত হচ্ছেন ভারতের ধর্মপ্রাণ জনজীবনের ধারার সঙ্গে।

কুমারস্বামী ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের প্রায় সারাটা বছরই ছিলেন ভারতে, বিশেষ করে কলকাতায়। তাঁর সমকালের বাঙালি ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসের উপাসক অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এই সময়কার কলকাতার ব্যস্ত দিনগুলির কথা লিখেছেন। তখন লর্ড কার্জনকৃত বঙ্গভঙ্গের ফলে যে জাতীয় চেতনার জোয়ার বাংলায় বইছিল তার তরঙ্গাঘাতে কুমারস্বামীও উজ্জীবিত হন। অর্ধেন্দ্রকুমার লিখছেন : 'তিনি ১৯০৯ সালে ভারতে এলেন এবং জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে খাঁটি স্বাদেশিকতার পথ নির্দেশ করে দিলেন নানা বক্তৃতায়, নানা প্রবন্ধে। বিলাতি বেশ ছেড়ে তখন তিনি তাঁর দেশীয় তামিল চাদর ও পাগড়ী পরে দেশবাসীর সঙ্গে একসঙ্গে বসে জাতীয়তার সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে এবং তাঁর 'স্বদেশি প্রচার'-এর প্রবন্ধাবলী পড়ে দেশের লোক তাঁকে স্বাদেশিকতা-মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত বলে বরণ করে নিল। কলকাতায় সেই বৎসর তিনি অনেকদিন বাস করেছিলেন এবং 'ডন সোসাইটি' ও 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন'-এর উদ্যোগে তিনি স্বাদেশিকতা, স্বজাতীয়তা ও জাতীয় শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে এই শহরের পুরবাসীদের চমৎকৃত ও মুগ্ধ করেছিলেন এবং একটি নতুন দৃষ্টি-পথ খুলে দিয়েছিলেন।' অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখদের প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' আয়োজিত এক সভায় কুমারস্বামী ভারতীয় শিল্প-বিষয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনে চিত্র-প্রদর্শনীসহ একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হয় স্যার জন উডরফের বাসভবনে, সভাপতিত্ব করেন সর্বমান্য দার্শনিক-পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা তিনি আর কখনও শোনবার সুযোগ পাননি। তাঁর নিজের ভাষায় : 'Dr. Coomaraswamy in this short hour of his address has taken me to etheral heights of Indian Culture in which I have gasped for breath.' সে দিন কুমারস্বামীর আলোচ্য বিষয় ছিল রাজপুত ও মুঘল চিত্রকলা।

ভারতের স্বরাজ ভাবনা যে তাঁর ভারত আগমনের পর, তা কিন্তু নয়। তিনি ইংল্যান্ডে থেকেও ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করতেন। আর তার ফলেই, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের আগেই, তিনি তাঁর প্রেস থেকে ইংল্যান্ডে বসেই একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, নাম *The Deepest Meaning of the Struggle*। এই পুস্তিকায় তিনি ইংরাজদের জ্ঞাতার্থে সাহসের সঙ্গে লিখলেন : 'The shadow of a coming conflict overhangs the sky....Signs are not wanting that the struggle will be a very bitter one. Everyday in India the gulf between Englishmen and Indians widens... 'Swaraj', or self-government, is the ideal of young India, and it depends upon the wisdom and sympathy of the English rulers of India to say whether it shall be allowed to proceed peacefully towards the inevitable goal.'। সে সময় এমনই উপলব্ধি ছিল কুমারস্বামীর। অথচ তিনি স্বদেশি আন্দোলনে এসে যোগ দিলেও, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেননি, যেমন করেছিলেন অ্যানি বেসান্ত। তাঁর স্বাদেশিকতার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের আত্মশক্তির উদ্বোধন। আর এই স্বাদেশিকতায় তাঁর উপজীব্য ছিল সংস্কৃতি—শিল্পকলা, কবিতা, সংগীত। তাই দেখা যায় যে তিনি আর্নেস্ট বিন্‌ফিল্ড হ্যাভেল অনুপ্রাণিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত নব্য ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। ঠাকুর পরিবারের জোড়াসাঁকোর বাড়ির পরিবেশে নিজেকে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন।

কলারসিক কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ির দুর্লভ সব সংগৃহীত শিল্পবস্তু দেখে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্র-শিষ্যদের আঁকা নব্য-ভারতীয় রীতির ছবি দেখে সপ্রশংস আলোচনা লিখেছেন। এই জোড়াসাঁকোর বাড়ির সাজসজ্জায় তখন বিদেশি ধারা বর্জিত হয়েছে, প্রাচ্য ধারার আসবাব ও অলংকরণ তার জায়গা করে নিয়েছে। সিংহলে যে স্বদেশি আন্দোলন শুরু করে শেষাবধি ব্যর্থ হন, তারই যেন সার্থক রূপ দেখলেন তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে। এই পরিবেশে পরিতৃপ্ত এক কুমারস্বামীকে দেখতে পাওয়া যায় অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলাল বসুর একটি রেখাচিত্রে। এই রেখাচিত্রে দেখা যায় মধ্যাহ্নভোজের পর গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথদের বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দায় পরপর কয়েকটি আরাম কেদারায় দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম নিচ্ছেন চারজন—অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ নিদ্রাচ্ছন্ন, মেজভাই সমরেন্দ্রনাথ পাঠরত আর কুমারস্বামী আধাশোয়া অবস্থায় তাঁর একটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নিরলস চিত্রকর্মরত নন্দলালের দিকে। এই ছবিটি দেখলে মনে হয় কুমারস্বামী যেন তাঁর নিজের স্থানটি খুঁজে পেয়েছেন। কেননা, ১৯০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *Essays in National Idealism*-এর একটি প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন : 'Nations are created

by artists and poets, and not by merchants and politicians.'।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কুমারস্বামী যোগ দিয়েছিলেন দেশের সংস্কৃতিকে ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত করতে। ১৯০৮-এ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত *The Message of the East*-এ তিনি লিখছেন : 'There can be no true realisation of political unity until Indian life is again inspired by national culture.'। তাঁর স্বদেশি ভাবনা এক সুউচ্চ আদর্শবোধ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তিনি মনে করতেন জাতীয়তাবোধের প্রকৃত অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যাবে দেশের সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন ও ধর্মে। তাঁর মতে এসব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন না করে যন্ত্রশিল্পনির্ভর অর্থনীতিতেও সফল হওয়া সম্ভব হবে না। তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে জাতীয় শিক্ষা। বলছেন : 'More necessary than all the labours of politicians is National Education.'। তাই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটি ও National Education-এর আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছেন, বাংলার তখনকার পরিবেশে জাতীয় শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে তাতে তিনি উৎসাহ বোধ করছেন। সেই আন্দোলনকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি চাইলেন সরকার ও মিশনারিদের পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলির পরিবর্তে দেশীয় পরিচালনায় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোক। কেননা, ইংরাজি ধারার শিক্ষার উদ্দেশ্য হল গায়ের রঙ ছাড়া আর সব বিষয়ে ইংরাজ করে তোলা। তিনি মনে করতেন শিক্ষায় এই পরিবর্তন না আনলে সত্যকারের জাতীয় ঐক্য সাধিত হবে না। মনে হয় গান্ধীজিও একথা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর আশ্রম-ভিত্তিক এই তালিম-এর বুনিয়াদি শিক্ষা, যার অঙ্গ ছিল কারুকর্মে দক্ষতা অর্জনও।

বাংলা দেশে যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তার অভিব্যক্তি ঘটে বিলাতি জিনিস বর্জনে। এই বিদেশি বর্জনের অন্যতম ছিল ইংরাজ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা। সেই শিক্ষাকে বর্জন করে স্বদেশি শিক্ষা প্রবর্তনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয় তার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সে সময়কার বক্তৃতায় স্বদেশি ভাবনা ও আশু কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় প্রায় সকলেরই জানা। তবু এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি দিলে তাঁর ও কুমারস্বামীর চিন্তাধারার মিল স্পষ্ট হয়ে উঠবে। লর্ড কার্জন 'ইউনিভার্সিটি বিল' প্রবর্তন করে উচ্চশিক্ষাকে সংস্কারের নামে সংকুচিত করার ব্যবস্থা করেন। তার প্রতিকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব দেন নিজেদের বিদ্যাদানের ভার নিজেরা গ্রহণ করতে হবে— 'বসিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না। আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্য আমাদের কোমর বাঁধিতে হইবে।... বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে নিজেদের বিদ্যাদানের ভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেম্‌ব্রিজ-অক্‌স্‌ফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজ-সরঞ্জাম দরিদ্রের মতো হইবে... কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মতো করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেষণ করিবেন, ধনমদ্‌গর্বিতা বণিক-গৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুক বিদায় করিবেন না।' (—*বঙ্গদর্শন*, ১৩১১, পৃ: ১৪৮)। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইতিমধ্যে ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-ভিত্তিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর নিজস্ব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন কলকাতায়, একই জাতীয় আদর্শে। 'ডন' ও ন্যাশনাল এডুকেশন-এর আন্দোলনও ছিল স্বদেশি শিক্ষাকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথও আচার-আচরণে ভাষায়-ভাষণে স্বদেশি জীবনচর্যায় ছিলেন অভ্যস্ত। তিনিও কুমারস্বামীর মতো বিদেশের অনুকরণ করার প্রতি ছিলেন বিরূপ। আর কুমারস্বামীর মতোই পল্লিই ভারতের প্রকৃত পরিচয়, এই বিশ্বাস পোষণ করতেন। ফলে অচিরেই কুমারস্বামী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সমভাবাপন্ন দুই মনীষীর মধ্যে এক দীর্ঘকালীন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কুমারস্বামী রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতাসহ তাঁর কবিকৃতি ও জাতীয় জীবনে তাঁর গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন এক ভারতীয় ইংরাজি সাময়িকপত্রে। সেটি তাঁর ১৯১১ সালে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত *Art and Swadeshi* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রকৃতার্থে জাতিসত্তার প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় : 'It would be difficult to exaggerate the significance for Indian nationalism of such heroic figures as that of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, dramatist, and musical composer; 'for nations are destroyed or flourish in proportion as their poetry, painting and music are destroyed or flourish.'.'। তিনি আরও লিখছেন : 'We have poets as our guides to take us back to the elemental and real things in life. They can show to us the significance of little things, the wonder of what is going on. They tell us what we

are not because of the dolls in our childhood's games, because of the rivers that we worship as divinities, because of the skill of craftsman and the loneliness of saints, because of the beauty of women, and the splendid indifference of men in danger and death.'। এই ক'টা পঙ্‌ক্তিতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির মহত্ত্ব ও তাৎপর্যকে তাঁর প্রখর অনুভূতি ও সংবেদনশীলতায় উপলব্ধি করে ব্যক্ত করেছেন। অথচ ভাবতে অবাক হতে হয়, কুমারস্বামীর পক্ষে গুরুদেবের ক'টা কবিতাই বা পড়া বা ক'টা গানই বা শোনা সম্ভব হয়েছিল সে সময়। গুরুদেব প্রসঙ্গে যেখানে তিনি জাতির জীবনের বিকাশ ও ধ্বংসের সঙ্গে জাতির কবিতা, চিত্রকলা ও সংগীতের বিকাশ ও ধ্বংসের কথা বলেন, তখন বোঝা যায় কেন তিনি নিজস্ব বুদ্ধি ও বিবেচনায় প্রত্যক্ষ রাজনীতি অপেক্ষা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। এই প্রবন্ধেই তিনি স্পষ্ট লিখেছেন যে, 'The pure politician is often no nationalist at all, in an idealist sense...'। কুমারস্বামী তাঁর জীবনে ও কর্মে ছিলেন এক অনমনীয় 'আইডিয়ালিস্ট'।

ঠাকুর পরিবারের পরিমণ্ডলে তিনি তাঁর উদ্দীষ্ট ভারতের অনেক কিছুই খুঁজে পেয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্য-ভারতীয় চিত্রকলায় তিনি ভারতীয় রীতির পুনরাবিষ্কার লক্ষ করেছিলেন, এবং তার প্রতি তাঁর প্রত্যাশার কথায়, যে অপূর্ণতা তাঁর চোখে ও মনে ধরা পড়েছিল, তাও তিনি নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছিলেন একটি প্রবন্ধে। আর সেটিও স্থান পায় তাঁর *Art and Swadeshi* গ্রন্থে। তবে তিনি, বলা যায়, সম্মোহিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথে। তাঁর বহুমুখী সৃষ্টি, তাঁর জীবনবোধ, তাঁর উদার মানবিকতা এবং লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন সম্পর্কে তাঁর সংবেদনশীলতা—সবকিছুর মধ্যেই তিনি এক দুর্লভ সহমর্মিতা অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর জীবনীকার রোজার লিপ্সির (Roger Lipsey) মনে প্রশ্ন জেগেছে, তিনি কেন ভারতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থেকে গেলেন না। এর উত্তরও তিনি খুঁজে পেয়েছেন কুমারস্বামীর জীবনসাধনার গতিপ্রকৃতির মধ্যে। কুমারস্বামী নিজেকে গড়ে তুলতে চাইছিলেন একজন শিল্প-ঐতিহাসিক হিসাবে। তাঁর ভারত ভ্রমণ, ভারতের জনজীবন ও ধর্মীয় সাধনাকে জানার যে প্রয়াস তারই জন্য। তিনি তারই জন্য প্রচলিত ও প্রাচীন ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করেছেন, ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে। অথচ সে-সময়, সম্ভবত আজও ভারতে শিল্প-ইতিহাস চর্চার কোনও পরিবেশ বা ধারা গড়ে ওঠেনি। তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত হওয়া। অন্য এক বাস্তব কারণও আছে। তিনি বুঝেছিলেন দেশের কলাশিল্পের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করার মতো মানুষ ভারতের ধনী অভিজাত বা অগ্রগণ্য নেতাদের মধ্যে নেই। তাঁকে তাই ভারতীয় শিল্পের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে পশ্চিমের শিল্পবেত্তা সমাজে, যেখানে কলাশিল্পের ইতিহাসচর্চা বিকাশ লাভ করেছে। আরও একটা কারণ উল্লেখ করেছেন লিপ্সি—ভারতে এমন প্রেস নেই যেখান থেকে ভারতীয় শিল্পের প্রতিলিপিসহ উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থ মুদ্রিত হতে পারে। তবু তাঁর স্বপ্ন ছিল, ভারতে থেকে যাবার, ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভারতে থেকে আত্মস্থ করার, তাকে সঞ্জীবিত করে তোলার।

॥৮॥

সে সময় অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথদের ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট দেশি ও বিদেশি শিল্প-রসিকদের সমন্বিত করে তৎপরতার সঙ্গে বহুমুখী কাজে লিপ্ত ছিল। সোসাইটির উদ্যোগে প্রতি বছর অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্য-ভারতীয় শৈলীর চিত্রকলার প্রদর্শনী হত কলকাতায়। সেই প্রদর্শনী কলকাতার পর ভারতের অন্যান্য বড় শহরেও নিয়ে যাওয়া হত। সারা ভারতের দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তার সমালোচনা বেরোত এবং এই নতুন ধারার শিল্পীদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ত দেশময়। হ্যাভেল ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে সেখানকার সবথেকে অভিজাত কলাবিষয়ক পত্রিকায় এই নব্য-ভারতীয় রীতির শিল্পীদের প্রসঙ্গে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করে বিলেতেও কোনও কোনও শিল্প-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সোসাইটি নিজস্ব ঘরানার শিল্পীদের ছবি ছাড়াও অন্যান্য শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজনও ক্রমে করতে শুরু করে। জাপান থেকে সে দেশের উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রমুখদের কয়েকটি চিত্র ছেপে এনে সোসাইটি দেশের মানুষের কাছেও তার বিস্তৃত পরিচয় ঘটায়। তবে বাংলায় ও ভারতে এই নব্য-রীতির চিত্রকলার প্রচারে সবথেকে বড় সহায়ক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। যিনি তাঁর সম্পাদিত প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ নামক বাংলা ও ইংরাজি পত্রিকায় এই ধারার শিল্পীদের আঁকা বহুবর্ণ ছবি ছেপে এবং তার প্রসঙ্গে নিবন্ধ প্রকাশ করে এক জাতীয় কর্তব্য পালন করেন। কুমারস্বামী, বলাবাহুল্য, মডার্ন রিভিউ-এর অন্যতম লেখক ছিলেন।

এই সোসাইটিই কুমারস্বামীকে একটি মহৎ দায়িত্বভার অর্পণ করে। তখনকার ইউনাইটেড প্রভিন্স বা সংযুক্ত

প্রদেশের এলাহাবাদ শহরে অনুষ্ঠেয় জাতীয় মেলায় ভারতীয় কলাশিল্প প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই কলাশিল্প প্রদর্শনীর পরিচালক নিযুক্ত হন কুমারস্বামী। মেলার সময় নির্ধারিত ছিল ১৯১০-১১ সালের শীতকালে। ১৯১০-এর গোড়ার দিকে একবার কয়েক মাসের জন্য ইংল্যান্ড ঘুরে এসে, পুরো শরৎকাল তিনি ভারতীয় শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহে ব্রতী হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর ভারতের শহরে, গঞ্জে, এমনকী প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও ঘুরতে থাকেন। তাঁর সংগ্রহের সূত্র ছিল নানাবিধ। কখনও ছবি কিনেছেন ব্যক্তিগত সংগ্রহের, কখনও শিল্পবস্তুর ব্যবসায়ীর কাছ থেকে, কখনও ক্ষয়িষ্ণু রাজন্য পরিবারের বংশধরদের থেকে। এই সংগ্রহের সময় তিনি দিন কাটিয়েছেন বারাণসীতে, আবার চলে গেছেন পাঞ্জাবের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ে অবস্থিত ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যগুলিতে। এই পাহাড়ি অঞ্চলের রাজারা ছিলেন রাজপুত। তাঁরা এসব অঞ্চলে রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে দূরে সরে থেকে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে। তবে তাঁদের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নিতে হত।

কুমারস্বামীর এই অন্বেষণ ও সংগ্রহের মধ্য দিয়ে ভারতীয় পরম্পরাগত শিল্পকলার সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, তা তাঁর কাছে বিশেষ শিক্ষণীয় হয়েছিল। তিনি রাজস্থান ও পাঞ্জাবের পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে রাজপুত চিত্রকলার শত শত নিদর্শন পরীক্ষা করার সুযোগ পান। তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয় যে ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী কাল অবধি উত্তর ভারতে মুঘল চিত্রকলার সমান্তরালে রাজপুত চিত্রকলার একটি স্বতন্ত্র ধারা সজীব ছিল। এতদিন পর্যন্ত ইউরোপের চিত্রবিদরা এই চিত্রকলাকে মুঘল চিত্রকলার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে এসেছেন। তাঁর এই আবিষ্কারের তাৎপর্য পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। এখানে যা বিশেষ উল্লেখ্য তা হল এই উত্তর ভারত ভ্রমণের সময় তিনি নানা শহরে বেশ কিছু উদীয়মান ভারতীয় চিন্তাবিদের সঙ্গে পরিচিত হলে, এঁরা প্রত্যেকেই তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। বারাণসী থাকার সময় কুমারস্বামী ছিলেন দার্শনিক ভগবান দাসের বাড়িতে। তাঁর স্মৃতিতে ভগবান দাস লিখেছেন, কুমারস্বামীর স্বাদেশিকতার বাণী তাঁকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অপর এক স্মৃতিচারণে জে. এম. হাফিজ সৈয়দ লিখেছেন, সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ ম্যাগাজিন, ইন্ডিয়ান রিভিউ ও. মডার্ন রিভিউ-তে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলি পড়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক কালে তরুণদের মধ্যে কতখানি উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। তিনি সে-সময় এক বীরের আসন অধিকার করেছিলেন। তাঁর কর্তৃত্বাধীন এলাহাবাদের কলাশিল্প প্রদর্শনী দেখে তাঁর স্মৃতি অনেকদিন তরুণ ও জনসাধারণের মধ্যে জাগরূক ছিল। এই প্রদর্শনীটিকে হাফিজ সৈয়দ এক দিক্‌চিহ্ন হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

এ সময় কুমারস্বামীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর দুটি প্রবন্ধ সংগ্রহের রচনাগুলির জন্য—সিংহল থেকে ১৯০৯ সালে প্রকাশিত *Essays in National Idealism* ও মাদ্রাজ থেকে ১৯১১ সালে প্রকাশিত *Art and Swadeshi*। তাঁর লেখা ছিল স্বাদেশিকতার স্বরূপ নিয়ে, তার আদর্শ নিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে, আর তিনি লিখেছিলেন সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ে। কুমারস্বামীর কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছিল ভারতের সংস্কৃতি। সিংহলে যেমন, ভারতেও তেমনই, তাঁর তীব্র বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের প্রতি যাঁরা ময়ূরপুচ্ছধারীর মতো বিদেশি ধারার শিক্ষার উন্নাসিকতায় রাজনীতিতে ব্যাপৃত ছিলেন। 'Art and Swadeshi' প্রবন্ধে তিনি লেখেন : '...It is the weakness of our national movement that we do not love India; we love suburban England, we love the comfortable bourgeois prosperity that is to be some day established when we have learned enough science and forgotten enough art to successfully compete with Europe in a commercial war.'। বলা বাহুল্য, তাঁর সেদিনের উদ্বিগ্ন মনের সতর্কবাণীই আজ ভবিষ্যৎ বাণী হয়ে 'স্বাধীন' ভারতীয় সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে প্রজন্মান্তরে।

স্বাভাবিক ভাবেই কুমারস্বামীর জীবনসাধনার অভিমুখ রাজনীতির প্রাত্যহিকতা থেকে সরে ভারতীয় কলাশিল্পের সেবায় নিয়োজিত হয়। তিনি ভারত অবস্থানের সেই পর্বে ভারতীয় কলাশিল্পের বিপুল বৈভব ও বহুমুখী বিকাশের কেন্দ্রে যে ভারতীয় জীবন ও তার ধর্মীয় বিশ্বাস তাকে সম্যকভাবে জানতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর লক্ষ্য হল ভারতীয় শিল্পের শুধু করণকৌশলগত দক্ষতা বা তার শৈলীর নান্দনিক উৎকর্ষ নয়, তার যে অন্তর্নিহিত অর্থ তা অনুধাবন করা। এক কথায় ভারতীয় উচ্চমার্গের কলাশিল্পের মর্মোদ্ধার করা। এই কাজে ব্রতী হয়ে তিনি ভারতীয় বৌদ্ধ ও পৌরাণিক সাহিত্যপাঠে মনোযোগী হলেন, মধ্যযুগের সন্ত কবিদের রচনার সঙ্গেও পরিচিত হলেন। তিনি আগেই পালি ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। ভারতে শিখলেন প্রাকৃত, হিন্দি ও উর্দু। তাঁর ভাষাজ্ঞান ছিল অভাবনীয়। কেননা, ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে থাকার নানা পর্বে তিনি শিখেছিলেন মাতৃভাষা ইংরাজি ছাড়া

লাতিন, ফরাসি, জার্মান এমনকী আইসল্যান্ডিক ভাষা। তাছাড়া সিংহলবাসী হিসাবে জানতেন সিংহলি এবং তাঁর পরিবারের ভাষা তামিল। পরবর্তীকালে যখন বৈদিক সাহিত্যে মনোযোগী হন তখন বৈদিক সংস্কৃতও তিনি আয়ত্ত করে নেন। এই বিপুল প্রস্তুতি আর দুর্লভ রসদৃষ্টি নিয়ে তিনি ভারতীয় শিল্পের ঐতিহাসিক হওয়াকেই নিজের জীবনের ব্রত করে নেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক চর্চার ফল তিনি রেখে গেছেন তাঁর অজস্র প্রবন্ধে এবং অনেকগুলি গ্রন্থে। তার সাধারণ পরিচয় দিতে হলেও পৃথক প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন হবে। এ প্রবন্ধ শেষ করব জাতীয় আন্দোলনের সেই উদ্বেলিত সূচনাকালে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব চিহ্নিত করে।

ঐতিহাসিক হান্‌স কোহ্‌ন (Hans Kohn) আনন্দ কুমারস্বামীকে আখ্যায়িত করেছেন নেশন হিসাবে ভারতকে গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর বলে। কুমারস্বামীর স্মৃতিতে প্রকাশিত Memorial Volume-এ এম. ডি. রাঘবন লিখেছেন, তাঁর বাণী 'Changed the course of many a man'। এই একই গ্রন্থে শিশিরকুমার ঘোষের মন্তব্য : 'During the years of Swadeshi, it was Coomaraswamy, who, along Annie Besant, Rabindranath, Sri Aurobindo and others, taught us the fine points of nationalism which politicians are apt to overlook.' আর কুমারস্বামীর সহমর্মী অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালের শারদীয় *পরিচয়ে* তাঁর স্মৃতিতে লেখেন : 'স্বদেশি আন্দোলনের আদি যুগে তাঁর ওজস্বী লেখা ও বক্তৃতা জাতীয় জীবনে নতুন সাড়া জাগিয়েছিল, নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল এবং দেশবাসীরা তাঁকে জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ পুরোহিত বলে, একজন যথার্থ দেশ-সেবক ও দেশ-নায়ক বলে অভিবাদন করেছিল।'

অথচ, আজকের ইতিহাস চর্চায়, বলা যেতে পারে, আনন্দ কুমারস্বামী যেন এক সম্পূর্ণ বিস্মৃত মানুষ।

তথ্যসূত্র

Roger Lipsey : *Coomaraswamy : His life and work*, Princeton (U.S.A.), 1977

S. Durai Raja Singam (ed) : *Homage to Ananda K. Coomaraswamy* (A Memorial Volume), Kuala Lumpur, 1952

Kalyan Kumar Dasgupta (ed) : *Ananda Coomaraswamy : A Centinary Volume*, Calcutta University, 1981

Asok K. Bhattacharya : 'Indian Society of Oriental Art in Restrospect' *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, (75th Anniversary Special Number), Vol. XII & VIII, (1985-86)

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : 'ডাক্তার আনন্দ কুমারস্বামী' *পরিচয়*, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৪৭

ওই : ভারত শিল্প ও আমার কথা, কলকাতা ১৯৬৩

অশোক ভট্টাচার্য : 'কুমারস্বামী, আনন্দ কেন্টিশ' *ভারতকোষ*, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা

ফ্লয়েড স্টার : তাঁর শিশু-সংশোধনাগার ও রবীন্দ্রনাথ

সমীর সেনগুপ্ত

ফ্লয়েড স্টার (Floyd Starr, ১৮৮৩-১৯৮০) আমেরিকান শিশুকল্যাণবিদ। 'স্টার কমনওয়েল্‌থ' নামক শিশু-সংশোধনাগারের প্রতিষ্ঠাতা। অল্পবয়স্ক সমাজবিরোধীদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করে তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে, সে-বিষয়ে সমস্ত প্রাচীনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি ফ্লয়েড স্টার বদলে দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য, 'খারাপ ছেলে বলে কিছু হয় না', তাঁর প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। ১৯১৩ সালে আমেরিকার মিশিগান রাজ্যের অ্যালবিয়ন শহরের উপকণ্ঠে, মন্টকাম হ্রদের তীরে একটি ৪০ একরের পোড়ো খামারবাড়ি কিনে তিনি তাঁর প্রথম বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। এখানে 'গৃহহীন, পরানুগ্রহনির্ভর, অবহেলিত ও বিপথগামী' বালকদের জন্য একটি সংশোধনাগার গড়ে তোলেন—নাম দেন 'স্টার কমনওয়েল্‌থ'। সাধারণ সংশোধনাগার যেমন হয় এটি সে রকম ছিল না। এখানে বালকদের শাসনের পরিবর্তে ভালবাসা দিয়ে পরিবর্তন করবার চেষ্টা করা হত। প্রথম কুটিরটি যে-ক'দিন তৈরি না হয়েছিল সেই ক'দিন স্টার ও তাঁর প্রথম ছাত্র দু'জনকে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয়েছিল। এই সময় থেকে ৫৪ বছর তিনি এই সংস্থার কর্ণধার ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে এটি একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং আমেরিকার নানা স্থানে এর শাখা স্থাপিত হয়।

মৃত্যুর পরে ফ্লয়েড স্টারকে তাঁর বিদ্যালয়ের ভিতরেই সমাধিস্থ করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত স্টারের মূল সূত্রটি ছিল এই, সম্মান ও ভালবাসা দিয়ে যদি কোনও বালকের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তাহলে সে উত্তম নাগরিক হয়ে উঠবেই। শান্তিনিকেতনের আদর্শের সঙ্গে এখানকার আদর্শের মিলটি লক্ষণীয়।

১৯১৬ সালে আমেরিকায় এসে রবীন্দ্রনাথ ও পিয়ার্সন এই প্রতিষ্ঠানটি দেখতে যান এবং দেখে মুগ্ধ হন। অ্যান্ডরুজকে এর কথা লিখেওছিলেন সানফ্রান্সিস্কো থেকে, ৫ জানুয়ারি ১৯১৭ তারিখে। পরে জাপান থেকে লেখা তাঁর আরেকটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, স্টার কমনওয়েল্‌থের ছেলেরা তাদের খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমের দরিদ্রভাণ্ডারে টাকা পাঠিয়েছে, এবং শ্রীযুক্ত স্টার সেখানকার হাসপাতাল তহবিলেও কিছু টাকা পাঠাবার কথা ভাবছেন।

যে সময় এই প্রতিষ্ঠানের বয়স মাত্র তিন বছর, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯১৬ সালে জাপান ভ্রমণকালে তিনি কারও কাছে এই বিদ্যালয়টির বিষয়ে শোনেন এবং বিদ্যালয়টির সঙ্গে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মিল অনুভব করে এটি দেখতে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন পিয়ার্সন—তথাকথিত 'খারাপ ছেলে'দের নিয়ে কাজ করার প্রসঙ্গটিতে তাঁরও উদগ্র কৌতূহল ছিল, তাঁর নিজের দেশ

ইংলন্ডের তথাকথিত 'খারাপ' ছেলেদের নিয়ে কাজও করেছেন এক সময়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি স্টার কমনওয়েল্থ-এ চিঠি লিখে জানালেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রতিষ্ঠানটি দেখতে চান। তিন বছর আগে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ এখন পৃথিবীবিখ্যাত—অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ফ্লয়েড তাঁকে নিমন্ত্রণ জানালেন।

কিন্তু আমেরিকার ডেট্রয়েটে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন, তিনি ইস্কুলটির ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছেন, নামটিও মনে নাই। নানাভাবে সন্ধান করে ব্যর্থমনোরথ হয়ে যখন তাঁরা ডেট্রয়েট ছাড়তে উদ্যত তখন *ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস* নামে একটি স্থানীয় দৈনিকের রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় হঠাৎ পিয়ার্সনের চোখে পড়ে, এই ইস্কুলটি সম্পর্কে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি লিখেছিলেন মার্ক ফল, অ্যালবিয়ন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং তখন অ্যালবিয়নের সান্ধ্য দৈনিক *অ্যালবিয়ন ইভনিং রেকর্ডার*-এর সম্পাদক। ডেট্রয়েট থেকে অ্যালবিয়ন খাড়া পশ্চিমে একশো মাইলের মধ্যে। পিয়ার্সন তৎক্ষণাৎ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্টার লিখেছেন, এই প্রস্তাবে প্রথমে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন; পরে সামলে উঠে তিনি পিয়ার্সনকে লেখেন, নোবেল বিজেতা স্যার রবীন্দ্রনাথ টেগোরের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করবার জন্য তাঁদের প্রতিষ্ঠান এখনও প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেনি—কিন্তু তিনি যদি ছেলেদের ভালবেসে একজন সাধারণ দর্শকের মতো আসেন, তাঁদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। পিয়ার্সন মন্তব্য করেছেন, তাঁদের চিঠিতে এই বাক্যটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়টি দেখতে যাবার জন্য বিশেষভাবে উৎসুক হয়ে ওঠেন। পিয়ার্সন ব্যবস্থা করে ফেললেন, তাঁরা দু'জন দু'টি দিন এই বিদ্যালয়ের মধ্যে কাটাবেন।

কিন্তু তাঁরা ঠিক কোন দু'টি দিন সেখানে কাটিয়েছিলেন, বিদ্যালয়ের মুদ্রিত কাগজপত্রে তার তারিখটির উল্লেখ নেই। বলা আছে, শ্রীযুক্ত স্টার-এর স্ত্রী ও পিতামাতা এই অতিসম্মানিত অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজনে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তখন সেখানে একটিই মাত্র ঘর ছিল স্নানাগার-সংলগ্ন—ঘরটিতে বাস করতেন বিদ্যালয়ের মেট্রন। দু'দিনের জন্য ঘরটি তিনি মহামান্য অতিথিকে ছেড়ে দিলেন। পিয়ার্সনের জন্য অন্য একটি ঘর ঠিক করা হয়। এই দিন নৈশাহারের পর বিদ্যালয়ের খেলার ঘরে (সম্ভবত এটিই তখন তাঁদের বৃহত্তম হলঘর ছিল) পিয়ার্সন স্লাইড দেখিয়ে বক্তৃতা সহযোগে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মী ও ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথও একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তারপর তিনি আরেকটি কাজ করলেন, সারা আমেরিকার বক্তৃতাসফরে তিনি যে কাজ আর কখনও করেননি বলে দাবি করেছেন শ্রীযুক্ত ফ্লয়েড স্টার—তিনি ছাত্রদের সামনে একটি গান গেয়ে শোনালেন।

বহু বছর পরে এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন স্টার-এর কন্যা, সেই সময়ে তাঁর বয়স ছিল তিন বছর :

> ...লম্বা, ঢোলা আঙ্‌রাখা পরে তিনি এলেন; মরমিয়া কবিদের মতো করুণাময় তাঁর চোখ দুটি—তাঁর শ্মশ্রুশোভিত, অসামান্য সুন্দর বাদামি রঙের মুখের মাঝখান থেকে উজ্জ্বলভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নির্মল ও প্রশান্ত একটি ব্যক্তিত্ব উৎসারিত হচ্ছে তাঁর ভিতর থেকে, তাঁর আধ্যাত্মিকতা যেন প্রায় আঙুল দিয়ে ছোঁয়া যায়। সান্‌ডে স্কুলের পুস্তিকায় ছবি দেখে আমি যিশুখ্রিস্টের চেহারার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। তাঁকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে যিশুই আমাদের স্কুল দেখতে এসেছেন, এবং আমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। মা অনেকবার আমার ভুল শুধরে দিলেও এই বিশ্বাস আমার অনেক দিন পর্যন্ত যায়নি।...

তিনি আরও লিখেছেন, টেগোরের খাওয়াদাওয়া একেবারেই তাঁদের মতো নয়, তাঁর খাবারের ব্যবস্থা করতে সকলকেই খুব ব্যস্ত হতে হয়েছিল। তাছাড়া দিনের মধ্যে অনেকটা সময় তিনি একা থাকতে চাইতেন। তবে তাঁর মা হ্যারিয়েট টেগোরের সমস্ত প্রয়োজনই সুন্দরভাবে মিটিয়েছিলেন; যাবার সময় টেগোর অত্যন্ত 'সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে' তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

ছাত্রদের থাকবার যৌথকক্ষগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্রামকক্ষ ছিল পাশাপাশি—তাই ফ্লয়েড স্টার ছেলেদের সাবধান করে দিয়েছিলেন তারা যেন শোবার সময়ে রোজকার মতো গোলমাল না করে। ইতিমধ্যে পিয়ার্সন এসে জানতে চাইলেন, রবীন্দ্রনাথ যদি এসে ছেলেদের শোবার ব্যবস্থাটি দেখেন এবং ছেলেদের শুতে যেতে সাহায্য করেন তাতে কোনও অসুবিধে আছে কি না। অনুমতি নিয়ে তিনি এসে ছেলেদের মাঝখানে দাঁড়ালেন, ছেলেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল, তাঁকে আলিঙ্গন করল, জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। শেষ শিশুটিও শুতে চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপর স্টারকে বললেন, 'মি. স্টার, বাংলাদেশে আমার ইস্কুলের ছেলেদের ছেড়ে আসবার পর থেকে আমি একটু ভালবাসা পাবার জন্যে তৃষিত হয়েছিলাম—আমেরিকায় এসে এখানেই প্রথম তার স্বাদ পেলাম।'

পরদিন সকালে তিনি ছেলেদের কাছে *দ পোস্ট অফিস* নাটকটি এবং *দ ক্রেসেন্ট মুন* থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে

শোনালেন। দুপুরের দিকে একটি গাড়ি এসে তাঁদের নিয়ে টলেডো অভিমুখে চলে গেল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্টার কমনওয়েল্‌থের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

এখান থেকে টলেডো শহরে ফিরে গিয়ে তিনি শ্রীযুক্ত স্টারকে যে চিঠিটি লেখেন তা এই :

হোটেল টলেডো, ওহায়ো
১৭ নভেম্বর ১৯১৬

প্রিয় মি. স্টার,

দিনের পর অলাভজনক দিনের মরুভূমির মাঝখানে আপনার ওখানে ঘুরে আসাটাকে আমার কাছে লেগেছে যেন কোনও মরূদ্যানে জীবনের প্রস্রবণে স্নান করে ওঠার মতো। অনেক বড় বড় মাপের ঘটনা বিস্মরণ হয়ে যাবে, কিন্তু আপনার ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির স্মৃতি আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে—কারণ ওখানে আমি সত্যের স্পর্শ পেয়েছিলাম, এবং ওখান থেকে আমি ঋদ্ধতর হয়ে ফিরে এসেছি।

আপনার ছেলেদের আমার ভালবাসা জানাবেন, এবং তাদের বলবেন যে তাদের পাঠানো চিঠিগুলি আমাকে অনেক আনন্দ দিচ্ছে।

শ্রীমতী স্টারকে আমার নমস্কার জানাবেন, আপনার জন্য এবং আপনার বাবা ও মাকেও নমস্কার জানাই।

আমি রইলাম
বিশেষভাবে আপনার
রবীন্দ্রনাথ টেগোর

পরের বার (১৯২০-২১) আমেরিকায় এসে রবীন্দ্রনাথ আর স্টার কমনওয়েল্‌থে যাবার সময় করে উঠতে পারেননি; তবে পিয়ার্সন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিবশত এবং অংশত ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পেও, পুনরায় কিছুদিন এই বিদ্যালয়ে কাটিয়ে যান। পরে শ্রীযুক্ত স্টারও ইংলন্ডে গিয়ে পিয়ার্সনের অতিথি হয়েছিলেন—তাঁদের বন্ধুত্ব সারা জীবন বজায় ছিল।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ মধ্য-আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে দিতে ভ্রাম্যমাণ, সঙ্গে সচিব হিসাবে আছেন পিয়ার্সন। পিয়ার্সন রবীন্দ্রনাথকে পাগলের মতো ভালবাসতেন, সেক্রেটারি হয়ে তাঁর সঙ্গে বিদেশে গেলে তাঁর সমস্ত ভার বহন করতেন, এমনকী রাত্রে শোবার আগে রবীন্দ্রনাথ দুধের সঙ্গে মল্ট খাবেন না কোকো খাবেন সে সিদ্ধান্তও পিয়ার্সন নিতেন বলে তাঁর জীবনীকার প্রণতি মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথও নানা স্থানে জানিয়েছেন, পিয়ার্সনের মতো ভাল সচিব তিনি আর কাউকে কখনও পাননি। স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব বহন করলেও, কখনও কখনও তিনি ক্লান্তও হয়ে পড়তেন, স্বভাবতই। সেই ক্লান্তি প্রকাশ পেত তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধে এবং শেষ পর্যন্ত কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য থেকে অব্যাহতি নিয়ে। এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। পিয়ার্সনও শিশুদের ভালবাসতেন, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করে তিনি গিয়ে কোথাও না কোথাও একটি বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিতেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসেও পিয়ার্সন এইভাবে রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর ওপরে দিয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন। নানা স্থানে ঘুরে আসেন 'স্টার কমনওয়েল্‌থ ফর বয়েজ' বিদ্যালয়ে।

ফ্লয়েড স্টার ও তাঁর শিশু-সংশোধনাগারেরর সংবাদ প্রথম জানতে পারি প্রশান্তকুমার পালের *রবিজীবনী*-র অষ্টম খণ্ড থেকে। সেখানে প্রশান্ত জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পরিত্যাগ করে পিয়ার্সন এই বিদ্যালয়ে এসে ওঠেন, এবং এখান থেকে চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ২৬ ডিসেম্বর ১৯২০ তারিখে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন :

> ...চেষ্টা করো যাতে গুরুদেব শিকাগো যাবার পথে একবার অ্যালবিয়ন-এ থেমে যান। ট্রেনটা অ্যালবিয়ন হয়ে যায়, আর সঙ্গের টাইমটেবিলে যে ট্রেনটাকে আমি চিহ্নিত করে দিলাম সেটাতে যদি তোমরা আস তাহলে নায়াগ্রা জলপ্রপাতটাও গুরুদেবের দেখা হয়ে যায়। ফল ভিউ ইস্টিশানে পাঁচ মিনিট দাঁড়ায় ট্রেনটা, সেখান থেকে পুরো প্রপাতটার আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ে—আমি চাই না এটা গুরুদেবের চোখ এড়িয়ে যায়। মি. স্টার খুব চাচ্ছেন যে গুরুদেব তাঁর ছেলেদের একবার দেখুন; উনি যদি দু'য়েকদিন এখানে থাকতে চান তাহলে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যাতে ওঁর সময়টা নিরিবিলিতে এবং স্বচ্ছন্দভাবে কাটে। আমি যদি শিকাগোয় চলে যাই তাহলে তুমিও এখানে [সেই জায়গায়] থাকলে তিনি খুব খুসি হবেন।...শিকাগোর পথের চারভাগের তিনভাগ গিয়ে অ্যালবিয়ন...
>
> —প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের *উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়ার্সন*, পৃ. ২৩১ থেকে অনূদিত

এর পর ইন্টারনেটে খোঁজাখুঁজি করে 'স্টার কমনওয়েল্‌থ' বিদ্যালয়ের সন্ধান পাই। তাঁদের কাছে জানতে চাই, রবীন্দ্রনাথ কখনও তাঁদের বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন কি না, গিয়ে থাকলে সে বিষয়ে তথ্যাদি তাঁদের কাছে আছে কি না। তাঁরা জানালেন, রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তাঁদের বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে রাত্রিযাপনও করেছিলেন;

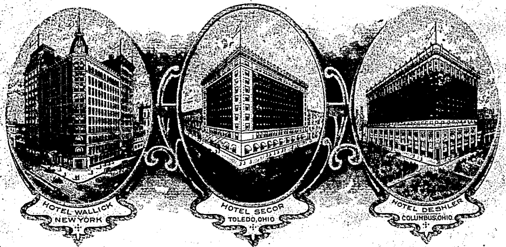

Toledo, O. Nov. 17, 1916

Dear Mr Stowe,

Amidst a desert of unprofitable days my visit to your place has been to me like some oasis with its spring of the water of life. Other things of bigger dimensions will be forgotten but the memory of your little school will remain a part of my life to the

end — because I had a touch of truth there and I came away richer than when I visited the place.

Please give my love to the boys and tell them that their letters have given me great delight.

My kind regards to Mrs Starr and yourself and your father and mother

I am
Sincerely yours
Rabindranath Tagore

আমি যদি এ বিষয়ে কৌতূহলী থাকি তাঁরা তাঁদের যাবতীয় তথ্য আমাকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। কিছুদিন পরে ডাকে মস্ত একটি পার্সেল এসে উপস্থিত, তাতে তাঁদের প্রকাশিত দুটি বড় বড় বই, এবং একটি সি-ডি। সমস্ত তথ্য তাঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে এই রচনাটি লিখে ওঠা গেল। বই দুটি হল :

1. *FAITH MADE VISIBLE* : The History of Floyd Starr & His School, by Dr. Keity J. Fennimore, Published by the Starr Commonwealth, Albion, Michigan, USA, 1988.
2. '*No Such Thing*' by Elizabeth W. McAdam. Published by the Starr Commonweaith, Albion, Michigan, USA, 1968.

বইগুলিতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু কিছু গৌণ তথ্যের ভ্রান্তিও নজরে পড়ে। বোলপুর হয়েছে বালপুর (Balpur), এবং বলা হয়েছে বিদ্যালয়টি তাঁর পিতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলা হয়েছে ১৯১৬ সালে চীন ভ্রমণে গিয়ে তিনি কারও কাছে বিদ্যালয়টির কথা শোনেন—কিন্তু ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ চীনে যাননি, গিয়েছিলেন জাপানে।

১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথ দু'টি দিন অ্যালবিয়ন শহরের 'স্টার কমনওয়েল্‌থ' বিদ্যালয়ে কাটান—*রবিজীবনী*-তে এই দু'টি দিনের উল্লেখ নেই। স্পষ্টতই, তাঁর অধিগম্য যেসব নথিপত্র থেকে প্রশান্ত রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসূচি তৈরি করেছেন তাতে অ্যালবিয়ন শহর বা 'স্টার কমনওয়েল্‌থ'-এর কোনও উল্লেখ নেই। তিনি ব্যবহার করেছেন মূলত সে সময়কার মার্কিন সংবাদপত্রের কর্তিকা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাসফরের আয়োজক শ্রীযুক্ত পন্ড্‌-এর প্রদত্ত হিসাব ও ভ্রমণসূচি। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথের অ্যালবিয়ন ভ্রমণ তাঁর ব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়েনি, সেখানে তিনি কোনও অর্থোপার্জক বক্তৃতাও করেননি, তাই পন্ডের উল্লিখিত ভ্রমণসূচিতে অ্যালবিয়নের নাম নেই। মিলিয়ে মিলিয়ে পড়তে গেলে তাঁর ভ্রমণসূচিতে ফাঁক আবিষ্কার করা যায়। *রবিজীবনী* থেকে রবীন্দ্রনাথের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি দিনগুলির ভ্রমণসূচি লক্ষ করা যাক :

১৪ নভেম্বর।। ওহায়ো রাজ্যের ক্লিভল্যান্ডে 'দ ওয়ার্ল্ড অব পার্সোনালিটি' প্রবন্ধটি পাঠ করেন (তথ্যসূত্র : সুজিত মুখোপাধ্যায়, *আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া*, পৃ. ২১৩)।

১৫ নভেম্বর।। ক্লিভল্যান্ডে ভাষণ দিলেন।

সমস্যাটা এর পরেই। প্রশান্ত লিখেছেন :

> ...পন্ডের হিসাব এখানে আমাদের কিছুটা সংশয়ান্বিত করে তুলেছে। তিনি ১৪ নভেম্বর ওহিও স্টেটের ক্লিভল্যান্ড ও কলম্বাস-এ রবীন্দ্রনাথের দুটি বক্তৃতা বাবদ যথাক্রমে ১২০ ও ১০০ ডলার কমিশন গ্রহণের কথা লিখেছেন—কিন্তু ক্লিভল্যান্ডের ভাষণটি দেওয়া হয়েছিল ১৫ নভেম্বর ও কলম্বাস-এ কোনো ভাষণ দেওয়ার কথা জানা যায়নি। পক্ষান্তরে মিচিগান স্টেটের *গ্র্যান্ড র‍্যাপিড নিউজ* [১৭ অক্টো] সুনির্দিষ্টভাবেই জানিয়েছিল (বঙ্গানুবাদ) : 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর...১৫ নভেম্বর অ্যান আর্বর-এ আসছেন, তিনি ইউনিভার্সিটি ওর‍্যাটরিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় বক্তৃতা করবেন।
>
> পন্ডের পত্রে ১৬ নভেম্বর ক্লিভল্যান্ডে বক্তৃতা বাবদ কমিশন হিসেবে ১৫০ ডলারের একটি অঙ্ক দেখা যায়—যার কোনো বিবরণ আমরা পাইনি।...'

দেখা যাচ্ছে, ১৬ এবং ১৭ নভেম্বর—এই দুটি দিন রবীন্দ্রনাথ কোথায় কাটিয়েছেন, তার খুব পরিষ্কার তথ্য প্রশান্তর সংগ্রহে নেই। সুজিত মুখোপাধ্যায় তাঁর *প্যাসেজ টু আমেরিকা* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সে দেশের যে ভ্রমণসূচি দিয়েছেন, তাতে আছে, ১৭ নভেম্বর তিনি ওহায়োর টলেডো শহরে দিনটি কাটান। প্রশান্ত এ-সম্পর্কে এই আপত্তি জানিয়েছেন যে তথ্যটি কোনও নথির দ্বারা সমর্থিত নয়—লিখেছেন, '...আবার ড. সুজিত মুখোপাধ্যায় যখন লেখেন : 'Toledo, Ohio—spent day (November 17)', তখন সেটিকে তথ্যসম্মত করার উপযোগী কোনো সংবাদ-কর্তিকা আমাদের চোখে পড়ে না।...'

১৮ নভেম্বর তিনি নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছিলেন, সে বিষয়ে সুজিত মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার পাল, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সেন্টিনারি ভলিউম-প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনীকোষ, সকলেই একমত, এবং এর পরেকার তারিখ নিয়েও কোনও মতদ্বৈধ নেই।

'স্টার কমনওয়েল্‌থ' কর্তৃপক্ষ আমাকে একটি সি-ডি উপহার পাঠিয়েছেন, তাতে অন্যান্য ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির প্রতিলিপি আছে—টলেডোর 'হোটেল সেকর (Secor)' থেকে লেখা, তারিখ ১৭ নভেম্বর ১৯১৬—যার বঙ্গানুবাদ একটু আগে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই চিঠিটি (প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য) থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে ১৭ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ টলেডো-তে ছিলেন, এবং তার অব্যবহিত আগে তিনি 'স্টার কমনওয়েল্‌থ'-এ কিছুটা সময় যাপন করে এসেছেন।

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণের সূচিতে এই যে দুটি দিনের ফাঁক—১৬ থেকে ১৭ নভেম্বর—এই চিঠিটি এই ফাঁক ভরাতে সহায়তা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বঙ্গীয় প্রেক্ষিত

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকে পশ্চিমের জ্ঞানবাদী সভ্যতার কালবোশেখি রামমোহন-ডিরোজিও-ইয়ং বেঙ্গল-মাইকেল হয়ে আছড়ে পড়েছিল, আমাদের বঙ্গীয় পাঠশালার খড়ো ঘরের চালে, তখনই পাকা খুঁটির আঁতিপাঁতি সন্ধান শুরু হয়েছিল দেশীয় ঐতিহ্যের আনাচে-কানাচে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ মাইকেল হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে চলেছিল সেই দেশীয়তার নিবিড় সন্ধানী নির্মাণ। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিগ্রহণ ও প্রাচ্য সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার; আতিথ্য ও গার্হস্থ্যের এক আশ্চর্য টানাপোড়েন দিয়ে বোনা বাঙালির নবজাগরণ। এ কাজ শেষপর্যন্ত যাঁকে গুটিয়ে তুলতে হয়েছিল তিনিই রবীন্দ্রনাথ।

নানান ভাবুক এবং কর্মী, লেখক এবং সাধক, গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী, মননশীল এবং মরমীর শতবর্ষব্যাপী অভিপ্রায় এবং কর্মকৃতিকে ঐকতান বাদনে পরিণত করার জন্য যে দেবদুর্লভ মানবপ্রতিভার প্রয়োজন হয়েছিল তিনি এসেছিলেন। তাঁকে মেলাতে হয়েছিল স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতার দুই পরস্পর বিরোধী মুখ। তাঁকে মেটাতে হয়েছিল অতিনাগরিকতা ও প্রত্যাখ্যাত পল্লির দুস্তর ফারাক, তাঁকে জুড়তে হয়েছিল বিশ্লেষণবাদী বিজ্ঞান ও সংশ্লেষণবাদী সাহিত্যের জল-অচল সম্পর্ক। তাঁকে বিশ্বাস ও বিতর্কের দুই মুখ এক করতে হয়েছিল। হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও এবং সংস্কৃত কলেজের মেধাবী ছাত্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় এবং বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মহাকবি মাইকেল এবং 'সারদা মঙ্গল' কাব্যের গীতিকবি বিহারীলাল, বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী অক্ষয় দত্ত এবং অধ্যাত্মবাদী দেবেন্দ্রনাথ, হিন্দুত্বাভিমানী বঙ্কিম ও বিদ্রোহী কবি নজরুল, ধুতি-উড়ুনি পরা বিদ্যাসাগর এবং হ্যাট কোট পরা মাইকেল—বৈপরীত্যের এই অভূতপূর্ব সমাবেশ বাঙালিকে যেন দু'মুখে জোতা এক ঘোড়ার গাড়ির বিহ্বল সওয়ার করে দেয়। সেই বাঙালিকে যিনি বিশ্বগ্রাসী ঔপনিবেশিকতার মুখে বিশ্বনন্দিত একটি পুষ্পিত ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ।

এর জন্য তাঁকে ঘরে-বাইরে মেটাতে হয়েছিল গরমিলের নানান অঙ্ক। ঠাকুরদা দ্বারকানাথের রাজসিক বিলাসিতা জীর্ণ বসনের মতো পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রকৃতির অরণ্যময় পার্বত্য নির্জনতায় হাফিজ আবৃত্তি করতে করতে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেন বা বীরভূমের প্রান্তর মধ্যবর্তী ছাতিম বৃক্ষের নীচে বসে তারকাখচিত আকাশের সৌন্দর্য যেন পান করতেন। রানি ভিক্টোরিয়ার রাজসভায় হীরে বসানো জুতো পায়ে দিয়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ মস মস করে প্রবেশ করেছিলেন একদা, বা বিলেতে প্রদত্ত ভোজসভার শেষে আমন্ত্রিত ফরাসি সুন্দরীদের গায়ে কাশ্মীরি শাল জড়িয়ে দিয়ে তাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রাজপুত্র নন, নন মহর্ষিও। তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছিল সম্পূর্ণ আলাদা এক যাত্রাপথ। সে পথ প্রিন্সের নয়, ঋষিরও নয়। সে পথ, বাঙালির চিরকালের পথ। 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল'—এ কবিতা স্থলে...রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিগুরু। দ্বারকানাথের বহির্মুখী প্রসারণ ও বিষয়মুখী বিস্তারকে এক পরাগতিময় ঐতিহাসিক বৈরাগ্যে ও অন্তর্মুখী অনুভবে জুড়ে আনতে হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথকে। তারপর সেই চাপাপড়া অনুভবের নিবিড় কথামালা আর্টেজীয় কূপের মতো শতধারে বিচ্ছুরিত করেন যিনি তিনি রবীন্দ্রনাথ। একই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতো আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ও দ্বারকানাথের মতো বিশ্ববিহারী। তাঁর নিজস্ব পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে দুই বিপরীতের (রাজসিক ও সাত্ত্বিক) যে জীবনচর্যা লীলায়িত হয়ে উঠেছিল তাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ বা আত্মসাৎ করে তিনি গড়ে নিয়েছিলেন এক নিজস্ব চলন পথ। এতটা যিনি করতে পারলেন বঙ্গীয় ইতিহাসের ভাগ্যদেবতা তাঁর জন্য আরও কঠিন অঙ্ক বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। সে অঙ্ক ঘরের নয় বাইরের।

বাঙালির বিপুল অধুনা যাত্রায় ততদিনে জমে উঠেছে নানান বিপরীতের মেলা। যথা—

বাঙালির সামাজিক মঙ্গল ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে আলাদা আলোচনার জন্য জরুরি বিবেচনা করে রামমোহন

কলকাতার ধনবান ও জ্ঞানবৃদ্ধদের জন্য স্থাপন করলেন 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫)। এ সভা কার্যত নগরবৃদ্ধদের। ডিরোজিও এসে বললেন, 'Your hand is on the helm, guide on youngmen'. সমাজোন্নতি বা সমাজ পরিবর্তন বৃদ্ধদের কাজ নয়, এ দায়িত্ব তরুণদের নিতে হবে। পরম ব্রহ্মের জন্য নিমীলিত নয়ন প্রার্থনা সভার বিকল্পে স্থাপিত হল 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র মতো চোখা বিতর্কসভা।

পশ্চিমী বিদ্যায় শিক্ষিত অক্ষয়কুমার দত্তের ধাত ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের ধাত। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর হাত ধরে যেখানে পৌঁছে ছিলেন সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসভার আসর নতুন করে সাজাচ্ছেন। তাঁর জোর পড়েছিল আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ হৃদয়ের দিকে। তাই মিল হয়নি ব্যথায় ও বুদ্ধিতে। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখ্য কাণ্ডারি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকের ব্যাপার-স্যাপারে অতিষ্ঠ হয়ে বলেই ফেললেন :

'আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ?'

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বরহস্যের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সন্ধান করেছিলেন ঔপনিষদিক ধ্যানের আলোয়, আর অক্ষয় দত্ত বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিলেন পর্যবেক্ষণশীল জ্ঞানের আলোয়। একটি অধ্যাত্মসাধনার পথ, অন্যটি বিজ্ঞানের।

ডিরোজিওর ছাত্ররা যখন বক্তৃতা করত তখন তাদের বক্তৃতা ছাওয়া থাকত বেকন, লক, হিউম, নিউটন, ডেভিডসন, টম পেইন, বায়রন, মুর, বার্নস, শেক্সপীয়র, ক্যাম্পবেলের ঝাঁক ঝাঁক উদ্ধৃতিতে। সেই বক্তৃতা স্বকর্ণে শুনে বিলেত থেকে সদ্য আগত মিশনারি পণ্ডিত আলেকজান্ডার ডাফ বিমোহিত হয়ে মন্তব্য করেছেন ১২/১৪ বছরের 'অলিভ কমপ্লেক্সড্ অ্যান্ড ব্রোঞ্জ কালারড্' ছেলেরা যেভাবে চোস্ত্ ইংরাজিতে তর্ক-বিতর্ক করছে তা তথাকথিত সুখী দেশেও অকল্পনীয়। ঠিক সেই সময় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সদ্য গ্রাম থেকে আসা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজে, ব্যাকরণ, সাহিত্য অলঙ্কার, জ্যোতিষ, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়, অধ্যয়ন করতে গিয়ে নিবিষ্টমনে পড়ছিলেন যে সব গ্রন্থ তার তালিকা এই রকম—মুগ্ধবোধ, অমরকোষ, ভট্টিকাব্য, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয় শিশুপালবধ, উত্তররামচরিত, কাদম্বরী, নৈষধচরিত, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর, মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তক মীমাংসা, দত্তক চন্দ্রিকা, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ভাষাপরিচ্ছেদ, ন্যায়সূত্র, কুসুমাঞ্জলি। একদিকে হিন্দু কলেজ অন্যদিকে সংস্কৃত কলেজ। একই হাতার মধ্যে দুই কলেজে দু'রকম বিদ্যাচর্চার পরস্পর্ধী ধারা। একদিক থেকে বেরিয়ে আসবেন বাংলা সাহিত্যে নবযুগের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অন্যদিক থেকে বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একজন হ্যাট-কোট বুট পরা যেন খাস বিলিতি সাহেব অন্য জন ধুতি-উড়ুনি তালতলার চটি পরা খাঁটি দিশি পণ্ডিত।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে বাঙালি নোঙর ছিঁড়ে ভেসে যেতে চেয়েছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অকূল সমুদ্রে দ্বিতীয়ার্ধে তার কণ্ঠে বেজে ওঠে ঘরে ফেরার জন্য সারি গানের সুর। মাইকেল দাঁড়িয়ে আছেন বঙ্গজীবনে সেই জোয়ার-ভাঁটার রাজসাক্ষী হয়ে। প্রবাস ও প্রত্যাবর্তনে বিভক্ত একটি দ্বিঅঙ্ক যুক্ত মহানাটকের ট্র্যাজিক নায়ক তিনি। মাদ্রাজ প্রবাসকালে তাঁর বিদ্যাচর্চার রুটিন ছিল এই রকম (১৮ আগস্ট, ১৮৪৯)

৬টা	—	৮টা হিব্রু
১২টা	—	২টা গ্রিক
২টা	—	৫টা তেলেগু এবং সংস্কৃত
৫টা	—	৭টা ইংরাজি

পরবর্তীকালে আর এক চিঠিতে লিখেছিলেন (১১ জুলাই, ১৮৬৪) 'ফরাসি ও ইতালি ভাষা আমি রপ্ত করে নিয়েছি। জার্মানও শীঘ্র শিখে নেব। লাতিন, ফরাসি ও ইতালির পর স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষা শিখে নেওয়া এমন কিছু শক্ত হবে না।'

যিনি খিদিরপুর ডকে বসে 'আলবিয়নস শোরে'র জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন এবং ইংরাজি কাব্য লিখে বসতে চেয়েছিলেন মিল্টনের পাশে তাঁকেই শেষ পর্যন্ত রামায়ণের কাহিনি অবলম্বন করে লিখতে হল বাংলা ভাষার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ'। নিজের হাতে লিখতে হল 'বঙ্গভাষা' নামক অনুশোচনামাখা অনবদ্য সনেটটি :

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি।) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত; করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
...
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,
...
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।

মাইকেল প্রতীচ্য সংস্কৃতির অভিবাসন থেকে দুর্লভ মণি মাণিক্য ও পরাজয়ের বিষণ্ণ অভিমান নিয়ে ফিরেছিলেন দেশীয় সাহিত্যের নবীন প্রাসাদ নির্মাণ প্রকল্পে।

'ভাই, সত্য বলিতেছি, আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর। এই ভাষার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিতে আমার ইচ্ছা হয়।'

কিন্তু 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়/তাই ভাবি মনে'র দীর্ঘশ্বাস তো চাপা পড়েনি। নবনির্মাণের অহংকৃত আনন্দ কার্যত তার পরাজয় ঢাকার নিবিড় ছলনামাত্র তা তাঁর আত্মবিনাশী জীবন পরিণামে স্বতঃপ্রকাশিত।

পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখুন। তিনি মাইকেলের মতো বঙ্গসাহিত্যের নিরুপায় মহাঅভিবাসী নন তিনি বঙ্গ সংস্কৃতির সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ, স্বাভিমানী গৃহকর্তা। বলতে গেলে বঙ্কিমেই প্রথম ফুঁসে উঠেছিল অভিমানিনী প্রাচ্য। তিনি টান-টান সংকল্পে সাজিয়ে ছিলেন তাঁর স্বধর্ম ও স্বাজাত্যভিমান। তিনি বঙ্গসংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্যের মহাকারিগর। তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্যকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেন উদার ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন গৃহস্থের সৌজন্যে আবার অনুচিত সাহেবি খবরদারিত্ব ও নির্বিচার পশ্চিমীয়ানাকে ধিক্কারও জানাতে পারেন। 'ইওরোপীয়রা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ কিরূপে বুঝেন'—এ বিষয়ে বঙ্কিমের অভিমত এইরকম—

'সংস্কৃত বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচনা পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য জগতে আর কিছুই হইতে পারে না।'

অথচ তিনি মনে করেন—

'জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে।'

প্রাচ্যাভিমানী হিসাবে অতিচিহ্নিত বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্বে' লিখেছেন,

'গুরু—ভূতকে জানিবে কোন শাস্ত্রে?

শিষ্য—বহির্বিজ্ঞানে

গুরু—অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোমতের চারি—

Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে।'

কিন্তু তাঁর নিজস্ব সাংস্কৃতিক অবস্থানটি নানাভাবে পরিষ্কার করে গেছেন তিনি—

'ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্বের যতই গাঢ়তর অনুসন্ধান হইতেছে—ততই দেখা যাইতেছে যে সাহিত্যে, দর্শনে, গণিতশাস্ত্রে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে ব্যবস্থাশাস্ত্রে ঐশ্বর্যে, বাহুবলে—একদিন ভারতভূমি ভূমণ্ডলে রাজ্ঞীস্বরূপা ছিলেন।'

পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চাকে স্বাগত জানিয়েও তিনি বাঙালির গতিবিধিতে পরিয়ে দিয়েছিলেন ঔচিত্যবোধের টান-টান স্বাভিমানের লাগাম।

'অনন্ত রত্ন প্রসূতী ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয় ততই ভাল।...অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখনও ইংরাজ হইতে পারিবে না। ...আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র।'

মাইকেলের সঙ্গে বঙ্কিমের তফাতটা স্পষ্ট হয়ে যায়। ইয়ংবেঙ্গল ঘরানার অতিপশ্চিমীয়ানার মুখ যে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয়তার দিকে ঘুরে গিয়েছিল তা মাইকেলেই দৃশ্যমান। প্রাচ্যাভিমানের ঝাঁঝালো মশলা দিয়ে দেশীয়তার যে নতুন সাংস্কৃতিক অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করার কাজ দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয়েছিল তাতে প্রথমার্ধের অতি পশ্চিমীয়ানার ভুল খারিজ করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু স্বদেশ ও স্বধর্মকে একাকার করে হিন্দুত্বের যে ভিয়েন দেওয়া হয়েছিল—দিয়েছিলেন অনেকে মিলে, তাতে আরেক রকম আভ্যন্তর বিভাজন বিভ্রাটের সূচনা হয়। হিন্দুত্বগন্ধী দেশিকতার উত্থান মুসলমানদের ক্রমশ দূরে ঠেলতে থাকে।

রামমোহন ঔপনিষদিক ঐতিহ্য ও ঐশ্লামিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক প্রতীচ্যকে একসঙ্গে ধরতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম পর্বে হিন্দুত্বের ঐতিহ্য সমূহ সমুচ্চতা পেল ঠিকই কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হল ঐশ্লামিক ঐতিহ্য ও মুসলমান সমাজ। এই ফাটলে পেরেক ঠুকতে তৎপর হলেন এদেশের মহামান্য ইংরাজ শাসকরা। এই প্রত্যাখ্যান, সম্পর্ক বিভাজন বঙ্গজীবনে শেষপর্যন্ত কী ধরনের ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা ঘনিয়ে তুলেছিল তা প্রায় সর্বজ্ঞাত।

এর সঙ্গে আর একটি ব্যবচ্ছিন্নতা দুস্তর হয়ে উঠেছিল। রেনেশাঁসের স্বধর্ম হচ্ছে নগরকেন্দ্রিকতা। জে. আর. হেলের কথায় 'নো সিটি নো রেনেসাঁস'। 'যদি রেনেসাঁসের সূর্য 'জ্যোতির কনকপদ্মে'র মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও, দেড়শো বছর পরেও, কেন অমাবস্যার রাতের মতো

অন্ধকার?' নগরজীবন ও পল্লিজীবনের এই পীড়ায় সাংস্কৃতিক ব্যবধানের মধ্যে গমনাগমনের সাঁকো কাউকে বাঁধতেই হত।

রেনেসাঁসের ভিতর রিভাইভ্যালিজমের প্রবল উত্থান, মানবতাবাদের সমান্তরালে বিশেষ জাতিত্ববাদের অহংকৃত প্রকাশ, নগরকেন্দ্রিকতার আবেশে লোকায়ত পল্লিজীবনের ক্রমবিস্তৃতি এইসব নানান জটে জড়িয়ে যাওয়া একটি বঙ্গশতক। তা থেকে মুক্তির ঠিকানা পাওয়া তো খুবই জরুরি।

উনিশ শতকের রেনেসাঁস বাঙালির সামনে খুলে দিয়েছিল নতুন ধরনের ডিসকোর্স। বিলিতি আধিপত্যবাদের সামনে বিনীত 'জো হুজুর' বা নিঃসত্ত্ব বিলয়ই যেখানে ভবিতব্য ছিল সেখানে কী করে যে রচিত হল বরণমালার বিশ্বজয়ী গাথা তা বোধহয় আমরা তেমন করে খতিয়ে দেখি না। আমাদের ইতিহাসের ডালা তাই ভরে থাকে ছিন্ন কুসুম, শুকনো পাতা, আর খণ্ড আলোর দুঃসহ ব্যথায়। নানা অঙ্কে ছড়ানো, নানা দৃশ্যে বিন্যস্ত একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতোই দাঁড়িয়ে আছে উনিশ শতকের বঙ্গীয় মহীরূহটি। বিপরীতের নানান টানাপোড়েন, জয় পরাজয়ের অজস্র কথাকলি দিয়ে বোনা একটি নকসিকাঁথা যেন। চমকপ্রদ ও অভিঘাতময়। রামমোহন বিলেত গিয়েছিলেন 'রাজা' হয়ে, রাজকার্যে, দরবারি টারবান মাথায় দিয়ে, বিবেকানন্দকে যেতে হল বৈরাগ্যের পোশাকে, মুণ্ডনযোগ্য মুক্তমস্তকে। দুই পর্বের দুই ব্র্যান্ড অ্যামব্যাসাডর যেন। রাজা রামমোহন রায় আর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর 'মোদের বিলাত' গিয়েছিলেন অনেকরকম ঘোষিত ও 'হিডেন অ্যাজেন্ডা' নিয়ে কিন্তু তাদের সেই অ্যাজেন্ডা বিলেতের মাটিতেই মিশিয়ে দিতে হয়েছিল, উভয়ের কেউই আর ফিরতে পারেননি সাধের কলকাতায়। মাইকেল সমস্ত রকম সাহেবি প্রস্তুতি নিয়ে বিলিতি পোশাকে হাজির হয়েছিলেন 'বিশ্বের সবচেয়ে জ্ঞানোজ্জ্বল ভূভাগে' কিন্তু ইউরোপ তাঁকে কার্যত ভিখিরি করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। বোঝা যাচ্ছিল বাঙালির প্রস্তুতি তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। শতাব্দীর শেষ দশকে বিবেকানন্দ চিকাগো গেলেন প্রায় কপর্দকশূন্য, নিরাশ্রয় অবস্থায় কিন্তু ফিরলেন বিশ্ববিজয়ীর বেশে। মাইকেল ও বিবেকানন্দ, সাহেব ও সন্ন্যাসীর মাঝে শুধু রামকৃষ্ণের মতো একজন সাদাসিধে ও লোকায়তনিক মেঠো মানুষ ছিলেন তা নয়, শীলিত পোশাক ও পরিণত মেধার এক নাগরিক ডেপুটিও ছিলেন। তাঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র। বিবেকানন্দের গেরুয়া পোশাক ফেটে ভারতীয়ত্বের যে দর্পিত অভিমান মশালের মতো জ্বলে উঠেছিল তার ঐতিহ্য ও মননমিশ্রিত দণ্ডটি প্রস্তুত করেছিলেন পাগড়ি-মাথা ডেপুটিটি। একসময় ডেপুটির পাগড়ি ও সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য একপাশে সরিয়ে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের মোকাবিলায় পরে নেবেন পালটা যুদ্ধের পোশাক।

রবীন্দ্রনাথ ডেপুটি বা সন্ন্যাসী নন, আজাদ হিন্দ ফৌজের দৃপ্ত কম্যান্ডারও নন। তিনি কবি। কে জানত যুদ্ধের গলায় পরিয়ে দেবার জন্য যে জয়মাল্য গাঁথা হয়েছে তা এসে পড়বে তাঁর মতো এক ভ্রামণিক কবির গলায়। তিনি তো দ্বারকানাথের মতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তনি নেবার সুপ্ত ইচ্ছা নিয়ে যাননি সেখানে, মাইকেলের মতো মিল্টন হবার স্বপ্নও তাঁর ছিল না, শাস্ত্র খুঁড়ে ধর্মকথা শোনাবেন সমবেত বিশ্ববাসীকে একথাও ভাবেননি। বিশ্বযুদ্ধের বুকচাপা দুর্যোগের মধ্যে, পরস্পরের দিকে তাক করা কামানের মাঝখানে বসে অনুচ্চকিত ও বিনম্র ভাষায় রচিত গীতাঞ্জলি শুনিয়ে তিনি শুধু মোহিত করেছিলেন তাই নয় টমাস মানের জন্য প্রায় বরাদ্দ হয়ে যাওয়া নোবেল প্রাইজটাই চুম্বকের মতো টেনে নিলেন। চিকাগোর পর স্টকহোম। ১৮৯৩-এর পর ১৯১৩। বিবেকানন্দের পর রবীন্দ্রনাথ। সন্ন্যাসীর পর কবি। বিজিতের কাছে পরাজয়ের এই বিস্ময় বিমোহিত ইতিহাস পৃথিবী আর কখনও দেখেছে—এর আগে? রবীন্দ্রনাথের এই জয়ের পিছনে আছে হয়ে-ওঠার এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। সেই হয়ে ওঠার ইতিহাস তাঁর লিরিকের মতোই একরত্তি নয়, নানা সর্গে অন্বিত. মাইকেলের মেঘনাদ বধের মতোই তা মহাকাব্যিক। তাঁর হয়ে-ওঠার আখ্যানে ঠাকুর পরিবার নামক জবরদস্ত পরিবারের তালফেরতা ইতিহাসের প্রেক্ষিত যেমন আছে তেমনই আছে গোটা উনিশ শতক জুড়ে বঙ্গসংস্কৃতিতে ঘনিয়ে-ওঠা উপাদান বৈপরীত্যের বহুস্তরিত ও বিসর্পিত বিপুল দ্বিরালাপ।

রবীন্দ্রনাথের অতুল প্রকাশবৈভব কারও মানা-না-মানা নিরপেক্ষভাবেই বিদ্যমান। তাই তাকে না মেনে আমাদের উপায় নেই। কিন্তু পুষ্পটিকে মানব বৃক্ষ বাদ দিয়ে? উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের কথা উঠলেই চণ্ডালের প্রবেশে শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্রাহ্মণের মতো পণ্ডিতেরা বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক প্রকল্পের সেই মহাকাব্যিক প্রেক্ষিতটি বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ বলে কি কেউ থাকেন? আমাদের খণ্ডিত পাণ্ডিত্যে রামমোহন আছেন, ডিরোজিও আছেন, বিদ্যাসাগর আছেন, মাইকেল আছেন, বঙ্কিমচন্দ্র আছেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আছেন, রবীন্দ্রনাথও আছেন। নেই শুধু রেনেসাঁস! চরিত্রগুলি আছে, আখ্যান নেই! নায়কেরা আছেন, নেই তাদের কর্মভূমি! মহানায়ক আছেন, নেই

মহাকাব্যটা! প্রেক্ষিতহীন এই রবীন্দ্রানুরাগে ভক্তি থাকতে পারে কিন্তু ইতিহাসবোধ নেই, সাংস্কৃতিক অনুভব নেই, মানবিক বিজ্ঞানও নেই।

উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতটি আছে বলেই রবীন্দ্রনাথ আছেন। না থাকলে তিনি থাকতেন না। যে উপাদান বৈপরীত্য ও জটিলতার সংকট দিয়ে উনিশ শতকের বঙ্গীয় ইতিহাস বোনা তার প্রতিটি সূত্র ও বর্ণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়েছেন তার সামঞ্জস্য সুঠাম সৃজন-লোক। একশো রকম ঝড়ের নির্যাস দিয়ে তিনি বানিয়েছেন একটি গানের মর্মবিদারী সুর। একটি নিঃসঙ্গ অনুভব তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন হাজার তারায়। সংকটের নানা অলি-গলি দিয়ে তিনি প্রবাহিত করেছেন বাঁধভাঙা বাণীর তরল তরঙ্গ। ধ্রুপদী বিপরীতের দুই কঠিন মেরুমুখকে রোমান্টিক অনুভবের রঙিন ছিলায় টানটান করে বেঁধেছেন। অক্ষয় দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ, ডিরোজিও এবং বিদ্যাসাগর, মাইকেল এবং বঙ্কিমচন্দ্র, কলকাতা এবং শিলাইদহ, জোড়াসাঁকো এবং শান্তিনিকেতন, রাজা এবং সন্ন্যাসী, গৃহস্থ এবং বাউল, কবি এবং সেনাপতি, প্রিন্স এবং মহর্ষি—উপন্যাসে হয়নি নাটকে, কবিতায় মেলেনি গল্পে, গানে পারেননি চিত্রে, —শত ধারায়, সহস্র শাখায়, লক্ষ কথার ফুলঝুরি জ্বালিয়ে তিনি চলেছেন ভাঙা চোরা খানাখন্দময় জীবনের ওপর ভালবাসার অব্যর্থ সাঁকো রচনা করতে করতে। প্রাণের এই বিপুল বৈভব, আকাঙ্ক্ষার এই অজস্র বিস্তার, জয়ের এই দুর্জয় প্রতিজ্ঞা, প্রকাশের এই অমিত উন্মাদনা তালফেরতা নদীর মতো গোটা উনিশ শতক জুড়ে নানা চরিত্রভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল একটি সমুদ্রের দিকে। সেই সমুদ্রটির নামই রবীন্দ্রনাথ।

উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের চোখে গৃহ-পরিচারিকা

সুমিতা চক্রবর্তী

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ বহু দিক থেকেই বাঙালির মনন ও জাতীয় জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছিল। এই সত্য স্বীকার করবার সঙ্গেই আমরা এ-ও মেনে নিয়েছি যে এই নবজাগরণের পরিব্যাপ্তিতে বেশ বড় একটি অভাবাত্মক দিক ছিল এই—চিন্তন ও কর্মজগতের যাবতীয় সমুন্নতি প্রধানত সমৃদ্ধ করেছিল উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে। নিম্নবিত্ত সমাজের একাংশও এই পরিবর্তনের কিছুটা শরিক হয়েছিলেন; কিন্তু সেই নিম্নবিত্ত সমাজকে মধ্যবিত্তেরই প্রান্তীয় বর্গ বলা যায়। তাঁরা সাধারণতই বর্ণ হিন্দু গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং জীবিকা-সংস্থানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী। এই শ্রেণির দরিদ্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অতি দারিদ্র সত্ত্বেও কৃষিকর্ম বা অন্য কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন না। অত্যন্ত অবস্থা-বিপর্যয়ে পাচক ব্রাহ্মণের কাজ তাঁরা গ্রহণ করতেন। কিন্তু উনিশ শতকের নবজাগরণের আলো সমাজের প্রান্তিক জনজীবনের অন্ধকার দূর করতে পারেনি—যে-সমাজের অন্তর্গত ছিলেন কৃষক, মৎস্যজীবী, তন্তুবায়, নৌ-বাহক এবং নিতান্তই দিন-মজুরের দল। জাতি-বর্ণের বিচারে যাঁরা শতকরা প্রায় একশো ভাগই নিম্নবর্গ। এই সমাজের অবস্থা-পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে—তা খুব গভীরভাবে চিন্তা করেননি বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ এবং ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ—বর্ণ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে। আদিবাসীদের সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব সত্যিই ছিল এমন যে মানব-পদবাচ্য বলেই তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে রাখতেন না তাঁরা। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' (১৮৮০-১৮৮২, '*বঙ্গদর্শন*' পত্রিকা) রচনাটি এ-বিষয়ে দিক-নির্দেশক হতে পারে। আদিবাসী কোল-সম্প্রদায়কে এতটা পরিসর দিয়ে আলোচনা করবার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রপথিক। কিন্তু 'কোল' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে বহুবার তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে, অনেক সময়ে যেন স্নেহভরেই 'অসভ্য' বিশেষণটি তার আগে লাগিয়ে দেন। কোল নারী ও বালকদের বন্য সৌন্দর্যের (বন্যেরা বনে সুন্দর...ইত্যাদি) প্রশংসা করেও এক জায়গায় পালামৌ-এর অরণ্যবাসীদের সম্পর্কে অনায়াসে তিনি লিখেছেন—'যে সকল ব্যক্তিরা তথায় বাস করে তাহারা জঙ্গলী, কুৎসিত, কদাকার, জানওয়ার; তাহাদের পরিচয় লেখা বৃথা।'

নিম্নবর্গের মানুষ সম্পর্কে কারওরই কোনও ভাবনা ছিল না—তা নয়। বিদ্যাসাগরমশাই আদিবাসী মেয়েদের রুক্ষ চুলে তেল দিয়ে দিতেন হয়ত। কিন্তু শেষ জীবনে কর্মাটাঁড়ে দরিদ্র সাঁওতালের উৎপাদিত ভুট্টা কিনে নিতেন এবং সেই ভুট্টা দরিদ্রতর ও অভুক্ত সাঁওতালেরা অপরাহ্নে তাঁর গৃহ-প্রাঙ্গণে এসে পুড়িয়ে খেত—এই দৃশ্য চাক্ষুষ করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি লিখেও গেছেন সে-কথা। কিন্তু বিদ্যাসাগর একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এই কায়িক শ্রমজীবী নিম্নবর্গের কথা চিন্তা করেছিলেন উনিশ শতকের শেষের দিকে। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় চটকল শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন।

পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন 'ভারত-শ্রমজীবী' নামে। কেশবচন্দ্র সেন কৃষকদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও তার সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যক্ত করেছিলেন নিজস্ব চিন্তা। উত্তরবঙ্গে ও অসমে চা-বাগানের শ্রমিকদের দুরবস্থার যেটুকু সম্ভব প্রতিবিধানে সক্রিয় হয়েছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেকেই। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধ-কাল পর্যন্ত সময়ে নিম্নবর্গের উপস্থিতি প্রায় নেই। প্রবন্ধে অবশ্য উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য'। পরবর্তীকালে তিনি 'সাম্য' প্রবন্ধে ব্যক্ত অভিমতকে 'সব ভুল' বলে ঘোষণা করলেও বঙ্কিমের সে-প্রবন্ধের সত্যতা তর্কাতীত।

উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন্ত উপস্থিতি আমরা পাই কেবল ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গৃহ-পরিচারক ও পরিচারিকাদের মধ্যে। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিই সর্বাধিক বর্ণময়। যেহেতু তিনি প্রধানত উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজকেই তাঁর উপন্যাসের অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং অনেক উপন্যাসেই সচ্ছল পরিবারের নারীর জীবন ও তাঁদের বিচরণক্ষেত্র যে অন্তঃপুর—সেই অন্তঃপুরের চিত্র কিছুটা সরস ভঙ্গিতে হলেও মোটের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছিলেন—তাই স্বাভাবিকভাবেই পরিচারিকাদের চরিত্র উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। বাংলা কথা-সাহিত্য প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রায় সর্বতোভাবেই পরিবারকেন্দ্রিক। তাই পুরুষ ভৃত্যের তুলনায় নারী-ভৃত্য অর্থাৎ পরিচারিকারাই প্রাধান্য পেয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে, বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাঁদের কিছুটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট 'চরিত্র' দেবারও চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের চোখে গৃহ পরিচারিকারা কীভাবে গৃহীত হতেন তার সন্ধান করেছি সাহিত্যের দৃষ্টান্ত সহযোগে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই এই প্রবন্ধে আমাদের অবলম্বন। আর, যদিও প্রবন্ধ শিরোনামে 'ভদ্রলোক' শব্দটি রয়েছে—সেটি ব্যক্তিগত নয়, শ্রেণিগত। ভদ্রলোক বললে এখানে ভদ্রমহিলাদেরও বোঝাবে।

'নিম্নবর্গ' শব্দটির পরিবর্তে 'পশ্চাৎপর' বা 'অনগ্রসর' বর্গ বললেই বেশি ভাল হয়। হিন্দিতে যেমন বলা হয় 'পিছড়ে বর্গ'। 'নিম্নবর্গ' শব্দটির মধ্যে যে 'বড়-ছোট' বা 'উঁচু-নিচু' ভাবটি আছে—তা 'অনগ্রসর' শব্দটির মধ্যে নেই। 'অনগ্রসর' বললেই বোঝা যায় যে, সমাজব্যবস্থার কারণেই সেই শ্রেণি 'অনগ্রসর'। শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব দায়িত্ব নেই সেখানে।

অনগ্রসরতা প্রধানত দুই ধরনের। এই দুই ধরনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ, তবু এই দুই জাতীয় অনগ্রসরতা আলাদাই। একটি হল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, অপরটি জাতিগত অনগ্রসরতা। নীতিগতভাবে আমরা মেনে নিয়েছি যে, কোনও জাতি ও বর্ণ অপর জাতি ও বর্ণের চেয়ে ছোট নয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজে জাতিবিচার চিরকালই এত তীব্র ও গভীর প্রোথিত ছিল এবং এখনও সামাজিক জীবনে অনেকটাই আছে যে, জাতিগত অনগ্রসরতাও মেনে নিতে হবে।

ভারতীয় সমাজের গঠন এমনই যে, জাতিগতভাবে যে অনগ্রসর সে অর্থনৈতিকভাবেও অনগ্রসর হবে—এই পরিস্থিতিটাই বাস্তব। ভারতীয় গণতন্ত্রে সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে বিগত তিরিশ-চল্লিশ বছরে জাতিগত নিম্নবর্গের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশকে কিছুটা আর্থিক সাচ্ছল্যের স্তরে পৌঁছে দেওয়া গেছে। তার অনুপাত এখনও খুবই কম।

অপরপক্ষে সমাজ-স্বীকৃতভাবে অগ্রসর বর্গের মানুষ যাঁরা—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণশ্রেণিভুক্ত—তাঁরাও অর্থনৈতিকভাবে অতি দরিদ্র অর্থাৎ অনগ্রসর হতে পারেন। দারিদ্রবশত, এই কালে তাঁরা এমন অনেক কাজই করেন যেগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে কেবল শূদ্রদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা কখনও সেসব কাজ করতেন না। দরিদ্র উচ্চবর্ণের মানুষকেও আমরা অনগ্রসর বর্গের অন্তর্ভুক্ত করছি।

আমাদের আলোচনার বিষয় উনিশ শতকীয় ভদ্রলোক শ্রেণির চোখে পরিচারিকাদের অবস্থান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে অনগ্রসর বর্গের নারীরা কী কাজ করতেন? বহু কাজই করতেন তাঁরা। সবই কায়িক পরিশ্রমের কাজ। তাঁদের লেখাপড়া শেখানো হত না বলে বিদ্যানির্ভর কোনও কাজ করবার উপায় তাঁদের ছিল না। ক্বচিৎ অবশ্য বৈষ্ণব কুলে বিশেষত, অল্প কিছু ক্ষেত্রে তার বাইরেও পুঁথির লিপিকর রূপে নিম্নবর্গের নারীর নাম পাওয়া গেছে। সংখ্যায় তা খুবই কম; এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা ছদ্মনাম বলেও মনে করা হয়েছে। অতি ব্যতিক্রম হিসাবে তিন-চারজন নারীর কথা ইতিহাসে পাই যাঁরা শিক্ষা-সমৃদ্ধ হয়ে গুরুগিরিও করেছেন।

অনগ্রসর বর্গের নারীরা তাঁদের জাতিগত বৃত্তির কাজে পুরুষদের সাহায্য করতেন। কৃষিকর্ম; কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্মকার, গোপালক ইত্যাদি পরিবারে পুরুষদের পাশাপাশি সব কাজই ভাগ করে নিতেন তাঁরা। এছাড়াও তাঁরা রাজা, অভিজাত শ্রেণি ও সম্পন্ন গৃহস্বামীদের গৃহে পরিচারিকা তথা দাসীর কাজ করতেন।

প্রাচীন-মধ্যযুগের ভারতে এবং উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্তও ধনীগৃহ ব্যতিরেকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত স্তরের উচ্চবর্গের নারীরাও প্রচুর কায়িক

শ্রম করতেন। কিন্তু তাঁরা তা করতেন নিজেদের সংসারের ও পরিবারের গণ্ডির মধ্যে। তাকে গৃহ-শ্রম বলতে পারি। তার জন্য কোনও পারিশ্রমিক ছিল না। পারিশ্রমিকের বা গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে অনাত্মীয়-গৃহে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করেছেন—এমন নারীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। প্রায় ছিলই না। অন্তঃপুরিকা নারীর ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনও কাজ করা, অর্থাৎ কাজ করে পয়সা উপার্জন করা নিন্দনীয় বলেই গণ্য ছিল। বাইরে থেকে রোজগার করে আনা বারাঙ্গনাদের কাজ, গৃহবধূ ও কন্যাদের পক্ষে তা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় এমনই মনোভঙ্গি ছিল সমাজের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্তও মধ্যবিত্ত বাঙালির গৃহে এই ধরনের রক্ষণশীলতা প্রকট ছিল। জ্যোতির্ময়ী দেবী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল মিত্র প্রমুখ লেখকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের কাল-পরিসরে লেখা অনেক গল্পেই এই চিত্র পাই যে, মেয়ের চাকরির টাকায় সংসার চলছে বলে বাবা-মা লজ্জিত তো অবশ্যই; উপরন্তু সেই মেয়ের প্রতিই তাঁরা অপ্রসন্ন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' গল্পের একটি অংশ স্মরণ করা যাক। ক্ষুধার্ত কৃষক ঘরে ফিরে ভাত চেয়েছে। গৃহ অন্নহীন—একথা জানিয়ে স্ত্রী বলেছে—'আমি কি বাহিরে গিয়া রোজগার করিয়া আনিব।' এতই অপমানকর লেগেছিল সে-কথা পুরুষের কাছে যে স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে এমন আঘাত করে যে সে মারাই যায়। 'বাইরে গিয়ে রোজগার করা' ব্যাপারটা বেশ্যাবৃত্তির ইঙ্গিত দিত।

নিম্নবর্গের দরিদ্র শ্রেণির মেয়েদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকার কোনও উপায় ছিল না। জীবিকার জন্যই তাঁদের মাঠে, ঘাটে, পথে, হাটে-বাজারে বিচরণ করতে হত। এবং সে কারণেই উচ্চবর্ণের অগ্রসর বর্গের নারী-পুরুষের মনে নিম্নবর্গের নারীদের চারিত্রিক শুদ্ধতা সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল না।

অনগ্রসর বর্গের মেয়েরাই ধনীগৃহে পরিচারিকার কাজ নিতেন। সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা কিন্তু নিম্নবর্গের হতেন না। ক্রীতদাসী প্রথা বলবৎ ছিল। দাসীর হাটে বিক্রি হতে আসা মেয়েরা বিভিন্ন জাতি-বর্ণের, বিভিন্ন দেশের মেয়ে হতেন। যুদ্ধবন্দিনী হিসাবে বহু উচ্চবর্গের, এমনকী অভিজাত শ্রেণির মেয়েদেরও রাজ-অন্তঃপুরে পরিচারিকার কাজ করতে হত। অনেক উচ্চবর্গীয় পরিবার থেকে স্বেচ্ছায় কন্যাকে রাজ-অন্তঃপুরে পরিচারিকা হবার জন্য পাঠানো হত। কখনও তার কারণ রাজ-পরিবারের অনুগ্রহ লাভ, কখনও রাজবাড়ির সহবৎ শিক্ষা। তবে এই মেয়েদের নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক অনেক সময়েই থাকত না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে পরিচারিকা নিয়োগের ইত্যকার যেসব প্রথা ছিল সে-সব আর উনিশ শতকে বিশেষ ছিল না। একেবারেই ছিল না তা-ও নয়। বিশেষত, দেশীয় রাজ-পরিবারগুলিতে ব্যাপক দাসী নিয়োগের প্রথা ছিল। রাজ-অন্তঃপুর ভরে থাকত বহু দাসী ও পরিচারিকায়। তাঁদের মধ্যেও ছিল বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন শ্রেণি। রাজা, রানি, নবাব, বেগমদের খাস-পরিচারিকা এবং নিতান্তই গৃহকর্মের জন্য নিযুক্ত সাধারণ দাসীর মধ্যে প্রভেদ সামান্য ছিল না।

উনিশ শতকে এসে মোটের ওপর আমরা গৃহ-পরিচারিকা ও বাড়ির দাসী তাদেরই বলতে চাই, যাঁরা আর্থিক দুরবস্থার কারণে অনাত্মীয় পরিবারে কায়িক শ্রম এবং পরিষেবার বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন। তাঁদের সম্পর্কে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা বোঝার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সম্ভার অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেছি।

নিম্নবর্গের নারীর এই একটি শ্রেণিই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পেয়েছি—গৃহ-পরিচারিকা বা দাসী। তাঁরা বিভিন্ন ধনীগৃহে কাজ করেন। তাঁদের বেতনের টাকা অবশ্যই জোগান দেন গৃহস্বামী কিন্তু প্রত্যক্ষত তাঁদের চালনা করেন প্রভু-পত্নী অর্থাৎ নারী-মনিব। বঙ্কিমচন্দ্র এই দাসীদের জাতি-বর্ণের উল্লেখ খুব স্পষ্টভাবে না করলেও কোথাও তাঁদের দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের মহিলা বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য ক্ষেত্রে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, অধিকাংশ দাসীই খুব নিচু জাতের নন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বলা হয়েছে নগেন্দ্রের গৃহে বিশেষ চেষ্টায় একটু ভদ্রঘরের মেয়েদের দাসীরূপে নিয়োগ করা হত। অনেকেই হতেন কায়স্থ-কন্যা।

দাসী নন কিন্তু নিজস্ব শ্রমে কিছুটা উপার্জন করবার চেষ্টা আছে—এমন তিনজন মেয়েকে আমরা আলোচনার বৃত্ত থেকে সরিয়ে রেখেছি। 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) উপন্যাসের প্রফুল্ল ও তার প্রৌঢ়া জননী সুতো কেটে পৈতে তৈরি করে বিক্রি করতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন—নিজেরা বাজারে গিয়ে সে পৈতে বিক্রি করতেন না। বিক্রি করত দোকানি। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে অর্থ উপার্জন সম্পর্কে সামাজিক নিষেধজনিত বাধা নারীকে মানতে হত।

'রাধারাণী' (১৮৭৭) উপন্যাসে বালিকা রাধারাণী ফুলের মালা গেঁথে বিক্রি করেছে কিন্তু সে নিতান্তই বালিকা। তার মা সে-কাজ করেননি। আর একটি মেয়ে রজনী। সে-ও কারও দাসী নয়। তাদের পারিবারিক ফুলের ব্যবসায়ে সে তার শ্রম লগ্নি করে। বিশেষত সে অন্ধ, তার বিবাহ হয়নি। এই কাজেই সে আত্মনিয়োগ করেছে। এই মেয়েরা দাসীবৃত্তি কখনও করেননি। গৃহের বাইরে গিয়ে উপার্জনের প্রয়াসও তাঁদের ক্ষেত্রে খুবই অনিয়মিত ও ধর্তব্য নয়।

অতঃপর আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে পরিচারিকাদের একটি তালিকা পেশ করছি। আমাদের আলোচনায় সকলকেই অবশ্য সমানভাবে গ্রহণ করবার প্রয়োজন হবে না। কেবল 'দাসী' বলেই উল্লিখিত কিন্তু চরিত্রটির ব্যক্তিগত কোনও রূপরেখা নেই—তেমন চরিত্রগুলিকে ধরা হয়নি।

১। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)	— ● আশমানি	—বীরেন্দ্র সিংহের পরিবারভুক্ত দাসী। সে বিমলার সঙ্গে এসেছিল।
	● বিমলা	—পরিচারিকার বেশে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বীরেন্দ্র সিংহের পত্নী। কারণ প্রকাশ্যে বীরেন্দ্র সিংহ তাঁকে স্ত্রী বলে স্বীকৃতি দিতে পারেন না।
২। কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)	— ● পেষমন	—লুৎফউন্নিসা ওরফে মতিবিবির ব্যক্তিগত পরিচারিকা।
৩। মৃণালিনী (১৮৬৯)	— ● গিরিজায়া	—স্বাধীনভাবে বিচরণকারিণী তরুণী বৈষ্ণবী। সে স্বেচ্ছায় মৃণালিনীর পরিচারিকার পদ গ্রহণ করেছে। তাকে সেবা করে। ভালবাসে। কিন্তু তাকে ঠিক দাসী বলা যায় না।
৪। বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)	— ● হীরা	—জমিদার নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরের প্রধান দাসী। কায়স্থ-কন্যা, শ্যামবর্ণা, সুন্দরী। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে অসন্তুষ্ট।
৫। ইন্দিরা (১৮৭৩)	● হারাণী	—কলকাতায় রামরাম দত্তের গৃহের দাসী। বাচিকা ব্রাহ্মণী
৬। যুগলাঙ্গরীয় (১৮৭৪)	—	×
৭। চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)	● কুলসাম্	—দলনী বেগমের দাসী।
৮। রাধারাণী (১৮৭৭)	● চিত্রা	—রাধারাণী যখন বিত্তশালিনী তখন তাঁর দাসী।
৯। রজনী (১৮৭৭)	—	×
১০। কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)	—	দাসী (বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই)।
১১। রাজসিংহ (১৮৮২)	● দেবী	—ঔরঙ্গজেবের পত্নী যোধপুরী বেগমের পরিচারিকা।
১২। আনন্দমঠ (১৮৮২)	—	পাচিকা ব্রাহ্মণী।
১৩। দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪)	● গোবরার মা	—(বনের মধ্যে প্রফুল্লর দাসী) নিশি এবং দিবা ভবানীঠাকুর-প্রেরিত প্রফুল্লর দুই সহচরী এবং শিক্ষায়িত্রী; দাসী নয়।
১৪। সীতারাম (১৮৮৭)	● মুরলা	—সীতারামের অন্তঃপুরের দাসী

এই তালিকার সকলকেই আমরা আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসব না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দাসীর ভূমিকা আজ্ঞা পালন করা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

প্রথমেই লক্ষণীয়—উল্লিখিত পরিচারিকা শ্রেণির নারীদের প্রায় কারওরই কোনও স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। জানা যায় না তাদের দেশ কোথায়, পিতার নাম কী, পরিবার পরিজনের মধ্যে কে কে আছেন। জানা যায় না, নিজেদের জীবন নিয়ে তাদের নিজেদের ভাবনা কী। উপন্যাসে অধিকাংশ সময় সেই পরিচয় জানবার কোনও প্রয়োজন হয় না। কারণ সেই পরিচারিকার নিজস্ব কোনও স্থান উপন্যাসটিতে থাকে না। উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং প্রতিপাদ্য বিষয় হয় অন্য কিছু।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে লুৎফউন্নিসা বা মতিবিবির দাসী পেষমনের কাজ কেবল মতিবিবির পাশে পাশে থাকা। পেষমন-এর সঙ্গে বাক্যালাপ সূত্রেই মতিবিবির মনের কথা এবং নবকুমারের সম্পর্কে মতিবিবির মনের নতুন ভাবতরঙ্গ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়।

নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে স্বগ্রামে ফিরছিলেন তখন চটিতে দীর্ঘকাল পরে লুৎফউন্নিসায় রূপান্তরিত, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি চিনতে পারেননি, কিন্তু লুৎফউন্নিসা চিনতে পেরেছিলেন। ঠিক সেই সময় জাহাঙ্গিরের জীবনে মেহেরউন্নিসার দ্বিতীয়বার উদিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মতিবিবি বাদশাহের অন্তঃপুর থেকে সসম্মানে বিদায় গ্রহণ করবার উপায় খুঁজছিলেন। সেই সময় নবকুমারের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁর অপ্রাপ্তপ্রেম হৃদয়ে নবকুমার সম্পর্কে বাসনার সঞ্চার হল। উপন্যাসের পক্ষে

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটি পেষমন-এর সঙ্গে কথোপকথনেই উদঘাটিত হয়। পেষমনকেই মতিবিবি জানান যে, মেহেরউন্নিসা যদি জাহাঙ্গিরকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হন তাহলে মতিবিবির স্থান আর বাদশাহের অন্তঃপুরে হবে না। এই সময়ে এই কূট মনোগ্রন্থি কেবল পেষমনকেই এক ঝলক দেখিয়েছেন মতিবিবি—'কোনো নূতন ভাব উদয় হইতেছে'।

পেষমন-এর ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে আমরা কেবল জানতে পারি যে, কপালকুণ্ডলাকে মতিবিবি যে নিজের গহনা পরিয়ে দিয়েছিলেন তাতে সে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। —'নবকুমারের প্রতি পেষমনের বিশেষ বিরাগ জন্মিয়াছিল। যে অলংকারগুলি মতি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিল, তৎ প্রতি পেষমনের বিশেষ লোভ ছিল, মনে মনে ভরসা ছিল, একদিন চাহিয়া লইবেন। সেই আশা নির্মূল হইয়াছিল, সুতরাং কপালকুণ্ডলা এবং তাঁহার স্বামী, উভয়ের প্রতি তাহার দারুণ বিরক্তি।' —এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্র পেষমন-এর অলঙ্কারের প্রতি আকর্ষণজনিত স্বভাবটিকেই তুলে ধরেছেন—আর কিছু নয়।

তবে পেষমন-এর প্রতি তুচ্ছ অবজ্ঞার মনোভাব অথবা স্বাভাবিক সম্মানের মনোভাব কোনটি বজায় রাখবেন সে বিষয়ে বঙ্কিমের কিছু দ্বিধার পরিচয় পাই এই অংশের ভাষার ব্যবহারে। বঙ্কিম একবার লিখেছেন—'পেষমন কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল'; তিন ছত্র পরেই কিন্তু সর্বনামে এবং ক্রিয়াপদে এসেছে সম্মান-চিহ্ন। পেষমন সম্পর্কে তিনি 'তাহার' নয় 'তাঁহার' ব্যবহার করেছেন। লিখেছেন '(পেষমন) অতএব স্বামিনীর প্রশ্নে উত্তর করিলেন,...'। এর কারণ কী। মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভাষাশিল্পের দ্বারা রূপাবয়ব সৃষ্টিতে পারঙ্গম বঙ্কিমচন্দ্রের দুই সত্তার সহাবস্থানই এর কারণ। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বঙ্কিম দাসী পেষমনকে 'আপনি' বলে উল্লেখ করতে চান না। দীর্ঘ অভ্যাসে তা বেধে যায়। এখনও যেমন, এই একুশ শতকেও মধ্যবিত্ত বাঙালি নরনারী রিকশ-চালক এবং কায়িক শ্রমিক জাতীয় যে-কোনও ব্যক্তিকে 'তুমি' এমনকী 'তুই' সম্বোধন করে থাকেন। কিন্তু দিল্লির বাদশাহের অন্যতম অনুগ্রহ-প্রাপ্ত অন্তঃপুরিকা লুৎফউন্নিসার পরিচারিকা পেষমন। এই পরিচারিকাদেরও সংগ্রহ করা হত মোটের ওপর কিছুটা শিক্ষিত এবং ভদ্র মধ্যবিত্তের পরিবার থেকে। যে-কথা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের হীরা প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। যখন শিল্পী বঙ্কিম মনশ্চক্ষুতে মতিবিবি ও পেষমন-এর এই কথোপকথন দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেছেন তখন পেষমন-এর আচরণ ও সহবৎ যেন চোখের সামনেই দেখেছেন। তখন 'তুমি' বলে আর তাঁকে উল্লেখ করতে পারেননি। হয়ত উল্লেখে সম্মান চিহ্নের এই পার্থক্য তিনি নিজেও খেয়াল করেননি।

পেষমনকে না হলে মতিবিবিকে আমরা চিনতে পারতাম না। পেষমন পরিচারিকা। পরিচারিকারা ধনী-গৃহে পরিষেবা দিতেই আগ্রহী থাকেন। পেষমনও বাদশাহের প্রিয়পাত্রী লুৎফউন্নিসার সেবিকা হতে পেরে খুশি। দারিদ্র তার পছন্দ নয়। নবকুমার সুন্দর পুরুষ কী না—মতিবিবির এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে—'দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিত কি?' এই পেষমনকে সামনে রেখেই উচ্চারিত হয়েছে লুৎফউন্নিসার অমোঘ আত্ম-স্বীকৃতি—'এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরা বিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।' —এই কথাটি পেষমনকে উপলক্ষ করে বলা হবে সমস্ত পাঠকের উদ্দেশে। সেজন্য এই বাক্যটি বলা হয়ে যাবার পর উপন্যাসের আখ্যান ভাগ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে পেষমন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের শেষে একটি প্রশ্ন রেখেছেন—'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বসন্তবায়ুবিলিপ্ত বীচীমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?' এই প্রশ্নটি এই উপন্যাসের রোমান্স রসকে বর্ধিত করেছে। কিন্তু পেষমনই বা কোথায় গেল—এই প্রশ্নটি তোলা হয়নি।

অতি বিশ্বস্ত আর এক পরিচারিকার চরিত্র আছে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে। দলনী বেগমের পরিচারিকা কুলসম, যথারীতি তারও কোনও নিজস্ব পরিচয় উপন্যাসে প্রদত্ত হয়নি। সে সর্বদাই দলনীর সহচারিণী এবং প্রথমে তাকে দলনীর বিশেষ অনুগত দেখতে পাই। এখানে দলনীর পরিচয় একটু না দিলে কুলসমকেও ঠিক বোঝা যাবে না। তরুণী দলনী জাতিতে আর্মেনীয়। ঘটনাচক্রে সে নবাব মীরকাশিমের পত্নী। মীরকাশিমকে সে প্রাণাধিক ভালবাসে; মীরকাশিমও ভালবাসে তাকে। দলনীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরগণ খাঁ মীরকাশিমের সুদক্ষ সেনানায়ক। ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে, কি হবে না—এমত প্রশ্ন গুরগণ খাঁকে গোপন পত্র পাঠাতে চায় দলনী। যদিও তার মত সপ্তদশী তরুণীর এ ব্যাপারে মাথা ঘামানো সংগত ছিল না; কিন্তু মীরকাশিমের যাতে বিপদ না হয় তার জন্য সে অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছে। সেসব কাজ কিছুটা অবিবেচনাপ্রসূত বালিকা-বুদ্ধির সিদ্ধান্তও বটে। রাত্রে নবাবের প্রাসাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু কুলসম দলনীর চিঠি নিয়ে গুরগণ খাঁ-র কাছে চলে গেছে দলনীর অনুরোধে। সে অতীব বুদ্ধিমতী এবং তার বুদ্ধির অহঙ্কারও যথেষ্ট। কেউ টের পাবে না একথা বলতে গিয়ে সে সগর্বে বলেছে—'এত আতর গোলাব সোনা রূপা চুরি করিলাম, কই কেহত টের পেল না! আমার মনে বোধহয়, পুরুষ মানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভার্থ—তাহাতে দেখিতে পায় না। কই, পুরুষে মেয়েমানুষের চাতুরি কখনও টের পাইল, এমত ত দেখিলাম না।'

আমরা দেখি দাসী শ্রেণির নারীদের মধ্যে এই বুদ্ধি, সাহস এবং তৎপরতা বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সর্বত্রই দেখিয়েছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের আশমানি 'মৃণালিনী'র গিরিজায়া, 'চন্দ্রশেখর'-এ কুলসম, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হীরা— সকলেরই এই গুণগুলি আছে।

ভৃত্যশ্রেণির ব্যক্তিবর্গ তাদের কর্মদাতা পরিবারের প্রতি একান্ত অনুগত হবে—এটি ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের একটি প্রিয় আকাঙ্ক্ষা, তাদের নিজস্ব পরিচয় অবলুপ্ত করে দিয়ে প্রভু পরিবারের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করে দেবে তারা—এরকম ভাবতে উচ্চবর্গীয়রা খুবই ভালবাসেন। এই ট্র্যাডিশন সারা বিশ্বের সাহিত্যে, নাটকে, চলচ্চিত্রে সেই আদি মহাকাব্যের যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় একইরকমভাবে চলে এসেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই কর্মদাতা পরিবারের মানুষজনেরা ভৃত্যশ্রেণির মানুষদের ঠিক বিশ্বাস করেন না। বাড়িতে কোনও কিছু হারালে প্রথমেই সন্দেহ করা হয় কাজের লোকেদের।

কুলসম অনায়াসেই গুরগণ খাঁকে চিঠি পৌঁছে দিয়েছে; তারপর দলনীর সঙ্গে গুরগণ খাঁ-এর কাছে গেছে। ফেরবার সময় গুরগণ খাঁ-র আদেশে তাদের প্রাসাদ-প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তখন চন্দ্রশেখর ঘটনাচক্রে সেই পথে যাবার সময় তাদের স্বগৃহে এনে আশ্রয় দিয়েছেন। কুলসম দলনীর সঙ্গেই আছে। তারপর ফস্টর-এর লোকেরা সেই বাড়িতে হানা দিয়ে শৈবলিনী ভ্রমে দলনী এবং কুলসমকে নিয়ে জলপথে যাত্রা করেছে অন্যত্র।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র দাসী কুলসমকে একটি নিজস্ব চরিত্র দিয়েছেন। যখন ইংরাজের নৌকোয় দলনী এবং কুলসম প্রায় বন্দিনী তখন ফস্টর তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। কারণ নবাবের লোকেরা দলনীর জন্য তার নৌকো আক্রমণ করতে পারে—এমন ভয় তার আছে। দলনী ইংরাজের নৌকোয় বন্দিনী থাকতে চায় না। সে তীরে নেমে যেতে প্রস্তুত। ফস্টরও সানন্দে সম্মত। কিন্তু কুলসম কিছুতেই নামতে রাজি হল না। কুলসমের যুক্তি কিন্তু অকাট্য—'ইংরেজ ছাড়িলে আমরা আবার নবাবের হাতে পড়িব। নবাব তোমাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমায় ক্ষমা করিবেন না, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারি। আমার এমন মন হয় যে, যদি কোথায় আশ্রয় পাই, তবে আর নবাবের হুজুরে হাজির হইব না।'

কুলসম দলনী নয়। দলনীর মতো মীরকাশিমের প্রতি প্রেমও তার নেই। আভিজাত্যের অহঙ্কারও তার নেই। ইংরাজের হাতে বন্দিনী থাকার গ্লানির চেয়ে নবাবের কাছে গিয়ে মৃত্যুও দলনীর কাছে শ্রেয়। এ ধরনের কোনও ভাবাবেগ কুলসমের নেই, থাকার কথাও নয়। সে স্পষ্টই বলেছে—'জগদীশ্বর করুন, ইংরেজ আমাদের না ছাড়ে।' আজকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুলসমকে দোষ দিতে আমরা পারি না। পরিচারিকা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই বিত্তবানের গৃহে কাজ করতে যায়। নিজের প্রাণ বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য, যেমন আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য। প্রেম অথবা আত্মাভিমানের জন্য জীবন বাজি রাখবে, সেরকম কোনও প্রেম বা আত্মাভিমান কুলসমের জীবনে ও চরিত্রে নেই। তাহলে কেন সে দলনীর প্রায় নির্বোধের মতো সিদ্ধান্তের শরিক হবে। এত আনুগত্যের প্রত্যাশা আজ আর আমরা করি না। কুলসম স্পষ্টই বলেছে,—'আমি নামিব না। আমি নবাবের হাতে পড়িলে, আমার কপালে কি আছে বলিতে পারি না। আমি সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় যাইব—সেখানে আমার জানাশোনা লোক আছে।'

কিন্তু উপন্যাসের প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র কুলসমের মধ্যে অভাবনীয় সাহস এবং তেজস্বিতার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। পরবর্তীকালে তার মনে ন্যায়বোধ জাগ্রত হয়েছে; প্রাণভয় অন্তর্হিত হয়েছে। যখন সে জেনেছে বিভ্রান্ত মীরকাশিমের আদেশ অনুসারে দলনী বিষপানে আত্মহত্যা করেছে, তখন সে ওয়ারেন হেস্টিংসকে ধরে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে মীরকাশিমের সামনে। নির্ভীকভাবে সমস্ত সত্য সে উদঘাটন করেছে এবং উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে—'মীরকাশিম নামক এক মূর্খ নবাব আছে।' অতঃপর উপন্যাসের শেষ গ্রন্থিটিও খুলে গেছে তারই সাহায্যে। লরেন্স ফস্টরকে শনাক্তও করেছে সে। এই অদ্ভুতকর্মা এবং অকল্পনীয় সাহসিকা কুলসম অতঃপর অদৃশ্য হয়ে গেছে এই উপন্যাস থেকে। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, উপন্যাসের আখ্যানভাগকে জমিয়ে তোলবার জন্য কুলসমকে আনা হয়েছে। প্রথম অংশে কুলসম পরিস্ফুট করেছে দলনীর চরিত্রকে; দ্বিতীয় অংশে কুলসম প্রায় শূন্য থেকে উত্থিত হয়ে উপন্যাসের আখ্যানভাগের শিথিল সূত্রগুলিকে নিপুণ হাতে বিন্যস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু পেষমনের মতোই তার সম্পর্কে পাঠকের প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। তারপর কুলসম কোথায় গেল! উপন্যাসে তার নিজের জায়গাটা কোথায়!

এমনই আর একটি বায়বীয় তেজস্বিনী কন্যা আছে 'মৃণালিনী' উপন্যাসে। বৈষ্ণবী ভিখারিণী গিরিজায়া। সে নিজেই নিজেকে মৃণালিনীর সহচরীর পদে নিযুক্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে হেমচন্দ্রের চর। মৃণালিনীর সংবাদ সন্ধানে তাকে নিযুক্ত করেছেন হেমচন্দ্র। চরিত্রটি চমৎকার। এবং চরিত্রটি অবাস্তব। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের আখ্যানভাগে মৃণালিনীর অংশটুকু যাতে একটু সম্ভাব্য দেখায় সেজন্যই

তাকে নিজের শিল্পী-মনের ফরমাস-অনুযায়ী বানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সম্ভাব্য হলেও সে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। ষোলো বছর বয়সের কৃষ্ণাঙ্গী সুন্দরী অকুতোভয়ে যত্রতত্র বিচরণ করে; প্রয়োজন হলে দুশ্চরিত্র বামুনের ছেলেকে কামড়েও দেয়; হেমচন্দ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তর্ক করে, আবার হেমচন্দ্রের অনুচর-ভৃত্য দিগ্বিজয়ের সঙ্গে রসিকতাও করে। কেউ কোথাও তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। যেখানে মৃণালিনীর বিপদ সেখানেই সে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়; মৃণালিনী আশ্রয়চ্যুত হলে নিজের 'পাতার কুঁড়ে'য় তাকে নিয়ে যায়; তাকে সঙ্গে নিয়ে হেমচন্দ্রের অবস্থান যেখানে— সেই নবদ্বীপে চলে যায়। বস্তুত মৃণালিনীর সব সমস্যার সমাধান সে-ই করে। তাকে দাসী বা পরিচারিকা ভাবা চলে না। বাংলার গ্রামে গ্রামে আঠারো-উনিশ শতকে মুক্ত বৈষ্ণব সমাজে এ জাতীয় বৈষ্ণবী মাঝে মাঝে দেখা যেত। ভিক্ষা নিয়ে বেড়াত তারা; গ্রামের অন্তঃপুরিকাদের শোনাত বাইরের জগতের খবর। তাদের কেউ কেউ কিছু লেখাপড়াও জানত। অনেক সময়ে সমাজ-শাসন-বহির্ভূত প্রণয়-সম্পর্কের দূতী রূপেও কাজ করত তারা। শৃঙ্খল পরানো বাঙালি মেয়েদের সমাজে তারাই ছিল অনেকখানি মুক্ত-পক্ষ। বাক্যে ও বিচরণে ছিল স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন। পুরুষদের সঙ্গে তারা সহজে বাক্যালাপ করতে পারত। পুরুষ-সংসর্গ বিষয়ে তাদের সামাজিক অনুশাসন ও মনের বাধা—দুই-ই অনেক কম ছিল, কিন্তু তারা বারাঙ্গনা ছিল না কখনই। পদাবলি-গায়িকা এই মেয়েরা সমাজে এক ধরনের সম্মানও পেত। গিরিজায়ার চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সবই আরোপিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের আদর্শ 'ভাল'টুকু ছেঁকে নেবার ফলে চরিত্রটি হারিয়েছে বাস্তবতা। কথাসাহিত্যে বৈষ্ণবীদের এই ভূমিকা আমরা পরেও দেখেছি—শরৎচন্দ্রের কমললতায়, তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে। তারাশঙ্কর অনেকটা বাস্তবতা দিতে পেরেছেন এ-জাতীয় চরিত্রগুলিকে।

দাসী চরিত্র বেশ বিস্তৃত ভূমিকা লাভ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে। উপন্যাসটিতে নারী ভূমিকা চারটি। তার মধ্যে তিলোত্তমা এবং আয়েষা— দু'জনেই দুর্গাধিপ কন্যা—দুর্গেশনন্দিনী। বাকি দু'জনকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে আকার দিতে শুরু করেছিলেন পরিচারিকা বলেই। তিলোত্তমার পিতা বীরেন্দ্র সিংহ তাঁর পিতার সঙ্গে মনোমালিন্যবশত গৃহত্যাগ করেছিলেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে দেশে ফিরলেন। 'বীরেন্দ্রের সহিত দিল্লি হইতে অনেকানেক সহচর আসিয়াছিল। তন্মধ্যে জনৈকা পরিচারিকা আর এক পরমহংস ছিলেন। এই আখ্যায়িকায় এই দুইজনের পরিচয় আবশ্যক হইবেক। পরিচারিকার নাম বিমলা, পরমহংসের নাম অভিরাম স্বামী।' অতঃপর বঙ্কিম বিমলার রূপ ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনা কীভাবে দিয়েছেন তা দেখি—'বিমলা গৃহমধ্যে গৃহকর্মে বিশেষতঃ বীরেন্দ্রের কন্যার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন, তদ্ব্যতীত দুর্গমধ্যে বিমলার অবস্থিতি করার অন্য কারণ লক্ষিত হইত না, সুতরাং তাঁহাকে দাসী বলিতে বাধ্য হইয়াছি; কিন্তু বিমলাতে দাসীর লক্ষণ কিছুই ছিল না। গৃহিণী যাদৃশী মান্যা, বিমলা পৌরগণের নিকটে প্রায় তাদৃশী মান্যা ছিলেন; পৌর-জন সকলেই তাঁহার বাধ্য ছিল।' বিমলার বাক্‌পটুতা ছিল কিন্তু সে পটুতা তাঁর চরিত্রকে লঘু করেনি। গাম্ভীর্য ছিল তাঁর অন্যতম আচরণ-বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য সমাজের ধনী গৃহে বা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহেও আঠারো-উনিশ শতকে, এবং বিশ শতকেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত 'হাউজকিপার' নামক যে মহিলা-প্রধান পদটি ছিল বিমলাকে অনেকটা তারই অনুরূপ বলা যায়। হাউজকিপাররা বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন; কিন্তু ঠিক দাসী বা পরিচারিকা ছিলেন না। বিমলা, আমরা পরে জেনেছি, ছিলেন বীরেন্দ্র সিংহের গোপনে বিবাহিতা পত্নী। তাঁর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র আগাগোড়াই সম্মাননীয়া পুরস্ত্রী সম্পর্কে ব্যবহার্য ভাষার সম্ভ্রম বজায় রেখেছেন। বিমলার প্রসঙ্গ আমরা এখানেই শেষ করছি।

'বিমলা ও অভিরাম স্বামী ভিন্ন আশমানি নাম্নী একজন দাসী বীরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে আসিয়াছিল।' আশমানিই ঠিকঠাক দাসী। পেষমন, কুলসমের মতোই তারও দেশঘর বা পরিবার পরিজনের কোনও উল্লেখ নেই। সে-ও আকাশ থেকে পড়া এক নারী, যার কাজ কেবলই দাসীত্ব।

আশমানি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের প্রয়োজনে ততটা নয়। এই নিবন্ধের যেটি প্রতিপাদ্য বিষয়—উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের চোখে গৃহ-পরিচারিকা নারী—সেই চোখের দৃষ্টিভঙ্গিটি বোঝবার জন্য আশমানিকে প্রয়োজন। এই আশমানিকে বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে বর্ণনা করেছেন তা দেখা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র এই রূপবর্ণনার আগে রঙ্গ-রসিকতাময় একটি ভূমিকার অবতারণা করেছেন উপন্যাসের মধ্যেই। বাগ্‌দেবীকে আবাহন আছে সেই ভূমিকায়। অতি কুশলী শিল্পীর রচিত এই আবাহন-বাণী। বাগ্‌দেবীর দু'টি রূপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন লেখক।

'মা! তোমার দুই রূপ; যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল, যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি উত্তররামচরিত, ভারবি কিরাতার্জুনীয় রচনা করিয়াছিলেন, সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না; যে মূর্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ

নৈষধ লিখিয়াছিলেন, যে প্রকৃতি প্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব রূপবর্ণন করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছিলেন, যাহার প্রসাদে দাশরথি রায়ের জন্ম, যে মূর্তিতে আজও বটতলা আলো করিতেছে, সেই মূর্তিতে একবার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশমানির রূপ বর্ণন করি।' স্পষ্টতই বঙ্কিমচন্দ্র বলে রেখেছেন যে, এই রূপ বর্ণনায় থাকবে কামোদ্দীপক, আদিরসাত্মক প্রলেপ। শ্রীহর্ষের নৈষধ সাধারণ বাঙালির খুব পঠিত না থাকলেও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' যে সর্বদা শালীন রুচিতে নিবদ্ধ থাকেনি তা সকলেরই জানা। কবিগানে ও বটতলার সাহিত্যে নিম্নরুচির জোগান থাকত, তা-ও অজানা নয়। অতঃপর বঙ্কিমের বর্ণনা একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করছি। সুরসিক বঙ্কিমচন্দ্রের রসদৃষ্টির একটা দিক 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ প্রকাশিত। আর একটা দিক এ দাসী-বর্ণনায়। বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনও দোষারোপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্কিম প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র। এই দৃষ্টি ছিল উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের চোখেই। সেকালে এই দৃষ্টিপাতে কেউই কোনও অসঙ্গতি বা দোষ দেখতেন না। বর্ণনাটিতে প্রকৃত সাহিত্যগুণেরও অভাব নেই।

'আশমানির বেণীর শোভা ফণীনির ন্যায়; ফণীনি সেই তাপে মনে ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজনটা কি! আমি গর্তে যাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্তের ভিতর গেলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন প্রমাদ; সাপ গর্তে গেলে মানুষ দংশন করে কে? এই ভাবিয়া তিনি সাপকে ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলেন, সাপ বাহিরে আসিয়া, আবার মুখ দেখাইতে হইল, এই ক্ষোভে মাথা কুটিতে লাগিল, মাথা কুটিতে কুটিতে মাথা চেপ্টা হইয়া গেল, সেই অবধি সাপের ফণা হইয়াছে। আশমানির মুখচন্দ্র অধিক সুন্দর, সুতরাং চন্দ্রদেব উদিত হইতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট নালিশ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, ভয় নাই, তুমি গিয়া উদিত হও, আজি হইতে স্ত্রীলোকদিগের মুখ আবৃত হইবে; সেই অবধি ঘোমটার সৃষ্টি। নয়ন দুটি যেন খঞ্জন, পাছে পাখি ডানা বাহির করিয়া উড়িয়া পলায়, এইজন্য বিধাতা পল্লবরূপ পিঁজরার কবাট করিয়া দিয়াছেন। নাসিকা গরুড়ের নাসার ন্যায় মহাবিশাল; দেখিয়া গরুড় আশঙ্কায় বৃক্ষারোহণ করিল, সেই অবধি পক্ষিকুল বৃক্ষের উপরেই থাকে। কারণান্তরে দাড়িম্ব বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পাটনা অঞ্চলে পলাইয়া রহিলেন; আর হস্তি কুম্ভ লইয়া ব্রহ্মদেশে পলাইলেন; বাকি ছিলেন ধবলগিরি, তিনি দেখিলেন যে, আমার চূড়া কতই বা উচ্চ, আড়াই ক্রোশ বই ত নয়, এ চূড়া অন্যূন তিন ক্রোশ হইবেক; এই ভাবিতে ভাবিতে ধবলগিরির মাথা গরম হইয়া উঠিল, বরফ ঢালিতে লাগিলেন, তিনি সেই অবধি মাথায় বরফ দিয়া বসিয়া আছেন।'

বর্ণনাটির রসরঙ্গ মসৃণ পালিশের উজ্জ্বলতা এবং কারুকাজের সূক্ষ্মতা মুগ্ধ করে দেয়। বিশেষ করে নারী-রূপের সঙ্গে জগৎ সৃষ্টির ও সভ্যতার যাত্রাপথের উপাদান সম্মিলিত করে বঙ্কিম বর্ণনাটিকে এক ধরনের মিথিক্যাল কোঅলিটি—আদি-পুরাণ অনুষঙ্গ দান করেছেন—তা খুবই মনোজ্ঞ। সাপের মাথা চ্যাপ্টা ও তার ফণা কেন, পাখি বৃক্ষচূড়ায় বাস করে কেন, নারীর মুখাবরণ কেন—সবই আশমানির রূপের কারণে। তবু বর্ণনাটিতে আদিরসের লেপনও স্পষ্টই। দাড়িম্ব, পর্বতচূড়া, হস্তীকুম্ভের উপমায় স্তন ও নিতম্বের চিত্রণ রয়েছে, যদিও শব্দ দুটির উচ্চারণ নেই। শালীনতার সীমা অতিক্রম করেনি এই বর্ণনা। কিন্তু প্রশ্নটি এই—নারী-অঙ্গকে যেভাবে এখানে পাঠকের দৃষ্টির বলয়ে পৃথকভাবে ফোকাস করেছেন বঙ্কিম—তা কি তিনি করেছেন বিমলা, আয়েষা, তিলোত্তমার ক্ষেত্রে? অভিজাত-বংশীয়া গৃহবধূ ও কুমারীকন্যাকে এই দৃষ্টি-সম্পাতের লক্ষ্যবিন্দুতে তিনি কখনও আনেননি। তাদের শরীর নিয়ে কেউ সপরিহাস আদিরসের ইঙ্গিতমাত্রও দেবে না; কিন্তু আশমানির ক্ষেত্রে তা দেবে। সে গৃহবধূ বা ঘরের মেয়ে নয়—সে দাসী। বঙ্কিম জানিয়েছেন—আশমানি বিধবা। কিন্তু সে সধবা, বিধবা না কুমারী—তা এখানে ধর্তব্য নয়। সে দাসী—গতর খাটিয়ে খায়। পয়সার বিনিময়ে শরীর সঞ্চালিত করে। তার দেহ খানিকটা হলেও, ঘুরিয়ে ও পরোক্ষভাবে হলেও সর্বজনভোগ্য হতে পারে; অন্তত হবার সম্ভাবনা থাকে। তার প্রতি আদিরসাত্মক ইঙ্গিত যেন দোষের নয়। সমাজ-প্রোথিত এই প্রক্রিয়ার দীর্ঘ পরম্পরা থেকেই এই দৃষ্টিকোণ জন্ম নিয়েছে। এই সমাজ পুরুষ দ্বারা শাসিত।

ভারত-ভূখণ্ডে আর্যরা এসে অন্-আর্য আদি অধিবাসীদের কোণঠাসা করে দেবার পর সমাজ ধীরে ধীরে চার বর্ণে ভাগ হয়ে গেল। সর্বনিম্ন স্তরে রইল শূদ্র সম্প্রদায়। তারা সকলেই কায়িক শ্রমিক। দাস-দাসীরা সাধারণত শূদ্র বর্ণেরই হতেন। যদিও সর্বদাই তেমন হত না। যুদ্ধবন্দি হয়ে দাসদাসীর কাজ করতেন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নরনারী। দেবতাদের পরাস্ত করবার পর বৃত্রাসুরের পত্নী ঐন্দ্রিলা দেবরাজ-পত্নী শচীকে দাসী করবার জন্য অধীর হয়েছিলেন। এমন লিখেছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বৃত্রসংহার কাব্য'-তে। অভিশাপ বা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চবর্ণের মানুষেরা সাময়িকভাবে হলেও দাস-দাসীর কাজ করেছেন। এমনকী ব্রাহ্মণরাও অপর ব্রাহ্মণের গৃহে দাসত্বে নিযুক্ত হতে

পারতেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা। ঋণশোধ করতে না পেরে যে-কোনও বর্ণের মানুষ ঋণদাতার গৃহে দাসত্ব করে ঋণশোধ করতেন। দারিদ্র্যবশত দাসত্ব স্বীকার করতেন যে-কোনও বর্ণের মানুষ। পাচক ও পাচিকা ব্রাহ্মণদের দৃষ্টান্ত তার প্রমাণ। তবে ধনীগৃহে, রাজপ্রাসাদে অগণিত দাসদাসীর অধিকাংশই ছিলেন শূদ্রবর্ণের জাতক।

দাস এবং দাসীদের ক্ষেত্রে প্রধান পার্থক্যের মানদণ্ডটি ছিল শরীরকেন্দ্রিক। সমাজ-স্বীকৃত ধারণা ছিল এই, যে-নারী স্ব-গৃহের অন্তঃপুরের বাইরে অপর কোনও গৃহে গিয়ে দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে সেই নারীর দেহ সেই পরিবারের পুরুষদের ভোগ্য হতে কোনও বাধা নেই। ধরেই নেওয়া হত যে, সেই নারীর চরিত্র স্খলিত। দাসীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সেখানে কোনও প্রশ্নই উঠত না। এই ব্যবস্থায় দাসীরাও অভ্যস্ত ছিলেন। অনেক সময়েই অর্থ বা অন্য কোনও সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে বা প্রত্যাশায়, বা অনেক ক্ষেত্রে কামনায় ও ভালবাসায় স্বেচ্ছায় তাঁরা দেহদান করতেন। পুরাণে, মহাকাব্যে এবং বাইব্‌লে এ ধরনের বহু আখ্যান আছে। বিরাট রাজার গৃহে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে থাকার সময়ে সৈরিন্ধ্রীবেশিনী দ্রৌপদীর প্রতি কামলুব্ধ হয়েছিল রানি সুদেষ্ণার ভাই কীচক। এই লোভের কথা রানিকে বলতে সে দ্বিধা করেনি। রানি পরিচারিকারূপিণী দ্রৌপদীকে জোর করেননি। কিন্তু ভাইয়ের ব্যবহারে কোনও অস্বাভাবিকতাও দেখেননি।

প্রভু, প্রভু-পুত্র বা পরিবারস্থিত অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমের ফলে সন্তানের জন্ম হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। মনে হয়, কন্যা-সন্তান হলে তাকে মেরে ফেলা হত, বা ফেলে দেওয়া হত। কারণ এই ধরনের কন্যা জাতকের উল্লেখ আমরা প্রাচীন সাহিত্যে পাই না। একটিমাত্র অনুমানের জায়গা আছে সীতাকে ঘিরে। রাজা জনক জমি চাষ করতে গিয়ে সীতাকে পেলেন! রাজা হঠাৎ নিজের হাতে জমিতে লাঙল চালাতে যাবেন কেন! পুরাণের অন্য কোনও রাজাকে একাজ করতে দেখা যায়নি। মনে হয় জমি ও লাঙল—দুই-এরই ব্যঞ্জনা ভিন্ন। মনে হয় সীতা 'ক্ষেত্রজ কন্যা'—এই অভিব্যক্তিরই ব্যাখ্যা ওইভাবে করা হয়েছে। রাজার নামটিও আর কিছু নয়, কেবলই জনক।

পুত্র সন্তান সমাজে এতই সমাদৃত ছিল যে, পুত্রদের মেরে ফেলার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের লালন-পালন করা হত ও শিক্ষিত করে তোলা হত। পরিবারে তাদের অমর্যাদা হত না, যদিও রাজপুত্রদের মতো পূর্ণ অধিকার পেত না তারা। অতঃপর নিজেদের ক্ষমতাবলে ও ব্যক্তিত্বের জোরে তারা রাজ-দরবারে উপযুক্ত পদ প্রাপ্ত হতে পারত। মহাভারতের বিদুর এই প্রক্রিয়ার উদাহরণ। বংশ-রক্ষার প্রয়োজনে যখন রাজপুত্রবধূকে ভিন্ন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হবার নির্দেশ দেওয়া হল তখন ভীষ্ম ও সত্যবতীর ব্যবস্থায় সেই পুরুষ রূপে আমন্ত্রিত হলেন ব্যাসদেব। কারণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সত্যবতীরই কানীন পুত্র। আর সম্পর্কে স্বামীর ভাইদেরই নারীর গর্ভাধানের জন্য নিয়োগ করবার বিধি ছিল স্বীকৃত। ব্যাসদেবের অ-সুন্দর রূপ আর বনবাসজনিত অপরিচ্ছন্নতায় বিমুখ-চিত্ত বধূর গর্ভে অনিচ্ছা মিলন-জাত অন্ধ ও রোগগ্রস্ত পুত্র জন্ম নিলে তৃতীয়বারও যখন ডাকা হল ব্যাসদেবকে তখন রাজবধূ নিজে না গিয়ে গোপনে রাত্রে শয্যায় পাঠিয়ে দিলেন শূদ্রা দাসীকে। সেই দাসীর নাম প্রদত্ত নেই মহাভারতে। তার প্রসঙ্গই নেই আর। বুদ্ধদেব বসু তাকেই কেন্দ্র করে লিখেছেন তাঁর কাব্যনাট্য 'অনাম্নী অঙ্গনা'। বুদ্ধদেবের নাটকে সেই দাসী সহজ সম্মতিতেই গ্রহণ করেছিল সেই রহস্যময় বিরাট পুরুষকে, কোনও বীতরাগ অনুভব করেনি। সেই মিলনের জাতক বিদুর। মহাভারতে সকলের কাছে শ্রদ্ধেয়, অতি সুশিক্ষিত, অতীব বিচক্ষণ, ধর্মপরায়ণ, মহামতি বিদুর—কেবল শূদ্রা জননীর গর্ভজাত বলেই কৌরব সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতে পারলেন না।

বাইব্‌লে এই ধরনের একটি উপাখ্যান আছে। গোষ্ঠী নেতার প্রধানা পত্নী সন্তান ধারণে অক্ষম। রাজা ক্রমশ প্রাধান্য দিচ্ছেন পুত্রবতী অপর পত্নীকে। তখন প্রধানা পত্নী নিজের ব্যক্তিগত দাসীর সঙ্গে রাজার মিলনের ব্যবস্থা করলেন। শর্ত রইল—মিলনের ফলে পুত্র জন্ম নিলে সেই পুত্র রানিরই সন্তান বলে গণ্য হবে। পরিবারের ও গোষ্ঠীর সকলের সম্মতিক্রমেই ব্যবস্থাটি কার্যকর করা হল। স্পষ্টই বোঝা যায়, পরিবার-প্রভু পুরুষ গৃহ-পরিচারিকার দেহ ভোগের অধিকারী হবেন—এই বিধি দীর্ঘকাল ধরে সমাজে গৃহীত ছিল বিশ্বের সর্বত্র।

দীর্ঘকাল অর্থে প্রকৃতই দীর্ঘকাল। ভারতে মধ্যযুগের প্রতিটি রাজপরিবারে, মোগল হারেম-এ এই ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের কোনও প্রভেদ ছিল না। বহু সন্তান জন্ম নিত যাদের পিতা রাজা, কিন্তু জননী রানি নন। সেইভাবে জন্মেছে এমন মেয়েদের খবর আমরা পাই না। কিন্তু যথাযথ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েই বড় করা হত ছেলেদের। তারা বৈধ রাজপুত্রদের সমান মর্যাদা না পেলেও যথেষ্ট মাসোহারা পেত। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রাজ-দরবারে বিভিন্ন দায়িত্বও পেত তারা। অথবা থাকতে পারত নিজেদের ইচ্ছামতো। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সেই সময়' উপন্যাসে

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তঃপুরে ও শাসনব্যবস্থায় এই প্রচল রীতির ফলে উদ্ভূত পরিণামসমূহের চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকাতেও ছিল না কোনও ব্যতিক্রম। ঔপনিবেশিক, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গ দাসীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তানদের নিয়ে স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়ই গড়ে উঠেছিল যাদের বাদামি রঙে এবং চুলে, চোখে, মুখাকৃতিতে শ্বেতাঙ্গ জাতিগোষ্ঠীগত শরীর লক্ষণ থাকত কিছু কিছু। তার ফলে তারা অনেকে শাসক শ্রেণির কাছে প্রিয়পাত্রও হত। তারা নিজেরাও একটু অহঙ্কার করত এইসব নিয়ে। উনিশ শতকে ভারত, সমগ্র এশিয়া এবং ইউরোপ-আমেরিকায় সর্বত্রই তথাকথিত অভিজাত-গৃহে পরিচারিকার গর্ভে জাত সন্তানের প্রচুর দৃষ্টান্ত ছিল। পার্থক্যের মধ্যে ভারতে আপাতভাবে ব্যাপারটি গোপন রাখার চেষ্টা করা হত; পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বিবাহসম্পর্ক বহির্ভূত ও পরিচারিকা গর্ভে জাত সন্তান নিজের পরিচয়সহই সমাজ-স্বীকৃতি পেত। সম্ভব হলে অনেক সময়ে সেই পরিচারিকাকে বিবাহও করতেন গৃহস্বামী। অনেক সময়ে সন্তান 'অবৈধ' বা 'ইললেজিটিমেট'-এর তকমাই বহন করত এবং তা নিয়ে কেউই খুব বেশি বিচলিত হত না। বহু সম্মানিত এবং প্রতিভাবান, প্রতিষ্ঠিত এবং স্মরণযোগ্য ব্যক্তির অবৈধ সন্তান ছিল। সেই সন্তানেরাও কেউ কেউ পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ভারতেও উদাহরণের অভাব নেই; কিন্তু তা অনুক্ত রাখাই সকলে ভাল মনে করেন।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল রিচার্ডসন-এর 'পামেলা অর ভার্চ্যু রিওয়ার্ডেড' (১৭৪০) উপন্যাসটির কথা। প্রভু-পুত্র দাসী পামেলার প্রতি আকৃষ্ট এবং তার সঙ্গে দৈহিক মিলন চায়। কিন্তু পামেলা বিবাহ না হলে তাতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত বিবাহ হল, পুরস্কৃত হল পবিত্রতাগুণ। এদেশে অবশ্য এমন উপন্যাস বোধহয় আজও রচিত হওয়া সম্ভব নয়। পরিচারিকার সঙ্গে মিলন তো হতেই পারে, কিন্তু কচিৎ প্রেম সম্ভব হলেও বিবাহ অসম্ভব। একটি চমৎকার ব্যতিক্রম আছে। 'আলিবাবা'-র কাহিনিতে। আলিবাবার পুত্রবধূ হয়েছে পরিচারিকা মর্জিনা। এ-গল্প পশ্চিম এশিয়ার। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র মেসের ঝি সাবিত্রীকে আগাগোড়াই ভিন্ন ধরনের মানবী রূপে উপস্থিত করেছেন। ঠিক আর পাঁচজন দাসীর মতো সে নয়। এবং সে বিধবা। বিবাহের প্রশ্নই নেই। তবু একমাত্র শরৎচন্দ্রই বাংলা উপন্যাসে তাঁর উপন্যাসের নায়িকাকে 'মেসের ঝি' রূপে দেখাবার সাহস করেছিলেন। আজ তাঁকে সাধুবাদ দিতে পারি আমরা। সে-কালে অবশ্য নিন্দাবাদই জুটেছিল তাঁর। 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পাণ্ডুলিপি।

আমরা ফিরে যাই মূল প্রসঙ্গে। উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোক (এবং ভদ্রমহিলা)-দের চোখে গৃহ-পরিচারিকার স্থান কীরকম ছিল। আমাদের সিদ্ধান্তটি এই যে, দাসী স্থানীয়া নারীদের বুদ্ধি, প্রভু-আনুগত্য, কর্তব্যবোধ এবং মহত্ত্বও স্বীকৃত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। কিন্তু মনের মধ্যে থেকে গেছে দুর্মর সংস্কার এই যে, দাসী শ্রেণির মেয়েদের ক্ষেত্রে শারীরিক শুচিতা বজায় রাখার বিষয়টি নিষ্প্রয়োজন। আশমানিকে যদি আবার মনে করি তাহলে দেখব—বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গের আর এক আশ্রিত—এক নির্বোধ ব্রাহ্মণ গজপতির সঙ্গে তার সরস সম্পর্ক ছিল। গজপতি ছিল আশমানির রূপমুগ্ধ; আশমানির দিক থেকে ছিল কেবল মজা। কৌতুক প্রায়ই হয়ে যেত নিষ্ঠুর। গজপতিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার জন্য আশমানি নির্দ্বিধায় তাকে আলিঙ্গন করেছে। কিন্তু দৈহিক শুচিতা সম্পর্কে এই ঔদাসীন্য সত্ত্বেও সে কোনও অর্থেই চরিত্রহীনা নয়। অত্যন্ত ভাল পরিচারিকা রূপে সে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত। ওই উপন্যাসেই দেখেছি, বিমলার প্রতি প্রেমাসক্ত বীরেন্দ্র সিংহ পূর্বজীবনে বিমলার সন্নিধানে এসে ধৃত হয়েছে। কিন্তু মুক্ত হবার শর্ত রূপে বিমলাকে বিবাহ করতে রাজি হয়নি। কারণ বিমলা ব্রাহ্মণকন্যা হলেও শূদ্রা গর্ভজাতা। তাতে প্রেম চলবে, দেহমিলন চলবে, বিবাহ চলবে না। তাতে হিন্দুত্ব নষ্ট হয়। সংক্ষেপে এই হল সমাজবিধি। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিধির অনুগত থেকেই আশমানিকে এঁকেছিলেন। তাঁর বোধহয় মনেও হয়নি—কাজটি সঙ্গত হচ্ছে না। কিংবা তাঁর মনে হয়েছিল কাজটি সঙ্গতই হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধারণাটি তাঁর একার নয়। পুরুষশাসিত বিশ্বসমাজে শত শত বর্ষ ধরে প্রবাহিত হয়ে আসা রীতি-সংস্কারই এই ধারণার মূলে কাজ করেছে।

গৃহ-পরিচারিকা সব সময়ে শূদ্র সম্প্রদায় থেকেই আসতেন এমন নয়। ব্রাহ্মণ পরিচারিকাও ছিলেন। সাধারণত রান্নার কাজ করতেন তাঁরা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে আমরা এমন ইঙ্গিত পাই ব্রাহ্মণ হলেও যে নারীরা গৃহাঙ্গনের বাইরে কর্ম-সম্পাদন করে রোজগার করছেন তাঁদের প্রতি সমাজের একেবারেই নেই কোনও সম্ভ্রমসূচক মনোভঙ্গি। এমন দু'টি চরিত্র আছে বঙ্কিমের উপন্যাসে। একজন 'ইন্দিরা' উপন্যাসে, অপরজন 'আনন্দমঠ'-এ।

'ইন্দিরা' উপন্যাসে ডাকাতের আক্রমণের পর নিরাশ্রয় কুমুদিনী (ইন্দিরার অপর নাম) সুভাষিণীর সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। সেখানে সে রান্নার কাজ পাবে এবং পাবে আশ্রয়। সুভাষিণীর শাশুড়ি তাকে প্রথম যে কয়েকটি কথা বলেছেন তার একটি বাক্য হল—'আমি সমস্ত লোক রাখি না।' কেন জিজ্ঞাসা করায় তাঁর উত্তর—'সমস্ত লোক

কি ভাল হয়?' দেশসুদ্ধ সব 'সমস্ত' (সমর্থ) লোক মন্দ হয় না—এই যুক্তি সুভাষিণী দেখালে গৃহিণী মোক্ষম কথাটি বলেছেন,—'...ছোটলোক, যারা খেটে খায় তারা কি ভাল?'

কথাটা শুনতে প্রত্যক্ষভাবে যতটা খারাপ লাগে আজকের দিনে, আসলে ততটা খারাপ বলার কিছু নেই। সমাজ শ্রেণিবিভক্ত। বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে একটা গোষ্ঠী-মানসগত দূরত্ব থাকেই। এই শ্রেণি মনস্তত্ত্ব থেকেই জন্ম নেয় 'আমরা'-'ওরা' বিভাজন। আমরা বাঙালি, ওরা বিহারি; আমরা বাঙালি, ওরা উড়ে—ওরা আমাদের সমান নয়। আমরা হিন্দু, ওরা মুসলমান (অথবা ম্লেচ্ছ)—ওরা আমাদের আপন নয়। মুসলমান ও খ্রিস্টানরাও একই রকম ভাবেন। ওরা আমাদের চেয়ে বড়লোক কিংবা ছোটলোক—আমাদের চেয়ে আলাদা। আমরা ব্রাহ্মণ, ওরা শূদ্র; আমরা সাদা, ওরা কালো; আমরা পুরুষ, ওরা নারী। যা কিছু খারাপ তা ওরাই করে। আমরা মোহনবাগান, ওরা ইস্টবেঙ্গল; আমরা এই রাজনীতির লোক, ওরা ওই রাজনীতির লোক। ভদ্রলোক শ্রেণি পরিচারক ও পরিচারিকাদের নিজেদের শ্রেণিভুক্ত ভাবতে পারেন না। ঠিক তেমনই দরিদ্র বর্গের মানুষও ধনবান ও মধ্যবিত্তদের মনে মনে দূরে রাখেন। প্রভু-পরিবারের সর্বনাশ সাধনে তৎপর কর্মচারীর অভাব নেই সমাজে। বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণি-মনস্তত্ত্ব খুব ভালভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। পরে আমরা তা দেখব।

সুভাষিণীর শ্বশুরালয়ে প্রৌঢ়া পাচিকা ব্রাহ্মণী থাকা সত্ত্বেও কুমুদিনী বহাল হল। এই নির্বোধ প্রৌঢ়াকে নিয়ে নিষ্ঠুর কৌতুকে মেতেছে সুভাষিণী, কুমুদিনী ও দাসী হারানী। হারানী দাসী হয়েও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি বোধ করেনি ব্রাহ্মণীর প্রতি। এখানেও শ্রেণি-দূরত্ব ক্রিয়াশীল। হারানী তথাকথিত ছোট জাত; তার ওপর ব্রাহ্মণীরও জাতিগর্ব আছে। হারানী পাচিকাকে স্বশ্রেণি বলে মনে করে না।

প্রৌঢ়ার রূপযৌবনের ঘাটতির কথা তোলায় সে ক্রুদ্ধ হয়েছে। কুমুদিনীর জবানিতে শুনতে পাই—'তখন ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী অর্ধনগ্নাবস্থায় বেড়ী নিয়া আমাকে তাড়া করিয়া মারিতে আসিলেন।' এই বাক্যের 'অর্ধনগ্নাবস্থায়' শব্দটির দিকে তাকাই। ওই শব্দটি বর্জন করলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু নগ্নতার এই যে ইঙ্গিত বঙ্কিমের ভাষাতে চলে এল তা এই ব্রাহ্মণী শ্রমজীবীনী বলেই। তার শরীরের সম্ভ্রম বজায় রাখার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি বলেই।

সেই পাচিকা কুমুদিনীর প্রতি বিরূপ হয়েছিল কারণ তার ভয় হয়েছিল যে, কুমুদিনী আসাতে তার চাকরি যাবে। সে তাহলে যাবে কোথায়? সে চুলে কলপ দিতে চেষ্টা করে, তার অন্তরে সংগোপন আছে বিবাহের ইচ্ছা। রূপহীনা, বালবিধবা নারীর মনের যে অসহায়তা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই ইচ্ছাগুলিতে উন্মোচিত হয় সেদিকে একবারের জন্যও কোনও সহমর্মী পলকপাত নেই উপন্যাসের কোথাও।

ওই একই আদলে গড়া হয়েছে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের পাচিকা ব্রাহ্মণীকে। মন্বন্তরের কারণে গ্রাম ছেড়ে আসা মহেন্দ্রর পত্নী কল্যাণী বিষপান করে পথে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। তাকে উদ্ধার করে নগরের একটি গৃহে রেখেছেন ভবানন্দ। তার জন্যই নিযুক্ত হয়েছে সেই ব্রাহ্মণী। ভবানন্দ ভালবেসেছেন কল্যাণীকে। তাকে দেখতে গেছেন তিনি। প্রথমে দেখা হল সেই ব্রাহ্মণীর সঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা—'স্ত্রীলোকটি অর্ধবয়স্কা, মোটাসোটা, কালোকোলো, ঠেঁটি পরা, কপালে উল্কি, সীমন্তপ্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা পাইতেছে।' ভবানন্দ প্রাতঃপ্রণাম জানাবার পর—'ঠাকরুণ দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্ত বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহনচূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না; কেন না সকড়ি হাত। নিষেকমসৃণ সেই চিকুরজাল—হায়! তাহাতে পূজার সময় একটি বকফুল পড়িয়াছিল! —বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল তাহা ঢাকিতে সক্ষম হইল না; কেন না ঠাকরুণটি একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভারপ্রণত উদরপ্রদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তারপর দুঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আব্রু পর্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে ঘাড়ে পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল।' আমরা লক্ষ করি, এখানেও—কাপড়ে শরীর ঢাকছে না—এই কথাটাই বলা হয়েছে ঘুরে ফিরে।

ভবানন্দ বলেছেন ঠানদিদিকে সাঙ্গা করবেন। ঠানদিদি বলেন, 'আমরা হলেম বিধবা'; কিন্তু তার পরেই বলেছেন, 'তা ভাই যা জান তা কর। তোমরা হলে পণ্ডিত, আমরা মেয়েমানুষ কি বুঝি? তা, কবে হবে?' এখানেও আশ্রয়হীনা বালবিধবার বিবাহ-ইচ্ছা-জনিত দুর্বলতাকে পরিহাসের উপকরণ করা হয়েছে। ভবানন্দ, আনন্দমঠের অন্যতম প্রধান সন্তান-সন্ন্যাসী, সুশিক্ষিত, প্রশস্ত-হৃদয়—প্রৌঢ়ার সঙ্গে এ-জাতীয় পরিহাস করতে দ্বিধা করেননি—তিনি শ্রমজীবীনী বলেই! পেটের দায়ে কাজ করতে এসেছেন বলেই।

এতক্ষণ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বন করে যে-কথাটি বলবার চেষ্টা করলাম তা একা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ নয়। উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক-শ্রেণি (মহিলাসহ) এইভাবেই পরিচারিকাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছি মাত্র।

একটি সযত্ন-নির্মিত, সুচিন্তিত দাসী-চরিত্র আছে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি-সম্ভারে। স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিত্বময়ী এক নারী। সে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের হীরা। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব নির্মাণ। এখানে বঙ্কিম শ্রেণি-প্রতিনিধি নন, স্বতন্ত্র শিল্পী।

আশমানি আর পেষমন এসেছে 'দুর্গেশনন্দিনী' আর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে। রোমান্স-জাতীয় উপন্যাস। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' সিরিয়স সামাজিক উপন্যাস। আশমানি আর পেষমনের মতো সে আকাশ থেকে পড়েনি। তাকে নিজস্ব সামাজিক পরিচয়ে চিহ্নিত করেছেন লেখক। নগেন্দ্রের গৃহে একটু ভদ্র ঘরের মেয়েদের দাসীত্বে নিযুক্ত করা হত—একথা প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হয়েছে। 'এই প্রকার যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে হীরা প্রধানা। অনেকগুলি পরিচারিকা কায়স্থ কন্যা—হীরাও কায়স্থ—নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর হইতে আনয়ন করেন। প্রথমে তাহার মাতামহীই পরিচর্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল—হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থা হইলে প্রাচীনা দাসীবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন সঞ্চিত ধনে একটি সামান্য গৃহ নির্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল—হীরা দত্তগৃহে চাকরি করিতে প্রবৃত্ত হইল।'

এই হীরা কুড়ি বছর বয়সের তরুণী; অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কর্মকুশল ও বাকপটু। মুখরাও বলা যায়। বিধবা বলে পরিচিত কিন্তু সধবার মতো বেশবাস ও আচরণ। তার স্বামীর প্রসঙ্গে কেউ কিছু জানে না কিন্তু তার কলঙ্ক-রটনাও কিছু নেই। লক্ষণীয় যে, হীরার দেহরূপ বর্ণনায় এক বিন্দু আদিরসও ঢালেননি বঙ্কিম। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ণনা খুবই সংযত কেবল গাত্রবর্ণ, চোখ, চুল আর মুখমণ্ডল সম্পর্কে একটিমাত্র উপমা—যেন 'মেঘঢাকা চাঁদ'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

হীরার কোনও অযত্ন হয় না, অমর্যাদা হয় না। তা সত্ত্বেও সে প্রভু-গৃহে সুখী নয়। সে অসন্তুষ্ট। নগেন্দ্রের পত্নী সূর্যমুখীর প্রতি তার বিরাগ। দুর্লভ আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা ধরে হীরা। সে নিজেকে জানে। সে ভেবেছে—

'আচ্ছা, সূর্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন, বলবো? সূর্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এইজন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট—সে মুনিব, আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ।'

হীরা ঈর্ষাপরায়ণ। সামাজিক শ্রেণিবৈষম্যকে সে মেনে নিতে পারে না। সূর্যমুখী সম্পদ-সৌভাগ্যশালিনী; কুন্দ প্রেম-সৌভাগ্যবতী। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র—দু'জনেই কামনা করেছে কুন্দকে। হীরাকে কেউ চায় না। হীরার এই ঈর্ষা প্রশংসাযোগ্য নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এই ঈর্ষা তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ; এই ঈর্ষা তার শ্রেণিবঞ্চনা এবং আহত আত্মমর্যাদার অভিব্যক্তি, 'বিষবৃক্ষ'-এর হীরা এবং 'চোখের বালি'-র বিনোদিনী এই উপাদানে গঠিত। 'চোখের বালি'-তে 'বিষবৃক্ষ' পাঠের বর্ণনা আছে।

হীরা নির্ভুল লক্ষ্যে নিজের মূল আকাঙ্ক্ষাটিকে চিহ্নিত করেছে। 'এখন, আমার হলো কিছু টাকার দরকার, আর দাসীপনা পারি না।' এত গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-সচেতন উক্তি সমগ্র উনিশ শতকের অন্য কোনও বাংলা উপন্যাসে পাই না। দাস দাসত্বমুক্ত হতে চায়। হীরাই সেই বিদ্রোহিনী।

দাসী সচেতনভাবে প্রভু পরিবারে অশান্তি বাধিয়ে দিতে চায়, রোপণ করে বিভেদের বীজ এমন দুটি পূর্ব-দৃষ্টান্ত আছে আমাদের। 'রামায়ণ' কাব্যের মন্থরা আর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ধনপতি আখ্যানের দাসী দুর্বলা বা দুবলা। নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষের কাছে উচ্চবর্গীয় শ্রেণি যে সর্বদা আপন নয়, পছন্দের নয়—তা-ও এইভাবে সাহিত্যে পরম্পরাবাহী ধারণা হয়ে আছে। বিংশ শতাব্দের বাংলা উপন্যাসে, স্বাধীনতার আগে ও পরে আছে তার অজস্র দৃষ্টান্ত। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' থেকে রমাপদ চৌধুরীর 'খারিজ'। তার আগে তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়।

হীরা ভ্রষ্ট-চরিত্র নয়, সে প্রণয়িণী। ভালবেসেছে দেবেন্দ্রকে। দেবেন্দ্রকে সে বলেছে,—'আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—'। হীরা দেবেন্দ্রের কাছে নিজের প্রেম ব্যক্ত করেছে। এই কাজকে সে অনধিকার মনে করেনি। দেবেন্দ্র তাকে প্রতারণা করেছে। সেই ক্রোধে উন্মত্তবৎ হয়ে সে প্রতিশোধ নিয়েছে দেবেন্দ্র এবং কুন্দ উভয়ের প্রতি। অতঃপর সুতীব্র ভাবাবেগের এবং কামনার আততি সহ্য করতে না পেরে সে নিজেই উন্মাদ হয়ে গেছে। আমাদের মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ীর কথা। হীরার উপাদান মিশে আছে কিরণময়ীর চরিত্রেও। হীরা, বিনোদিনী, কিরণময়ী—তিনটি নারী চরিত্রেরই প্রায় একই কাঠামো।

হীরাকে উন্মাদ করে দিয়ে তার গভীর একনিষ্ঠা এবং ইনটিগ্রিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এই হীরা চরিত্রটিই প্রমাণ করে দেয় যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন স্বমহিম কথাশিল্পী। তিন উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রের পরিসীমা ছাপিয়ে সর্বকালের, সর্বমানবের কথাকার হয়ে উঠেছেন। দাসী চরিত্র পরিপূর্ণ মানবী চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখনীশক্তিতে।

টেরাকোটা দেশের কবিতা

শান্তি সিংহ

॥এক॥

বিমোহিত অন্ধকার, অবিরল কারা গায় গান!
টুপটাপ-বটফল, ধূ ধূ মাঠ, গ্রীষ্মের দুপুর
এলোমেলো হাওয়া বয়, সোনালি নূপুর বাজে
রুনুঝুনু, রজকিনী প্রেমে-মুগ্ধ বড়ু চণ্ডীদাস!

ময়ূর পেখম, নাকি নীলকান্ত মণি মেঘ!
চন্দ্রবর্মা শিলালিপি, পুষ্কর্ণার ভ্রষ্টকীর্তি গ্রাম
জগদ্রামী রামায়ণ অষ্টকাণ্ডে অভিনব আজও
টেরাকোটা-ঘোড়া ছোটে, দৃপ্ত তেজ ফোটে বিশ্ব মাঝে!

বীর হাম্বিরের শৌর্য বন-বিষ্ণুপুরে কথা কয়
জোড়বাংলা-রাসমঞ্চ-দলমাদল আজ ইতিহাস
যদু ভট্ট-গোপেশ্বর সুরের আকাশে ধ্রুবতারা
পুথি-খোঁজে হন্যে, শেষে ধন্য হন বসন্তরঞ্জন!

॥দুই॥

জারুল-পলাশ ফুল খর রৌদ্রে আরও মহীয়ান
শালবনে দুলে ওঠে সতেজ মঞ্জরী, মহুয়ার সুতীব্র মহকে
ভালুকও মাতোয়ারা, চিহড়লতায় দোলে বন-টিয়ে ঝাঁক
ময়ূর পেখম মেলে বাদামের খেতে, খেলা করে সাদা খরগোস
দামাল দলমা-দল ছুটে আসে ধান খেতে, আখের বাদায়—
গ্রাম্য টোলা, টিলা-ডুংরি ভেসে যায় ঝুমুরের সুরে!

এ-এক আশ্চর্য দেশ : কাঁকুরে খোয়াইভরা রুক্ষ লাল মাটি
তাল-খেজুরের সারি, শামখোল-বালিহাঁস উড়ে আসে বাঁধ-জলাশয়ে
টুসু-সহরায় গান, দ্রিমি দ্রিমি ছন্দে জাগে দুরন্ত যৌবন
কিরাত-খরার দেশে সন্ত্রাসের হিংস্র ফণা, প্রতিবাদী হয়ে ওঠে গাঁয়ের মানুষ।

সাপ

রিমি দে

সাপের গর্ভ থেকে ফুলে ওঠা
মাছ গান গায়

সাপের গর্ভ থেকে পুড়ে যাওয়া
নাচ গান গায়

ফুলে ওঠা মাছ ও পুড়ে যাওয়া নাচ
জন্মসূত্রে পরিচিত পাপ

আহা কী অপরূপ আহির ভৈরব
সাপের গর্ত থেকে গজলের নবজন্ম হয়.....

চাঁদের নরম ছায়া

পার্থপ্রতিম মজুমদার

চাঁদের নরম ছায়া পড়েছে বাগানে
কেউ কি দেখেছে তাকে
কিছু ছায়া আলোমাখা পড়ে আছে ঘাসে
এসব গহন কথা শুধু রাত জানে

এ সময় সে-ও ওঠে জেগে
তোমার গভীর থেকে সে এসে দাঁড়ায়
দূর কত দূর ওই আকাশের নীচে
রাতের সাগর ভরা তারায় তারায়

তারপর কে যে ছোঁয় কাকে
অযুত হাওয়ার দল শুধু ছুটে চলে
যেন নীরবতা তার কথা শুধু বলে
আকাশ-তারার ফাঁকে ফাঁকে

মেঘে ঢাকা চাঁদের আকাশে
সবাই ঘুমিয়ে থাকে
শুধু তারাগুলি জাগে বাতাসের গানে

চাঁদের নরম ছায়া পড়েছে বাগানে...

ভ্রমণ

তাপস রায়

আমাকে উস্‌কে থেকে ভোর আজ অন্য হয়ে এল
দু'পাশে গমের খেত, দু'পাশে নতুন পাতারা মাথা নেড়ে
আনন্দ জানায়, অতিথি আলোর আজ ফুটে ওঠা ঢল

তিস্তায় মৃদু-জল, পাইনের উঁচু মাথার উপরে যেতে যেতে
ঘাসফুল, সামান্য খাদ সঙ্গী হয়, আর সে-ও অযাচিত কথার ভেতরে
এত প্রাণ ঢালে, ক্রমে হাওয়া রোমাঞ্চ জানায় বৈশাখের চরে

এক একটি উঁকি দেয়া বাঁক তার নতুনের হাত ধরে এসে
খুব চুপ আশ্লেষ দিয়ে যায়, এমন বন্ধু-রং পথের শিরায়
মনে হবে দু'পাশে ডানার যোগে ভেসে যেতে পারি, ডেকেছে পাহাড়

মেঘে মুড়ে থেকে লাভা আজ নতুন বধূটি, লাভা আজ নতুন জীবন

সাড়া

বিশ্বনাথ গরাই

দিনের ওপারে আলো প্রায় নিভু নিভু—
অস্থিরতার পর্ব এখনো রয়েছে কিছুটা বাকি,
ক্রান্তিকালীন হাজার তারায় কেউ বুঝি উঁকি দিয়ে
সূর্যকে ফের ডাকে ঘনীভূত স্তবে!

বেলা-অবেলায় শাণিত সময় মাতে ঘোর উল্লাসে
ধাতুর চমকে ঠিকরায় সেই নিষ্ঠুর গূঢ় আঁচ
বেলা-অবেলায় হঠাৎ আঁধার ঘনালে
ইতিহাসবোধে তিন তুড়ি দেয় মগজে চোলাই স্মৃতি!

ফেলে আসা পথে কাচের জমাট ভিড়ে
হাজার মুখোশ-মিছিল জমেছে হঠাৎ—
সূক্ষ্ম আড়ালে মায়াবি পর্দা দুলে
ছায়াকে করেছে সবিশেষ উন্মাদ;

পায়ের তলায় গতি আরো দ্রুততর—
প্রস্তুতি তবে পর্ব-অতিক্রান্ত?
তীক্ষ্ণ আওয়াজে ধাবন্ত পা-র খুরে
ধুলোগুলি ধায় মেঘের নিভৃত ত্রাসে;

সংহত হয়ে টুপটাপ নামে—তপ্ত শরীর
ভিজিয়ে দিচ্ছে কারা?
নির্জন বাঁকে নিভু নিভু আলো
স্থির হয়ে ফের তোমাকে দিচ্ছে সাড়া!

মানববোমা

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

গাছের পাতা থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত
বৃষ্টি নয়, আকাশ থেকে ধারাস্নানে নামছে রক্ত

নদীর বুক লাল হয়ে আছে রক্তে
সমুদ্রের ঢেউ থেকে ছিটকে আসছে রক্ত

যেদিকে তাকাই শুধু রক্ত, রক্ত আর রক্ত
মানুষ মেতেছে অর্থহীন হত্যায়

শিশুর হাতের খেলনা বোমা হয়ে ফেটে
প্রাণ নেয় আরও অনেক নিষ্পাপ শিশুর

আমার পাশে পাশে এখন হেঁটে চলেছেন যিনি—
তিনি মানুষ?... না মানববোমা......

গ্রামস্মৃতি

অজয় নাগ

বুকের মধ্যে মনের দেখা মুখগুলো সব জাগে
এলোমেলো ভুবনডাঙার
মাঠ পেরিয়ে বাঁদিক ঘেঁষে দিঘির পারে বকুল
বট-সবজে আদুল বনে

নিঝুম আকাশ-ঝক্করেখ গহিন চিত্রশালায়
নীল বেদনে ঘুমিয়ে-পড়া
কাদামাখা উত্তরীয়—পানপাতা মুখ আঁকিবুঁকি

অল্প আলো-অস্তাচলে খেজুর রসের লক্ষ্মী নামে
শিশির ধোয়া মস্ত ডানায়
লাজুক আখর সুপ্ত সুরের লগ্ন দুয়ার খোলে

আধোমায়া ছায়াঘেরা মনে
শাখায় শাখা ভরিয়ে দিয়ে স্বর্ণচাঁপা মুখটি তোলে
পাগলপারা ফাগুনবেলা
অনেক দেখা শেষ না-হওয়ার গানের পথ চেয়ে

জাতিস্মর

গৌতম ঘোষদস্তিদার

চলন্ত ট্রেনের কামরায় তুমি হাসিতে ঝরনা হয়ে বললে
'তোমাকে একদিন নদী দ্যাখাব আমার নিজস্ব নদী'
তুমি আসলে যা বললে, আমি তা বুঝলাম না স্বভাবতই—
চকিতে আমার মনে এল আনকথা অকথা ও কুকথা
তোমার দিকে তাকিয়ে আমার গা-ছমছম করে উঠল...

আমি স্পষ্ট দেখলাম, তোমার ভিতরে একটি পরিপূর্ণ বনভূমি
শেষ-বসন্তে দুলে উঠছে অবিকল সুদূর বাতাসেরই মতো
আর ঠিক তার মাঝখান দিয়ে একটি একাকী নদী ক্ষীণধারায়
বয়ে চলেছে অনন্তের দিকে তার অতল জলে পড়েছে মেঘের ছায়া
একাদশীর চাঁদ একটু পরেই সেই নদীতে জল খেতে আসবে
বনভূমির আড়াল থেকে নির্জন নদীর ঢাল বেয়ে নেমে আসবে
চর্যাপদের সতৃষ্ণ হরিণেরা চলকে উঠবে বালির গভীরে অবশিষ্ট জল
গতজন্মের স্মৃতির ভিতর থেকে তুমি তাদের দেখবে দু'-চোখ ভরে...

সেই দৃশ্যের কোথাও আমি নেই থাকার কথাও নয়—
আমি কেবল দেখলাম এই অবেলায় তুমি আরার একটু-একটু করে
লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ হয়ে উঠলে হাসলে সেই গতজন্মের হাসি...

প্রবন্ধ

সুস্থির শান্ত সংযত প্রত্যয়ী অম্লান দত্ত

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

অম্লান দত্তের মতামত, দর্শন, তাত্ত্বিক চিন্তা ইত্যাদি নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করতে গেলে নিতান্ত চর্বিতচর্বণের দায়ে দায়ী হব, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। প্রথমত, তিনি নিজে তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে এত বিশদভাবে এত দীর্ঘ দিন ধরে লিখে গিয়েছেন এবং এমন প্রাঞ্জল করে লিখে গিয়েছেন যে তাঁর কথাগুলো আবার নতুন করে বলার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, তাঁর সেই মতামত সম্পর্কে তাত্ত্বিক বা দার্শনিক সমালোচনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, সম্যক আলোচনার গুরুত্বের কথা তিনি নিজে আজীবন বলে গিয়েছেন, কিন্তু সেই সমালোচনার অধিকার আমার নেই। খুব সংক্ষেপে একটাই কথা বলার চেষ্টা করব। অম্লান দত্ত যেভাবে লিখতেন, যেভাবে তাঁর যুক্তি পেশ করতেন, সে বিষয়ে দু'একটা কথা বলতে চাই। নিছক স্মৃতিচারণা বা শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য নয়, বলতে চাই খুব বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে। সমকালের প্রেক্ষিতে।

বিভিন্ন বিষয়ে অম্লান দত্তের সুস্পষ্ট মত ছিল। কেবল সুস্পষ্ট নয়, সুস্থিতও। উনিশশো পঞ্চাশের দশক থেকে তিনি ক্রমাগত লিখে গিয়েছেন, প্রায় আক্ষরিক অর্থেই জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি। অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এই লেখালিখির মধ্যে যে অভিমত এবং ধারণাগুলি প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলির ধারাবাহিকতা সত্যিই বিস্মিত করে। বস্তুত, কখনও কখনও মনে হতেই পারে যে তিনি বহু কাল ধরে একই কথা বলেছেন, নিজেকেই পুনরাবৃত্ত করেছেন। কথাটা সম্পূর্ণ ভুল নয়, বিশেষ করে তাঁর শেষের দিকের প্রবন্ধগুলি পড়লে পুনরাবৃত্তি চোখে পড়তে বাধ্য। কিন্তু তাঁর দিক থেকে সম্ভবত এই পুনরাবৃত্তির একটা খুব সহজ যুক্তি ছিল। যুক্তিটা এই যে, কয়েকটা মূল নীতি বা বিশ্বাসের মাপকাঠিতে সমকালকে বিচার-বিশ্লেষণ করে চলাটাই একজন চিন্তাজীবী মানুষের কাজ, সেই নীতিগুলি যদি না পালটায় তা হলে বিচার-বিশ্লেষণের ভাষায় এবং ভঙ্গিতে একটা পুনরাবৃত্তি থাকা স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথ হলে বলতেন, সূর্য তো রোজই একই ভাবে আকাশে ওঠে এবং অস্ত যায়, তাকে তো পুনরাবৃত্তির দায়ে অপরাধী করা হয় না—সূর্যের আলো বদলায় না, সেই আলোয় রোজই পৃথিবী নিজেকে নতুন করে দেখে, একটু একটু করে পালটে যেতে দেখে। অম্লান দত্তও চাইতেন, তাঁর স্থির নীতি ও যুক্তি দিয়ে ক্রমাগত পালটে যেতে থাকা পৃথিবীকে নতুন করে দেখতে, তাঁর পাঠক ও শ্রোতাদের দেখাতে। আপাতদৃষ্টিতে যা পুনরাবৃত্তি, তার অন্তরালে ছিল এই বার বার নতুন করে দেখার চেষ্টা। অম্লান দত্ত কখনওই তাঁর সমকালকে অগ্রাহ্য করেননি, সেই সমকালের পরিবর্তনশীলতাকে তুচ্ছ করেননি। কিন্তু নিজের বিশ্বাসের ভিতটাকে তিনি সেই পরিবর্তমান সমকালের হাতে সমর্পণ করেননি। এখানেই তাঁর চিন্তাভাবনায় একটা মৌলিক ভারসাম্য কাজ করত। ধারাবাহিকতা এবং সমকালচেতনার একটা সমন্বয় কাজ করত।

এই ভারসাম্যকে মর্যাদা দেওয়া খুব জরুরি। আমরা অনেক সময়েই এর গুরুত্ব ঠিক ঠিক খেয়াল করি না। খুব সহজেই নিজেকে কালস্রোতে ভাসিয়ে দিই। ইদানীং এই অ-স্থিরতা বেড়েছে। সেটা অস্বাভাবিক নয়। এক দিকে, বাস্তব দুনিয়া বলতে যা বুঝি, সেখানে অতি দ্রুত এবং অতি প্রবল পরিবর্তন ঘটে চলেছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন, যা অনেক সময়েই পরস্পরের সঙ্গে সমঞ্জস নয়, এমনকী পরস্পরবিরোধীও। বিশ্বায়ন এবং আঞ্চলিকতার টানাপোড়েন গত এক দশকে দুনিয়া জুড়ে কী তীব্র আকার ধারণ করেছে, সেটা ভাবলেই এই অন্তর্বিরোধের কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। প্রত্যাশিত ভাবেই তত্ত্বের দুনিয়াতেও ক্রমাগত মন্থন চলছে, আমরা দ্রুত একটি তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে অন্য একটা তাত্ত্বিক কাঠামোয় সরে যাচ্ছি, কখনওবা ঝাঁপ দিচ্ছি। বস্তুত, তত্ত্ব বলতে সচরাচর যে সুনির্দিষ্ট, সুস্থিত কাঠামোকে বোঝানো হয়ে এসেছে, আমাদের উত্তর-আধুনিকতা, নীতিগত ভাবেই, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, তার পূর্বনির্দিষ্ট শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করেছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই তাত্ত্বিক বিপ্লব। ফলপ্রসূও। কিন্তু বাস্তব এবং তাত্ত্বিক, দুই স্তরেই এই অভূতপূর্ব দ্রুত-বদলের ফলে আমরা অনেক সময়েই নিজেদের চিন্তার ভুবনে কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়ছি, এমন কথা মনে করার কারণ আছে। আজকের পৃথিবীতে 'চলতি হাওয়ার পন্থী' কথা ব্যবহার করার আগে

রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবার ভাবতেন। অম্লান দত্তের চিন্তাগত সুস্থিতি, এই দ্রুত-বদলের একেবারে বিপরীত মেরুতে বলেই, আমাদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর নিজস্ব স্থানাঙ্কে স্থির থাকেন। সেই স্থানাঙ্ককে মেনে নেওয়ার কোনও দায় আমাদের নেই, নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু আমরা তাকে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে, অর্থাৎ নিজেদের ধারণাগুলোকে পরখ করে নেওয়ার একটা উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। শেষ পর্যন্ত তাঁর মত মানলাম কি না, সেটা এখানে প্রশ্ন নয়, অম্লানবাবু নিজে কখনও তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, কিন্তু নিজের ধারণাগুলোকে বাজিয়ে নেওয়ার পক্ষে তাঁর ধারণাকাঠামোটি বেশ কার্যকর।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। সমাজবদলের উপায় হিসাবে হিংসার ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বিস্তর তর্কবিতর্ক শুনেছি আমরা। গত দু'দশকে, প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপর্যয় এবং তারপর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের অভিযান সেই বিতর্কে অনেক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। হিংসার নৈতিকতা নিয়ে যুক্তি এবং প্রতিযুক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে আমরা অনেক নতুন প্রশ্ন তুলেছি, হয়ত কিছু নতুন উত্তরও পেয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে, অনিবার্যভাবেই, অর্জন করেছি অনেক গভীর সংশয়, বিস্তর মৌলিক অনিশ্চয়তা। আমরা যে কেবল অনেক প্রশ্নের উত্তর জানি না তা-ই নয়, কোথায় কীভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে তা-ও জানি না। এই না-জানা আমাদের অনেক সময়েই বিপাকে ফেলে, ধর্মসংকট ডেকে আনে, আমরা স্থির করতে পারি না, কোন দিকে দাঁড়াব। সমাজ এবং অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বিপ্লবীরা যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আমরা অনেকে তাকে নৈতিক সমর্থন জানাই। বিপ্লবীরা যখন অতর্কিত আক্রমণে পুলিশ ফাঁড়ি উড়িয়ে দেয়, দিনের শেষে ভাত খেতে বসা পুলিশকর্মী নিহত হয়, আমাদের সমর্থনে হয়ত একটু টোল পড়ে, কিন্তু তখনও আমরা যুদ্ধের মূল যুক্তিটাকে আঁকড়ে থাকি। বিপ্লবীদের আক্রমণে যখন রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি অ-সামরিক নাগরিকেরও ক্ষতি হয়, তখন আমরা বলি, বিপ্লবীদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যখন তারা সরাসরি অ-সামরিক নাগরিকদের নিশানা করে, 'সফট টার্গেট'-এ হানা দিয়ে রাষ্ট্রকে পিছু হটাতে চায়, তখন আমরা বলি, এটা অনৈতিক। এই অভিযোগের জবাবে বিপ্লবীরা যদি বলে, রাষ্ট্রের অনৈতিকতার মোকাবিলা করতেই এই লড়াই, সে জন্য নৈতিকতার কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে হবে, মেনে নিতে হয়, তখন আমাদের ধর্মসংকট ঘনীভূত হয়। বিশেষ করে, তারা যখন পুলিশের গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে বা বিরোধী রাজনীতির শিবিরে থাকার অভিযোগে নিরস্ত্র নাগরিককে আক্রমণ করে, তখন আমরা অনেকে দোটানায় পড়ে যাই—নিজে নিরস্ত্র হলেও কেউ যদি পুলিশের গুপ্তচর হয়, তা হলে সে-ও কি যুদ্ধের প্রতিপক্ষ নয়? তাকে আক্রমণ করতে নৈতিক বাধা কোথায়? ভাল হিংসা বনাম খারাপ হিংসা-র একটা দ্বন্দ্বে পড়ে যাই আমরা।

অম্লান দত্ত এই দ্বন্দ্বে পড়তেন না। বস্তুত, এই দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে অ-সম্ভব। তিনি নিজেকে গান্ধীবাদী বলতেন না, নিজেকে কোনও একটা মতাদর্শগত তকমায় বেঁধে ফেলতে তাঁর নীতিগত আপত্তি ছিল। কিন্তু গান্ধীর অহিংসা-তত্ত্বের মূল নির্দেশটি তিনি মান্য করতেন। ১৯৬৮ সালে 'গান্ধীবাদ কি অচল?' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'হিংসাত্মক আন্দোলন কোনো অবস্থায় ক্ষমতালাভে বা রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করার দ্বন্দ্বে সফল হতে পারে; কিন্তু সেই সাফল্যও ঝুটা সাফল্য। হিংসা ও মিথ্যাকে আশ্রয় করে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাতে অবিশ্বাস ও অত্যাচার এমনই অনিবার্য যে, বিপ্লবের মহৎ আদর্শকে পাঁকের তলায় টেনে নামিয়ে তবে বিপ্লবীরা ক্ষমতায় আসীন হন।' এই অবস্থান থেকে তিনি সারা জীবনে কখনও সরে আসেননি। ফলে তাঁর কাছে ভাল হিংসা আর খারাপ হিংসার দ্বন্দ্বটা আমাদের পরিচিত অর্থে প্রাসঙ্গিক ছিল না। একটা অন্য অর্থে অবশ্য 'ভাল হিংসা'র ধারণা তিনি স্বীকার করতেন, যেমন গান্ধীও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রতিরোধে হিংসা আবশ্যিক ছিল, এই ধারণাকে গান্ধীও স্বীকার করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, সেখানেও কোনও সংশয় ছিল না, কোনও ধর্মসংকট ছিল না। এই প্রত্যয় থাকতেই হবে, এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না, কিন্তু এই প্রত্যয়কে তুচ্ছ করা ঠিক নয়।

অম্লান দত্ত যদি কেবল প্রত্যয়ী ভাবুক হতেন, তা হলে তিনি হতেন অনেকের মধ্যে, অনেকের মতো, এক জন। প্রত্যয় দুর্লভ নয়। কিন্তু সচরাচর প্রত্যয়ের সঙ্গে মিশে থাকে এক ধরনের অসহিষ্ণুতা। আমি প্রত্যয়ী, সুতরাং আমার কথাই সত্য, এটাই শেষ কথা—এমন একটি সুর অধিকাংশ প্রত্যয়ী মানুষের উচ্চারণেই সুলভ। অম্লান দত্ত এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। তিনি কখনও উচ্চকণ্ঠ নন। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'চেঁচিয়ে বলা' বলেছিলেন, অম্লানবাবু সেই অভ্যাস থেকে মুক্ত। তিনি যা বলেন, স্পষ্ট বলেন, নিঃসংশয়ে বলেন, কিন্তু কখনও বলেন না যে, সেটাই একমাত্র ঠিক কথা। তাঁর কথার ভাষা নম্র, সুর মৃদু। এটাই তাঁর স্ব-ভাব।

এই স্ব-ভাব আকস্মিক নয়, অহেতুক নয়। এর মূলে ছিল তাঁর চিন্তার মৌলিক চরিত্র। অম্লান দত্তের অভিমত স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট, সেই স্পষ্টতা এবং নির্দিষ্টতার মূলে তাত্ত্বিক ধারণার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ নৈতিকতার

অনুশাসনও, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই তত্ত্ব এবং নৈতিকতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকে এক সহজ বাস্তববোধ। তিনি যে কোনও প্রশ্নকে তার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে রেখে বিচার করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতের বাইরে, তাকে অগ্রাহ্য করে, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক তর্কে তাঁর রুচি নেই।

দু'একটি দৃষ্টান্ত দিই। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে অম্লানবাবুর অবস্থান সুবিদিত। তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিজের মতামত স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টতায় জানিয়ে গিয়েছেন, যে কোনও সাম্প্রদায়িক অশান্তির মুহূর্তে নিজস্ব নিরপেক্ষ অবস্থানে সুস্থিত থেকেছেন। কিন্তু কখনও কোনও ক্ষেত্রেই তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে নিছক একটি নীতিগত সমস্যা হিসাবে দেখেননি। সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবাদে তাঁর একটি ধারাবাহিক যুক্তি ছিল, যে-দেশের বহু অংশ জুড়ে এক বিরাট জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘুর বসতি, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বশীভূত হয়ে চললে শান্তি এবং সুস্থিতি বজায় রাখা অসম্ভব, কয়েক কোটি মানুষকে নিঃশেষ করে দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা মেটানো যায় না। লক্ষণীয়, সংখ্যালঘুর সংখ্যা যদি অনেক কম হত, এবং সেই সংখ্যালঘুরা যদি সীমিত এলাকায় কেন্দ্রীভূত হতেন, তা হলে এই যুক্তির জোর থাকত না। কিন্তু অম্লান দত্ত এ ভাবে ভাবতেন না, তিনি জীবন যে রকম, তাকে ধরে নিয়েই ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। আবার, বাস্তববোধ দিয়ে ভাবতে গিয়ে নৈতিক বা আদর্শগত যুক্তিটা কমজোর হয়ে যাচ্ছে কি না, সেই চিন্তাও তাঁকে বিব্রত করত না; সম্ভবত তাঁর নিজস্ব অভিমতের নৈতিক এবং আদর্শগত জোরটা নিজের কাছে এত নিশ্চিত ছিল যে তাঁকে সেই অভিমতের ভিত নিয়ে ভাবতে হত না।

অহিংসার প্রশ্নেও দেখি একই বাস্তববোধের ভূমিকা। ১৯৮৬ সালে 'গান্ধী ও ঈশ্বর' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'হিংসার যুদ্ধে মানুষ বহু শতাব্দী ধরে অভ্যস্ত। যতদিন মানুষের হাতে অস্ত্র ছিল সামান্য, ততদিন সেই যুদ্ধ ভয়াবহ হলেও মানুষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। ক্রমে মানুষের হাতে এল হিংসার এমন অস্ত্র যে, তার ব্যবহারে যদি সংযম না আসে, যদি শতাব্দীব্যাপী হিংসায় অভ্যস্ত মনের সঙ্গে সংযোগ ঘটে নব আয়ত্ত ধ্বংসের শক্তির, তবে মানুষের সভ্যতার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে বলা ছাড়া উপায় থাকে না।' অর্থাৎ, অহিংসাকে কোনও বিমূর্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন না অম্লানবাবু, বাস্তব পৃথিবীতে টিকে থাকতে গেলে মানুষকে হিংসার পথ ছাড়তে হবে—এটাই তাঁর যুক্তি। তার মানে এই নয় যে তিনি নীতিগত ভাবে অহিংসাকে সম্মান করেন না, অবশ্যই করেন। কিন্তু নৈতিক আদর্শের সঙ্গে তাঁর চিন্তায় চেতনায় সতত জাগ্রত থাকে বাস্তববোধ।

এই বাস্তববোধ আসলে জন্ম নেয় একটা গভীর এবং সহজ মঙ্গলচেতনা থেকে। অম্লান দত্ত 'শুকনো সন্ন্যাসী' নন। তত্ত্বের কৈবল্যবাদে তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি নিজের সমস্ত চিন্তাকেই সমাজের মঙ্গলের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চান। আর সেই কারণেই নিজের তাত্ত্বিক জ্ঞান বা আদর্শগত মহত্ত্বকে জাহির করার দায় তাঁর নেই, যেখানে দরকার যতটা দরকার তিনি বাস্তবের তাগিদকেই তার পূর্ণ গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত, বস্তুত আগ্রহী।

তাঁর অনেক লেখা পড়েই মনে হয়েছে এই কল্যাণচেতনা, এই বাস্তববোধ; এগুলোই অম্লান দত্তকে তাঁর শান্ত এবং মৃদু ভাষা ও ভঙ্গি দিয়েছে, এই কারণেই তিনি কোনও বিষয়ে স্বর তুলে উত্তেজিত সুরে কথা বলেননি, নিজেকে একটা স্বাভাবিক সংযমে সংবৃত রেখেছেন। এই সংযম বাইরে থেকে আরোপ করা নয়, এটা তাঁর চিন্তার অভ্যাস থেকেই এসেছে, এসেছে তাঁর জীবনদর্শনের মূল চরিত্র থেকে। তিনি মনে করেন, মানুষকে যদি তাঁর বাস্তবনিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে, তাঁর মাঙ্গলিক চিন্তা দিয়ে কিছুটাও প্রভাবিত করা যায়; সেটাই বড় কাজ, তত্ত্বের লড়াই জিতলেন কি না, নিজের আদর্শের জয়ধ্বজা যথেষ্ট উঁচুতে ওড়াতে পারলেন কি না, সে প্রশ্ন তাঁর কাছে গৌণ। এটা একটা মানসিক অভ্যাস। দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে এই অভ্যাস স্বভাবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

ইদানীং মনে হয়, আমাদের পক্ষে এই মানসিক অভ্যাসটা খুব মূল্যবান, খুব জরুরি। আমাদের চারপাশে সর্বক্ষণ অনেক তর্ক, অনেক বিবাদ, অনেক চিৎকার। সেই চিৎকারে একটা অসহিষ্ণুতা সচরাচর প্রকট হয়। অসহিষ্ণুতার দুটি মাত্রা। এক, আমরা নিজেদের মতকে অত্যধিক গুরুত্ব দিই। দুই, আমরা অন্যের মতকে তার প্রাপ্য সম্মান দিই না। আর তার পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, আমরা যারা কোনও প্রশ্নে একমত, তারাই পরস্পর কথা বলি, ভিন্নমতের মানুষের কাছে আমাদের কথা পৌঁছে দিতে পারি না, তাঁদের সঙ্গে কথা একটু এগোতে না এগোতেই বিবাদ শুরু হয়, তাতে অনেক আগুন জ্বলে, আলো জ্বলে না। এই নেতিবাচক বিবাদে আমরা কোথাও এগোতে পারি না, কারণ যাঁরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁদের মধ্যে কোনও সংযোগ তৈরি হয় না। আমরা এতে বিচলিত হই না, তার কারণ, আমাদের কাছে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করাটা সামগ্রিক মঙ্গলের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। এই প্রেক্ষিতেই অম্লান দত্তের মানসিক স্বভাবটি আমাদের কাছে মূল্যবান। অম্লানবাবু বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সুস্থির, শান্ত, সংযত প্রত্যয় শিখে নেওয়ার প্রয়োজন এখনও সমান প্রবল। আরও অনেক দিন প্রবল থাকবে বলেই মনে হয়।

কেউ না কেউ খুঁজে নেবে

অমর মিত্র

খোকন বলল, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন দাদা। কথাটা এমন আচমকা যেচে এসে বলল যে বিনায়কের না ঘাবড়ে উপায় নেই। ক'দিন আগেই শীতের হাওয়া ঢুকেছে এই শহরে, এপাড়ায়। কতদিন থাকবে বলা যায় না। গেল বার তো তেমন শীতই পড়েনি। আর এবছর মৌসুমিবায়ুও অনেক আগে ঢুকে পড়েছিল সমস্ত দেশে, ক'দিন বৃষ্টি নামিয়ে সেই যে দুর্বল হল, অদৃশ্য হল মেঘ, বৃষ্টি হলই না সময়ে। তা হোক অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহের ভোরে কবে ঠান্ডা পড়েছে কলকাতায়? একে ধরে রাখতে হবে। তোয়াজ করে বসিয়ে রাখতে হবে তাই সাবধানী মানুষ গলায় মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে নিয়েছে। গায়ে সোয়েটার লাগিয়েছে বেশ ক'জন। মাথায় টুপিও। বিনায়কও গলায় জড়িয়ে নিয়েছে পাতলা সিল্কের স্কার্ফ, তার মেয়ের। গায়ে মোটা শার্ট আছে, পাতলা সরের মতো ঠান্ডাটি মনোরম লাগছে। সেই মনোরম সুখের ভিতরে আচমকা খেলার মাঠের রেলিঙের ওপর বসা খোকন কুন্ডু নেমে এসে তার সামনে দাঁড়াল। পাতলা হাফশার্ট, তার আবার বোতামও খোলা বুকের কাছে, কোমরে লুঙ্গি। তার মাথায় ছিল খেলার মাঠের ধারে দাঁড়ান মহাশিরীষ গাছের ছায়া। বর্ষা গিয়ে ছায়া খুব ঘন, ওপরে তাকালে আকাশ দেখা যায় না।

বিনায়ক জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

এই চলছে স্যার, কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন দাদা।

অবাক হল বিনায়ক। খোকন কুন্ডুর সঙ্গেই তো সে বড় হয়েছে পাড়ায়। আগে থাকত পৈতৃক বাড়িতে মা বাবা ভাই বোনের সঙ্গে, সেই বাড়ি ভেঙে বহুতল ওঠায় অনেক টাকা সমেত বড় ফ্ল্যাট পেয়েছে সে, প্রায় দেড় হাজার বর্গফুট, দক্ষিণ খোলা। খোকন কুন্ডু থাকে বাজারের পিছনে বস্তিতে। থাকত। এখনও কি থাকে? জানে না বিনায়ক। জানার কৌতূহলও নেই। কিন্তু এখন যেন হল। খোকন তার বয়সি, এপাড়াতেই পঞ্চাশ বছর পার করে বছর পঞ্চান্ন, বিনায়কও তাই। তারা একসঙ্গে এই মাঠে ফুটবল পিটিয়েছে, ওপারের পুকুরে গরমের দুপুরে দাপিয়েছে, তার প্রথম প্রেমের চিঠি খোকন কুন্ডু হাতে করে নিয়ে গিয়েছিল গগনডাক্তারের মেয়ের কাছে এবং যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় খোকনই যেন তার চেয়ে ভেঙে পড়েছিল বেশি। ও কি জানে, কে ওকে লাভলেটার পাঠিয়েছে, আমি বললাম, বলল, কই চিনি না তো; আশাপারেখ ওরকম অনেক পাবি বিনু, ছেড়ে দে।

বিনায়ক বলেছিল, চিঠিটা ফেরত আনলি কেন?

কী করব, তোকে নিয়ে হাসছে, ওই চিঠি নিয়েও হয়ত হাসবে রে বিনু, আমার এত খারাপ লাগছে!

সেই মেয়ে বিয়ের পর নাকি কোচবিহার। এমন কড়া শ্বশুরবাড়িতে পড়েছে যে কলকাতায় আসতে পারে না। গৌহাটি ডিব্রুগড় যায়। কথাটা বলেছিল এই খোকনই। তাও প্রায় বছর কুড়ি আগে। বিনায়কের মনে পড়ে গেল। তমালির শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়তা আসামের সঙ্গে। ওদের পৈতৃক ভিটেও ছিল আসাম বর্ডারে। এসব খবর দিয়েছিল খোকন। তমালি যে বিনুকে প্রত্যাখ্যান করে আসাম বর্ডারে চলে গেল বিয়ে করে, এ ছিল তার কাছে মস্ত আঘাত। যেন সে নিজেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যেন বিনায়ক নয় তারই পরাজয় ঘটেছিল।

বিনায়ক নিজে বুঝেছিল তার প্রেম একতরফা। তাই সে বাধ্য হয়ে, ক্রুদ্ধ হয়ে মেনেও নিয়েছিল। মানতে পারেনি এই খোকন। এই যে এখন তার সামনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বলছে, সাবধানে থাকবেন স্যার।

খোকন কুন্ডু কবে থেকে তাকে স্যার বলতে আরম্ভ করল। এ পাড়ায় সে তো কোনও লোকের কাছে স্যার সম্বোধন শোনে না। হ্যাঁ, খেলাত ঘোষ লেনের একটা লোক তাকে কিছুদিন বলেছিল বটে। তিনি যে দপ্তরের কেরানি ছিলেন বিনায়ক সেই দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছিল কিছুদিন। তারপর লোকটি রিটায়ার করে যায়, বিনায়কও বদলি হয়। সেই সম্বোধন আর শোনে না। লোকটিও তাকে এড়িয়ে চলে।

বিনায়ক জিজ্ঞেস করে, সাবধান তুমিও থেকো খোকন, নতুন ঠান্ডা।

না দাদা ঠান্ডার কথা বলছিনে। প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো হাসি ফোটায় খোকন তার মুখে। শরীরের বিভঙ্গ, দাঁড়ানোর ভঙ্গিও মনে করল চল্লিশ বছর আগের কথা। খোকনের যখন দশ ছিল, তারও তো দশ, খোকনের যখন পঞ্চাশ পেরিয়েছে, বিনায়ক কীভাবে তার দাদা হয়ে গেল, স্যার হয়ে গেল?

কবে এসব হল? কবে খোকন দাঁড়িয়ে থাকল, সে ধাঁই ধাঁই করে বড় হয়ে গেল? সে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে দাদা বলছ কেন?

খোকন একটু বেঁকে গিয়ে বলল, তাহলে কী বলব স্যার?

খোকন, তুমি তো আমার ছেলেবেলার বন্ধু।

কিন্তু আপনি আমার অনেক বড়।

তা কী করে হল?

বুঝতে পারিনি দাদা, কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন।

বিনায়ক বলল, ভেতরে মোটা গেঞ্জি আছে।

গম্ভীর হয়ে খোকন বলল, মোটা গেঞ্জি কি বুলেট আটকাতে পারবে?

বিনায়কের গা সিরসির করল আচমকা। কী বলছে ও। কী করে খোকন? কোনও খোঁজই রাখে না। আগে, তাও প্রায় বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে দেখত খোকন টাইপ মেশিন নিয়ে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে বসত। এখন টাইপরাইটার উঠে গেছে। সব কম্পিউটার। তাহলে? সে জিজ্ঞেসই করে ফেলল, তুমি কী কর খোকন?

খোকন বলল, কিছু করি না।

কিছু কর না মানে?

কী করব এখন, কিছু করা যায়? করার কিছু নেই, একথা তো মিনিস্টারই বলেছে সেদিন।

তাহলে?

খোকন বলল, লোক গুনি স্যার? পাড়ায় নতুন মুখ দেখলে থানায় বলে দিই।

তার মানে খোঁচড়। ভালভাবে খোকনের মুখ দেখল বিনায়ক। কোনও দাগ নেই। একেবারে নির্ভেজাল সত্যি কথা বলছে। কিন্তু খোকন কুন্ডু কী করে পুলিশের স্পাই হবে, নিজেই বলে দিচ্ছে নিজের পরিচয়!

খোকন বলল, দাদা তোমার থানায় চেনা আছে?

কেন?

এত খবর দিচ্ছি কিন্তু কিছু ঠেকাচ্ছে না।

তবে খবর দিচ্ছ কেন?

খোকন বলল, ধনিরামকে ধরিয়ে দেব।

কে ধনিরাম?

বহুত খতরনাক। পুলিশও জানে না ও ক'টা মার্ডার করেছে, ক'টা রেপ করেছে, ক'টা ব্যাংক ডাকাতি করেছে, দেখলে বোঝাই যাবে না।

বিনায়ক বলল, আমি যাই।

দাদা যাবে কিন্তু ধনিরাম থেকে সাবধান, দু'হাতে রিভলবার চালাতে পারে, সোর্ড ফাইট, মোটর সাইকেলে চেজিং, সাংঘাতিক।

হুঁ। বিনায়ক বুঝতে পারছিল খোকন কুন্ডু কী বলছে তা ও নিজেই বুঝতে পারছে না। ধনিরামই নাকি সব নষ্টের মূল। এই যে চারদিকে এত খুনখারাপি, মার্ডার, ল্যান্ডমাইন ব্লাস্ট হচ্ছে—ধনিরাম আছে। ধনিরামের খবর অনেকবারই দিয়েছে খোকন থানাকে, কিন্তু থানা কোনও অ্যাকশান নেয় না। ধনিরামের চেলার খবর দিয়েছে। তাও থানা কিছু ঠেকায় না। ধনিরামের মেয়েমানুষ ও পাড়ায় এসেছে ক'বার, কিন্তু থানা চুপচাপ। যখন কিছু হয়ে যাবে, পুলিশকে তুলে নিয়ে যাবে কিংবা ব্লাস্ট হয়ে যাবে তখন থানা নড়বে। তার কাছেও আসবে তা জানে খোকন। কিন্তু তার তো একটা কর্তব্য আছে নাগরিক হিসাবে। তাদের ট্যাক্সের টাকায় তো থানার বড়বাবু মেজবাবু থেকে কনস্টবল মাইনে পায়, বন্দুক নাচায়।

বিনায়ক ঘাড় কাত করল, ঠিক, কিন্তু ধনিরামের খবর তো সে জানে না। কে ধনিরাম? কাগজে কি তার নাম দেখেছে বিনায়ক?

খোকন বলল, কেন এই যে তেলেগু মধুকে ধরল খড়গপুর থেকে, সন্ত্রাসবাদী, তাকে কি আগে কেউ জানত, না কাগজে তার নাম বেরোত?

হতে পারে। বিনায়ক হাঁটল। কত দিন ধরে পাড়ায় রয়েছে। পুরনো বাড়ি ভেঙে সাত ব্লকের বহুতল, কত ফ্ল্যাট, তার ভিতরে সেও ঢুকে গেছে, ঢুকে গিয়ে পাড়া থেকে আলাদা হয়ে গেছে। না হলে খোকন কুন্ডুর এই অবস্থা কি সে জানতে পারত না? বিনায়ক সোমের মনে হল বহুদিন পরে সে তার পুরনো পাড়ায় এসেছে। প্রায় প্রতিদিন ভোরেই সে বেরয়। হাঁটা, কিছু ব্যায়াম—এইসব করে শরীর পোক্ত রাখে। খোকনকে কি দ্যাখে না? মনে করতে পারে না। কতদিন বাদে খোকনের সঙ্গে কথা হল তার। খোকন কি এই পাড়ায় থাকে? নাকি তাকে এইসব শোনাবে বলে আজ এসেছে এ পাড়ায়।

খোকন জিজ্ঞেস করল, তোমার বাড়িটা তো নেই, থাকো কোথায় বল দেখি বিনুদা, স্যার?

বিনায়ক হাঁটছে। তার সঙ্গে হনহন করে লুঙ্গি হাফ শার্ট গালে দিন পনেরোর পুরনো দাড়ি নিয়ে খোকনও। বলছে, সেই যে বাড়িটার পিছনে ফলবাগান, পেয়ারা, আম, সবেদা আর সামনে গোলাপবাগান, মাঝখান দিয়ে রাস্তা, মনে আছে স্যার আপনার?

বিনায়ক বলল, আমাদের বাড়ি।

আমরা ওই বাগানের পেয়ারা খেয়েছি কত?

হুঁ। বিরক্ত হচ্ছে বিনায়ক, বলল, ঠিক আছে খোকন।

খোকন বলল, তুমি হাঁট না, আমি হলাম তোমার বডিগার্ড, তোমাকে যে গাড়ি নিতে আসে, সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে পুলিশ থাকে, তোমার গার্ড তো?

সিকিউরিটি।

এখন আমি তোমার সিকিউরিটি ধরে নাও, তুমি খুব দামি লোক, ধনিরাম এইসব লোককে টার্গেট করছে, আমিও টার্গেটে আছি, পুলিশকে খবর দিই তো, খোচড় ধরছে আর মারছে, কিন্তু কে, কে, মানে খোকন কুন্ডু কোনও কিছুর পরোয়া করে না, দেখে নেবে সে, আচ্ছা স্যার আপনি তমালিকে ভুলে গেছেন সত্যি?

ওফ্! বিরক্ত হল বিনায়ক।

আমি কিন্তু ভুলিনি, বেচারির শ্বশুরবাড়িতে বেনামে চিঠি গেল বিয়ের পর, সব বানানো কথা, আর তার দুঃখ শুরু হল।

কী বলছিস?

হ্যাঁ বিনুদা নতুন স্টেশন থেকে কোচবিহারের ট্রেন ছাড়ছে, আসাম মেল।

বিনায়ক হাসল, ওই নামে কোনও ট্রেন নেই।

নেই মানে, আমি একবার কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিতে গেলাম, গৌহাটির ঠিক আগে, কিসে গেলাম? তমালির সঙ্গে দেখা ওই মন্দিরে, কে চিঠি দিয়েছিল জিজ্ঞেস করল আমাকে। তুমি?

কবে গিয়েছিলি?

আগে একবার, তখনও তমালির বিয়ে হয়নি, ও যোগেন পাইকের সাইকেলের পিছনে করে ঘুঘুডাঙা পার হয়ে সুরের মাঠে বেড়াতে যায়, পরে আর একবার ওর বিয়ের পর।

বিনায়ক বলল, ঠিক আছে তুই এবার যা।

মেয়েছেলের বুদ্ধি নেই, থাকলে আপনাকে ফেরাত না, এখন কত সুখে থাকত বিনুদা, সঙ্গে সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরত, ধনিরাম টার্গেট করত কিন্তু কে, কে, চোখে চোখে রাখত, ম্যাডাম বলে ডাকত তমালিকে। কিন্তু কপালে জুটল বেনামি চিঠি, তাতে সব মিথ্যে লেখা, শোধ নিয়েছে কেউ প্রেমে ঝাড় খেয়ে।

বিনায়ক হন হন করে হাঁটছে। তার জীবনের সবচেয়ে অসফলতার কথা বলছে খোকন কুন্ডু। আবার সবচেয়ে হিংসা, প্রতিশোধের কথাও বলছে। এমনিতে পরীক্ষায় ফার্স্ট, চাকরিতে তরতর করে উঠেছে ওপরে, সেরা সুন্দরীকে বিয়ে করেছিল। শ্বশুরবাড়ির কৌলিন্য আছে। তার শ্বশুরমশায়কে এক ডাকে চেনে প্রশাসনিক মহল। রিটায়ার করে গেছেন বটে, কিন্তু তিনিও উঠেছিলেন অনেক উঁচুতে। বিনায়কের উত্থানের পিছনে তাঁর অবদানও আছে। বিনায়কের বউ উর্মি একটা কলেজে পড়ায়। খুব অহঙ্কারী তার বাবা আর তার স্বামীকে নিয়ে। নিজেও কলেজে তিনজনকে টপকে বিভাগীয় প্রধান।

বিনায়ককে ছাড়েনি খোকন, বলছে, আমার ভয়ে তমালি এদিকে আসে না, কোচবিহার থেকে গৌহাটি যায়, ডিব্রুগড় যায় আবার ফিরে আসে কোচবিহারেই।

ঠিক আছে, তুই এবার যা।

কেন বিনুদা। তুমি কত বড় হয়েছ, প্রায় তালগাছ, আমি তোমার পাশে কি আসতে পারি না, তমালিকে আমি কতবার বলেছি তোকে ভালবাসে বিনায়ক, তুই মত দে তমালি, তোর ভাল হবে, ফরাক্কা পার হতে হবে না।

বিনায়কের মনে পড়ে প্রত্যাখ্যানে ফুঁসছিল সে। রোগা, ফর্সা, মুখখানি সুন্দর, চোখ দুটি ভাসা ভাসা, দুটি বিনুনির একটি সামনে, হলুদ রঙের শাড়ি পছন্দ করত তমালি। গানের গলা খুব ভাল, পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তী, বিচিত্রা অনুষ্ঠানে তমালিই সব। কী সুন্দর গেয়েছিল, 'মনে কর আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে—' সুমন কল্যাণপুর ভাল না তমালি ভাল এ নিয়ে কম তর্ক! সেই তর্কে এই খোকন কুন্ডুও ছিল। আবার 'সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে...।' বুক কেঁপে গিয়েছিল বিনায়কের। কিন্তু তমালি তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। তার বদলে যোগেন পাইকের প্রেমিকা হয়ে গেল। যোগেন পাইক ভাল ফুটবলার ছিল। টালা পার্ক একাই যেন দখলে রেখেছিল। যোগেনকে হারানো তার কম্মো ছিল না। পাড়ায় আলোচনা হত, যোগেন অনেকদূর যাবে। মোহনবাগান, বেঙ্গল থেকে ইন্ডিয়া খেলবে। ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন হয়ে এশিয়ান গেমস থেকে সোনার মেডেল আনবে।

খোকন কুন্ডু বলল, স্যার এখন খুব মনে পড়ে, যোগেনটার খেলা নষ্ট করে দিয়ে তমালি কোচবিহার চলে গেল, যোগেন মোহনবাগানে ঢুকে একটা ম্যাচে চারটে গোল মিস করে সাইড লাইনে বসে থাকল।

বাদ দে, তুই এবার যা দেখি।

যাচ্ছিই তো, আমি কি দাঁড়িয়ে?

বাড়ি যা।

যাচ্ছিই তো, যাচ্ছি না কে বলল বিনুদা? বলতে বলতে তার পাশাপাশি হাঁটছে খোকন, বলল, যোগেন ধ্বংস হয়ে গেল তমালি ওকে ছেড়ে দিতে। ছেড়ে দিয়ে তোমাকে ধরলে তুমি ধরা দিতে বিনুদা? নাকি—

স্টপ ইট! বিনায়ক এবার রেগে যাচ্ছে। জীবনে সে অসফলতার মুখ দেখেছে কম। শুধু শুধু খুঁচিয়ে পুরনো কথা তুলছে পাগলাটা। তাকে ধরার জন্য ক'দিন থেকেই পার্কের কোণে অপেক্ষা করছিল, সাহস পায়নি তাই মুখোমুখি হয়নি। আজ অকুতোভয় হয়ে উঠেছে।

বিনায়ক বলল, তুই যা এবার, সত্যি সত্যি যা।

সত্যি সত্যিই যাচ্ছি তো বিনুদা, আমি ক'দিন ধরে তোমার বাড়িটা খুঁজছি, তমালি খুব অন্যায় করে এখন ভুগছে—রোগে ধরেছে ওকে।

বিনায়ক চুপ করে থাকে। পাগলটা কথা বলতে বলতে থেমে যাবে এক সময়। বিনায়ক রাগ পুষে রেখেছিল। প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারেনি। বিয়ের পর তমালি কোচবিহার চলে যেতেই চিঠিটা চলে গিয়েছিল। সমস্ত জীবন সন্দেহ নিয়ে বাঁচুক। স্বামীর ভালবাসা পাবে না আর। কিন্তু এসব তো কত পুরনো কথা। সে ভুলেই গিয়েছে। জীবন কতটা পার হয়ে গেছে তারপর। তার ভাল লাগছে না। এত সফলতার ভিতরে সেই অসফল ব্যর্থ সময়কে মনে করতে চায় না সে। কিন্তু খোকন কুন্ডু সেই কথা মনে করাতেই বুঝি ধরেছে তাকে। বিনায়ক বলল, তুই ধনিরামকে খোঁজ গিয়ে, আমাকে ছাড়।

আমার কি মনে হয় যোগেন পাইকই ধনিরাম হয়ে গেছে।

হেসে ফেলল বিনায়ক, জিজ্ঞেস করল, কী করে বুঝলি?

তোমাকে টার্গেট করেছে, বুঝছ না।

আমি যোগেনের কী করলাম?

কিছু না, ও যে তমালিকে এখনও ভালবাসে, তার কষ্টের জন্য কে দায়ী খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বিনায়ক হাঁ করে দেখছে খোকনকে। মাথার চুল খাড়া খাড়া এখনও এই বয়সেও। কিন্তু সে চুল সাদা হয়েছে অনেক। চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। যে কথা বলল খোকন, সেই প্রস্তাবই তো পাঠিয়েছিল বিনায়ক। তমালি চিঠিই নিল না। খোকন যেন বলছে, তোমাকে একদম ফালতু করে দিয়েছিল তমালি, তুমি যোগেনের নখেরও যুগ্যি নও সেই কথা পরে বলেছিল। খুব চিনত তোমাকে। বিনায়ক এত বছর বাদে সহসা যেন জীবনের ব্যর্থতা টের পেল। তার চমৎকার সুখী সংসার। কিন্তু সবই যেন ভাসা ভাসা। সে বেশি সময় অফিসের কাজে জড়িয়ে থাকে। ফেরে কত রাত্তিরে। ঊর্মির সঙ্গে কতটুকুই বা দেখা হয়। ছেলে থাকে হোস্টেলে। ঊর্মির কলেজ সকালে। কী অদ্ভুত তাদের সংসার!

খোকন কুন্ডু জিজ্ঞেস করে, আপনার বাড়িটা কোথায় বলুন দেখি স্যার?

তুই চিনিস না?

চিনতাম, কিন্তু এখন খুঁজে পাই না, ধনিরামও তাই।

কে বলল তোকে?

আমি জানি, ধনিরাম লোক পাঠায় তোমার বাড়িটা খুঁজে বের করতে। আমি প্রত্যেকবার থানায় খবর দিয়েছি, থানা অ্যাকশান নেয় না, লোকটা খুঁজে খুঁজে চলে যায়, পাত্তা করতে পারেনি বলে বেঁচে যাচ্ছ।

বিনায়ক বলল, তাহলে তো ঠিক আছে।

কিন্তু আমার তো জানা দরকার, সেই পেয়ারা আম সবেদার বাগান, সেই গোলাপের ঝাড়, নুড়ি বেছানো পথ, যে পথে তমালি তোমাদের ঘরে উঠবে কথা ছিল, সেই পথ সেই গোলাপের বাগানওয়ালা বাড়িটা ধনিরাম মানে যোগেন পাইক একবার জেনে গেলেই বিস্ফোরণ ঘটে যাবে, ওর ফুটবল শেষ করে দিয়ে গেছে তমালি, কোথায় ইন্ডিয়া-ক্যাপটেন হবে, হয়েছিল সাইড লাইনের বলকুড়ুনি, কিন্তু তাতে কোনও আফশোস নেই, জানে তমালির দুঃখের জন্য বিনায়স সোম দায়ী।

বিনায়ক বলল, খোকন এসব বন্ধ কর, ভাল লাগছে না।

ভাল লাগে না, আমি জানি এসব সত্যি না, কিন্তু যোগেন পাইক মানে টেররিস্ট ধনিরাম জানে অন্য কথা, কোথায় তোমার বাড়ি?

বিনায়ক বলল, আমি তো নিজেই জানি না।

আশ্চর্য! অমন সুন্দর বাগানবাড়িটা হাপিস হয়ে গেল!

বিনায়ক বলল, হ্যাঁ রে, খুঁজেই পাই না।

খবরদার, খুঁজতে যেও না, ধনিরাম ঘুরুক।

বিনায়ক হেসে বলল, তাহলে আমি যাই?

কোথায় যাবে?

বাড়ি, আর কোথায়?

বাড়ি তো নেই বিনুদা, বাড়ি চলে গেছে কোচবিহার, তুমি যাও?

বিনায়কের মাথা আচমকা নেমে গেল! কী বলছে খোকন কুন্ডু, কে, কে? তাদের সেই সুন্দর বাড়ি, গোলাপ বাড়ি, বাগান বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে এখন দশতলা বহুতল। তার ভিতরে ঢুকে যেন আত্মরক্ষা করছে বিনায়ক। দশতলায় কুড়িটা ফ্ল্যাট, তার ভিতরে কোন তলায় কত নম্বরে সে থাকে তা না জানলে খুব বিপদ। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা প্রায় কেউ কাউকে চেনে না। খোকন কুন্ডু তার পাশে পাশে হাঁটছে আর বলছে, আমি থাকতে তোমার ভয় নেই বিনুদা, আয়াম কে কে—ধনিরামের সব পরিকল্পনা নষ্ট করে দেব। চলো, কোথায় লুকিয়ে আছ দেখে আসি।

রোদ এখন ছড়িয়ে গেছে সবদিকে। শহর জেগে উঠছে নিত্যকার অভ্যেসে। খোকন কুন্ডু সব দিন তার অভ্যেস বদলায়। আজও বদলেছে। তার দু'চোখ বনবন করে ঘুরছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। চারপাশটা দিন দিন সন্দেহভাজনে ভরে যাচ্ছে। সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে। কে কোন বেশে আছে কিছুই ধরা যাচ্ছে না। আচমকা দাঁড়াল খোকন, বলল, স্যার আপনি যান, আমি থানা থেকে ঘুরে আসি, একজনকে দেখেছি, ডাউটফুল, খবরটা তো দিতে হবে, আপনার ডেরা হয় আমি না হয় পুলিশ, ঠিক খুঁজে নেবে।

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সানাউল হক একজন সিভিল সার্ভেন্ট। সাবেক 'ইস্ট পাকিস্তান জুট ট্রেডিং কর্পোরেশনে'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ফোন পেয়ে তিনি আমাকে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। অবিভক্ত বাংলায় সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে চাকরি পেয়েছিলেন ১৯৪৬-৪৭-এ। দেশবিভাগের পর 'পূর্ব-পাকিস্তান' প্রাদেশিক সরকারে বিভিন্ন জেলায় কাজ করেছেন। অসাধারণ ভাল বাংলা গদ্য লেখেন। একাধিক ব্যক্তিগত প্রবন্ধের গ্রন্থরচনা করেছেন। পাকিস্তান সরকারের হয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায়, রাষ্ট্রসংঘে এবং ইউনেস্কোতে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলে ছিলেন। বাংলা লেখার জন্য তিনি ইউনেস্কো পুরস্কারও পেয়েছেন। 'বন্দর থেকে বন্দরে' তাঁর বিদেশে চাকুরির অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৬০-এর যুগে পূর্ববাংলায় আওয়ামি লিগের তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী অফিসারদের যে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সানাউল হক সেই দলেরই একজন অন্যতম প্রবক্তা। ঢাকায় আমার প্রথম সপ্তাহ দু'য়েকের অভিযানে সানাউল আমার প্রধান শিকার। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্তের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়কালের ছাত্র তিনি। গদ্যের সঙ্গে ভাল কবিতাও লেখেন—ঢাকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি একজন নামকরা প্রাবন্ধিক। এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে পূর্ববাংলার সমাজজীবনের খুব ধীর গতিতে হলেও যে পরিবর্তনগুলো ঘটেছে তার একটা প্রাথমিক রিপোর্ট পেয়েছিলাম। সানাউল একজন নাট্যমোদীও। দেশবিভাগের পর বিশেষ করে ১৯৫০-এর ভয়াবহ হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গার পর যখন পূর্ববাংলার সরকারি জীবন থেকে হিন্দুদের সংস্কৃতি, অনুভূতি বস্তুতপক্ষে অস্তিত্ব মুছে ফেলার প্রয়াস চলছিল তখন ঢাকার সখের এবং পেশাদারি নাট্যমঞ্চগুলি এবং বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের বিভিন্ন নাটক ঢাকা শহরের পাড়ায় পাড়ায় অভিনীত হয়েছে। যে নাটকগুলোতে হিন্দুদের ধর্মাচরণ যেমন সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানো, কীর্তন এসব দৃশ্য রয়েছে—সেগুলির অভিনয় হত যাতে হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র সংস্কৃতির কিছুটা অন্তত নতুন প্রজন্মের বাঙালি মুসলমান ছেলেমেয়েরা জানতে পারে। সানাউল করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে চাকরি করেছেন। সেখানেও তিনি সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক অভিনয়ের একজন পুরোধা ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের কাজে যখনই ভারতে এসেছেন তখনই ফেরার পথে একবার শান্তিনিকেতন ঘুরে যেতেন। এই লোকটিকে ধরে আমি এই উপমহাদেশের সাংঘাতিক দুর্দিনের দিনগুলির এক বিস্মৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এস. এম. আবদুল্লার সাক্ষাৎ লাভ করি, এই এস. এম. আবদুল্লা প্যারেলালের 'Gandhi the last phase' গ্রন্থটিতে এবং অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর 'My days with Gandhi' গ্রন্থের বহু জায়গা দখল করে আছেন। আবদুল্লাসাহেব ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে পুলিশ সুপারইনটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর সময়ে ওই বছরে অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে ভয়ানক হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা হয়েছিল, যার পরিণতিতেই গান্ধীজির ঐতিহাসিক নোয়াখালি যাত্রা। আমি যখন আবদুল্লাসাহেবের সাক্ষাৎ পাই পুরনো ঢাকার একটি সাধারণ বাড়িতে, তিনি তখন অনেকটাই বৃদ্ধ এবং চোখেও খুব কম দেখেন। নির্মলবাবু তাঁর গ্রন্থে এই পুলিশঅফিসার সম্বন্ধে বলেছেন যে দেশভাগের সময়ে গান্ধীজি যখন কলকাতার বেলেঘাটায় অবস্থান করছেন সেই সময় আবদুল্লাসাহেব গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে পুলিশ অফিসার হিসাবে ভারতে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। গান্ধীজি তাঁকে বলেছিলেন, 'না, আবদুল্লা, তোমাকে পাকিস্তানেই যেতে হবে। একটা নতুন রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন সেখানকার মানুষের তোমার মতো অফিসারের খুব প্রয়োজন।' আবদুল্লা ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর সখ্যের জন্য তিনি সেখানে চার-পাঁচ বছরের বেশি চাকরি করতে পারেননি, পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্যারেলাল তাঁর গ্রন্থে (Gandhi the last phase) উল্লেখ করেছেন যে গান্ধীহত্যার পর দিল্লির

রামলীলা ময়দানে গান্ধীজির স্মরণে অনুষ্ঠিত শোকসভায় তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে একটি আন্তর্জাতিক তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজে এই সংবাদ পেয়ে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ঢাকা থেকে একটি মানিঅর্ডার এসেছিল এক হাজার এক টাকার। আবদুল্লাসাহেবের পাঠানো এই মানিঅর্ডারটি ছিল বিদেশ থেকে পাওয়া প্রথম মানিঅর্ডার। আমি আবদুল্লাসাহেবকে তাঁর সম্বন্ধে এসব গ্রন্থে যেসব কথা লেখা হয়েছে তার উল্লেখ করেছিলাম। তিনি সবিনয়ে জানিয়েছিলেন তিনি এগুলো কিছুই জানতেন না। তবে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তাঁর যে একটা পরিচয় রয়ে গেছে এটা আমার কাছ থেকে জানতে পেরে তিনি একটা মানসিক শান্তি পেলেন। সানাউল আমাকে আর এক ভদ্রমহিলার ঠিকানা দিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানের দ্বিতীয় বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলির প্রথমপক্ষের স্ত্রী। তাঁকে আমি বারতিনেক কলকাতায় দেখেছি। একবার তিনি তাঁর স্বামী মহম্মদ আলির সঙ্গে ড. বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে এসেছিলেন তাঁকে দেখতে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমার একটি আলাদা অনুভূতির জায়গা থেকে। আমি তখনও মনে করেছি, এখনও মনে করি বেগম মহম্মদ আলি অর্থাৎ এই ভদ্রমহিলাই ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের প্রথম মুসলমান মহিলা যিনি মুসলমান পুরুষদের যখন-তখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে তাঁর স্বামী মহম্মদ আলি একজন বিদেশি মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করায় তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে করাচির রাস্তায় মহিলাদের একটি বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করেছিলেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে ওটাই ছিল মহিলাদের ওই ধরনের প্রথম প্রতিবাদ মিছিল। বেগম মহম্মদ আলি আমাকে নিজের হাতে চা করে খাইয়েছিলেন। কিন্তু এর মাস-দু'য়েকের মধ্যে তাঁর বাড়িতে রাতের বেলা কয়েকজন চোর ঢুকেছিল। বেগম মহম্মদ আলি সেটা টের পেয়ে যান এবং আলো জ্বেলে চোরদের মুখোমুখি হন। সম্ভবত একজন চোরকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। ফলে চোরদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় চোরেরা তাঁকে গলা টিপে মেরে ফেলে। ঢাকার কাগজে এই মর্মান্তিক সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারি মাসের (১৯৭২) দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় এডওয়ার্ড কেনেডি ঢাকায় এলেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরবর্তীকালে নিহত দ্বিতীয় ভাই রবার্ট কেনেডি (একসময়কার আমেরিকার এটর্নি জেনারেল), স্ত্রী ও তাঁর পুত্র-কন্যা। এটা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মানুষের সকলেরই জানা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকসন যখন তখনকার 'পূর্ব পাকিস্তান'-এ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন সেই সময় এডওয়ার্ড কেনেডি সম্পূর্ণ বিপরীত সুরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। ফলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাঁর একটা আবেগপূর্ণ ইমেজ গড়ে উঠেছিল। এডওয়ার্ড কেনেডির সঙ্গে আমি বনগাঁ-বাগদা-বয়রা এবং রানাঘাট ও কল্যাণীর বাংলাদেশি শরণার্থী শিবিরগুলি সফর করেছিলাম। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার খবরের কাগজের রিপোর্টার হিসাবে অল্প পরিচয় হয়েছিল। তিনি কলকাতা থেকে একটি বিশেষ ডাকোটা বিমানে ঢাকার তেজগাঁও বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করলে বাংলাদেশ সরকারের অফিসাররা তাঁকে স্বাগত জানায়। বিমানঘাঁটির বাইরে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিভিন্ন কলেজের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী এডওয়ার্ডকে সংবর্ধনার জন্য অপেক্ষমাণ। বিমান থেকে নামার পর আমার দিকে কেনেডির চোখ পড়তেই হেসে তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'You are chasing me here too?' কেনেডি গাড়িতে উঠতে যাবেন এমন সময় পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ঢাকার ছাত্রছাত্রীরা কেনেডিকে বরণ করার জন্য এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে অসংখ্য মেয়ে, পরনে তাদের লালপেড়ে শাড়ি, খালি পা, শান্তিনিকেতনি কায়দায় খোঁপায় ফুলের মালা গোঁজা এবং বরণকুলো হাতে নিয়ে বলতে গেলে কেনেডির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুলিশ অনেক কষ্টে কেনেডি আর তাঁর আত্মীয়দের গাড়িতে তুলে দিতে পারল। গাড়ি কেনেডিকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওল্ড ক্যামপাসে চলে গেল। সেখানে তাঁর জন্য বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন। কেনেডি চলে যাওয়ার পর আমি তখনও বিমানঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম কলকাতার যাত্রীবাহী বিমানের জন্য—যদি পরিচিত কোনও সহকর্মী রিপোর্টার ওই বিমানে আসে। বিমানটি থামার পর কয়েকজন যাত্রীর পিছনে যিনি বিমান থেকে নামলেন তিনি আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, Statesman পত্রিকার রিপোর্টার মানস ঘোষ। মানস আমাকে দেখে খুব খুশি। মানসের জিনিসপত্র আমার গাড়িতে তুলে আমরা দু'জনে রওনা হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওল্ড ক্যাম্পাসের দিকে। সেখানে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কেনেডি-বন্দনা চলছে, অনেক কষ্টে জনতার ভিড় ঠেলে মঞ্চের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছি কেনেডির বক্তৃতার নোট নেওয়ার জন্য। সেখানে একটা সময়ে সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, কেনেডিকে স্পর্শ করার জন্য ঢাকার ছাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। একসঙ্গে কয়েকশো মেয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে মঞ্চের ওপর

লাফিয়ে উঠল। মঞ্চ ভেঙে পড়ে আর কি! তাড়াতাড়ি কেনেডিকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনা হল। অনেকক্ষণ লাগল এই বিশৃঙ্খলার সমাপ্তি ঘটতে। মানসকে নিয়ে তখন আমি আমাদের যুগান্তর-অমৃতবাজার পত্রিকার সেগুনবাগিচার নতুন বাড়িতে।

কেনেডি যেদিন ঢাকায় পৌঁছলেন তার আগের দিন ঢাকায় এলেন ভারতের অন্যতম প্রবীণ রাজনীতিবিদ শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে (এস. এ. ডাঙ্গে); সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেয়ে রোজা দেশপান্ডে এবং পশ্চিমবাংলার দুই বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অরুণ সেন ও ভবানী রায়চৌধুরী। ওইদিনই তাঁরা ঢাকার পল্টন ময়দানে মৌলানা ভাসানির সঙ্গে একটি শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা করলেন। ওই সমাবেশে দু'জন সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাও ছিলেন। ডাঙ্গে ঢাকা ছেড়ে আসার আগের দিন হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা ভারতীয় দূতাবাস থেকে আমাদের ভারতীয় সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হল এক ককটেল পার্টিতে। সেখানে ডাঙ্গে উপস্থিত থাকবেন। আমি ও মানস যথারীতি দূতাবাসের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলাম। সেখানে অরুণ সেন আমার সঙ্গে ডাঙ্গের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডাঙ্গে বক্তা হিসাবে অতুলনীয় এটা সকলেরই জানা কিন্তু বৈঠকি আড্ডায়ও তিনি অসাধারণ। তিনি নিজে একটি হুইস্কির গ্লাস আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার কথা অরুণের কাছে শুনেছি। তুমি সাংঘাতিক কমিউনিস্ট বিরোধী। কিন্তু অরুণরা তোমাকে ভালবাসে কেন আমি জানি না।' আমি মানসের সঙ্গে একটু চোখ টেপাটেপি করে ডাঙ্গেকে বললাম, 'আপনি আগের দিনের ঢাকার কাগজগুলো দেখেছেন?' ডাঙ্গে একটু চোখ নাচিয়ে একটা হাত মানসের কাঁধে আর একটা হাত আমার কাঁধে দিয়ে বললেন, 'তোমরা এডওয়ার্ড কেনেডির কথা বলছ তো?' আমি একটু জোরে খোঁচা দিয়ে বললাম, 'কেবল এডওয়ার্ড কেন? বাংলাদেশের এই তরুণ প্রজন্ম যে সাংঘাতিকভাবে আমেরিকাপন্থী সেটাও তো প্রমাণ হল।' ডাঙ্গে হেসে হেসে বললেন, 'তোমরা যে আমাকে এভাবে ঘেরাও করবে সেটা আমি আগে থেকে বুঝেছি। তবে আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হল প্রেসিডেন্ট নিকসন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তাঁর মূর্খামির প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এডওয়ার্ড কেনেডিকে দিয়ে একটা বন্ধ দরজা খোলার চেষ্টা করছেন।' ওই ককটেল পার্টিতে একটি বাংলাদেশি মেয়ের সঙ্গে অরুণ সেন পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওই মেয়েটি পল্টন ময়দানের শ্রমিক সমাবেশে রাশিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন। মেয়েটি রাশিয়ান, স্প্যানিশ এবং পোলিশ ভাষাও জানেন, দারুণ সপ্রতিভ। এমন সপ্রতিভ মুসলমান মেয়ে আমি বিশেষ দেখিনি। ওই ককটেল পার্টিতে অঢেল মদ্যপান করলেন, আমাদের সঙ্গে হাসি মশকরা করলেন কিন্তু এক পলকের জন্যেও গা থেকে শাড়ির আঁচল খসে পড়েনি। ককটেল পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমি মেয়েটিকে বলেছিলাম, 'আপনি যতই বিদেশি ভাষা শিখে থাকুন না কেন, আপনি যে শ্রীহট্টললনা এটা কিন্তু আপনার বাচনভঙ্গিতে ধরা পড়ে।' মেয়েটি হো হো করে হেসে উঠল। পার্টি ত্যাগ করার আগে আমি ও মানস আমাদের হাইকমিশনার সুবিমল দত্ত'র কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তিনি আমাদের অপরিমিত স্নেহ করতেন। সুবিমল দত্ত ফেব্রুয়ারি মাসের একেবারে গোড়ায় ঢাকায় এলেন প্রথম ভারতীয় হাইকমিশনারের দায়িত্বভার নিয়ে। আমার সঙ্গে সুবিমলবাবুর প্রথম পরিচয় ১৯৬০ সালে তিনি যখন সোভিয়েত রাশিয়ায় আমাদের রাষ্ট্রদূত। এর আগে তাঁকে কয়েকবার দেখেছি কিন্তু পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। তাই তিনি যেদিন প্রথম ঢাকায় এলেন সেদিন অন্যান্য ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে আমিও বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমাদের নামের লিস্টটা আমি পেয়েছি। লিস্টে তোমার নাম দেখে ভাবলাম একটা পরিচিত ছেলেকে পাওয়া গেল। অন্যদের তো কাউকেই আমি চিনি না।' তিনি ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার জে. এন. দীক্ষিতকে আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি।' ওইদিনই বিকালে ঠিক হল ভারতীয় হাইকমিশনার সুবিমল দত্ত ঢাকা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের বিপরীত দিকে রমনা ময়দানের একপ্রান্তে আবুল কাশেম ফজলুল হক ও সাহিদ সুরাবর্দির সমাধিতে মাল্য অর্পণ করবেন। নির্দিষ্ট সময়ে আমি একজন ফটোগ্রাফার নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিলাম। অন্য দু'এক ঢাকার রিপোর্টারও এসেছিলেন। সুবিমলবাবু ফজলুল হকসাহেব ও সুরাবর্দিসাহেবের সমাধিতে মালা দিয়ে রিপোর্টারদের বলেছিলেন, 'কালের গতিতে কখন যে কী হয় তা আমরা আদৌ ধরতে পারি না। এই ব্যক্তিত্ব দু'জনেই আমার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আমি এঁদের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর অফিসার হিসাবে কাজ করেছি। তাই আমার কাছে এঁদের স্মৃতি এখনও অনেকটা উজ্জ্বল।'

ঢাকায় কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে কাজ করতে গিয়ে আমি প্রথম একটা বড় ধাক্কা খেয়েছিলাম। ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় কিংবা মাঝামাঝি সময়ে একটা মর্মান্তিক এবং একই সঙ্গে রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটির নায়ক বিখ্যাত চিত্রপরিচালক জাহির রায়হান। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় জাহির পালিয়ে

কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর ওই সময়কার বিখ্যাত ছবি 'জীবন থেকে নেয়া'-র প্রিন্ট। এই ছবিটি সেই সময় কলকাতার কয়েকটি হলে দর্শকদের খুবই আকর্ষণ করেছিল কাহিনির মানবিকতা আর জীবনবোধের জন্য। জাহিরের দাদা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের প্রধান ড. শাহিদুল্লা কায়সর। শাহিদুল্লা কায়সর ১৯৪১-৪২ থেকে ১৯৪৫-৪৬ পর্যন্ত সময়কালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বেশ নামকরা ছাত্র ছিলেন। ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের তিন দিন আগে 'চিফ অফ স্টাফ' রাও ফরমান আলি যে-জনচল্লিশেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে গভীররাতে বাড়ি থেকে তুলে এনে খুন করিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিখ্যাত এই অধ্যাপক শাহিদুল্লা কায়সর। কিন্তু আমরা ভারতীয় সাংবাদিকরা ১৯ ডিসেম্বর (১৯৭১) ঢাকার উর্দুভাষী মহল্লা মহম্মদ বাজারে যখন ওই ঘটনার রিপোর্ট করতে যাই তখন জানতে পারি যে একটা শুকিয়ে যাওয়া ডোবার মধ্যে ওই বুদ্ধিজীবীদের বিকৃত শবগুলি পড়ে আছে। কিন্তু অধ্যাপক কায়সরের আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে শনাক্ত করতে পারেনি। কারণ অধিকাংশ শবদেহ শিয়াল ও শকুনে খুবলে খুবলে খেয়েছিল। জাহির রায়হান ঢাকায় ফিরে এসে দাদার এই নৃশংস হত্যায় একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় একদিন সন্ধ্যার পর তিনি একটি উড়ো ফোন পান। ওই উড়ো ফোনের অপর প্রান্ত থেকে একটি বাঙালি কণ্ঠ তাঁকে জানায় 'শাহিদুল্লাসাহেব বেঁচে আছেন।' এই উড়ো ফোন পাওয়ার পর জাহির তাঁর বউদি এবং অন্যান্য আত্মীয়দের ভাসা-ভাসা ব্যাপারটি জানিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে মহম্মদ বাজারের দিকে চলে যান। মহম্মদ বাজার এলাকা তখনও ভারতীয় বাহিনী 'বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত করে রেখেছিল। জাহির ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা পুলিশের কোনও পদস্থ অফিসারকে কিছু না বলেই নিজে মহম্মদ বাজার এলাকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি আর ফিরে এলেন না। তখন তাঁর পরিবারের লোকেরা বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এবং ঢাকা জেলার প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের জানান। ঢাকা জেলা কর্তৃপক্ষ জনা চল্লিশেক পুলিশের একটি দলকে ঘটনাস্থলে পাঠান জাহিরের খোঁজে তল্লাশি চালাতে। কিন্তু এই পুলিশ দলটিকে কিছু পাকিস্তানপন্থী সশস্ত্র লোক 'অ্যাম্বুশ' করে ফেলে। এই 'অ্যাম্বুশে'র ঘটনায় ৩২ জন পুলিশ নিহত হন। বাকিদের আহত অবস্থায় ভারতীয় সৈন্যরা এবং বাংলাদেশ রাইফেলস্ উদ্ধার করে। সেই সময় জাহিরের মৃতদেহেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এই ঘটনাটি ঘটার পর ওই ৩২ জন নিহত পুলিশের দেহ নিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনেরা মাঝরাতে ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনের কাছে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঘটনার তিন-চারদিন পরেও ঢাকার সংবাদপত্রগুলিতে এবং কলকাতার কোনও সংবাদপত্রে এই ভয়াবহ ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হল না। আমি খবরটি পেয়ে যতটা সম্ভব ঘটনার বিবরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির খোঁজ নিয়ে একটি রিপোর্ট লিখলাম। ওই সময় ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অরুন্ধতী ঘোষ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অরুন্ধতী খুবই পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই সম্পর্কের জন্যই ভারত সরকার তাঁকে ঢাকা হাইকমিশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু আমার সঙ্গে অরুন্ধতীর একটা আলাদা সম্পর্ক ছিল। তাঁর দাদা ভাস্কর ঘোষ (একজন বিশিষ্ট আই এ এস অফিসার) আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই সুবাদে অরুন্ধতীকে আমি ডাকনামে সম্বোধন করতাম এবং আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গা গড়ে উঠেছিল। অরুন্ধতী কী করে জানতে পেরেছিল যে আমি জাহির রায়হানের ঘটনা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট কলকাতায় আমার পত্রিকার জন্য পাঠাচ্ছি। অরুন্ধতী আমাকে রাতের দিকে ফোন করে জিগ্যেস করেছিল, 'তুমি কি রিপোর্টটা পাঠাবেই?' আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'এটা আমার পেশাগত বাধ্যবাধকতা'। অরুন্ধতী এবার আমাকে খানিকটা আবদারের সুরে বলল, 'আমার একটা কথা রেখো। তোমার রিপোর্টে শেখসাহেবের বাড়ির সামনে বিক্ষোভের কথাটা নাইবা লিখলে। আমার এই অনুরোধটা তুমি রাখবে কিন্তু...।' আমি আমার মূল রিপোর্ট থেকে ওই একটি লাইনই বাদ দিয়েছিলাম। পরদিন কলকাতায় একমাত্র 'যুগান্তর' পত্রিকাতেই পাঁচ কলাম ব্যানার হেডলাইনে আমার নামে এই সংবাদটি প্রকাশিত হল। 'যুগান্তর' পত্রিকা বেলা ১০-১০.৩০টা নাগাদ ঢাকায় পৌঁছনোর পর প্রচণ্ড সোরগোল পড়ে গেল। কারণ ঢাকার খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এই খবরটি প্রায় সকলেই জানতেন কিন্তু তাদের বাংলাদেশ তথ্য ও বেতার দপ্তর থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল এই সংবাদটি 'এই মুহূর্তে' যেন প্রকাশ করা না হয়। ফলে ঢাকার খবরের কাগজগুলো সংবাদটি ছাপেনি। কিন্তু আমার রিপোর্ট প্রকাশের পরে তথ্য ও বেতার দপ্তরের সেক্রেটারি হোসেন আলি তড়িঘড়ি এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে একটি সরকারি প্রেসনোটে জাহির রায়হানের নিখোঁজ ও খুন হওয়ার ঘটনার বিবরণ জানালেন। কিন্তু ঢাকার রিপোর্টাররা একবাক্যে বাংলাদেশ সরকারের এই ঘটনা চেপে যাওয়ার ব্যাপারটির সমালোচনা করে প্রত্যেকে আমাকে

অর্থাৎ 'যুগান্তর' পত্রিকার এই রিপোর্টারকে তাঁর পেশাগত দায়বদ্ধতার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

'একুশে ফেব্রুয়ারি' এসে গেল। স্বাধীনতার পর এই প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি। একদিন আগে থেকে ঢাকা শহর উত্তাল হয়ে উঠল। আমাদের অর্থাৎ আমার ও 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার ঢাকার রিপোর্টার মানস ঘোষের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা চলছে। কারণ আমরা দু'জনেই ঢাকার সেগুন বাগিচার একই বাড়িতে বসবাস করছি। বলতে গেলে একইসঙ্গে দু'জন সর্বত্র ঘোরাফেরা করি। আমরা ২০ ফেব্রুয়ারির দুপুর থেকে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় গাড়ি করে ঘুরছি এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন দেখছি। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ সাজানো হচ্ছে। সাজানো হচ্ছে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিতে যেখানে শহিদদের স্মৃতিতে প্রথম শহিদমিনার নির্মিত হয়েছে সেই জায়গাটিকেও। এই জায়গাটি ঢাকা সেক্রেটারিয়েট থেকে প্রায় আধ মাইল দূরত্বে। তার পাশেই একটি প্রদর্শনী মণ্ডপ তৈরি চলছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা নয়া প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য। মাঝেমাঝে শহরের পথে লরি ও ট্রাকে করে তরুণ-তরুণীদের সমবেত কণ্ঠের গান—কখনও রবীন্দ্রসংগীত, কখনও নজরুল, কখনও অতুলপ্রসাদ, কখনওবা রজনীকান্ত। সেইসঙ্গে মাঝে মাঝে চলছে ভুলে যাওয়া সেই অসাধারণ গানটি : 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান......'। কখনওবা খোলা ট্রাকে আবৃত্তি চলছে মাইকেল মধুসূদনের...'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন...' কখনও রবীন্দ্রনাথের কবিতা, কখনও শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরচনার আবৃত্তি। ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতের আগেই আমি মানসকে নিয়ে শহিদমিনারের ঠিক উলটো দিকে একটা গাড়িতে বসে আছি শুধু দেখবার জন্য যে-মাতৃভাষা একটা নতুন জাতিকে জন্ম দিতে পারে তার শক্তি কতখানি এবং তার জন্য কতটা মমতা জড়িয়ে আছে।

মধ্যরাতের পর থেকে শহিদমিনারের কাছের ওই রাস্তাটি বন্ধ হয়ে গেল। প্রবল জনস্রোত। শিক্ষিত বাঙালি তরুণীদের মধ্যে কোনও রক্ষণশীলতার বাঁধন আমি দেখতে পাইনি। তারা দলবেঁধে শহিদমিনারের কাছে ভিড় করছে। সকলেরই লক্ষ্য একটাই যে শেখ মুজিবর রহমান কোন সময়ে শহিদমিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন। ১৯৫২ সালের সেই দিনটিতেও শেখসাহেব মাতৃভাষার দাবিতে মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন। গাড়িতে বসে আমি ভাবছিলাম ইতিহাসে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে। যে-ব্যক্তি পরোক্ষভাবে একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য দায়ী তিনি ইতিহাসে অনেকটাই হারিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন সেই সময়কার ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন হায়দার। এই হায়দারসাহেব অবিভক্ত বাংলা সরকারের 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস'-এ যোগ দিয়েছিলেন ১৯৪৫ সালে। স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পর তিনি ১৯৫১ সালের কোনও এক সময় ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোনও একটি দিনে ফজলুল হকসাহেব, শেখ মুজিবর রহমানসহ কয়েকজন নেতা একটি আবেদনপত্র নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন হায়দারের কাছে গিয়েছিলেন। হোসেন হায়দারসাহেব চেয়ার থেকে উঠে এই প্রতিনিধিদের সম্মান জানিয়ে তাঁদের কাছ থেকে আবেদনপত্রটি গ্রহণ করেছিলেন। আবেদনপত্রের বক্তব্য ছিল এই—একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একটি মিছিল ঢাকা সেক্রেটারিয়েট ভবনের কাছে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাবে। সেইজন্য মিছিলের এই উদ্যোক্তারা সরকারের অনুমতিপ্রার্থী। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হায়দার তাঁদের জানিয়েছিলেন যে মিছিলকারীরা শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে বিক্ষোভ দেখালে এবং বিক্ষোভকালে শাসকদলের প্রতি সচরাচর যেসব ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেইসব উচ্চারণ না করলে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তবে মিছিলকারীদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তাঁরা কোনও রকম হাঙ্গামা এবং পুলিশকে আক্রমণ করবে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে হোসেন হায়দারের কাছে এরকম 'আই বি' রিপোর্ট ছিল যে মিছিলকারীরা চিৎকার চেঁচামেচি এবং অশ্রাব্য ভাষায় প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীদের গালাগাল করে চলে যাবে, তবে তেমন কোনও হাঙ্গামার আশঙ্কা নেই। ফজলুল হকসাহেব ও শেখ মুজিবর রহমানের আশ্বাস এবং 'আই বি' রিপোর্টের ভিত্তিতে হোসেন হায়দারসাহেব সেক্রেটারিয়েটের ওই রাস্তায় মিছিল ও সভা করার লিখিত অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির দিন-তিনেক আগে প্রাদেশিক (পূর্ব পাকিস্তান) মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন চিফ সেক্রেটারি আজিজ আমেদ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন হায়দারকে ডেকে পাঠালেন। নুরুল আমিনসাহেব সরাসরি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জিগ্যেস করেছিলেন কেন রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে এই বিক্ষোভ সমাবেশের জন্য অনুমতি দেওয়া হল? জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন হায়দার এই জবাব দিয়েছিলেন যে পুলিশের গোয়েন্দা রিপোর্ট এবং ফজলুল হকসাহেব ও শেখ মুজিবর রহমানের মতো নেতারা শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার আশ্বাস দিয়েছেন, সেই মোতাবেক তিনি তাঁর অধিকারের মধ্যে থেকে এই সভা ও মিছিল করার অনুমতি

দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলেন যে এখনই যেন মিছিলের উদ্যোক্তাদের লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে একুশে ফেব্রুয়ারি ওই মিছিল ও সভা করতে সরকার দেবেন না। এবং এখন থেকেই রমনা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ও সেক্রেটারিয়েটের চারপাশে একশো চুয়াল্লিশ ধারা বলবৎ করা হোক। নুরুল আমিনের এই নির্দেশের জবাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হায়দার বলেছিলেন, 'আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ফৌজদারি দণ্ডবিধি মোতাবেক রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিক্ষোভ-সমাবেশ ও মিছিল করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এই অনুমতি প্রত্যাহার করব না। আপনি ও চিফ সেক্রেটারি যদি ইচ্ছে করেন আমাকে এইমুহূর্তে বদলি করতে পারেন।' কিন্তু নুরুল আমিন ও চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমেদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হোসেন হায়দারকে সভা করার অনুমতি প্রত্যাহার করার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি সরাসরি তাঁদের জানিয়ে দেন যে তিনি আজ থেকে ছুটিতে চলে যাচ্ছেন এবং সরকার তাঁর জায়গায় অন্য কোনও অফিসারকে বসিয়ে সভা করার অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। হোসেন হায়দারসাহেব মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে বলেছিলেন, 'স্যার, খোঁচাইয়া ঘা করবেন না...' এককথায় এই হোসেন হায়দারসাহেবই একুশে ফেব্রুয়ারির দাঙ্গার অন্তরালের নায়ক।

একুশে ফেব্রুয়ারি হোসেন হায়দার তাঁর কথা রেখেছিলেন। তিনি ছুটিতে চলে যান। চিফ সেক্রেটারি ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব দিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এ ডি এম) কুরেশিসাহেবকে। উর্দুভাষী কুরেশিসাহেব 'আমার মায়ের ভাষা—মুখের ভাষা—বাংলা ভাষা'-এই পোস্টার-ফেস্টুন নিয়ে জমায়েত মিছিলের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি তন্ময় হয়ে কুড়ি বছর আগের এই দিনটির কথা ভাবছিলাম। তখন কেইবা ভেবেছিল যে 'মাতৃভাষা বাংলাভাষা'—এই দাবির উত্থান কুড়ি বছর পর কেবল 'মাতৃভাষার' ভিত্তিতে একটি নতুন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবে? সম্বিৎ ফিরে আসতেই চেয়ে দেখি ঢাকার নীলখেত এলাকাটি জনসমুদ্রে পরিণত। কয়েক মিনিট পর পর শহরের সংগীত ও নৃত্য শিক্ষায়তনগুলির এবং বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা দলে দলে গান গাইতে গাইতে ও আবৃত্তি করতে করতে শহিদমিনারের কাছে জড়ো হয়েছে। আমি ও মানস এই অবস্থা দেখে অতি কষ্টে গাড়িটিকে বের করে ঢাকা প্রেস ক্লাবে এনে রাখলাম। তারপর আমরা সিকি মাইল রাস্তা হেঁটে আবার গিয়ে শহিদমিনারের বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলিংঘেরা চৌহদ্দির বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাত তিনটে বেজে গিয়েছে। ইংরাজি ও সরকারিমতে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' এসে গিয়েছে। এই দিনটিতে এই মুহূর্তের জন্য ঢাকা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উর্দিপরা পুলিশের পরিবর্তে সাদা পোশাকের নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই জনসমুদ্র অপেক্ষা করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের জন্য। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জাতির 'প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি'তে তিনি শ্রদ্ধা ও অশ্রুর অর্ঘ্য দেবেন এই শহিদমিনারে। ২০শে ফেব্রুয়ারির রাতের অন্ধকার তখনও ঢাকার আকাশ থেকে অপসৃত হয়নি। ভোরের পাখিদের নিশি অবসানের কলকাকলি তখনও অশ্রুত। এমন সময় কানে এল নীলখেতের পশ্চিম দিক থেকে ভেসে আসা মৃদু সাইরেনের শব্দ। বুঝে নিলাম শেখসাহেব আসছেন। জনসমুদ্রের মধ্যেই তিনি গাড়ি থেকে নামলেন। ঠিক ওই মুহূর্তে এক শান্ত স্তব্ধতা নেমে এল। শেখ মুজিবর রহমান দীর্ঘকায় বলে আমরা তাঁকে শহিদমিনারের বেদির কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছতে দেখলাম। তারপর তিনি আমার নজরে আসেননি। ফটোগ্রাফারদের কাছ থেকে শুনেছি শেখসাহেব সাদা ফুল ছড়িয়ে দিয়ে বাংলায় কোরানের কয়েকটি কথা যখন বলছিলেন তখন তাঁর চোখে জল। জামার হাতায় তিনি চোখ মুছেছিলেন কয়েকবার।

সকাল আটটায় ছুটে গেলাম 'বাংলা একাডেমি' ভবনে। এখানেই 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র প্রধান রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি আবু সঈদ চৌধুরী সপ্তাহব্যাপী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন। প্রাঙ্গণের সেই প্রাচীন বটবৃক্ষের গোড়ায় বাঁধানো বেদিটাই ছিল অনুষ্ঠানের মঞ্চ। মঞ্চে কোনও চেয়ার-টেবিলের অস্তিত্ব ছিল না। রাষ্ট্রপতি আবু সঈদ চৌধুরী আসনপিঁড়ি হয়ে বসে প্রায় ত্রিশ মিনিট তাঁর সুললিত কণ্ঠে অনবদ্য গদ্যে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা আমি ঢাকা ও কলকাতায় খুব কম বাঙালির কণ্ঠেই শুনেছি। এই দিনটিতে ঢাকা শহরের চেহারাটা ছিল আমার চোখে প্রথম দেখা এক তীর্থের মতো। ঢাকার শিক্ষিত বাঙালি মেয়েরা যে এত কবি প্রেমিক, এত প্রেম-ভালবাসার কবিতা, অত্যাচার, আর্তনাদ ও বিষণ্ণতার কবিতা লিখতে পারে তা জীবনে এই প্রথম অন্তর দিয়ে বুঝলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের, ইডেন গার্লস ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের মেয়েরা রমনা, নীলখেত, সেগুনবাগিচা, পুরানা পল্টন, সেক্রেটরিয়েট রোড এবং ধানমন্ডির পাড়ায় পাড়ায় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের লেখা কবিতা ছাপিয়ে পথচারীদের পথরোধ করে বিক্রি করছে—এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য আমি দেখেছি। আঠারো-উনিশ বছর থেকে ত্রিশের কাছাকাছি বয়সের মেয়েদের কবিতার বই নিয়ে এই উচ্ছ্বাস, উচ্ছলতা এবং সেইসঙ্গে পরিমিতি বোধ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি সেদিন 'বাংলাদেশ'-এর প্রথম 'একুশে

ফেব্রুয়ারি'তে যে-প্রজন্মের মেয়েদের দেখেছি তাঁরা জন্মেছেন ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে। সাবেক পূর্ববাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মেয়েদের এই উত্থান ও এই অনুভূতি আমার হৃদয়কে বারবার একথা বলেছে যে যদি পুরুষেরা কিংবা রাষ্ট্রশক্তি শিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের এই অধিকার ও অনুভূতিকে কেড়ে না নেয়, তাহলে এই উপমহাদেশে বাংলাদেশের এই ও পরবর্তী বাঙালি প্রজন্ম 'নক্ষত্রের অক্ষরে' বিরাজ করবে।

একুশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কলকাতার সংগীতশিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঢাকাকে এক রাত্রির জন্য দখল করে ফেলেছিলেন। আবৃত্তিকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নজরুলপুত্র কাজি সব্যসাচী। আমি সব্যসাচীর নাম এই কারণে করলাম ঢাকা পৌঁছেই তিনি আমাকে খবর দিয়েছিলেন যে একুশে ফেব্রুয়ারির রাতটা তিনি আমার সঙ্গে সেগুনবাগিচার বাড়িতে কাটাবেন। কারণটা আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে ঢাকা প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠান সেরে সেগুনবাগিচায় আমার বাসস্থানে আসাই সবচেয়ে সহজ। কেননা একমাত্র আমার বাড়িটাই নিকটতম দূরত্বে অবস্থিত। সব্যসাচী আমায় খুব পছন্দ করতেন। আমি ওকে 'তুমি' বলে ডাকলেও, ও আমৃত্যু আমাকে 'তুই' বলে ডাকত এবং যেখানে সেখানে অযাচিতভাবে আমার সম্বন্ধে ভাল ভাল কথা বলত। ওই সন্ধ্যায় আমার একটা চিন্তা মাথায় এল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আলোকমালায় সাজানো হয়েছে। ছেলেমেয়েদের হস্টেলগুলোও তাই। ইচ্ছে হল 'কার্জন হল' দেখে আসতে। প্রথম বঙ্গভঙ্গের যুগে (১৯০৫-১১) লর্ড কার্জনের নামে এই সুবৃহৎ হলটি নির্মিত হয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখলাম যথারীতি কার্জন হল-ও আলোকমালায় সজ্জিত। ভেতরে ঢুকে দেখলাম লর্ড কার্জনের পূর্ণাবয়ব বিখ্যাত তৈলচিত্রটিও আলোতে ঝলমল করছে। আমার মনে হল কার্জনসাহেবকে বলি, 'আপনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে আপনার Two Bengal থিওরি বঙ্গভঙ্গের দু'টো প্রজন্ম পরে এরকম একটা রূপ পাবে। আপনি Two Bengal থিওরি তৈরি করে সাবেক পূর্ববাংলাকে The Provience of Eastern Bengal... তৈরি করতে চেয়েছিলেন। আপনি হেরে গিয়েছিলেন। আপনার হারার কারণ সম্পর্কে পরবর্তীকালে আপনি আপনার জীবনীকার লর্ড রোনাল্ডস্‌কে বলেছিলেন যে আপনাকে হারিয়ে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তখনকার বাংলায় কলকাতা শহরের প্রবল পরাক্রমশালী শিক্ষিত গোষ্ঠীর দাপট এতখানি ছিল যে আপনার মতো ভাইসরয়কে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল! কিন্তু দু'টি প্রজন্ম পরে ঢাকার শিক্ষিত বাঙালিরা বলতে গেলে আপনার Two Bengal থিওরি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে একটি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি অবদান জুগিয়েছে।' আমার মনে হয় আমার এই অভিব্যক্তি মেনে নেওয়ার পক্ষে অনেক লোকই এসে দাঁড়াত।

নেহাত একুশে ফেব্রুয়ারির সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় সময় পায়নি। শহিদমিনারের পাশে বাংলাদেশ ছাত্র লিগ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রদর্শনী ওই দিনই শুরু করে। পরের দিন আমি ওই প্রদর্শনীটি দেখতে যাই। প্রদর্শনীর প্রবেশপথে বাঁদিকে প্রায় সাড়ে তিন-চার ফুট রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ কাটআউট আর ডানদিকে প্রায় অনুরূপ উচ্চতার মাইকেল মধুসূদনের কাটআউট। রবীন্দ্রনাথের কাটআউটের নীচে সুন্দর বড় বড় হস্তাক্ষরে লেখা ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণের কয়েকটি লাইন। যে লাইনের একাংশে 'চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত চিত্তে' রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সম্প্রসারণে ও উচ্চতর শিক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন রেখেছিলেন। ডানদিকে মাইকেলের কাউআউটের নীচে লেখা সেই বিখ্যাত কবিতা...'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন/তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি/পরধন লোভে মত্ত...স্বপ্নে মোরে কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে/ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি...'। ভেতরে প্রদর্শনীতে আমি যা দেখেছিলাম তার স্মৃতিরোমন্থন করে আমার আজও মনে হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপরে আমি এমন প্রদর্শনী আর কখনও দেখিনি। সেখানে জায়গা পেয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানের অবদান'-এর বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করা। গৌড় সম্রাট হুসেন শাহের আমলের কিছু পুঁথি ও বাংলা বর্ণমালার নমুনা। আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, তাঁর কয়েকটি প্রেমের কবিতার উদ্ধৃতি। সেই সঙ্গে তাঁর অনবদ্য বাংলা গদ্য 'ঢাকার বৃষ্টি' লেখাটির কিছু কিছু অংশ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে কয়েকটি লাইন সেই সঙ্গে নদীতে একটি নৌকোর স্কেচ। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার উদ্ধৃতি রয়েছে। সুভাষদার বিখ্যাত কবিতা 'স্ট্রাইক-স্ট্রাইক-স্ট্রাইক'-এর কয়েকটি লাইন রয়েছে। নজরুল এবং জীবনানন্দ তাঁর 'রূপসী বাংলা' নিয়ে সারা প্রদর্শনীটাই জুড়ে রয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র একটি আবেগময় দৃশ্য যেখানে অপুকে প্রথম পাঠশালায় পাঠানোর দিন তাঁর মা তাঁকে কাপড় পরিয়ে দিচ্ছেন ও দিদি চুল আঁচড়ে দিচ্ছে—এই দৃশ্যটির বর্ণনা। প্রদর্শনীর একপাশে

বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বানান ও ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে ড. মহম্মদ শহীদুল্লা, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুশীলকুমার দে-র মতো পণ্ডিতদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ ওখানে প্রদর্শিত হয়েছে। তবে যেহেতু এ বিষয়টি সম্পর্কে আমার ভীতি সবচেয়ে বেশি সেইজন্য আমি এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইনি। আমি আবার সৃজনশীল জায়গায় ফিরে এলাম।

মাইকেল মধুসূদন প্রদর্শনীতে অনেকখানি জায়গা পেয়েছেন। জায়গা পেয়েছে তাঁর পিতৃপুরুষের সাগরদাঁড়ির বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের ফটোগ্রাফ। সাগরদাঁড়ির গ্রাম্য রাস্তা, ছায়াচ্ছন্ন পথ, কপোতাক্ষ নদের ফটোগ্রাফ। তার নীচে লেখা 'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে' চমৎকার অনুভুতি! ঢাকার বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, জিয়া হায়দারের কবিতাও রয়েছে। আমার যতদূর স্মরণে আছে এই বাংলার কবিদের মধ্যে শেষ কবি ছিলেন শঙ্খ ঘোষ। তাঁর পঞ্চাশের যুগের (১৯৫০) শেষদিকের বিখ্যাত কবিতা যেই নামটি আমি ভুলও করতে পারি কিন্তু আমি এই কবিতাটিকে প্রকাশের সময় থেকে 'চিন্তাহরণ দে' কবিতা বলে উল্লেখ করতাম। এই কবিতার যে কয়েকটি লাইন আমার মনে আছে, তা হল : 'ঝাঁপ দিয়েছে ঝাঁপ দিয়েছে ঝাঁপ দিয়েছে রে/ঝাঁপ দিয়েছে ঝাঁপ দিয়েছে চিন্তাহরণ দে/কী হয়েছে কী হয়েছে চিন্তাহরণ দের/চিন্তাবাবুর বউ বলেছে চাল এনে দাও ফের...!' এই কবিতাটি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ভাল লাগে এই কারণে যে তেরোশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে মানুষের অভাবের স্মৃতি আমার প্রজন্মের অনেক লোকেরই মনে আছে। এই কবিতাটি প্রদর্শনীতে দেখতে দেখতে আমার সেই কিশোর বয়সের স্মৃতি আমাকে অনেকটাই ভাবিয়ে তোলে। প্রায় আড়াই-তিন ঘণ্টা এই প্রদর্শনীতে কাটিয়ে আমি যখন বেরিয়ে আসি তখন মনে মনে বলি, চমৎকার-চমৎকার! আবার বলি চমৎকার।

এই প্রদর্শনীটির একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। বাংলাদেশ ছাত্র লিগ সংগঠনটি মূলত রাজনৈতিক সংগঠন কিন্তু ১৯৬০-৬১ সাল থেকে এই ছাত্র লিগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগীরা তাঁদের প্রতিভা, মেধা ও কল্পনা একত্রিত করে এই প্রদর্শনীটি রচনা করে। এই ছাত্র লিগের অন্যতম নেতা ও প্রদর্শনীর সংগঠক শাহজাহান সিরাজ আমাকে বলেছিলেন যে তাঁরা এটিকে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী হিসাবে বিভিন্ন জেলায় নিয়ে গিয়েছেন এবং প্রত্যেক জায়গায় এই প্রদর্শনী দেখার জন্য বহু মানুষের ভিড় হয়েছে। যেটা শাহজাহান সিরাজ আমাকে বলেননি সেটি হল প্রদর্শনীটির মেয়াদ ঢাকা কর্তৃপক্ষ তিনদিন পর্যন্ত রাখতে দিয়েছিলেন। এর কারণটা অবশ্য উহ্য। ছাত্র লিগ সেই মুহূর্তে বিভাজনের পথে যাচ্ছিল। প্রদর্শনীর সংগঠক আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের ছাত্রনেতা ফজলুল হক মণির আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ফলে এই বিভাজনের সূচনা। তবে সেটা আমার বিচার্য বিষয় নয়।

এর মধ্যে একদিন বাংলা একাডেমি ভবনে এক কবিতা সন্ধ্যায় ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে ছিলাম। আমি আগেও বলেছি ঢাকার কলেজে-পড়া মেয়েরা এত কবিতা ভালবাসে যে আমি বারবার তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। তিন ঘণ্টার এ কবিতা আসরে কাটিয়ে যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন একাডেমির বাইরে রমনার বিস্তৃত ময়দান জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। আমি দাঁড়িয়ে ভাবছি হেঁটে যাব না রিকশা ডাকব। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না আমার মনকে আবিষ্ট করে ফেলেছে। এই সময় আমার কাঁধে হাত রাখল বাবুল ওসমান (স্মৃতির ভুলে ওর নাম 'বুলবুল'-ও হতে পারে)। ইনি পঞ্চাশের যুগের বাংলা সাহিত্যের খুব শক্তিশালী গল্পলেখক শওকত ওসমানের ছেলে। 'গণকণ্ঠ' সাপ্তাহিক পত্রিকার কর্মী। খুব ভাল চোখা বাংলা লেখে। বাবুল শ্রীহট্টের উচ্চারণে আমার কাছ থেকে জানতে চাইল হেঁটে যাওয়া হবে না রিকশায় যাওয়া হবে। আমি বললাম, 'চলো হেঁটেই যাই'। দু'জন প্রায় আধ ঘণ্টা হেঁটে নীলখেত পেরিয়ে জ্যোৎস্না ও আলো-আঁধারিতে এসে সেগুনবাগিচা এলাকায় পড়লাম। তোপখানা রোডের মোড়ে বাবুল আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এবার তাহলে আমি অফিস যাই।' এই ছেলেটিকে আমার ঢাকা জীবনে খুব ভাল লাগত। বয়সের দিক থেকে আমরা খুবই কাছাকাছি। একুশে ফেব্রুয়ারি এবং তার পরবর্তী বাংলা ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও সভা আলোচনা নিয়ে আমি আমার নিজের কাগজ 'যুগান্তর' পত্রিকায় একটি লেখা লিখেছিলাম। লেখাটির শিরোনাম ছিল 'ঢাকার চিঠি'। এই লেখাটি প্রকাশের পর আমি দিল্লি থেকে আমার কিছু বাঙালি আই.এ.এস অফিসার বন্ধুর কাছ থেকে অভিনন্দন পত্র পেয়েছিলাম আর পেয়েছিলাম দিল্লিতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর প্রধান রণজিৎ রায় এবং 'প্রেস ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়ার' ডিরেক্টর চঞ্চল সরকারের কাছ থেকে। এছাড়া কেবল ঢাকার নয়, বাংলা কাব্য সাহিত্যের এই প্রজন্মের বিখ্যাত কবি শামসুর রাহমানও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শামসুর রাহমান কোনও চিঠি লেখেননি, তিনি সরাসরি সেগুনবাগিচার বাড়িতে এসে কড়া নেড়ে ঢুকেছিলেন। তিনি ঢুকেই আমার নাম করে একজনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আমি নিজে আমার পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ আমাকে বুকে জড়িয়ে রাখলেন।

পরে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি কবিতাও লেখেন কিংবা লিখতেন?' শামসুর ঢাকার লোক, স্বভাবতই তাঁর উচ্চারণে ঢাকার বৈশিষ্ট্য। আমি শামসুরকে বললাম যে আমি কখনওই কবিতা লিখিনি বা লেখার চেষ্টাও করিনি। এই শুনে শামসুর বললেন, 'তাহলে আপনার গদ্য লেখায় কবিতার আস্বাদ কেন পাই?' আমি হেসে জবাব দিয়েছিলাম, 'বোধহয় সেগুনবাগিচার মাটির গুণ—এই সেগুনবাগিচা থেকে বুদ্ধদেব বসু কত অসাধারণ বাংলা গদ্য লিখেছেন।' এই কথা শুনে শামসুর খানিকটা মেনে নিয়ে মন্তব্য করলেন, 'এই কথাটি কিন্তু ফেলনা নয়।' আমার ওই 'ঢাকার চিঠি'র ক্লিপিং রেখেছিলাম কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে আমি সেটি হারিয়ে ফেলি।

এর কয়েকদিন পর মার্চ মাসের গোড়ায় হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে দেখি দিল্লির চঞ্চল সরকার আমার সেগুনবাগিচার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'এ কী চঞ্চলদা আপনি! কবে ঢাকায় এলেন?' চঞ্চলদা জানালেন আগের রাতে দিল্লি থেকে সরাসরি এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছেছেন। হোটেল থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছেন। যাতে আমার দেখা পান। চঞ্চলদার ঢাকা আসার প্রধান কারণ ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহপাঠী পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান নিহত অধ্যাপক ড. শহিদুল্লা কায়সরের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা। অধ্যাপক শহিদুল্লা কায়সরকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ১৩/১৪ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করেছিল। আমি তাড়াতাড়ি চঞ্চলদাকে নিয়ে শহিদুল্লা কায়সরের বাড়িতে গেলাম। শহিদুল্লা কায়সর শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজেই নয় বিলাতে পড়াশুনার প্রবাসজীবনেও চঞ্চলদার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। চঞ্চলদা সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা এইসময় বলে রাখি। এটি অনেকটা ব্যক্তিগত ঋণ। চঞ্চলদা 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় খুব নামকরা অ্যাসিসটেন্ট এডিটর ছিলেন। খুব সুন্দর ইংরাজি লিখতেন। পঞ্চাশ এবং ষাটের যুগে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওর খুব নামকরা script writer ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি রেডিওর জন্য ইংরাজিতে কী ধরনের script লিখতে হয় এটি শিখেছিলাম। সে-সময়ে আমি যখন তাঁর কাছে এই ধরনের লেখার মহড়া নিচ্ছি তখন তিনি আমার ইংরাজি লেখার এবং শব্দ চয়নের প্রশংসা করতেন। আজ চঞ্চলদা আর নেই। কিন্তু সে যুগের ইংরাজি পত্রিকার পাঠকেরা তাঁকে অবশ্যই মনে রাখবেন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত কলাম 'Speaking Generally'-র রচনাগুলির জন্য।

মার্চ মাসের ১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকায় এলেন। তার প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে থেকে ঢাকা শহর কঠোর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হল। অবশ্য ওই সময় ঢাকাসহ বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট অবস্থান করছিল এবং প্রয়োজনে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছিল। ইন্দিরা গান্ধী দু'দিন ঢাকায় ছিলেন। সেখানে তাঁর দু'টি বড় কর্মসূচি ছিল; রমনা ময়দানে জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া এবং একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা। জনসভায় ইন্দিরা বাংলায় বক্তৃতা আরম্ভ করলে তুমুল হর্ষধ্বনি ওঠে। তবে তিনি বাংলায় বলতে উঠে 'শান্তিনিকেতনে যখন পড়ছিলাম তখন আমি খুব আগ্রহ নিয়ে বাংলা শিখছিলাম। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় আমি বাংলা ছাড়া আর কিছুই বলতাম না। শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই আমার বাংলা বলা কমে গিয়েছিল। তবে বাংলা আমি সবসময়ই বুঝতে পারি। এখন বেশিক্ষণ বাংলায় বক্তৃতা করতে গেলে কষ্ট হয়। তাই আপনাদের কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে আমি হিন্দিতে বক্তৃতা করছি।' বলে হিন্দিতেই বক্তৃতা চালিয়ে যান। পরের দিন ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে তাঁর সাংবাদিক বৈঠক হয়। সারা পৃথিবী থেকে দেড়শোর বেশি সাংবাদিক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকা, চীন এবং এশিয়ার দু'একটি ছোট দেশের রিপোর্টাররা ছাড়া বেশিরভাগ রিপোর্টারই ছিলেন ইউরোপ এবং ভারতসহ এশিয়ার বড় দেশগুলির। সাংবাদিক বৈঠকের একটা দৃশ্য আমার আজও চোখে ভাসে। সেটি হল রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পক্ষে এবং বিপক্ষে রিপোর্টারদের দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া। ভারত, বাংলাদেশ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর এই দেশগুলির রিপোর্টাররা এমনভাবে ইন্দিরাকে প্রশ্ন করছিলেন যেটা স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের জনগণের অভ্যুত্থানের পক্ষে এবং ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের সমর্থনে। কিন্তু আমেরিকা, চীনসহ আরও দু'একটি দেশের সাংবাদিকেরা 'অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের' বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রশ্ন ইন্দিরা গান্ধীকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি এ ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ওই প্রশ্নকারী সাংবাদিকদের ইন্দিরা সরাসরি একটি প্রশ্ন করেছিলেন, 'যে-রাজনৈতিক দল পরিষদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে ৮৮%-৯০% মানুষের ভোটে নির্বাচন জিততে পারে তাকে সরকার গড়ার ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার একটা নজির আপনারা দেখান।' সেই সাংবাদিকরা তখন নীরব হয়ে যান। ইন্দিরা খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবর রহমান পরিষদীয়

গণতন্ত্রের সবরকম রীতি ও ঐতিহ্য মেনেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব চেয়েছিলেন। তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার মধ্যেই উপমহাদেশের এই অস্থির সময়ের অবস্থান। সুতরাং এই উপমহাদেশে গত এক বছর যেসব ঘটনা ঘটেছে তার পুরো দায়িত্ব পাকিস্তানকেই বহন করতে হবে। ভারত এবং বাংলাদেশ কখনওই কোনও অবস্থাতেই এই পরিণতির জন্য দায়ী নয়।' আমি যতগুলি উত্তেজনাপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের রিপোর্ট করেছি এটি তার মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। বৈঠক শেষে বেশিরভাগ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা অফিসাররা ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী তাঁর আসনেই বসেছিলেন। অল্প কিছু ভারতীয় ও বাংলাদেশি সাংবাদিক ওই কক্ষে ছড়িয়েছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও তাই ছিলাম। এক বছর আগে বাংলাদেশের মানুষের বিদ্রোহজনিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর পশ্চিমবাংলার সীমান্ত অঞ্চলে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমি অনেকগুলো জনসভায় গিয়েছি। বাংলাদেশি শরণার্থীদের সঙ্গে তিনি যখন কথাবার্তা বলতেন আমি তাঁর খুব কাছ থেকেই নোট নিতাম ফলে আমার মুখটা তাঁর খুব চেনা হয়ে গিয়েছিল। তিনি এই সাংবাদিক বৈঠকে আমাকে দেখে আমার কাছে একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'When did you come?' আমি জবাব দিলাম, 'One day after the 16th'। তিনি বুঝতে পারলেন না আমি কী বলতে চাইছি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'Since then you are here?' আমি বললাম, 'Not Exactly, there was a little break for a few days, then I have been posted here.' তিনি মন্তব্য করলেন, 'Very good'। এই সাংবাদিক সম্মেলনেই ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে 'দখলদারি বাহিনী' নয় এবং মার্চ মাসের মধ্যেই (১৯৭২) ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে চলে যাবে। অবশ্য জানুয়ারির পর থেকে ধীরে ধীরে ভারতীয় বাহিনীর অপসারণের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

ঢাকায় আমি প্রথম যে পাড়াতে বাড়ি ভাড়া করেছিলাম সেটি ছিল তোপখানা রোড। আমার সে ভাড়া করা বাড়ির একেবারে গায়ে ছিল একটি সুন্দর দোতলা বাড়ি, চারিদিকে পাঁচিল দেওয়া। বাড়িটি দেখে আমার খুব ভাল লাগে। বাড়িটির গঠনশৈলী দেখে আমি নিশ্চিত যে এটি কোনও হিন্দু পরিবারের বাড়ি ছিল। বাড়িটির গায়ে একটি নেমপ্লেট ছিল। তাতে লেখা তোফাজ্জল আলি। আর কোনও পরিচয় লেখা ছিল না। আমি জানলা দিয়ে ওই বাড়িটিকে বারেবারেই দেখতাম। বাড়ির বারান্দায় এক ভদ্রমহিলা এবং এক ভদ্রলোক পাশাপাশি দু'টো চেয়ারে বসে থাকতেন। তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে জানালা দিয়ে দেখতেন। একদিন সকালবেলা ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক গেটের বাইরে এসে জানালা দিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি আমাকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি এবার তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'আমি কলকাতার খবরের কাগজের রিপোর্টার এটা আপনারা জেনেছেন কিন্তু আমি এখনও জানিনি আপনার পরিচয়।' বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখতে ভাল, তিনি একটু হেসে বললেন আমার জীবনেও একটা সময় ছিল যখন খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে আমার খুব বেশি মেলামেশা করতে হয়েছে। তিনি জানালেন যে তিনি তোফাজ্জল আলি, ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রাদেশিক আইনসভার ডেপুটি স্পিকার।

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY
PRINCIPAL OFFICERS OF THE BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY.
SPEAKER,
THE HON'BLE KHAN BHADUR NURUL AMIN.
DEPUTY SPEAKER
MR. TAFAZZAL ALI, ADVOCATE

তোফাজ্জল আলিসাহেব বেশ সুপুরুষ। বয়স সত্তর পেরিয়ে গেলেও দেহের কাঠামো বেশ মজবুত। পরের দিন তিনি আমাকে ব্রেকফাস্টে ডেকে নিলেন। তাঁর বসার ঘরে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি। ঘরটি বেশ বড়। হঠাৎ ঘরের চার দেয়ালের ওপরের অংশ থেকে দোতলার সিলিং পর্যন্ত চাইতেই আমার চোখ আটকে গেল। ঢাকায় প্রায়শই আমি ধুতি পরে থাকি। তখনও ছিলাম অর্থাৎ আমি যে একজন 'হিন্দু'—এটা আমার পোশাকে পরিস্ফুট। আর যে ঘরটিতে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি, সেই ঘরের চার দেয়ালের উপরিভাগ জুড়ে 'রামায়ণের' কতগুলি বিশেষ দৃশ্য আঁকা। যদিও তুলির রঙ কতকটা আবছা হয়ে এসেছে, তবুও আমার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না যে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রা থেকে চতুর্দশ বর্ষ পরে তাঁর অযোধ্যায় ফিরে আসা, সিংহাসনে আরোহণ এবং সীতার পাতালপ্রবেশ পর্যন্ত দৃশ্যগুলি অংকিত। প্রতিটি দৃশ্যের নীচে শিল্পীর নাম 'চিত্রনিভা' লেখা রয়েছে। আমি বিস্মিত তো বটেই বলতে গেলে আর একটু বেশি অর্থাৎ স্তম্ভিত। কারণ, তা যুক্তবঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র অবস্থানের চিহ্ন এবং পরবর্তীকালে সে চিহ্নগুলি 'হিন্দুত্ব' বলে নিন্দার্হ, তাকে ১৯৪৭ সালের পরে মুছে ফেলতে তো কয়েক মুহূর্ত! কিন্তু তা না করে তোফাজ্জল আলি এতদিন ধরে এটা কেন চোখের

সামনে রেখে দিয়েছেন? আমার প্রশ্নের উত্তরে আলিসাহেব জানালেন যে তিনি '৪৭ সালের শেষে তাঁর কলকাতার সম্পত্তির বন্দোবস্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হিন্দু অধ্যাপকের এই বাড়িটি কেনেন। ওই অধ্যাপকের এক মেয়ে শান্তিনিকেতনে ছবি আঁকা শিখতেন। ঘরের দেয়ালের ছবিগুলি তাঁরই আঁকা। 'এর পরে তোমার আর যত প্রশ্ন সব তুমি আমার স্ত্রীকে কর—তিনিই জবাব দেবেন'—এই কথা বলে তোফাজ্জল আলিসাহেব তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন। ভদ্রমহিলার বয়স ষাটের ওপর। তাঁর পোশাক ও চেহারায় আভিজাত্য ও শিক্ষা এই দুটোই খুব স্পষ্ট। তিনি আমাকে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে জানালেন যে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম.এ পড়েছেন। তাঁর সেই সময়কার সিলেবাসে রামায়ণ মহাভারত তো বটেই হিন্দু ধর্মের অনেক কাব্যগ্রন্থ তাঁকে পড়তে হয়েছে। এগুলোতে পরীক্ষায় তিনি ভাল নম্বরও পেতেন। ঢাকার এই বাড়িটি কেনার পর যখন নিজেদের মতো চুনকাম, রং করা হচ্ছিল তখন আলিসাহেবের স্ত্রী জানিয়ে দিলেন যে রামায়ণের এই দৃশ্যগুলি যেমন আছে তেমনই থাকবে। কারণ এটা তাঁর শিক্ষার্থী জীবনের একটা অংশ। আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যে তিনি কি কখনই ওই দৃশ্যগুলিকে 'ইসলাম ধর্ম বিরোধী' বলে মনে করেননি? তিনি আমাকে জবাব দিয়েছিলেন, 'তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করছ, সেসব কথা আমার আত্মীয়েরা অনেকবার বলেছে। আমি তাদের বলেছি তাহলে তো পুরো বাড়িটা ভেঙে ফেলে নতুন করে এই মাটিতে বাড়ি করা উচিত। সেটা যখন হচ্ছে না, তখন ওই ছবিগুলি মুছে ফেলার কী দরকার? কালচক্র যতদিন মুছে না দেয় ততদিন এই দৃশ্যগুলি এভাবেই থাকুক। তাই এখনও আমার চোখের সামনে তোমাদের এই 'রামায়ণ'টুকু আছে...।'

তোফাজ্জল আলিসাহেব নিজে একজন রক্ষণশীল মুসলমান। তিনি বহু বছর পাকিস্তানে মন্ত্রী ছিলেন। কয়েকটি ইসলামিক দেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতও ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁদের বাড়িতে রামায়ণের ওই দৃশ্যগুলির অবস্থান তাঁকে পীড়িত করেনি এবং এখনও করে না। ঢাকায় আমি তোফাজ্জল আলির মতো অনেক প্রাচীনপন্থী মুসলমান দেখেছি যাঁরা সংখ্যায় খুব কম হলেও 'বাংলাদেশ' নামে একটি নয়া জাতির অভ্যুত্থান পছন্দ করেন না। কেউ কেউ আবার কমবেশি 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' নীতিকেও পছন্দ করেন। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে হিন্দুদের সঙ্গে সহাবস্থানকে সামাজিকভাবে একেবারেই অপরিহার্য মনে করেন। তিনি পরিতাপের সঙ্গে একটি তথ্য দিলেন যে ঢাকার নবাবদের ভূসম্পত্তির অংশটুকু বাদ দিলে দেশ বিভাগের আগে ঢাকা শহরের প্রায় ৭০ ভাগ স্থাবর সম্পত্তি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানার। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় হিন্দুদের মালিকানার প্রায় ৫০ ভাগ ভূসম্পত্তি লুঠপাট ও জবরদখল হয়েছে।

তোফাজ্জল আলি আমাকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের এক সময়কার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের হদিশ দিলেন। এই লোকটি সম্পর্কে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮-এর অক্টোবর পর্যন্ত তিনি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পশ্চিমবাংলা সরকারের ধাঁচে তিনিই প্রথম এই প্রদেশে জমিদারি দখল আইন চালু করেছিলেন। এই আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার সাবেক হিন্দু জমিদাররা। ঢাকা হাইকোর্টে এই মামলায় ভারতীয় আইন বিশেষজ্ঞদের একটি দল এসেছিলেন। তাঁদের নেতা ছিলেন দেশবন্ধু অনুজ পি আর দাশ। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আতাউর রহমান খান পি আর দাশমশাইকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। ঢাকা শহরে দেশবন্ধু পরিবারের কিছু স্মৃতি ছিল। সেসব তিনি পি আর দাশকে দেখিয়েছিলেন। আমি আতাউর রহমানসাহেবের সঙ্গে কথা বলার সময় পুরনো দিনের ওইসব ঘটনার উল্লেখ করাতে তিনি আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন।

ঢাকার হিন্দুরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে ফজলুল হকসাহেবের পর হিন্দুদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার দ্বিতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেন আতাউর রহমান খান। তিনি ১৯৬০ সাল থেকেই নিজেকে রাজনীতির বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আতাউর রহমান খান ও তোফাজ্জল আলি প্রায় একই বয়সি। দু'জনেই আলাদা আলাদাভাবে অনেকটাই কৌতূহলোদ্দীপক পর্যালোচনা করেছিলেন আমার কাছে। তা হল ১৯০৫ থেকে ১৯৭১ কালপর্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলি। তাঁরা উভয়েই মনে করেন যে ১৯০৫ সালের The Province of Eastern Bengal-এর সঙ্গে ১৯৪৭-এর The Province of East Pakistan-এর তেমন কোনও ভৌগোলিক ও মৌলিক তফাত ছিল না। তারপর সেই একই ভৌগোলিক এলাকা বা ভূখণ্ডের স্বাধীন অভ্যুত্থান অর্থাৎ 'বাংলাদেশ' তো সেই সাবেক Two Bengal-এর একটি আলাদা Bengal!—আতাউর রহমান ও তোফাজ্জল আলি উভয়েই কিছুটা খেদ কিছুটা ক্ষোভ এবং অনেকটা ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে বলেছিলেন, '...এত বছর পর বাংলা ভাষীরা সকলেই তো 'বাংলাদেশ' বা Two Bengal-এর একটি স্বাধীন অংশকে মেনে নিতে দ্বিধা করেননি...।' তাঁদের কথার এই যুক্তি সেটাকে যদি আমি 'আবেগ' বলে ধরে নিই তাহলে তাঁদের অনুভূতি বিবেচনার যোগ্য। ১৯৭৩ সালে 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যেসব ভারতীয়

সাংবাদিক ঢাকায় গিয়েছিলেন, আতাউর রহমান খান তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে আমি তাঁর বাড়িতে সেই ব্যবস্থা করতে সাহায্য করেছিলাম।

১৯৭২-এর মার্চের গোড়ায় মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি খুব অসুস্থ হয়ে ঢাকার পি জি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলেন। ঠিক ওই সময়ে মৌলানা ভাসানি এই উপমহাদেশের সবচেয়ে বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সেইসঙ্গে তিনি সবচেয়ে বিতর্কিত এবং অস্থির চিত্তের ব্যক্তিত্বও। আমি তাঁকে কলকাতায় দেখি ১৯৭১ সালে ভারত সরকারের আশ্রয়ে। ঢাকায় তাঁর সঙ্গে আমার যোগসূত্র ছিলেন তাঁর অতি স্নেহভাজন সাংবাদিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার এক সময়কার চিফ রিপোর্টার মিজানুর রহমান। মিজানুর আমাকে হাসপাতালে মৌলানার কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে তাঁর শয্যার পাশে বসতে বললেন। আমি তাঁকে বললাম যে তাঁকে একা তো দূরের কথা, এমনকী দু'একজন লোকের মধ্যে পাওয়াও খুব কষ্টকর। ঠিক হল আমি দুপুরে তাঁর খাওয়ার সময় তাঁর কেবিনে আসব। তিনি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট নার্সদের আমাকে চিনিয়ে দিয়ে বললেন '...অরে ঢুকতে দিবা...বুঝলা মনে থাকে যেন...।' বেরিয়ে আসার সময় ওই নার্সরা আস্তে আস্তে আমাকে বললেন, '...আপনে আইস্যা অনেকক্ষণ থাকবেন কেমন?' আমি কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলাম, 'কেন অনেকক্ষণ?' তাঁরা জবাব দিলেন, 'ততক্ষণই আমাগো গালাগালি থেকে নিস্তার, এইটা বুঝলেন না?' পরে শুনেছিলাম, মৌলানাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান তাঁকে দেখতে আসেন। তখন তিনি হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সদের কাছে হাতজোড় করে বলেছিলেন 'খুব অসুবিধাজনক রোগী আপনারা পাইলেন। ওনার গালাগালি ও খারাপ কথার লাইগ্যা আপনারা আমারে ক্ষমা করবেন...।'

এই হলেন মৌলানা ভাসানি। একসময় অর্থাৎ ১৯২০/২১ সাল থেকে এই ব্যক্তি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুগামী। দেশবন্ধুর চিরবিদায়ের পর থেকে তাঁর নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনবাবুর প্রতি তাঁর আবেগপ্রবণতা দেখে আমি মজা করে বলেছিলাম, 'একে পাশাপাশি জেলার লোক তার উপর শুঁটকি মাছের কানেকশন!' শুনে বুড়োর সে কী হাসি। ১৯২৮/২৯ সালে কলেজ স্কোয়ারে বিপিনবাবুর একটা বক্তৃতা বেশ খানিকক্ষণ তিনি আমাকে মুখস্ত শুনিয়ে দিলেন। 'বিপিনবাবু খালি গলায় কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা করলে আমরা বউবাজার মোড় থিক্কা শুনতে পারতাম'—এই কথা বলে মৌলানা তাঁর সাবেক নেতাকে স্মরণ করলেন। তিনি আমাকে জানালেন ভারত থেকে ঢাকায় ফেরার আগের দিন দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তেলিরবাগ গ্রামে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মায়ের নামে একটা কিছু করার পরিকল্পনা তিনি ভারত প্রধানমন্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীকে জানানো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পৈতৃক ভিটায় নিস্তারিণী দেবীর নামে মৌলানার পরিকল্পনায় বাঙালি মুসলমান সমাজের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব ছিল। তিনি একই সঙ্গে স্কুল ও কলেজের নকশা করেছিলেন। আমি তাঁর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, 'আপনি কাগমারিতে (ময়মনসিং জেলা) পাঁচবিবিতে (বগুড়া জেলা) যা করতে চেয়ে পারেননি—তেলিরবাগে কি আপনি সেটাই করতে চান অর্থাৎ একটি আশ্রমভিত্তিক নারী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা?' মৌলানা অনেকটা হেসে বলে উঠলেন, 'তুমি পোলাটা আমার এত খবর রাখলা ক্যান?' আসলে মৌলানা ভাসানির এ ব্যাপারে একটা ব্যর্থতা ও হতাশা ছিল। ১৯৬০-৬২ সালে তিনি পাঁচবিবিতে অনেকটাই 'রাজনৈতিক আশ্রম' তৈরি করেছিলেন। তখন মৌলানা সোভিয়েট রাশিয়ার মতাদর্শ থেকে চীন মতাদর্শের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন। সে সময়ে পাকিস্তানে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত প্রায়শই পাঁচবিবিতে মৌলানা ভাসানির সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তেলিরবাগের ব্যাপারটা অনেকটা এগিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় হাইকমিশনের মারফৎ তেলিরবাগে দেশবন্ধুর পারিবারিক ভিটা চিহ্নিত করে ম্যাপ তৈরি করিয়েছিলেন। মৌলানার নকশা সংশোধন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি তেলিরবাগের জন্য এক কিস্তি মালমশলাও ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এটা যে কত বড় দুঃখের কথা যে ওই সময়ে ১৯৭৩ সালের কোনও এক সময়ে আওয়ামি লিগের রাজনীতিতে শেখসাহেবের ঘনিষ্ঠতম তাঁর ভাগ্নে ফজলুল হক মণি সাংঘাতিকভাবে তেলিরবাগ পরিকল্পনায় বাধা দিলেন। হঠাৎ এ ব্যাপারে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন একেবারেই নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং অন্যদিকে মৌলানা ভাসানি তাঁর 'হক্ কথা' পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমানের আদ্যশ্রাদ্ধ ও ভারত সরকারের কড়া সমালোচনা আরম্ভ করে দিলেন। এটা আমার কাছে আজও রহস্যাবৃত যে কেন ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবর রহমানকে মৌলানা ভাসানির তেলিরবাগ পরিকল্পনা নিয়ে বোঝাতে পারলেন না। কিন্তু এটা না বলে উপায় নেই যে একটা নতুন জাতিকে গড়ে তোলার সময়ে যে মানসিক ও রাজনৈতিক উদারতার প্রয়োজন তা ফজলুল হক মণির আদৌ ছিল না। কেবল তাই নয়—যে সব ভারতীয় সাংবাদিক আওয়ামি লিগের চৌহদ্দির বাইরে শিক্ষিত, বলতে গেলে অন্য মতাদর্শের 'এলিট' ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, ফজলুল হক মণি

সেইসব সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় হাইকমিশনে নালিশ জানাতেন। আমিও মণিসাহেবের 'টার্গেট' ছিলাম। মৌলানার তেলিরবাগ পরিকল্পনা বানচাল হওয়ায় আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। তার প্রথম কারণ আমি ঢাকায় বাংলাদেশের মেয়েদের যে একটি প্রজন্ম দেখেছি যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য কাতর এবং বাংলা ভাষার প্রবাহকে তাঁরা জীবনের প্রাত্যহিক সঙ্গী বলে চিহ্নিত করেছেন, তেলিরবাগ পরিকল্পনার রূপায়ণ ওই প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে এগিয়ে চলার পথে সাহস যোগাত। দ্বিতীয় কারণটি হল, এই দুই বাংলায় দেশবন্ধুর মা'র নামে মাত্র একটি স্মৃতিই আছে। সেটি পুরুলিয়ায় নিস্তারিণী দেবী কলেজ। ডা. বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫৮ সালে দেশবন্ধুর পুরুলিয়ার স্থাবর সম্পত্তি বাসন্তী দেবীর কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়ে মেয়েদের জন্য ওই কলেজটি স্থাপন করেছিলেন। তেলিরবাগ পরিকল্পনা সফল হলে নিস্তারিণী দেবীর নামে আর একটি স্মৃতিচিহ্ন থাকত!

একুশে ফেব্রুয়ারি ও ইন্দিরা গান্ধীর ঢাকা সফরের পর ঢাকা আবার বেশ কিছুদিন শান্ত ও নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়ল। এই সময়ে একদিন সকালে আমার ঢাকা-জীবনের প্রথম বন্ধু মোস্তাফা জামান আব্বাসি (আব্বাসউদ্দীনের পুত্র) আমাদের বাড়িতে চলে এল। হাতে একটি বাদামি রঙের লম্বা খাম। খামটি আমার হাতে দিয়ে বলল, 'দাদা, এটা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের কলকাতা অফিসে পৌঁছে দিতে হবে যে।' খামটির ওপরে ইংরাজিতে ঠিকানা লেখা। প্রাপকের নাম শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্ত—সুপারভাইজার—এয়ারলাইন্স হাউস—কলকাতা। খামের ওপর নামটি দেখে আমার চেনা মনে হল। আব্বাসিকে বললাম, 'নামটি চেনা চেনা মনে হচ্ছে। পৌঁছে দেব। কিন্তু তোমাকে এই চিঠিটি কে দিয়েছেন?' আব্বাসি জবাব দিল, 'মামু'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মামুটি কে?' আব্বাসি জবাব দিল, 'মুজতবা আলি আসমার মামা।' একসঙ্গে আমার হৃদয়তন্ত্রীতে কয়েক হাজার কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি মুহূর্তের জন্য বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়লাম। আমি অভিযোগের সুরেই বললাম, 'এই তিন-চার মাসে আসমা বা তুমি কেউই আমাকে একবার জানালে না যে মুজতবা আলি তোমাদের মামা।' পরে মনে হল ওদের দোষ দিয়ে কী লাভ! এটা তো আমারই অপরাধ একরকমের। আমিইবা কেন ভুলে ছিলাম যে প্রায় বছর তিনেক আগে আলি খুবই অসুস্থ হয়ে ঢাকায় আসেন। তারপর থেকে আর শান্তিনিকেতনে যাননি। আমি দ্রুত শার্ট গলিয়ে আব্বাসিকে বললাম, 'চলো তোমাদের মামুর কাছে।' আব্বাসি তাঁর গাড়ি আনতে চাইল। আমি বাধা দিয়ে ওকে নিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে দু'জনে রিকশাতে উঠলাম। ধানমন্ডি লেনে ঢোকার মুখেই সম্ভবত দু'তিনটি বাড়ি পরেই আব্বাসি রিকশা থামিয়ে দিতে বলায় বুঝতে পারলাম আমরা এসে গিয়েছি। ঢাকার এই এলাকাটির একটি বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে একটু ছোট 'লন' আছে। আব্বাসি আস্তে করে আমায় বলায় দেখতে পেলাম ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে অত্যন্ত কৃশকায় একজন কেউ বসে রয়েছেন। তিনি যে মুজতবা আলি সে বুঝে নেওয়া কার সাধ্যি। এই দুরন্ত মানুষটিকে আমি ১৯৬০ সালের পর আর দেখিনি। রিকশা ঘোরানোর শব্দেই হোক বা আমাদের পায়ের শব্দেই হোক সেই লোকটি চোখ তুলে চাইলেন। আমাকে পাজামা পরা তিনি কখনও দেখেননি। জ্বলজ্বলে চোখ দুটি নিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। কাছে যেতেই চোখ নামিয়ে নিলেন। আমি বিনা দ্বিধায় মেঝেতে ওঁর পায়ের কাছে বসে পড়লাম। ওর দুটো হাঁটুতে হাত রেখে নবাবি দরবারের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলাম, 'গোস্তাকি মাপ হুজুর।' এবার হাত বাড়িয়ে আমার চুলের মুঠি ধরে তিনি বলে উঠলেন, 'মাপ কখনই নয়। ইয়ার্কি, বদমাশটা...।' এই সময় ওঁর স্ত্রীর গলা পেলাম। আব্বাসিকে লক্ষ করে তিনি জানালেন যে তিনি তো স্কুলের পথে। 'মেহমানকে' আপ্যায়নের ভার আব্বাসির হাতে দিলেন। বেরিয়ে যাওয়ার মুখে আমাকে মেঝেতে বসে থাকতে দেখে ছুটে এলেন—মুজতবাকে বললেন, '...এ কী তুমি 'মেহমানকে' মাটিতে বসিয়ে...।' মজুতবা বিনা ভ্রূক্ষেপে বললেন, 'এই ব্যাটা যে কত বড় 'মেহমান' তা তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি...।' আমি দাঁড়িয়ে উঠে মিসেসকে নমস্কার করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'ভাই, আমার আর কিছু বলার নেই...আমি চললাম।' মিসেস আলি তখন কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের হেডমিসট্রেস। এবার আমি মুজতবা আলির মুখোমুখি চেয়ারে বসে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, আপনি কি আব্বাসিকে দিয়ে ওই চিঠিটা পাঠিয়ে 'টেস্ট কেস' করতে চাইলেন? কারণ, আমি প্রতিমাদিকে চিনতাম, তিনি যখন দমদম এয়ারপোর্টে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের গ্রাউন্ড হোস্টেস। সেটা তো ভোলেননি দেখছি।' এবার অনেকটা সহজ হলেন। বললেন, 'ব্যাটা তুই জল দিয়ে খামটা খুলে চিঠিটা পড়িসনি তো?' আমি বললাম, 'সময় পেলাম কই? আব্বাসি বলল, এটা মামু দিয়েছে। আর মামুটি মুজতবা আলি...পরক্ষণেই রিকশা...তারপর ধানমন্ডি। তবে একটা কথা...ওই খামটা যদি বসন্তমঞ্জরী দেবীর নামে হত তাহলে খুলতামই...।' এবার হাত বাড়িয়ে আমার কানটা টানলেন গম্ভীরভাবে। কে এই বসন্তমঞ্জরী দেবী?

ফিরে যাই কুড়ি বাইশ বছর আগের কটক শহরে। মুজতবা আলি তখন কটকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর স্টেশন ডিরেক্টার। আর বসন্তমঞ্জরী দেবী? ওড়িশার এক দেশীয়

রাজ্যের সুন্দরী রাজকুলবধূ। রাজা স্বামীর লাম্পট্য ও সুরাসক্তির জন্য বসন্তমঞ্জরী রাজপরিবার থেকে বেরিয়ে এলেন। যোগ দিলেন রাজনীতিতে। ড. হরেকৃষ্ণ মহাতবের শেষ মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন এই বসন্তমঞ্জরী। কখন কীভাবে বসন্তমঞ্জরী দেবী মুজতবা আলির হৃদয়ের কাছে এসে পড়েছিলেন জানি না তবে পঞ্চাশের যুগের শেষভাগে কটকের খবরের কাগজগুলিতে এই নিয়ে অনেক কথা লেখা হয়েছে। ওড়িশা বিধানসভায় বিরোধী দলের সদস্যেরা এরকম প্রশ্ন তুলেছেন যে কেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বসন্তমঞ্জরী দেবী প্রতি সন্ধ্যায় মুজতবা আলিকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠান? কিন্তু বসন্তমঞ্জরী ওই সব প্রশ্নের তোয়াক্কাই করতেন না। তবে এটুকু অনেকেই জেনে গিয়েছিলেন যে বসন্তমঞ্জরী দেবী নিঃসঙ্গ জীবনে মুজতবা আলির কাছে কিছু ভালবাসা যার সাধারণ অর্থ মমতা—তাই পেয়েছিলেন। মুজতবা আলি যখন কটক ছেড়ে চলে আসেন (সম্ভবত তিনি কটক থেকেই রেডিওর চাকরিতে অবসর নিয়েছিলেন) সেদিন বসন্তমঞ্জরী কটক স্টেশনে এসে মুজতবা আলিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ট্রেনের শেষ কামরাটি অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছিলেন।

ঢাকা থাকাকালীন সময়ে বারতিনেক মুজতবা আলিকে দেখতে গিয়েছিলাম। মনে পড়েছিল ১৯৫৪/৫৫ সালের কথা। কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকার পার্ল রোডের বাড়িতে আবু সয়ীদ আইয়ুব আমাকে প্রথম মুজতবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ওই বাড়িটির দোতলায় আইয়ুব থাকতেন। তিনতলায় মুজতবা আলি মাঝে মাঝে কারও কাছে আসতেন। তখন তিনি আইয়ুবের ঘরে ঢুকে পড়ে আইয়ুবের রোগা হাল্কা শরীর ধরে খুব ঝাঁকুনি দিতেন। ওপরে তিনতলায় দাপাদাপি শুনলেই আইয়ুব বলে উঠতেন, 'এবার সাইক্লোন যে কোনও সময়ে আমার ঘরে আছড়ে পড়বে...।' মুজতবা আলিকে সেই প্রথম দেখি। তখন তিনি দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে। সে সময় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে 'দেহলি প্রান্তে' শিরোনামে একটি কলাম প্রকাশিত হত। ওই লেখা কখনও মুজতবা আলি এবং কখনও সন্তোষকুমার ঘোষ লিখতেন। অতুলনীয় ছিল এই লেখা। ১৯৬০-এর গোড়াতে মুজতবা আলির সঙ্গে আমার আবার নতুন করে পরিচয় ঘটে দমদম এয়ারপোর্টে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের সেই সময়কার 'এরিয়া ম্যানেজার' এস আর দত্তের মাধ্যমে। এস আর দত্তসাহেব শ্রীহট্ট জেলার লোক—মুজতবা আলির একেবারে শৈশবদিনের বন্ধু—দু'জন দু'জনকে 'তুই' বলে শ্রীহট্টের ভাষায় কথা বলতেন। এই পরিচয়টিতেই আমার মুজতবা আলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। অসম, মণিপুর, ত্রিপুরা, বিহার, ওড়িশাসহ সারা পূর্বাঞ্চলে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একচ্ছত্র কর্তাব্যক্তি ছিলেন এই এস আর দত্ত। ওই সময়কালে পূর্বাঞ্চলে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের শতকরা ৮০ জন কর্মীই ছিলেন বাঙালি এবং তাঁরা নারী-পুরুষ প্রায় সকলেই ছিলেন পূর্ব বাংলার জেলাগুলির। এই কৃতিত্ব প্রায় সবটাই এস আর দত্তের। মুজতবা আলি নিজেও বহু বাঙালি মেয়েকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে এয়ার ও গ্রাউন্ড হোস্টেসের চাকরিতে ঢুকিয়েছেন এস আর দত্তকে দিয়ে। ঢাকায় মুজতবা আলিকে দেখার পর এসব অনেক কথাই মনে পড়ছিল। একদিন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ওর কাছে গিয়েছি। বাড়িতে পরিচারিকা ছাড়া আর কেউ নেই। এই সময় একটি মেয়ে আমারই কাছাকাছি বয়সের হবে ঢুকলেন হুড়মুড়িয়ে। মুজতবা আলি শ্রীহট্টের ঢঙে তাকে আমার কাছে দাঁড় করিয়ে জানালেন যে এই মেয়েটি আসমার দিদি সালমা। আমি ঢাকায় যত সুন্দরী মেয়ে দেখেছি, ইনি তাঁদের অন্যতমা বলতে আমার দ্বিধা নেই। প্রায় চল্লিশ ছুই ছুই বয়স হবে। কী সুন্দর মুখশ্রী ও দেহসৌষ্ঠব। গায়ের রং বোন আসমার মতো অতটা উজ্জ্বল নয়। কিন্তু খুবই ঝকমকে। মুজতবা আলি তাঁর এই ভাগ্নিটিকে আমার নাম বলতেই চমৎকার ভ্রূভঙ্গি করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে ফেললেন, '...না দরকার নাই আলাপের...উনি আসমার বাড়ি কতবার গেছেন কতবার খাইছেন—আর একবারও আমার বাড়ি আইলেন না...।' এবার মুজতবা আলির আমাকে ভর্ৎসনা, 'এই ক'দিনে ঢাকায় বসে দুই বোনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধালি?' আসলে সালমার সঙ্গে সামনাসামনি এই প্রথম দেখা হলেও তিনি বোন আসমার কাছে আমার কথা শুনে আমাকে ফোন করেছেন কয়েকবার তাঁদের বাড়ি যেতে। কিন্তু ওঁর বাড়িটা বেশ খানিকটা দূরে। তাছাড়া সালমা একটি মেয়ে কলেজের অধ্যাপিকা। তাই সালমার সঙ্গে আমার সময়ের মিল না হওয়াতে এই বিপত্তি—এই অভিমান! সালমা কলেজে যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে এভাবেই তাঁর মামাকে দেখতে আসেন। সেদিনও এসে পড়াতে আমার সঙ্গে এই কাণ্ড। যাহোক সালমার অভিমান অনেকটা স্তিমিত করে তাঁর মামাকে কথা দিলাম যে আমি তাঁর আদরের বড় ভাগ্নি সালমার বাড়িতে যাব। এরপর মুজতবা আলিকে একটু সাহস করে বলে ফেললাম, '...শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক বিন্যাসে একটু ভুল করেছেন।' মুজতবা আলির বক্র ঘোষণা 'সেটা আবার তোর কী আবিষ্কার রে...।' আমিও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই। আমিও গলা চড়িয়ে বললাম, 'নারীনাং মাতুলক্রমও বটে...।'

ঢাকায় আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় সাংবাদিকদের অনেকগুলি বিধি ছিল সেগুলি সবই অলিখিত অনুশাসন যা

মাথায় রেখে কাজ করতে হত। এর মধ্যে পয়লা নম্বরটি হল এই উপমহাদেশের যে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের পটভূমি। দু'নম্বরটি হল পেশাগত দায়বদ্ধতা। এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা খুব সহজ কাজ নয়—বিশেষ করে আমরা যে সব রিপোর্টার অভ্যুত্থানের প্রথম লগ্ন থেকেই বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত। একাজে আমি যাঁর কাছে বিশেষ পরামর্শ পেতাম ও নিতাম তিনি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের (I F S) অরুন্ধতী ঘোষ। এর সঙ্গে আমার সম্পর্কের একটা জায়গা আগে থেকে ছিল তা আগেই বলেছি। অরুন্ধতী ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসাবে যোগ দিয়েই হাইকমিশনের সিনিয়ার ও জুনিয়ার অফিসারদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে আমি তাঁর 'দাদার বন্ধু এবং একই সঙ্গে দাদাও।' এই অন্তরঙ্গ পরিচয় আমার ঢাকার দিনগুলিকে খুবই সমৃদ্ধ করেছে। এই অরুন্ধতীকে নিয়ে বাংলা সংবাদপত্রে তেমন কিছু কখনওই লেখা হয়নি। কেবল ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সময়কালে তিনি যখন ইউনেস্কোতে (UNESCO) এবং রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনে প্রধান ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেছিলেন, তখন বাংলাসহ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি তাঁর খুব গুণগান করেছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন ভারতীয় অফিসার হিসাবে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে যে-ভূমিকা পালন করেছিলেন তার অনেকটাই রইল অলিখিত। ১৯৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে অরুন্ধতী কলকাতায় এলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসার হিসাবে। তাঁর প্রধান কাজ ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর 'বেঙ্গল রেজিমেন্টের' যেসব সৈন্য ও অফিসার বিদ্রোহ করে বাংলাদেশ অভ্যুত্থানের সহযোগী হলেন তাঁদের সঙ্গে ভারতে চলে আসা আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক কর্মীদের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা এবং সেইসঙ্গে 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস' বাহিনীকে যুক্ত করা। এটাই ছিল 'মুক্তি বাহিনীর' মূল কাঠামো। যেসব যুবক পূর্বপাকিস্তানের জেলাগুলিতে তাঁদের বাবা মা ও পরিজনদের রেখে এসেছেন তাঁদের খোঁজ নেওয়া ও তাঁদের সঙ্গে গোপন যোগসূত্র তৈরি করার দুরূহ মানবিক কাজটির দায়িত্ব ছিল অরুন্ধতীর ওপর। এভাবে তিনি 'মুক্তি বাহিনীর' জওয়ানদের অসংখ্য পরিবারকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। ফলে তিনি যখন ১৯৭২-এর গোড়ায় ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনে একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি (First Secretary) হিসাবে নিযুক্ত হলেন তখন তিনি 'মুক্তি বাহিনীর' জওয়ান ও তাঁদের বহু পরিবারের কাছে 'দিদি' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন।

একদিন গড়িয়ে যাওয়া মধ্যাহ্নে সেগুনবাগিচার বাড়ির ঘরের টেবিলে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে কিছু একটা লেখার কথা ভাবছিলাম। এমন সময় অরুন্ধতী ঘোষ এসে হাজির। এসেই কোনওরূপ ভণিতা না করে বলে উঠল, 'বউদিকে ফোন করে চেঁচামেচি করাব...না আমার কথা শুনবে?' আমি একেবারেই হতবাক হয়ে বলতে চাইলাম 'কেন কী হয়েছে?' এবার অরুন্ধতী আমাকে সাংঘাতিকভাবে বিস্মিত করে দিয়ে বলল, '...আজ সকালে তোপখানা রোডের মোড়ে কে তোমাকে রিকশাতে টেনে তুলল?' আমি বললাম, 'রাস্তায় একগাদা লোকের সামনে ওই সিরিন মেয়েটা আমাকে টেনে রিকশায় তুলে নিল। সিরিন আমাকে কিছু বলারই সুযোগ দিল না...। কেবল শ্রীহট্টের বাচনভঙ্গিতে বলে উঠল —'কিতা ভাবতছিলেন দাদা।'... আসলে আমি তোমারই খুব চেনা 'ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সির (ENA) সিরাজের কাছে যাব বলে একটা রিকশার জন্য অপেক্ষা করছিলাম...।' সিরিন বলে যে মেয়েটিকে নিয়ে এই কথা তিনি অত্যন্ত স্মার্ট ঢাকা শহরের একটি মেয়ে। খুব ভাল রাশিয়ান ও স্প্যানিশ ভাষা বলতে কইতে পারেন। ভারতীয় হাইকমিশনসহ ঢাকার বিভিন্ন দূতাবাসের পার্টিতে তাঁকে দেখা যায়। প্রচুর মদ্যপান করতে পারেন। এভাবেই তাঁর সঙ্গে আমার ঢাকার সোভিয়েট দূতাবাসে এক পার্টিতে পরিচয়। তারপর থেকে অনেকবারই ভারতীয় হাইকমিশনের পার্টিতে সিরিনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আড্ডা হয়েছে। এবার অরুন্ধতী বলল, 'দ্যাখো, সিরিনকে আমাদের মতো অন্য অনেকেরই প্রয়োজন। ওর সঙ্গে মদ খাও, আড্ডা মারো...ব্যস ওই পর্যন্ত। কখনই ওর ফ্ল্যাটে যাবে না...ওর সঙ্গে গাড়িতে উঠবে না...। সিরিন যথেষ্ট গণ্ডগোলের মেয়ে। তুমি আমাকে বলনি...কিন্তু আমি জানি সিরিন তোমাকে অনেকবারই ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে...তুমি এড়িয়ে গিয়েছ...।' এবার আমি হেসে ফেললাম...বললাম, 'আমার ওপর এত নজর কেন তোমাদের...!' এতক্ষণ অরুন্ধতীর মধ্যে একটু টেনশন ছিল। এবার সহজভাবেই জবাব দিল, 'তোমাকে দেখিয়ে আমি সবাইকে বলি he is my Dada's friend...he is also my Dada...। ফলে কর্তৃত্ব তো আমি কিছুটা করবই...আর তোমার ওপর নজর কেবল আমার নয়—অনেকেরই তোমার ওপর নজর আছে। এবার বল তো সোভিয়েট ডিপ্লোম্যাট গুরগেনভ্ (Gurgenov) তোমার কাছে এই বাড়িতে এসেছিল কেন? তোমাকে নিয়ে এই নামকরা ডিপ্লোম্যাট প্রায় অর্ধেক দিন বুড়িগঙ্গায় নৌকায় কাটিয়েছিল কেন?'

এবার গুরগেনভের কথা একটু বলি। ১৯৬০-এর গোড়া থেকে ৮/৯ বছর গুরগেনভ কলকাতায় সোভিয়েট দূতাবাসে

ভাইস কন্সাল ও পরে কন্সাল জেনারেল ছিলেন। সেই সময়ে গুরগেনভের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। কলকাতায় আসার আগে এই সোভিয়েট কূটনীতিবিদ ঢাকায় সোভিয়েট দূতাবাসে (১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে) নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকায় তিনি বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। মোটামুটি ভালভাবে বাংলা বলা শিখে তিনি কলকাতায় যান। কলকাতায় তিনি অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষের বাংলা শেখার ইন্সটিটিউটে যোগ দিয়ে বাংলায় লেখাপড়ার বেশ কয়েকটি সার্টিফিকেট অর্জন করেন। এই সোভিয়েট কূটনীতিবিদ কখন যে আমাকে পছন্দ করে ফেলেছিলেন তাও আমি জানি না। আমি সাংঘাতিক সাংঘাতিক কমিউনিস্ট বিরোধী লেখা লিখি এটা জেনেও তিনি আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। এটা আমার কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। তবে আমার গুরগেনভকে মানুষ হিসাবে খুব ভাল লাগত। ১৯৬৯ সাল নাগাদ তিনি কলকাতার সোভিয়েট দূতাবাস থেকে বদলি হয়ে যান। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হঠাৎ একদিন ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গুরগেনভের সঙ্গে দেখা। এর কয়েকদিন আগে The Statesman পত্রিকার বিখ্যাত রিপোর্টার মানস ঘোষ ওই কাগজের তরফে ঢাকায় কাজ করতে আসেন। মানসকে নিয়ে ওই হোটেলের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। গুরগেনভ তাঁর কয়েকজন সোভিয়েট সহকর্মীকে নিয়ে হোটেলের লবিতে কোথাও বসেছিলেন। আমাকে দেখামাত্র চিৎকার করে বাংলায় আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মানস তো হতবাক এই বাংলাজানা সাহেবের কাণ্ড দেখে। আমি মানসের সঙ্গে গুরগেনভের পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি ইংরাজিতে Statesman পত্রিকার এই রিপোর্টারের কাছে জানতে চাইলেন যে তিনি কতদিনের জন্য ঢাকায় কাজ করতে এসেছেন। মানস ইংরাজিতে জবাব দিয়েছিল 'Three years.' মানসের জবাব শুনে এই অভিজ্ঞ সোভিয়েট কূটনীতিবিদ গলার স্বর নামিয়ে বলে ফেললেন, 'What...three years! ...Sukharanjan, what will happen to this wretched country tomorrow morning...!' সোভিয়েট কূটনীতিবিদের এই উক্তিটি আমি একদিন একান্তে ভারতীয় কূটনীতিবিদ অরুন্ধতী ঘোষকে বলেছিলাম। অরুন্ধতীর সেটা মনে ছিল।

বাকিটা যে অরুন্ধতীকে কেন জানি না আমার বলা হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ গুরগেনভ যে এই সেগুনবাগিচার বাড়িতে এসে আমাকে নিয়ে একদিন বেরিয়েছিল। অরুন্ধতী তারই জের টেনে আমাকে মনে করিয়ে দিল যে আমার ওপর 'ঢাকায় অন্যদেরও নজর আছে।' অরুন্ধতী খোলাখুলিই আমাকে বলেছিল যে বাংলাদেশের ঘটনাবলির ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা, আমার অনুভূতি ও ব্যাখ্যা সোভিয়েট কূটনীতিবিদ গুরগেনভের খুবই প্রয়োজন ছিল তাই তিনি আমাকে নিয়ে বুড়িগঙ্গায় নৌকায় চেপেছিলেন। অরুন্ধতীর কথা তখনও শেষ হয়নি। তখনও তাঁর বলা চলছে '...আমরা তোমাকে নজরে রাখি তার অনেক কারণের মধ্যে একটা কারণ তুমি মাঝে মধ্যে অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে ঢাকার বাইরে চলে যাও—যেটা অন্য ভারতীয় রিপোর্টাররা করে না। ...তুমি একদিন হঠাৎ করে কুমিল্লা চলে গেলে অধ্যাপক অম্লান দত্তের বাড়ি দেখতে—দীনেশচন্দ্র সেন মশাই কুমিল্লার যে স্কুলে একসময় বাংলা পড়াতেন সেই স্কুলটি দেখতে। ...নদীতে দশ-বারো মাইল নৌকায় চড়া কিন্তু অনেকটা পথ... তুমি ওইভাবে ধলেশ্বরী নদী পেরিয়ে ড. প্রফুল্ল ঘোষের গ্রাম মালেকান্দায় গান্ধী আশ্রমের ভিটা দেখতে গিয়েছিলে? ...সেখান থেকে আর একটা গ্রাম শ্রীপুরে গেলে বিখ্যাত বিপ্লবী প্রতুল গাঙ্গুলির জন্মভিটা দেখতে...নোয়াখালির শ্রীরামপুরে গান্ধী আশ্রম দেখার জন্য তোড়জোড় করেছিলে। আমার বারণ শুনতে চাওনি। পরে হোম সেক্রেটারি তছলিমউদ্দিন আমেদ নিষেধ করলে নিরস্ত হলে তো...। আরও বাকি আছে...তুমি কয়েকদিনের জন্য খুলনা চলে গিয়েছিলে। অবশ্য আমাকে বলেছিলে যে তুমি খুলনা যাচ্ছ... আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তোমার ছোটবেলার শহর...স্মৃতির টানে যাচ্ছ...কিন্তু ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন...খুলনা রওনা হওয়ার আগে তুমি London Times-এর পিটার হ্যাজেলহার্স্টের (Peter Hazelhurst) হোটেলে গিয়েছিলে। ওই ব্রিটিশ রিপোর্টারের কাছ থেকে তুমি দৌলতপুরের ঘটনাবলি শুনে নিয়েছিলে। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি আগে জানতে পারলে তোমাকে আটকে দিতাম। কারণ খুলনা শহর থেকে দৌলতপুর যাওয়ার রেললাইন ও রাস্তা দুই-ই একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তুমি এমনই সেয়ানা যে ওই পরিস্থিতি অনুমান করে তুমি খুলনা স্টিমারঘাটে না নেমে আগের দৌলতপুর স্টিমারঘাটে নেমে গিয়েছিলে। দৌলতপুর ঘাটে স্টিমার থেকে নেমে রিকশায় করে তোমার যা দেখার তা দেখে নিয়েছিলে। কারণ ইন্টারন্যাশন্যাল রেড ক্রশ ওইসব উর্দুভাষী শ্রমিকদের রেখে দিয়েছিল নদীর পারের চটকল গুদামে। কলকাতা থেকে আমাদের কিছু লোককে দৌলতপুরে পাঠানো হয়েছিল যশোর রোড ধরে। আমাদের লোকেরাও 'বিদেশি' রিপোর্টারদের শনাক্ত করতে সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু তোমার ভূগোল জ্ঞানটা এতই নির্ভুল ছিল যে তুমি যা দেখার তা দেখে দৌলতপুর ঘাট থেকে একটা নৌকা ভাড়া করে

নদীর ভাঁটির টানে দ্রুত খুলনা স্টিমারঘাটে পৌঁছে গিয়েছিলে। খুলনা শহরের 'টাউন হোটেলে' তুমি দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলে। হোটেলের রেজিস্টারে তোমার নাম ছিল...।' এতখানি ঘটনাবলির বিবরণ দিয়ে অরুন্ধতী একেবারে রিলাক্সড মুডে বলেছিল '...এবার বুঝে নাও তোমার ওপর আমি কেন নজর রাখি...। এবার শেষ কথা বলি...আমি মেয়ে—তাই অন্য কোনও মেয়েকে তোমার চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি চিনতে পারি... এটা মানবে তো?' —আমি জবাব দিয়েছিলাম 'ভগবানের এই দান উপেক্ষা করার সাহস আমার নেই...।'

(খুলনার দৌলতপুরের ঘটনাবলিকে London Times 'Daulatpur Massacre' আখ্যা দিয়ে ব্যানার হেডলাইনে পিটার হ্যাজেলহার্স্টের পাঠানো খবর ছেপেছিল। ঢাকার ভারতীয় সাংবাদিকেরা ওই খবর নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে যাতে বিব্রত না করেন সে সম্পর্কে দিল্লি ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। আমি সম্ভবত একমাত্র ভারতীয় সাংবাদিক যে দৌলতপুরের ঘটনাবলির কিছু চিহ্ন দেখে নিয়েছিলাম। বোম্বাই'য়ের 'The Current' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি এ বিষয়ে 'London Times'-এ প্রকাশিত সংবাদটি হুবহু পুনর্মুদ্রণ করেছিল। তার ফলে ভারতের উর্দুভাষী মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল এবং 'Save Biharees' নামে কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। খবরে এরকম বলা হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক রেড ক্রশের তত্ত্বাবধানে যে হাজার ত্রিশ উর্দু ভাষী চটকল শ্রমিক দৌলতপুরের চটকল গুদামগুলিতে ছিল সেখানে বাংলাভাষী মুসলমানেরা আক্রমণ চালিয়ে তিন থেকে পাঁজ হাজার বিহারি মুসলমানদের খুন করেছিল। তবে এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান আন্তর্জাতিক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্ফর খান পেশোয়ার থেকে ঢাকায় শেখ মুজিবরকে একটি চিঠি লিখে দৌলতপুরের ঘটনায় তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশ করেছিলেন।)

ঢাকায় আমরা ভারতীয় রিপোর্টাররা বলতে গেলে প্রতিদিনই আমাদের হাইকমিশনে যেতাম। কোনও কোনওদিন আবার কোনও নির্দিষ্ট অফিসারের কাছে যেতাম। এরকম একদিন অরুন্ধতী ঘোষের ফোন পেয়ে ওর কাছে গিয়েছি। ঘরে ঢুকতেই অরুন্ধতী বলল, 'তোমায় কোনও খবর দেব বলে ডাকিনি। ডেকেছি একটা কাজের জন্য। সেটা হল—তোমায় যদি কোনও মহিলা বা পুরুষ নেমন্তন্ন করতে চান, তাহলে তাতে রাজি হবে। ওটা আমার স্বার্থে, বুঝলে?' আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে না পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। তখন সে ব্যাপারটা আমাকে এভাবে বুঝিয়ে দিল যে ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি মহিলা ডিপ্লোম্যাট বলে তাঁকে অনেক ব্যক্তি ও সংগঠন ডিনারে ডাকে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা না থাকলেও কূটনৈতিক বিবেচনায় তাঁকে ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হয়। ওইসব পার্টিতে প্রচুর মদ্যপান চলে। ফলে বেশি রাতে ওই লোকদের কারও গাড়িতে তাঁকে বাড়ি ফিরতে হয়। কিন্তু গাড়িতে ফেরার সময় তাঁকে বার দু'য়েক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। তাই ওটা এড়ানোর জন্য অরুন্ধতী আমন্ত্রণকারীদের আমাকেও 'নিমন্ত্রণ' করার শর্ত দিয়েছে। কারণ ফেরার সময় আমি তাঁর সঙ্গে থাকছি। আমি রাজি হয়ে বললাম, 'ঠিক আছে...কেবল প্রতি মাসে মদ্যপানের দিনের সংখ্যা কয়েকটা বাড়বে আর কী।' এরকম অনেকগুলো পার্টিতে আমরা গিয়েছি আলাদা। কিন্তু অনেক রাতে ফিরেছি অরুন্ধতীকে নিয়ে। এগুলোর মধ্যে একটা পার্টি ছিল কয়েকটা কারণে মনে রাখার মতো। আমন্ত্রণকারী ছিলেন বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের স্ত্রী। তিনি ঢাকায় মহিলা অফিসারদের একটি সংগঠন চালান। পার্টি হয়েছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ঘর ভাড়া করে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি ও অরুন্ধতী ছাড়া আরও একজন হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ময়মনসিং শহরের লোক, পদবি 'আচার্য'—ঢাকা শহরে মাঝে মাঝে আসেন। শিক্ষিত মুসলমান পরিবারগুলিতে বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে তাঁর খুবই জনপ্রিয়তা। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করেন যে 'আচার্যবাবু' এক 'ঐশ্বরিক ক্ষমতার' অধিকারী। তিনি মানুষকে দেখে, কেবল তাঁর পাশে বসে সেই ব্যক্তির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 'বলতে পারেন'। এই ধরনের লোকদের প্রতি আমার আগ্রহ দীর্ঘদিনের। ফলে আমার ঔৎসুক্য ছিল ঢের। আমি ও অরুন্ধতী পাশাপাশি বসে। আচার্যবাবু অরুন্ধতী সম্পর্কে কিছু বলতে আগ্রহ দেখালেন। অরুন্ধতী তাঁকে জানিয়ে দিল, 'আপনি বলতে পারেন তবে প্রেম-ভালবাসা-বিয়ে এসব বাদ দিয়ে। আমার কেরিয়ার, শরীরস্বাস্থ্য সম্পর্কে শুনতে আপত্তি নেই।' আচার্যবাবু আমাকে অরুন্ধতীর কাছে খানিকটা সরে বসতে বললেন। এক ঘর স্তব্ধতার মধ্যে আমরা সকলেই উৎসুক হয়ে আছি। আচার্যবাবু কিছুক্ষণ অরুন্ধতীকে দেখলেন। কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। এরপর তিনি বললেন, 'আপনারা দু'জনেই বাংলাদেশকে ভালবেসে ফেলেছেন। দু'জনে অবশ্যই আলাদা আলাদা ভাবে। কিন্তু দু'জনই হঠাৎ করে ঢাকা থেকে চলে যাবেন অত্যন্ত বিষণ্ন মনেই...।' একথা শুনেই অরুন্ধতী আমাকে লক্ষ করে খোঁচা দিয়ে বলল, 'দাদার চলে যাওয়ার জন্য জ্যোতিষ জানার দরকার নেই। ওটা আমিই বলে দিতে পারি। যদি শেখ মুজিবর রহমানের

মতো একজন ব্যক্তি তাঁর সপ্তাহের সাংবাদিক বৈঠকে দাদাকে না দেখলে বলে ওঠেন—সুখরঞ্জনবাবুকে দেখলে আমার বাবার ধুতিপরা চেহারা মনে পড়ে। আমাদের সেই সময় আমার বাবা-কাকারা ওরকম ধুতি পরতেন—এটা শুনলে অন্য রিপোর্টারদের হিংসে হবে না? সুতরাং দাদাকে কলকাতার কয়েকজন রিপোর্টারের হিংসা ঢাকা থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আওয়ামি লিগের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও শেখসাহেবের অতি ঘনিষ্ঠ জিল্লুর রহমান ছিলেন। তিনি অরুন্ধতীর কথায় খুব হাসলেন। আরও কয়েকজন হেসে উঠলেন। আচার্যবাবুও হাসিতে যোগ দিয়ে বললেন, 'তাই বলে আপনারাও বাদ যান না—দাদার প্রতি আপনাদের ভালবাসাও ওই ঈর্ষার আরও একটা কারণ তা অস্বীকার করতে পারবেন না...যাক সে কথা...কিন্তু মিস ঘোষ, আপনি ঘুমের মধ্যে সাংঘাতিক দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ওঠেন, তাই না? আপনার মেরুদণ্ডে একটা দুঃসহ ব্যথাও হয় মাঝে মাঝে। এটা অবহেলা করবেন না।' খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে মধ্যরাত পেরিয়ে গেল। গাড়ির কাছে এসে অরুন্ধতী বলে ফেলল, 'তোমাদের অফিসের গাড়িটা আজ আমি চালাব... ভয় পেও না...আমি গাড়ি ভালই চালাই?' হোটেল থেকে অরুন্ধতীর বাসস্থান হাইকমিশনের কাছে অনেকটা দূরের পথ। ড্রাইভার পিছনে চলে এল। গাড়ি চালাতে চালাতে অরুন্ধতী বলল, '...ওই আচার্যবাবু লোকটি দুটো কথা কিন্তু ঠিক বলেছে...আমি সত্যি ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠি...মনে হয় আমাকে কেউ মারছে...আর কোমরের কাছে আমার spinal chord মাঝে মাঝে খুবই যন্ত্রণা দেয়...। আর একটা তো ভবিষ্যতের কথা...।' কিন্তু সেই মুহূর্তে অলক্ষে অদৃশ্য দেবতা বিষণ্ণ হাসি হেসেছিলেন।

এই সময়ের প্রায় দেড় বছর পরে ১৯৭৪ সালের শেষদিকে ঢাকা সেক্রেটরিয়েটে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল। ১৯৭২ সালের গোড়া থেকেই বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সরকার পর্যায়ে দেখা সাক্ষাতের কাজটা প্রধানত ভারতের পক্ষে অরুন্ধতী ঘোষই করতেন। ফলে সেক্রেটরিয়েটের নিরাপত্তা অফিসাররা ও লিফটম্যানরা সকলেই অরুন্ধতীকে চিনতেন। তাঁরা 'আদাব' দিয়ে এই ভারতীয় অফিসারকে সম্মান জানাতেন। কিন্তু ওইদিন একটা অঘটন ঘটল। অরুন্ধতী লিফটে ঢুকলে লিফটম্যান তাঁকে 'আদাব' দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন কেরানি হুড়মুড় করে লিফটে ঢুকে পড়ল। লিফট ছেড়ে দিতেই ওই লোকটি অরুন্ধতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর গায়ের জামা ছিঁড়ে দিল। অরুন্ধতী লোকটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, লিফটম্যান এক হাতে লিফটের হ্যান্ডেল ধরে পা দিয়ে ওই আক্রমণকারীকে আঘাত করছে। এই অবস্থায় তিনতলায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে লিফট থামতেই ওই লোকটি লিফট থেকে নেমে পালিয়ে গেল। অরুন্ধতী শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজেকে আবৃত করে অশ্রুসিক্ত চোখে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের ঘরে ঢুকলেন লিফটম্যানকে সঙ্গে নিয়ে। লিফটম্যানের কাছ থেকে কয়েকটি কথা শুনেই শেখসাহেব চিৎকার করতে করতে ঘরের বাইরে এলে অফিসাররা ছুটে এলেন। আক্রমণকারীর নাম লিফটম্যান বলে দেওয়াতে তখনই তাকে সরকারি নির্দেশে সাসপেন্ড করা হল। শেখসাহেব এই লাঞ্ছনার জন্য অরুন্ধতীর কাছে ক্ষমা চাইলেন। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে যা যা করণীয় তিনি তাই করলেন। কিন্তু ঘটনার তিন-চারদিন পরে সেক্রেটরিয়েটের একদল কর্মচারী ওই লোকটিকে সাসপেন্ড করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন এবং 'ভারতীয় মহিলা অফিসারের ঔদ্ধত্য সহ্য করব না'—এই ভাষায় পোস্টার সাঁটলেন সেক্রেটরিয়েটের দেওয়ালে! আমি তখন আর ঢাকায় নেই। কলকাতায় অরুন্ধতীর এই অপমানের সংবাদ আমার চোখে জল এনে দিয়েছিল। বছর ত্রিশ বয়সের এই মেয়েটি বাংলাদেশের মানুষের জন্য ১৯৭১ সালে কত বিনিদ্র রাত্রিযাপন করেছে...সীমান্তের জেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বাপ-মায়ের খবর রেখেছে সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টদের মারফৎ...বাপ-মায়ের হাতে টাকা পৌঁছে দিয়েছে...তাঁকেই এই লাঞ্ছনা! এরপর ভারত সরকার অরুন্ধতীকে ঢাকা থেকে বদলি করে দিল। আমার মনে উঠে এল বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের স্ত্রীর দেওয়া পার্টিতে 'ভবিষ্যদ্বক্তা' আচার্যবাবুর কথা '...আপনারা দু'জনেই বাংলাদেশকে ভালবেসে ফেলেছেন...কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কারণে আপনারা ঢাকা থেকে চলে যাবেন বিষণ্ণতা নিয়ে!'

১৯৭৩-এর নির্বাচনের পর মে মাস নাগাদ একদিন মুজতবা আলিকে দেখতে গেলাম। অনেকদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে খবর নিতাম ওঁর ভাগ্নি আসমার কাছ থেকে। শরীরটা আর ধরে রাখতে পারছিলেন না কিছুতেই। প্রতিদিনই নতুন নতুন উপসর্গ তাঁকে শেষ মুহূর্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয়বার যখন আলিসাহেবের কাছে এসেছি তখন সাহিত্য বা লেখা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করিনি। ওঁর শেষদিকের, বলতে গেলে একেবারেই শেষের দিকে ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সালের সময়ের একটি অসাধারণ হাস্যরসাত্মক লেখার প্রসঙ্গ তুললাম। লেখাটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'রবিবাসরীয়'তে প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়টি ছিল 'গুল' মারা

অর্থাৎ কাল্পনিক ও অবান্তর কাহিনিকারদের জন্মবৃত্তান্ত। লেখাটির প্রতিটি লাইনে পাঠককে হাসতে হবে দম ফাটিয়ে। প্রসঙ্গের অবতারণা করতে গিয়েই আমি হেসে ফেলেছিলাম। ‘গুল’ কাহিনিকারেরা মুজতবা আলির লেখায় জন্ম নিয়েছিল পাঠান মুল্লুকে। তখন ‘গুল’বাজদের নাম ছিল গুল মহম্মদ, গুল ওস্তাদ, গুলসান, গুল বাহাদুর প্রভৃতি। মোগল মুল্লুকে ওই ‘গুল’বাজদের পদোন্নতি ঘটল। তখন নাম হয়েছিল ‘সম্রাট গুলমগীর’—কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে সেই ‘গুলবাজ’ দিল্লিতে এসে নাম পেলেন ‘গুলজারিলাল’। আমার এই শেষ নামটির পুনরুক্তিতে লেখক মুজতবা আলি নিজেও হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে আমাকে পিঠে চড় মেরে বলেছিলেন, ‘তুই ব্যাটা সাংঘাতিক মনে রাখিস...।’ কথা প্রসঙ্গে তিনি ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র সন্তোষকুমার ঘোষের উল্লেখ করলেন। দিল্লিতে পঞ্চাশের যুগে তাঁরা দু’জনে ওই পত্রিকায় পালা করে একটি ‘কলম’ লিখতেন। উঠে আসার সময় একটু অভিযোগ আর কিছুটা তিরস্কারের সুরে বললেন, ‘তুই এখনও সালমার বাড়ি যাসনি কিন্তু...।’ আমি বলে ফেললাম ‘ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে অবশ্যই যাব।’ আমার এই উক্তিতে মুজতবা ইজিচেয়ার থেকে ওঠবার চেষ্টা করতেই আমি ওকে চেপে বসিয়ে দিলাম। এই সময় তিনি আমার আঙুলগুলি চেপে ধরে বললেন, ‘তুই ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছিস বুঝি!’ মুজতবা আলির বড় ভাগ্নি সালমার বাড়িতে একদিন তাঁকে তেমন সময় না দিয়েই চলে গিয়েছিলাম। ঢাকা নিউ মার্কেটের কাছে সরকারি হাউসিং এস্টেটে থাকেন সালমা তাঁর দুই সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে। বাচনভঙ্গিতে মাধুর্যের সঙ্গে প্রখরতা যথেষ্ট। এখানটাতেই বোন আসমার সঙ্গে বেশ অমিল। আমাকে যখন খাবার দিচ্ছিলেন তখন সালমাকে বলে ফেললাম, ‘দেশবিভাগের সময়কালে ও তার আগে জেলা শহরে যখন ছিলাম, তখন যেসব মুসলমান পরিবারকে প্রতিবেশী পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আপনার মতো মেয়ের অস্তিত্ব পাইনি—অবশ্য তখন মেয়েদের সম্পর্কে কৌতূহলের বয়সে এসে গিয়েছি।’ সালমা আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন, ‘...যদি পেতেন তাহলে কি এদেশ ছেড়ে চলে যেতেন না?’ পরক্ষণেই সালমা বললেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমি জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রহনক্ষত্রে বিশ্বাস করি। কিন্তু কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াতে পড়াতে কখনও কখনও একথা ভাবি যে রাষ্ট্রবিপ্লব বা ওই জাতীয় যেকোনও অভ্যুত্থান বুঝি মানুষের সবচেয়ে বড় ভাগ্য নিয়ামক—যা আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনকে নাস্তানাবুদ করে দেয়!’ কথাটা একেবারেই ঠিক। তাই নিরুত্তর রইলাম। একটু পরে সালমা আবার বললেন, ‘আপনি তো বছর খানেক হল ঢাকায় আছেন—আপনি যে মেয়ে-পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকেন তাতে আপনার কানে পৌঁছে যাওয়া স্বাভাবিক...।’ আমি কথা না বলে সালমার দিকে ঔৎসুক্য নিয়ে চেয়ে আছি। সালমা বললেন, ‘...আমি নাম বলব না। ঢাকার একটি মেয়েদের কলেজের প্রিন্সিপাল যিনি খুব নামকরা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী এবং যাকে আপনাদের ইন্দিরা গান্ধী চেনেন তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনাদের ওখানে চলে গিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট সম্মানের একটা কাজও পেয়েছিলেন। তিনি স্বাধীনতার পরপরই ঢাকায় ফিরে এলেন, কলেজে পড়ানো শুরু করলেন। তারপর তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর স্বামী গোপনে আর একজনকে বিয়ে করে ফেলেছেন। এবার তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটা বুঝুন কী অবস্থায়! যদি বাংলাদেশের অভ্যুত্থান না ঘটত তাহলে তাঁর দাম্পত্যজীবন অটুট থাকত, একথা তো বলা যেতেই পারে...। আপনার পেশার কয়েকজন রিপোর্টার মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয়েও আগের স্ত্রীদের ত্যাগ করে এই শহরেরই অন্য মেয়েদের গোপনে বিয়ে করে ফেলেছে। একজন ফিল্ম ডিরেক্টার তো একজন হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছেন। তাই নিয়ে তাঁর পরাক্রমশালী শাশুড়ি প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমানের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। তাই বলছিলাম যে ব্যক্তিজীবনে গ্রহনক্ষত্রের যে বন্ধন আমরা দেখতে পাই, রাষ্ট্র বিপ্লব বা অভ্যুত্থান সে সব তছনছ করে দিতে পারে...।’ ফিরে আসার সময় সালমা আমার সঙ্গে নীচে নেমে এলেন। হাত ধরে আমাকে রিকশায় তুলে দিয়ে বললেন, ‘খুদা হাফিজ’। আমিও ‘খুদা হাফিজ’ পুনরুচ্চারণ করে বললাম, ‘নারীনাং মাতুলক্রম’।

ঢাকার পাট আমি চুকিয়ে দিলাম ১৯৭৩-এর বর্ষার সময়। যেদিন প্রথম চলে আসার দিন ছিল, সেদিন সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টি। ঢাকার বৃষ্টি আমার খুব ভাল লাগে। ওই বৃষ্টির মধ্যেই এয়ারপোর্টে এলাম। কিন্তু সারা রানওয়ে জলে থই থই। কোনও বিমানকেই নামার অনুমতি দিচ্ছে না কন্ট্রোল টাওয়ার। ফলে কলকাতা থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমান ঢাকায় নামতে না পারায় আমার আর সেদিন কলকাতায় ফেরা হল না। আমার অফিসের গাড়ির ড্রাইভার আমার যাওয়াতে বাধা পড়ায় বেজায় খুশি হয়ে বলেছিল, ‘ঢাকা আপনারে ধইরা রাখতে চায়।’ কলকাতায় ফেরার কয়েক মাস পরে আমি পত্রান্তর গ্রহণ করি অর্থাৎ ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ গোষ্ঠীতে যোগ দেই। সেখান থেকে অবসর নেওয়ার মুখে ১৯৯১ সালের শেষে দিল্লিতে যাই আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ সিভিল সার্ভেন্ট বন্ধুর সঙ্গে জীবনে শেষবারের মতো দেখা করতে। অরুন্ধতী তখন সিওলে

(দক্ষিণ কোরিয়া) আমাদের রাষ্ট্রদূত—প্রথম বাঙালি মেয়ে 'রাষ্ট্রদূত'। ঢাকায় তাঁরই সহকর্মী ছিলেন এস. কে. লাম্বা (IFS)—তিনি তখন পররাষ্ট্র দপ্তরে 'পাকিস্তান ডেস্ক'-এর দায়িত্বে। সে সময় পাকিস্তানে আমাদের হাইকমিশনার জিতেন্দ্রনাথ দীক্ষিত। দীক্ষিত ঢাকায় আমাদের ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে খুবই বিশেষজ্ঞ অফিসার। দীক্ষিত ও লাম্বা এই দুই অফিসারই ঢাকায় আমাকে এই বলে ভালবাসতেন, 'since you are Arundhuti's Dada—you are also our Dada...'। লাম্বা ইসলমাবাদে ফোন করে দীক্ষিতকে জানিয়েছিলেন যে আমি অবসর নিচ্ছি। ইসলামাবাদ থেকে জিতেন্দ্রনাথ দীক্ষিত আমাকে মনে রাখার মতো সুন্দর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন '...time flies so fast. I recollect those exciting days in Bangladesh we have witnessed and shaked together...'।

বাংলাদেশের জীবনপ্রবাহের সূচনাপর্ব আমার দু'চোখ ভরে এখনও ভাসে। প্রায় চল্লিশ বছর আগের ওই জীবন প্রবাহের জন্মমুহূর্তের ঢাকা—সেই সেগুনবাগিচা, সেই রমনা, সেই নীলখেতের ঠাসবুনোন শিরিষ গাছগুলির প্রখর দ্বিপ্রহরের স্নিগ্ধ উদাসী হাওয়া আমাকে ডাকে। প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় জন্মমুহূর্তের দিনগুলির ছবি যেখানে আসমা, সালমা, আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ ও তাঁর বাগদত্তা কুমিল্লার সেই মেয়েটি, কামাল লোহানি, বাবুল ওসমান এবং একুশে ফেব্রুয়ারির কবিতাপাগল এক অবিশ্বাস্য মেয়ে প্রজন্মের অস্তিত্ব...বাংলাদেশের জীবনদেবতাকে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে—

'যখন যাব চলে
ওরা ফুটবে তোমার কোলে'

এক আলাদা বাংলার জন্ম জন্মান্তরের সাক্ষী হয়ে।

(সমাপ্ত)

সবিনয় নিবেদন

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'চতুরঙ্গ' সাহিত্য পত্রিকাটির প্রকাশ অনিবার্য কারণে আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। এজন্য অনুরাগী পাঠক, সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতা এবং গুণী লেখকবৃন্দের কাছে আন্তরিক দুঃখ জানাই। যাঁরা এই ঐতিহ্যবাহী পত্রিকার সত্তর বছরের দীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন ভাবে অকৃপণ সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার কোনও সীমা নেই। যদি এই পত্রিকাটির প্রকাশ আবার কখনও সম্ভব হয়, তাহলে অবশ্যই সবাইকে সে-বিষয়ে অবহিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নীরা রহমান
প্রকাশক
চতুরঙ্গ

বাংলা সাহিত্য-পরিবেশ বিশ্লেষণে অপরিহার্য দু'টি গ্রন্থ

স্বপন মজুমদার

বিদ্যায়তনিক বাংলা বিদ্যাচর্চাকে যাঁরা সম্মান এনে দিয়েছেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (১৯১২-২০০৭) সেই পুরোগামীদের অন্যতম। পাঠকক্ষে এই শিক্ষকদের খ্যাতি একদিকে যেমন বিষয়কে গৌরব দিয়েছে, তেমনই বহু ছাত্রছাত্রীকেও আকৃষ্ট করেছে বাংলা বিদ্যার চর্চায় কেবলমাত্র তাঁদেরই অধ্যাপনার সুকৃতিতে। গত শতাব্দীর ৫০ ও ৬০-এর দশকে কলকাতার বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ এমনই এক পরিচিত প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল অধ্যাপক ভট্টাচার্য ও তাঁর সতীর্থদের শিক্ষকতার সুবাদে। এঁদের মধ্যেও স্বতন্ত্র ছিলেন তিনি; রজতকৌলীন্যে অথবা সরকারি আনুকূল্যে প্রসাদপুষ্ট বিদ্যায়তনে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার আহ্বান তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। তাঁর ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করেছেন তাঁরই আপন আসনে থেকে।

ভুল হবে যদি শুধুমাত্র শিক্ষকতার গৌরবেই তাঁকে চিনতে চাই আমরা। পাঠকক্ষের সঙ্গে সমকালীন সাহিত্যের এক নিরন্তর সংযোগও রচনা করে চলেছিলেন তিনি। পাঠক্রমের মাধ্যমে পাওয়া সাহিত্যপাঠের রীতি ও রুচি তিনি তাঁর নিজের অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর আঙিনায়। তাঁর সময়ের কবি ও কথাশিল্পীদের বিষয়ে শুধু ব্যক্তিগত পরিচয়ের মধ্যেই তাঁর অনুসন্ধিৎসা শেষ হয়ে যায়নি, তাঁদের লেখার গুণাগুণ বিচারের থেকেও বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল সমসময়ের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সৃজনধর্ম নিবিড় করে জানার এক আন্তরিক আমন্ত্রণ। তার মধ্যে গবেষকের অহমিকা ছিল না, বিশেষজ্ঞের অভিমান ছিল না, তাত্ত্বিকের গম্ভীরতা ছিল না, ছিল রসিকের আনন্দ-উপভোগ।

২

সজনীকান্ত ও তারাশঙ্করের সঙ্গে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠতা প্রায় আত্মীয়তার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এই নৈকট্য একদিক থেকে যেমন আলোচককে এক অতিরিক্ত মাত্রা দিতে পারে তাঁর সহৃদয় বিশ্লেষণে, অন্যদিকে তেমনই এক অলঙ্ঘ্য অন্তরায়ও হয়ে উঠতে পারে তাঁর নিরাসক্ত বিচারে। এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলেই অধ্যাপক ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের সম্পর্ক-ইতিহাস বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের পরিকাঠামোর ওপর রেখে। এই পরিকল্পনার জন্যই বইটি নিছক ব্যক্তি-সম্পর্কের উত্থানপতনের মানচিত্র হয়ে থাকেনি, গত শতাব্দীর ২০ ও ৩০ দশকের সাহিত্যসমাজের বিরোধসংকুল পরিবেশের এক প্রতিবেদন হয়ে উঠেছে যেন। বোঝাই যায়—আর অধ্যাপক ভট্টাচার্যও অকপটে উল্লেখ করেছেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *কল্লোল যুগ*-এর একদেশদর্শী বয়ানের পরিপূরক হিসাবে *শনিবারের চিঠি*-র সম্ভাব্য বয়ানটিই যেন উত্থাপন করতে চেয়েছেন এই বইয়ের লেখক। *চিঠি*-র বিভিন্ন সংখ্যা, সজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথের পত্রবিনিময়, সজনীকান্তের কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য লেখা—বিশেষ করে তখন পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত *আত্মস্মৃতি*-র দু'টি খণ্ড ও *চিঠি*-তে প্রকাশিত ধারাবাহিক তৃতীয় খণ্ড ছিল তাঁর রচনার প্রধান উপকরণ। কিন্তু এই উপাদান-সমাহার গ্রথিত হয়েছিল অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সহানুভূতিশীল মন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পরিচয়ের অলক্ষ্য গ্রন্থিতে।

বলা বাহুল্য, কোনও পক্ষপাতমূলক বিবরণের প্রতিবিবরণও পক্ষপাত বর্জন করে চলতে পারে না। সে-সংকট এই বই লেখার ক্ষেত্রেও পূর্ণমাত্রায় ছিল এবং লেখকও সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন সে-বিষয়ে। আর তাই পৌরাণিক আখ্যানের আদলে সজনীকান্তের জীবনে 'শত্রুভাবে উপাসনার' ও তার সম্প্রসারণে ভক্তভাবে আত্মনিবেদনের এক পর্ব-পর্বান্তর নির্দেশ করে দিতে হয় তাঁকে। সজনীকান্তের স্বভাবের সমুন্নত ও স্খলিত দু'টি দিকই ধরিয়ে দেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর এই বইতে। তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারেন, 'সজনীকান্ত একসময় রবীন্দ্রবিদূষণে শালীনতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন।' (ভূমিকা, পৃ [৯]।) আবার সজনীকান্তের ব্যঙ্গকবিতার 'খাতা-বগলে' মোহিতলালের 'এই নবাবিষ্কৃত কবিশিষ্যকে নিয়ে পরিচিত মহলে প্রচার' করে বেড়ানোকে তাঁর মনে হয়, 'মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ' (পৃ. ১৪)।

সজনীকান্তের সব দাবি অবশ্য অতর্কে মেনে নেননি অধ্যাপক ভট্টাচার্য। 'আমাদের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল

ভানের বিরুদ্ধে, ন্যাকমির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কণীলেহনের বিরুদ্ধে।', *আত্মস্মৃতি*-র এই আত্মপক্ষ সমর্থন সংশয়ের দৃষ্টিতে বিবেচনা করেছেন লেখক : '*শনিবারের চিঠি* সর্বক্ষেত্রে এই আদর্শ রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা তা অবশ্যই তটস্থ বিচারের অপেক্ষা রাখে। এবং সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিপক্ষকে কোমরবন্ধের অধোদেশে আঘাত করা হয়নি, একথা সজনীকান্তও নিশ্চয়ই হলফ করে বলতে পারতেন না।' (পৃ ৪১-৪২।) সহানুভূতি সত্ত্বেও এই স্বচ্ছতা অধ্যাপক ভট্টাচার্যের রচনার প্রধান গুণ।

কোনও তার্কিক সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, লেখকের এই সহানুভূতি কি ব্যক্তির জন্য, না ব্যক্তির অবস্থান বা তাঁর আদর্শের প্রতি? আমার ধারণা, কোনও সনিষ্ঠ পাঠক *রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত* বইটি পড়লেই বুঝতে পারবেন, বাংলা সাহিত্যের এই তর্কক্লেদসংকুল সময়ে *চিঠি*-র প্রকাশভঙ্গি সর্বত্র সমর্থন করা না-গেলেও তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা কঠিন ছিল। এমনকী একালেও এমন একটি প্রতিবাদী পত্রিকার অভাব অনুভব করেছেন অনেক সাহিত্য-বিবেচক। সজনীকান্তের এই আপসহীন অবস্থানই সম্ভবত লেখকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জন করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে অস্বস্তিও ছিল লেখকের মনে। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের বিরুদ্ধে বিদূষণে তাঁর যে ঈষদুষ্ণ সমর্থন ছিল, ১৩৩৫ থেকে ১৩৪৫ পর্যন্ত যাকে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন 'গুরুদ্রোহে'র পর্ব, রবীন্দ্র-বিরোধিতার এই দশককে ততটাই কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন লেখক : 'দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনা যে তাঁকে বারবার পথভ্রষ্ট করেছে তার নিদর্শনও তাঁর জীবনে দুর্লভ নয়।' (পৃ ৭৫।) সজনীকান্তর স্বীকারোক্তি— 'অবিমৃষ্যকারিতা', 'নির্বোধ হঠকারিতা'—তিনি যথার্থ মনে করেই পুনর্ব্যবহার করেছেন। কিন্তু লেখককে অনেক নিশ্চিন্ত, আনন্দিত ও স্বচ্ছন্দ মনে হয় বইয়ের শেষ দু'টি অধ্যায়ে ('দক্ষিণাবর্ত বহ্নি' ও 'গুরুদক্ষিণা') যেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সজনীকান্তর 'পুনর্মিলন' সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন তিনি।

কবিতা লেখায় সজনীকান্তের দক্ষতা অস্বীকার করা যায় না। প্যারডি বা ব্যঙ্গকবিতা যেখানে অন্য একটি রচনার অবলম্বন আছে, সেখানে তাঁর সফলতা যতটা, যেখানে অনুভূতি-কল্পনা থেকে তাঁর কবিতার উৎসার সেখানে ততটা নয়। কিন্তু কবিতার মধ্য দিয়েও সজনীকান্তের মনোপরিবর্তনের সমর্থন পাওয়ার জন্য অধ্যাপক ভট্টাচার্য সম্ভবত এই প্রসঙ্গটি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' (১৯৩১) ও সজনীকান্তের 'কে জাগে' (১৯৩৩) (পৃ ১১২-১৯) বা সজনীকান্তের *রাজহংস*-এর 'পান্থপাদপ' (১৩৪২ চৈত্র) ও রবীন্দ্রনাথের *শ্যামলী*-র উৎসর্গ-কবিতা (১৩৪৩ ভাদ্র) বা *সেঁজুতি*-র 'যাবার মুখে' (১৩৪৩ মাঘ) মিলিয়ে পড়া কাব্যগুণের বিচারে সমতুল্য না-হলেও কবিদের সন্নিহিত মনোভাব বুঝে নেওয়ার পক্ষে জরুরি ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত শুধু 'গুরুশিষ্যে'র সম্পর্ক-ইতিহাস নয়, অধ্যাপক ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, সজনীকান্তের 'কবিজীবনী'।

৩

ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের তারাশঙ্কর বিষয়ক প্রবন্ধ-সংগ্রহ। মরণোত্তর এই প্রকাশনায় যে-পরম্পরাক্রমে লেখাগুলোকে আমরা পেলাম এখানে তাঁর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখকের নিটোল পরিকল্পনা, যেগুলি সংগ্রথন করে দিয়েছেন শ্রীনন্দন ভট্টাচার্য, শ্রীতপোব্রত ঘোষ ও শ্রীশুভেন্দু দাসমুন্সী। সংকলনকর্তারা প্রভূত সাধুবাদ পেতে পারেন তার জন্য।

বইয়ের প্রথম পর্যায়ে স্থান পেয়েছে ১৯৭৫-৭৭ খ্রিস্টাব্দে *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ*-এর ভূমিকায় অন্তর্ভূত তাঁর জীবনকথা (পৃ ১-১০০)। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে *শনিবারের চিঠি*-তে অনিয়মিত প্রকাশিত অসমাপ্ত 'ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর'। বিষয় ও সময়-সমীপতায় তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ১৯৭৩-এ প্রকাশিত *তারাশঙ্কর রচনাবলী*-র পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকা। *তারাশঙ্কর গল্পগুচ্ছ*-এর সাহিত্য আলোচনা নিয়ে গ্রথিত হয়েছে পরবর্তী পর্যায়। আর পরিশিষ্টে স্মৃতিমূলক দু'টি লেখা ও 'তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের পল্লীচেতনা' (*রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী*-র সমালোচনা) দিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে বইটি।

সজনীকান্ত বিষয়ে বইটির ক্ষেত্রে যেমন, তারাশঙ্কর বিষয়েও অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের অন্যতম অবলম্বন অবশ্যই ছিল তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক বইগুলি। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় তাকে ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছিল। তার পরিচয় আছে পরিশিষ্টের দু'টি স্মৃতিকথায় : 'শঙ্করদা' ও 'ব্যক্তিগত তারাশঙ্কর'-এ।

আকাশবাণীর এক বেতার-কথিকায় তারাশঙ্কর বলেছিলেন, 'উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত...এই শতবর্ষের ইতিহাস ও উপাখ্যান নিয়ে মহাভারতের মত নবভারত রচিত হোক, বিভিন্ন প্রদেশ নিয়ে বিভিন্ন পর্ব।... এই মহাকাব্যের একটি অংশ লেখার ইচ্ছা আমার হয়।' (পৃ ২৬২।) অংশটি 'মহাভারতের বঙ্গ পর্ব'। ভারতকথার এই স্বপ্ন আজও সাহিত্যে চরিতার্থ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু

ভারতবর্ষের এক ক্রান্তিকালে এক অঙ্গপ্রদেশ বাংলার মর্ম-ইতিহাস রচনা করে গেছেন তারাশঙ্কর। গ্রাম ভেঙে শহরে, কৃষি ছেড়ে শিল্পে, পৌরাণিক থেকে লৌকিকে ছড়িয়ে পড়ছে যে-জীবন, তার সংকট ও মূল্যবোধের পরিবর্তন মরমী মন নিয়ে দেখেছিলেন তারাশঙ্কর; তাঁর আখ্যান-সাহিত্য গড়ে উঠেছে সেই জীবনকে কেন্দ্র করেই।

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের পরিগ্রহণের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে আছে এই পরিবর্তনকালের গোষ্ঠীগত সাহিত্যবিচার। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন গান্ধীপন্থী ও কংগ্রেস সমর্থক। জীবনযাপনে সত্যকার সাম্যবাদী। জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও লেখার উপার্জনই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। তাঁর জীবনের প্রথম পর্ব 'ভাগ্যের অবহেলার কাল, অবজ্ঞার যুগ', লিখেছেন তিনি নিজেই (পৃ ৪৮)। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেছে রাজসূয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ললাটে এঁকে দিয়েছেন রাজটীকা : 'তোমার স্থূলদৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্ম স্পর্শ আছে, আর তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয় তাতে বাস্তবতার কোমরবাঁধা ভান নেই, গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি। লেখায় অকৃত্রিমতাই সবচেয়ে দুরূহ।' (১২ মার্চ ১৯৩৭। পৃ ৫১।)

তারাশঙ্করের জীবনের শেষ পর্ব 'সমৃদ্ধি, সার্থকতা ও স্বীকৃতির', লিখেছেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য। স্বাধীন ভারতে তিনি রাজসম্মান পেয়েছেন, দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন চীনে ও রাশিয়ায়। পুরস্কার-সম্মান এসেছে অবারিত। নাট্যমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাঁর লেখা। কিন্তু আঘাত তখনও থামেনি। প্রথম ও উত্তর পর্বের মধ্যবর্তী এক বিক্ষুব্ধকে তারাশঙ্কর যুক্ত হয়েছিলেন ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে। তাঁদের 'সমাদরে সমারোহে নিশ্চয়ই অনেকটা আচ্ছন্ন হয়েছিলাম বই কি! সেদিন তাঁদের কাছে পেয়েছি অনেক...। দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এঁদের কর্মীরা। সে সময় সেইটেই আমাকে মুগ্ধ করেছিল।' অকপটে স্বীকার করেছেন তারাশঙ্কর। (পৃ ৭৮।) কিন্তু অল্পসময়ের জন্য হলেও এই সংযোগ নিয়ে রাজনীতির দুই পক্ষেই তাঁকে বিড়ম্বিত হতে হয়েছিল।

কিন্তু তার থেকেও এক বড় সংকটে বিদ্ধ হয়েছিলেন তারাশঙ্কর এইসময়ে। নাস্তিক্য আর আস্তিকতা, বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতার টানাপোড়েনে তখন বিধ্বস্ত হচ্ছিলেন তিনি। এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির পথ তিনি পেয়েছিলেন অলৌকিক দুই ঘটনা থেকে, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল তাঁর দীক্ষাগ্রহণে (১৯৫৪)। একদিকে এই অধ্যাত্মসন্ধান, অন্যদিকে জমিদারি-বিলোপের ক্ষতিপূরণ বিনোবাজির ভূদান-যজ্ঞে দান করে আত্মমুক্তি তারাশঙ্করকে আত্মস্থ করে তুলল। তিনি লিখেছেন, 'শেষ জীবনটা শুধু ভাবব, খুঁজব, ডাকব। এই তিন পথে জগৎ ও জীবনের উৎসকে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি, সেইটে জানবার রোঝবার বা যদি কেউ বলবার থাকে তবে তার কাছে শোনবার চেষ্টা করব।' (পৃ ৮১।) ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাসকে তারাশঙ্কর দেখেছিলেন পরিবর্তনশীল এক স্রোত হিসাবে আর তার অন্তরতর সত্তাকে ধ্রুব ও সনাতন এক অস্তিত্ব হিসাবে। এই দু'য়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণ থেকেই ভারতশিল্পের বিকাশ লক্ষ করেছিলেন তিনি। তারাশঙ্করের সাহিত্যে তারই উদ্‌যাপন বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর এই লেখাগুলিতে।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলতে পারতেন, এ-বই তারাশঙ্করের যথার্থ কবিজীবনী। তথ্যময় জীবন আর সৃষ্টিময় ভুবন উভয়কেই মিলিয়ে তৈরি হয়ে উঠেছে এই বয়ান। একের পর এক আখ্যানের পরিচয় আর তার কাছে-দূরের সময়ের পরিধি মিলে তৈরি হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতার এক আরশিনগর। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পরিবেশনের গুণে *ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর* একই সঙ্গে তাই হয়ে উঠতে পারে সৃজনশীল সমালোচনার এক বিরল উদাহরণ। সানুরাগ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, আবার অন্যদিকে পূর্বপক্ষের মত খণ্ডনের দায়িত্ব স্বীকার করেও, অধ্যাপক ভট্টাচার্য কিন্তু তাঁর বিচারকে একদেশদর্শী করে ফেলেননি; যখনই সঙ্গত বিবেচনা করেছেন, সমালোচনা করতে ইতস্তত করেননি। তাঁর লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি, *গণদেবতা* ও *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* তারাশঙ্কর সংস্কার করেন অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতামতের ভিত্তিতেই। লেখকের ঔদার্য আর সমালোচকের সত্য ভাষণের সাহস, দু'য়েরই অসামান্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে ঘটনা দু'টি।

জীবনের অন্ত্যপর্বেও সংসার প্রতিপালনের জন্য নিরন্তর লিখে যেতে হয়েছিল তারাশঙ্করকে। তার পরিণাম সম্বন্ধে অচেতন ছিলেন না তিনি। লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে আমাকেই সবথেকে বেশী লিখতে হয়, সে-সব রচনা সাময়িকপত্রের কলেবরই পুষ্ট করে, তার থেকে বেশী কিছু হয়ে উঠতে পায় না, পারে না। সময়ও পাইনে, হয়তো বা শক্তিও ক্ষয়িত হয়ে এসেছে।' (পৃ ৯৫।) এমন সত্য স্বীকারের তেজ আমাদের কালেও কি সহজলভ্য?

৪

একই সময়ের দুই সাহিত্যপুরুষকে তাঁর লেখার বিষয় করেছিলেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন

ধাতুতে গড়া, তাঁদের সৃজনক্ষেত্র স্বতন্ত্র। অনুভূতিময় শ্রদ্ধায় তাঁদের জীবন ও কর্মকে, সময় ও পরিপার্শ্বকে, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশকে আবিষ্কার করেছেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য। বিংশ শতাব্দীর মধ্যকালীন পাঁচটি দশকের বাংলা সাহিত্যের সাহিত্য-পরিবেশের বিশ্লেষণ হিসাবেও অপরিহার্য হয়ে থাকবে এই দু'টি বই। আমাদেরই শ্রদ্ধেয় এক অধ্যাপক, যাঁকে আমরা চিনতাম, তিনিই যে গ্রন্থ দু'টির লেখক, সেই আমাদের গৌরব।

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত—জগদীশ ভট্টাচার্য/ভারবি, কলকাতা-৭৩। (দ্বিতীয় সংস্করণ)/১০০.০০

ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর—জগদীশ ভট্টাচার্য/ভারবি, কলকাতা-৭৩/১৫০.০০

স্বর্ণকুমারী দেবী : একটি অন্য সম্ভাবনা : অপূর্ণ

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সরলাদেবী চৌধুরাণী তাঁর আত্মকাহিনিতে লিখেছেন, 'মামী-মাসিদের প্রাতঃকালীন ভাঁড়ার ঘরের বৈঠকটি বেশ জমে। উপরেই ভাঁড়ার ঘর—তাঁরা সেখানে বসে সবাই মিলে তরকারি কোটেন। দাসীরা মাছ কোটে নীচে রান্নাঘরের কাছে।

এই তরকারি কোটার আসরে বড় মাসিমা, মেজ মাসিমা, বড় মামী, ন-মামী...এই কজনের নিত্য উপস্থিতি দেখতে পেতুম, দিদিও যেতেন। আমার মা কখনোও সেখানে আসতেন না।' (জীবনের ঝরাপাতা)

তরকারি কোটার আসরে আড্ডা জমাবার জন্য স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়নি। তিনি হয়ত তখন লিখছিলেন, 'আকাশে চন্দ্র নাই। রজনী অন্ধকার কিন্তু মেঘশূন্য। কুয়াশাহীন, নির্ম্মল। সুতরাং ছায়াপথের আভা এবং নক্ষত্রভাতির প্রশান্ত আলোকে সেই অন্ধকারের ভীষণতা লোপ করিয়া চৌদিক রমণীয়, মৃদু মধুর করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ তারকা-দীপ্ত প্রশান্ত রাত্রি স্নেহলতার বড় ভাল লাগে। এইরূপ কত রজনীতে, নক্ষত্রখচিত সুগভীর আকাশের দিকে চাহিয়া নীরব বিশ্ব সঙ্গীতে তাহার আত্মা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র মানব হৃদয়ের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া তাহার দুঃখতাপপীড়িত হৃদয় অপূর্ব শান্তি রসে ডুবিয়া গিয়াছে।' (স্নেহলতা বা পালিতা)

স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে নৈসর্গিক সৌন্দর্য সম্পর্কে এরকম মুগ্ধ বিহ্বলতা যেমন বারে বারে এসেছে, তেমনই মানব হৃদয়ের, মানবাত্মার সৌন্দর্যও কম অভিভূত করেনি লেখিকাকে। তাঁর 'কাহাকে?' উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর আরেক ঔপন্যাসিক, George Eliot (তিনিও নারী, আসল নাম Mary Ann Evans), তাঁর সম্পর্কে লেখিকার আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। George Eliot ওই রকম এক রজনীতে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর বস্তু ওই নক্ষত্রখচিত আকাশ এবং মানুষের কর্তব্যবোধ।' স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে মানুষের হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে তার কর্তব্যচেতনার সংঘাত একটা প্রধান স্থান অধিকার করেছে। 'স্নেহলতা' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয়। তার পাত্র-পাত্রীরাও যে খুব সুনির্দিষ্ট সুসম্পূর্ণ আকৃতি পরিগ্রহ করতে পেরেছে তাও বলা যায় না। তাঁর উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয়, তাঁর কল্পনা, তাঁর যে সৃজনশক্তি, ইংরাজিতে যাকে বলে creative energy, তাকে তিনি তত দূর খেলাতে পারেননি যাতে নিজস্ব অস্তিত্ব বিশিষ্ট মানুষ তা থেকে বেরিয়ে আসে, যেমন কুমোরের আঙুলের কৌশলে তার ঘুরন্ত চাকা থেকে সুন্দর হাঁড়ি-পাতিল বেরিয়ে আসে, আমাদের চোখের সামনে।

কিন্তু ওই যে সংঘাতের কথা বললাম, যা কোনও ব্যক্তিবিশেষের, কোনও বিশেষ নারী, বিশেষ পুরুষের কাহিনি নয় সেটা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে তাঁর কলমে। Wordsworth তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় কর্তব্যকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তুমি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরের কঠোর কন্যা, stern daughter of the Voice of God যতই সে কঠোর হোক, সে অলঙ্ঘনীয়। স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা'-য় সে কেমনভাবে এসেছে?

'পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে চারুর মূর্তি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, চারুর গতি টলমল, দৃষ্টি বিহ্বল, অথচ প্রদীপ্ত, সমস্ত মূর্তি অস্বাভাবিক...। স্নেহ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। চারু বিকৃত অসংলগ্ন স্বরে বলিল, স্নেহ দেখ, আমার ভবিষ্যৎ মূর্তি চাহিয়া দেখ। তুমিই আমার এই দশা করিয়াছ।'

চারুর এই দশার কারণ, স্নেহলতা, যে নিজেও চারুকে নিজের সমগ্র আত্মা, সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে কামনা করে, তার

কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে গিয়ে মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার কানে সেই অমোঘ কণ্ঠস্বর।

স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটিও প্রেমেরই কাহিনি, এবং প্রেম সেখানে অতটা ভাবরাজ্যের বস্তু নয়। স্বর্ণকুমারী ভাবরাজ্যে বিচরণ করতে ভালবাসতেন, তাঁর নায়িকারা সংগীতের মধ্য দিয়ে অহরহ নিজেদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করেন, সংগীতের দ্বারা অভাবনীয়ভাবে প্রভাবিত হন। 'ছিন্নমুকুল'-এ নীরজা একাকিনী গভীর জঙ্গলে নিশীথ রাত্রিতে গান গেয়ে গেয়ে ভ্রমণ করে। 'কাহাকে?'-তে মৃণালিনীকে একটি গানের কয়েকটি কলি এমন সম্মোহিত করে যে সেটা প্রায় বিশ্বাসযোগ্যতার সীমাই অতিক্রম করে যায় বলে মনে হয়।

তারপর সংগীতের সম্মোহনটা কেটে যাওয়ায় অবশ্য কাহিনি এবং সেইসঙ্গে তার নায়িকাও যুক্তিগ্রাহ্য জগতে নেমে আসে। তখন সেই উপন্যাস, 'কাহাকে?' স্বর্ণকুমারীর প্রকৃত শক্তিকে উন্মোচিত করে। এই উপন্যাসের নায়িকা একজন আধুনিকা, পুরুষদের সমকক্ষ। তাদের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনারত, আধুনিক সমাজ ও প্রাচীন সংস্কার নিয়ে সুস্পষ্ট স্বচিন্তিত প্রকাশে অকুণ্ঠিত। যে সমস্যাটি নিয়ে উপন্যাসের নামকরণ, দু'জনের মধ্যে কাকে সে স্বামীরূপে গ্রহণ করবে তার মধ্যেই আমরা আধুনিক নারীকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি।

স্বর্ণকুমারীদেবী তাঁর উপন্যাসের মধ্যে চিন্তার জগতে প্রবেশ করেছেন, যে-চিন্তা মানুষের—পুরুষ কিংবা নারীর নয়। এইখানেই নারীর মুক্তি। অবাক হতে হয় যখন পড়ি, 'মানুষ নিতান্ত অদূরদর্শী, সামান্য বুদ্ধি, অসম্পূর্ণ জীব। সে ফল কামনা করিয়া কার্য করিতে গিয়া প্রায়ই এক ফল চাহিয়া অন্য ফল পায়, তাহার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হয়।' এ তো গভীর চিন্তার প্রসারিত পর্যবেক্ষণের ফল। এবং এখানেই তিনি থামেননি। 'দুরভিসন্ধিময় কার্যের পরিণাম পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা এই শিক্ষাপ্রাপ্ত হই। এইখানেই অসীম ন্যায়মঙ্গলের পরিচয় ও বিশ্বের বুদ্ধি যে আমাদের বিবেচনাকে অতিক্রম করিতে চান, ইহাই তাহার প্রমাণ আর এই জন্যই জ্ঞানীগণ ভাল কাজও নিষ্কামভাবে করিতে বলেন।

গল্প, উপন্যাস, গাথা, বিজ্ঞান-প্রবন্ধ, গীতিনাটক, কৌতুক নাট্য, কাব্যনাট্য, প্রহসন, নাটক পাঠ্যপুস্তক স্বরলিপিগ্রন্থ, হেন জিনিস নেই যা এই বহু প্রসবিণী নারী রচনা করেননি। শুধু উপন্যাস ও কাহিনি, কিংবা প্রধানত উপন্যাস ও কাহিনি লেখাতেই যদি তিনি মনোযোগ দিতেন, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সমৃদ্ধি আরও গভীরতা লাভ করত, আরেকটা নতুন দিক থেকে, একজন অতিশয় যোগ্য নারীর দিক থেকে তার ওপরে অন্য একটা আলো আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত।

স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র, ১ ও ২—সংকলন, সম্পাদন, ভূমিকা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়/দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা—৭৩/দু'খণ্ড একত্রে ৬৫০.০০

লেটো গানের ঐশ্বর্যের ডালি

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

বই-এর নাম 'প্রসঙ্গ : লেটো গান'। লেখক মুহম্মদ আয়ুব হোসেন। লেটো গান মানে সেই লোকনাট্য দুখু মিয়া যার গান বা পালা বেঁধে কাটিয়ে ছিলেন তাঁর কৈশোর জীবন, পরে খ্যাতনামা হয়েছিলেন কাজি নজরুল নামে। তাঁর বাড়ি ছিল বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। গ্রন্থের লেখক মুহম্মদ আয়ুব হোসেনের বাড়িও বর্ধমানের চুরপুনি গ্রামে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে আচার্য সুকুমার সেনকে। ঘটনাক্রমে তিনিও ছিলেন বর্ধমানের মানুষ। বইটি পর্যালোচনা করার দায়িত্ব পড়েছে যার ওপর তার বাড়ি কোথায়—সে আর নাই বললাম। বইটি প্রকাশিত হয়েছে 'রাঢ়' প্রকাশনের পক্ষে সিউড়ি, বীরভূম থেকে। বইটির প্রথম প্রকাশ বীরভূম বইমেলা, ১৪১৬। শুধু বিষয়বস্তুর কারণে নয় লেখকের বাসস্থান, প্রকাশস্থান সব মিলিয়ে রচনাটি মফস্বলময়—মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

বইটির ভূমিকা লিখেছেন 'খ্যাতনামা লোকসংস্কৃতিবিদ', অ্যাকাডেমি অব ফোকলোরের (কলকাতা) মহাপরিচালক ড. দুলাল চৌধুরী। তিনি লেখক সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি খাঁটি মৃত্তিকা সংলগ্ন গবেষক'। অধিকাংশ গবেষণার কাজ গ্রন্থাগারেই সারা যায়। কিন্তু লোকসংস্কৃতির গবেষণায় একটু 'ফিল্ড ওয়ার্ক' লাগে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্ররা

লোকসংস্কৃতির গবেষণা করতে অগত্যা গ্রামে যান তাদের ডিগ্রির পাথেয় জোগাড় করতে। সাহেবি তত্ত্ব আর দিশি তথ্যের কাঁচিকাটা থিসিস দিয়ে তাঁরা শহুরে গবেষণা-পরীক্ষকদের মুগ্ধ করে দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন সত্তরোত্তীর্ণ মুহম্মদ আয়ুব হোসেনের গবেষণামূলক গ্রন্থটি সেই গোত্রের নয়। চার দশক ধরে তিনি লেগে আছেন গ্রামীণ অন্বেষণের মধ্যে যার সুফল ইতিমধ্যেই গ্রন্থাকারে অনুসন্ধিৎসু পড়ুয়াদের কাছে পৌঁছেছে। এই বইটি তার মধ্যে অন্যতম।

'প্রসঙ্গ : লেটো গান' বইটির দু'টি অংশ—লেটো গানের ইতিহাস (১-১২৮ পৃ.), কাজি বজলে করিম ও দুখু মিয়ার লেটো গান (১৩১-২৩৭ পৃ.)। প্রথম অংশটিতে আছে লাইব্রেরি ওয়ার্ক ও ফিল্ড ওয়ার্কের যুগলবন্দি। দ্বিতীয় অংশটি বিশুদ্ধ ফিল্ডওয়ার্কের ফসল। প্রথম অংশে আছে পাণ্ডিত্য, দ্বিতীয় অংশে পরিশ্রম। প্রথম অংশে ঐতিহ্যের তন্ন তন্ন অনুসন্ধান, দ্বিতীয় অংশে লেটো গানের সযত্ন সংকলিত নিদর্শন। পড়ুয়া এবং পর্যালোচক হিসাবে আমি গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশটিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

দ্বিতীয় অংশে আছে লেটো গানের দুই ওস্তাদ কাজি বজলে করিম ও দুখু মিয়ার রচিত লেটো গানের পালা। কাজি বজলে করিম ছিলেন নজরুলের চাচাতো চাচা যিনি নিজে লেটো গানের ওস্তাদ এবং তাঁরই প্রণোদনায় নজরুল কিশোর বয়সে লেটো গানের দলে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। 'লেটো গানের আদি ওস্তাদ' বজলে করিমের রচিত ১৫টি প্রাচীন লেটো গান এবং গ্রাম্যকেচ্ছা ও কাহিনিনির্ভর দু'টি চাপানমূলক লেটো সঙ এখানে সংকলিত হয়েছে যেগুলি শেষ হচ্ছে বিপক্ষের ওস্তাদকে জব্দ করার মতো সমস্যা সৃষ্টি করে। কাজি নজরুল ছিলেন বজলে করিমের সুযোগ্য শিষ্য। তিনি নিজস্ব ঢঙে নানাপ্রকার লেটো গান, সঙ, একমুখো কমিক, লেটোর পালা রচনা করে গেছেন। তাঁর রচিত একটি হাস্যরসাত্মক লেটো গান এইরকম—

তুমি আমার কমলালেবুর প্রাণ
সিলেটেতে জন্ম তোমার বেলেঘাটায় ধাম॥
তুমি যখন বোটায় আস,
অর্ধেক পাকা অর্ধেক কেসো,
তোমার ভিতর এত রস, কে জানে সন্ধান॥

'বনের পাপিয়া' নামক একটি লেটো পালা শুরু হয়েছে—

ও আমার দেশের মাটি, তোমারে প্রণাম জানাই
সোনা গাঁয়ের আমরা মানুষ, তোমার গুণগান গাই॥

এই পালায় আছে জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষদের জাগরণের ও জয়ের কাহিনি।

এই সংকলনাংশটিকে মূল্যবান বলে মনে করি দু'টি কারণে—১. Oral Tradition-এর জিনিস যা বিশেষ সময়ের ও বিশেষ সমাজ বা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা থেকে একসময় সৃজিত হয়েছিল, যা কখনও মুদ্রিত হয়নি, মুদ্রিত হতও না, হস্তাক্ষরের অবগুণ্ঠনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকতে থাকতে নিশ্চিত বিনষ্টিই ছিল যার ভবিতব্য সেগুলি গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে তুলে আনা এবং সকলের গোচরে এনে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২. দুখু মিয়া নামে লেটোর দলে গান বাঁধতেন যিনি পরে তিনিই নজরুল নামে বরেণ্য প্রতিভায় পরিণত হন। মাটির পৃথিবীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের ভিত্তিই যে তাঁর লেখ্য সাহিত্যের রূপে রসে এনে দিয়েছিল অন্য চারিত্র—সেটা বোঝার জন্য জানা দরকার লেটোর গান ব্যাপারটা কী? এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে সেই আবশ্যক উপাদানের সংকলন। লেটোর গানে রাধা-কৃষ্ণও আছে, ইসলামি বিষয়ও আছে। সে গান গৌর বাগদি, ভুবন বাগদিও গাইত; গাইত ছকু শেখ, রজব আলি শা-ও।

এই বইয়ের প্রথম অংশে আছে ভারতীয় সাহিত্যে নাটগীতের ঐতিহ্যানুসন্ধান। বৈদিক সাহিত্য-সংস্কৃত সাহিত্য রামায়ণ-পুরাণ হয়ে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ওপর দিয়ে দ্রুত ধাবমান বিহঙ্গের মতো চলেছে এই অনুসন্ধানী পরিক্রমা। এই বিস্তারময় সন্ধানের মধ্য দিয়ে লেখক একটি প্রতীতি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন—নাটগীতের লৌকিক ঐতিহ্য এ দেশে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। লেখ্যসাহিত্যের শীলিত নিদর্শনেও সেই ঐতিহ্য বারংবার উঁকিঝুঁকি মেরেছে। এটা এই পরিক্রমা থেকে পাঠকের ইতিবাচক প্রাপ্তি। কিন্তু দ্রুত ধাবমানতা ও উল্লেখ সংক্ষেপের কারণে এই অংশে কিছু অনিবার্য ত্রুটি অর্শেছে যা না থাকলে ভাল হত। অধ্যয়ননির্ভর রচনায় নাড়াচাড়া করতে হয় অন্যের পণ্য। অনধিকার বা অসতর্কতার কারণে কিছু ভুলের সম্ভাবনা সেখানে থেকে যায়। কিছুটা অসংলগ্নতা ও উল্লম্ফন তো আসেই। প্রমাণহীন ও ভিত্তিহীন মন্তব্য স্বগতোক্তির মতো করে যেতে হয় যেগুলি আসলে অন্যের কাছ থেকে নেওয়া কিন্তু ভ্রান্তির দায় তো শেষ পর্যন্ত গ্রহীতার ওপরেই বর্তায়। দু'একটা বলি। 'লেটো গানের ক্রমপরিণতি' বিষয়ক আলোচনায় তিনি লিখেছেন—'লেটো দল ভেঙে ক্রমে ছ্যাঁচরা গানের উদ্ভব হয়। ...ক্রমে ক্রমে ছ্যাঁচরা গান ভেঙে উদ্ভব হয়েছিল আলকাটা কাপ গানের। ...ক্রমে ক্রমে আলকাটা কাপ ভেঙে উদ্ভব হয়েছিল 'আলকাপ' গানের। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানা অঞ্চলের 'ঝাকশু' নামের এক নট, আলকাপ গানের আদি শিল্পী। ...আলকাপ

ভেঙে ধীরে ধীরে উদ্ভব ঘটেছে পঞ্চরসের।...অতীত দিনের লেটো গানের এই ক্রমপরিণতি'। বিবর্তনের এতগুলি স্তরের কথা লেখক মাত্র এক পৃষ্ঠার মধ্যে লিখে দিয়েছেন। কোনও ব্যাখ্যা নেই—একটার সঙ্গে আর একটার পার্থক্য নিয়ে কোনও কথা নেই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক কী পাবেন এই বলা থেকে! 'ঝাকশু'-র বাড়ি ভগবানগোলা থানা নয়, জঙ্গিপুর শহরের সন্নিকটে ভাগীরথীতীরবর্তী 'ধনপতনগর' গ্রামে। সে-গ্রামে আমি গেছি। আলকাপ নামক লোকনাট্যটি নিয়ে একটি পরিশ্রমপূর্ণ গবেষণাকর্ম পড়ার সৌভাগ্যও হয়েছিল এই পর্যালোচকের যার খুব সামান্য অংশই ছেপেছিল পুঁথিপত্র।

আর একটা বিষয়ে আমি কিছুটা সন্দিহান। লেটো গানের ঐতিহ্য খুঁজতে পতঞ্জলি, রামায়ণ পেরিয়ে বেদে পৌঁছনোর কি প্রয়োজন ছিল? সংস্কৃতির বহুরূপতা বিশেষ করে লোকসংস্কৃতির প্রান্তিকতাকে মহীয়ান করার জন্য 'main stream literature'-এর সঙ্গে তাকে সম্পর্কিত বা প্রবাহবদ্ধ করে দেখাতেই হবে কি? তবে আমার এই সন্ধিগ্ধতায় পড়ুয়ারা কর্ণপাত না করলে লাভবান হবেন এই জন্য যে লেখক পাঠকের জন্য যে বিপুল মহাভোজের আয়োজন সাজিয়ে রেখেছেন এই অংশে তা সত্যিই দুর্লভ ও লোভনীয়।

পেট্রোমেক্সের আলোয়, বড় শামিয়ানার নীচে কাঁচা মাটি ফেলে সামান্য উঁচু করা ২০ × ২০ হাত মঞ্চে খড় আর পাতা চটের ওপর যে লেটোর গান গাওয়া হত এক সময়, সেখানে বাঁশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে টাঙানো থাকত জয়ী পক্ষের জন্য বড় বড় জিলাপি ও সোনা রূপার পদক, অন্যদিকে পরাজিত পক্ষের জন্য এক কাঁদি কলা ও নতুন জুতো। সমবেত দর্শক শ্রোতাদের মুখে ও আচরণে মজা মেশানো উৎসাহের ভাব যেন ফেটে পড়ত—ইলেট্রিকের আলো, বোরো ধানের চাষ আর সিনেমার সংস্কৃতি এক সময় মুছে নিয়ে গেছে সেই লোকনাট্যের গ্রামীণ প্রমোদ দৃশ্যগুলি। তা নিয়ে যে এমন একটা ভারী অ্যাকাডেমিক বই হতে পারে ভাবিনি কখনও। যিনি তা ভেবেছেন এবং কাজে অনুবাদ করেছেন তাঁকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা তো জানাতেই হয়। প্রগতি এবং পরিবর্তন যখন গ্রিক নিয়তির মতোই অপ্রতিরোধ্য তখন সাংস্কৃতিক স্মৃতি সংরক্ষণের এহেন প্রয়াস অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। সাধুবাদ শুধু কাজটিকে নয়, যে-ভালবাসা থেকে সৃজিত হয়েছে কাজটি সাধুবাদ সেই ভালবাসাকে।

প্রসঙ্গ : লেটো গান—মুহম্মদ আয়ুব হোসেন/রাঢ় 'ছুটি', রবীন্দ্রপল্লি সিউড়ি, বীরভূম—৭৩১১০১/২০০.০০

ধুলায় আঁকা চরণচিহ্ন

প্রসাদরঞ্জন রায়

এমন সুযোগ একজনের জীবনে কদাচিৎ আসে। বইটির রচয়িতা সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত শুধু সাংবাদিকতার জগতে অত্যন্ত পরিচিত নাম তাই নয়, গত ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার খুব কাছের মানুষ। তাঁকে দাদা সম্বোধন করতেই অভ্যস্ত আমি। লেখাটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে '*চতুরঙ্গ*' পত্রিকায় আর প্রতিটি সংখ্যা হাতে আসার পর সব আগে এই লেখাটি পড়েছি। বারে বারে তাঁকে অনুযোগ করেছি লেখাটি দ্রুত শেষ করে বই প্রকাশের কথা কেন ভাবছেন না! নানা টুকরো আলোচনায় গ্রন্থপ্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথাও জেনেছি। ঘটনাচক্রে এ বছর (২০১০) বইমেলায় বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশে উপস্থিত ছিলাম আমি আর শঙ্খ ঘোষ মশাই। তার ওপর বইটি উৎসর্গ করা আমাদের রাজ্যের দুই বিশিষ্ট প্রয়াত 'সিভিল সারভেন্ট' রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কল্যাণ বিশ্বাসের স্মৃতিতে, যাঁদের দু'জনের স্নেহই কর্মজীবনে পেয়েছি বারবার। একটি বইয়ের ক্ষেত্রে এরকম সমাপতন কি বাস্তব জীবনে ঘটে?

ভূমিকায় লেখক বলেছেন এ লেখার সূত্রপাত অনুজপ্রতিম সাংবাদিক অমিত সর্বাধিকারীর আগ্রহে '*কালজয়ী*' পত্রিকায়। সে কাগজ বন্ধ হয়ে যাবার পর সম্পাদক আবদুর রাউফের আগ্রহে গোটাটি ছাপা হয় '*চতুরঙ্গ*' পত্রিকায়। অবশেষে মধুময় পালের আগ্রহে পুনশ্চ'র সন্দীপ নায়ক বইটি ছাপাতে রাজি হন এবং একাজে সহায়তা করেন মেঘ মুখোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

অনেক বছর আগে এক বিদেশি ঐতিহাসিক বলেছিলেন, ভারতের ইতিহাস এত প্রাচীন যে সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কারওর আগ্রহ নেই। 'anecdotal history' অর্থাৎ কানে শোনা বা চোখে দেখা

কাহিনিভিত্তিক ইতিহাসও এখানে বিশেষ লেখা হয় না। আলোচ্য বইটি কিন্তু এই দুটি অভাবই মেটাবে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এই বইয়ের সময়সীমা, যদিও এর মূল কাহিনি ১৯৭৩ সালে শেষ হয়ে গেছে। এ শুধু সুখরঞ্জনদার সাংবাদিক জীবনের স্মৃতিচারণ নয়, যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের প্রসঙ্গে নানা জানা-অজানা তথ্যে ভরপুর। আমাদের বয়সি লোকেরা যাঁরা এই সমস্ত ঘটনারই সাক্ষী (অবশ্য প্রথমদিকের ঘটনাবলির কোনও স্মৃতি নেই), তাদের আরও ভাল লাগবার কথা।

১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর সুখরঞ্জনদার সাংবাদিক জীবন শুরু। ভাবতে অবাক লাগে এই সমালোচকের বয়স তখন ছিল ঠিক দুই। শুরু করেছিলেন লোকসেবক পত্রিকায় মাসিক ১৮ টাকা মাইনেতে। সে পত্রিকার নামও আজ প্রায় সবাই ভুলে গেছেন, অথচ এটি তখন ছিল কুমিল্লা অভয় আশ্রমের মুখপত্র। সেখানে প্রথম দিন নেহরুর 'Glimpses of World History' থেকে দু'পাতা বাংলায় তর্জমা করে তবে খবরের কাগজের অফিসে ঢোকার ছাড়পত্র পান। যথেষ্ট কঠিন পরীক্ষা বটে! এখানে তাঁর বার্তা-সম্পাদক ছিলেন শৈলেন রায়, সম্পাদক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সেই সময়েই কংগ্রেসে প্রথম ভাঙন—দল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন ড. প্রফুল্ল ঘোষ, ডা. সুরেশ ব্যানার্জি, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীমশাইরা, গঠন করলেন কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি। কাগজে পড়ল 'ব্যানার হেডলাইন'। সেই সময়েই শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে বসিরহাট সফরে গিয়ে জুটেছিল বিরাট ভোজ আর শ্যামাপ্রসাদের স্নেহ। আবার ড. প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির সম্মেলনে গিয়ে ফল হল ঠিক বিপরীত, তিনি কোথাও খেতে রাজি ছিলেন না। লোকসেবক পত্রিকায় কিছুদিন ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবে তাঁর সহকর্মী ছিলেন এক সুদর্শন, স্মার্ট যুবক। তিনি নিমাই ভট্টাচার্য!

যখন এই ১৮ টাকা মাস-মাইনেও প্রায় অমিল হয়ে দাঁড়াল, তখন লোকসেবক ছেড়ে অল্পদিন পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় কাজ করে যান জনসেবক পত্রিকায় (১৯৫১)। অতুল্য ঘোষ তখন ছিলেন সম্পাদক। আর নির্মলেন্দু দে (বদুবাবু) প্রকাশক। বার্তা-সম্পাদক ছিলেন শান্তিকুমার মিত্র। এঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে অকপটভাবে। এখানে সম্পাদকীয় দপ্তরে কাজ করতেন তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত দাস, সুমথনাথ ঘোষ আর গজেন্দ্রকুমার মিত্র! সাংবাদিক হিসাবে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, যিনি 'বটুকদা' নামেই পরিচিত। কংগ্রেসের কাগজে তাঁর মতন কট্টর কমিউনিস্টেরও কাজ করতে অসুবিধা হয়নি।

প্রায় ১০ বছর জনসেবক পত্রিকায় কাজ করে ১৯৬০ সালে যোগ দেন যুগান্তর পত্রিকায়। সেখানকার চিফ রিপোর্টার অনিল ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'আমার প্রায় অর্ধশতাব্দীর সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতায় অনিল ভট্টাচার্যের মতো প্রভাবশালী, সাহসী, দক্ষ ও দাপটের চিফ রিপোর্টার আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। আমার মতে তিনি বাংলা খবরের জগতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিফ-রিপোর্টার।' অনেকেই একমত হবেন। বার্তা-সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসুরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পরে তিনি যুগান্তর ছেড়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় যান, আরও পরে বর্তমানে। বরুণ সেনগুপ্ত সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সময়ক্রমের বাইরে বলে এখানে স্থান পায়নি।

তিনি লিখেছেন : 'তখনও পর্যন্ত বাংলা খবরের কাগজের মালিকেরা কেউই সম্পাদক ছিলেন না।' কিন্তু 'যাঁদের কলমে দাবদাহ সৃষ্টি হত' তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আর চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের নাম। এঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সবচেয়ে কাছে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। একদা বন্দেমাতরম্ পত্রিকা-খ্যাত ও দীর্ঘদিন বসুমতীর সঙ্গে যুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিরাট লাইব্রেরি আর দরাজ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বিপিনচন্দ্র পালের পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আর প্রেস আইন আলোচনার সময় শ্যামাপ্রসাদকে তাঁর লাইব্রেরিতে সংগৃহীত তথ্য দিয়ে কীভাবে সাহায্য করেছেন এসব কথা ধরা আছে এখানে। হেমেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম পা রেখেছিলেন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ব্রাহ্ম সমাজে, তবে তাঁর মন্তব্য 'একসঙ্গে অত সুন্দরী সুরূপা মেয়ে জীবনে কখনও দেখিনি।' এই হেমেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গেই গিয়েছিলেন ছায়া সিনেমার পাশে এক পুরনো বাড়ির দোতলায়—সেখানে দেখেন মৃত্যুপথযাত্রী উল্লাসকর দত্তকে, যাঁর সঙ্গে বিপিন পালের এক মেয়ের বিয়ে হয়।

কথা প্রসঙ্গে অনেক প্রায়-বিস্মৃত তথ্য প্রকাশ করেছেন প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গে, যিনি সংবাদপত্র জগতে 'জংলুদা' বলেই পরিচিত ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর শতবার্ষিকীর সময়ে আমরা খুব কাছ থেকে এই 'জংলুদাদু'-কে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন 'অবলাবান্ধব'-খ্যাত দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র, সম্পর্কে সুকুমার রায়ের মামা, কিন্তু বয়সে ছোট। এক সময় ব্রাহ্ম যুব সমিতির নেতৃত্ব দিতেন তিনি এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। দীর্ঘদিন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, তাঁর বোন জ্যোতির্ময়ী ১৯৪৫ সালে প্রাণ হারান মহিলাদের মিছিলে পুলিশের লাঠি চালনায়। পরনে হাঁটু পর্যন্ত খদ্দরের

ধুতি, খদ্দরের আধময়লা হাফশার্ট, বগলে ছাতা, অবিন্যস্ত চেহারা—এই মানুষটিকে আমরা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম।

অনেক মজার ঘটনারও উল্লেখ আছে এই বইতে। আছে 'পলিটিকাল স্যাটায়ার' লিখতে সিদ্ধহস্ত সত্যেন মজুমদারের কথা যাঁর যুগান্তর পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হবার কথা পাকা ছিল, কিন্তু মদে বেহুঁশ করে তাঁকে গোয়ালন্দগামী ট্রেনে ও নারায়ণগঞ্জের স্টিমারে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আছে স্টেটসম্যান পত্রিকার অস্থায়ী সম্পাদক এস কে র‍্যাটক্লিফ-এর কথা, যিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করায় জনগণ নাম দিয়েছিল 'শরৎ কুমার র‍্যাটক্লিফ'। আছে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ফণী মুখোপাধ্যায়ের কথা, যিনি এক বিশাল মেহোগনি কাঠের টেবিলে বসতেন। সুখরঞ্জনদার কৌতূহল দেখে বলেছিলেন টেবিলটা আর ল্যাম্পসেটটা ছিল লর্ড কার্জনের—রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হওয়ায় নিলামে টেবিলটা কেনেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গভঙ্গের স্রষ্টা, দুর্ধর্ষ ইম্পিরিয়ালিস্ট লর্ড কার্জনের টেবিলেই লেখা হয়েছে বহু জাতীয়তাবাদী সম্পাদকীয়!

চোখের সামনে ইতিহাসের নানান ঘটনা দেখেছেন ওঁরা, বইয়ে তা বর্ণিত হয়েছে দু'-চারটি ঘটনার সাহায্যে। ১৯৫১ সালে কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলন, যাতে পুলিশের গুলিতে জনাচারেকের মৃত্যু ঘটে তার তদন্তের জন্য বিচার-বিভাগীয় ট্রাইবুনালের শুনানি 'কভার' করেছিলেন তিনি। তদন্তে গুলি চালানোকে 'বেআইনি' বলা হলেও সরকার তা গ্রহণ করেনি, রিপোর্ট প্রকাশও করেনি। ১৯৫১ সালে জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের ৯০তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয় তারাশঙ্কর ও সৌম্যেন ঠাকুরের পরিচালনায়। অনুষ্ঠানটি তাঁর মনে দাগ কেটেছিল, কিন্তু দর্শক সংখ্যা ছিল ১০০'রও কম। ১৯৫২ সালে বসুমতী পত্রিকার দখল নিয়ে বারীন ঘোষ ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ধস্তাধস্তির তিনি সাক্ষী। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম ভাষা আন্দোলনের (২১শে ফেব্রুয়ারি) তিনি সাক্ষী ছিলেন, যদিও তার তাৎপর্য তখনও বোঝেননি। ১৯৫৩ সালের ট্রামভাড়া-বৃদ্ধি-বিরোধী আন্দোলন এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে পি বি মুখার্জি কমিশনের বিবরণ আছে বিস্তারিত। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরবর্তী অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৯৫৩ সালে এম এন রায়ের শেষ কলকাতা সফর ও তাঁর অ্যালবার্ট হলে সম্বর্ধনা দেওয়ার তিনি সাক্ষী। তখন এম এন রায় কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে সরে এসে Radical Humanism প্রচার করছেন। তাঁর আদি নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ক'জন মনে রেখেছেন? কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে একমাত্র তিনিই সরে আসেননি—১৯৬৫ সালে হাঙ্গেরি আক্রমণের পর মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে আসেন হাওয়ার্ড ফার্স্ট। Mainstream পত্রিকায় তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য বইয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে। Freedom Road (১৯৪৪), My Glorious Brothers (১৯৪৮), Spartacus (১৯৫১) প্রভৃতি বিখ্যাত বইয়ের রচয়িতা হাওয়ার্ড ফার্স্ট যে ইহুদি তা আমারও জানা ছিল না, যেমন জানা ছিল না এই তথ্যটি যে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ে ভারতেও এক ইহুদি কমিউনিস্ট নেতা পদত্যাগ করেন, তাঁর নাম ডেভিড কোহেন। তিনি পরে ইস্রায়েলে চলে যান।

স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি অনেকটা জায়গা দখল করে আছে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে ফজলুল হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি ও সুরাবর্দি—মৌলানা ভাসানির আওয়ামি লিগের যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লিগকে ধরাশায়ী করে দিয়ে প্রাদেশিক আইন-সভার দুই-তৃতীয়াংশ আসন জিতে নেয়। কিন্তু গভর্নর ফিরোজ খাঁ নুন তাঁর বিরুদ্ধে কড়া বিবৃতি দেওয়ায় ফজলুল হকসাহেব তাঁর কাছে শপথ নিতে অস্বীকার করেন। তখনকার বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলি তখন চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে গভর্নর করায় সমস্যা মিটে যায় এবং 'বঙ্গ রাজনীতির প্রবাদপুরুষ আবুল কাসেম ফজলুল হক' পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন। জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ভারতীয় নেতারা তাঁকে অভিনন্দন জানান। সে বছরই কলকাতায় এসে হকসাহেব বলেন 'গঙ্গায় ডুইব্যা গিয়া বুড়িগঙ্গায় ভাইস্যা উঠছি'। বিধানসভায় তাঁকে প্রবল অভিনন্দন জানানো হয় এবং তারপর সুভাষচন্দ্রের বাড়িতে আবেগতাড়িত হয়ে তিনি সাংবাদিকদের অনেক কথা বলেন এবং মুসলিম লিগের নিন্দা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে চক্রান্ত করার অভিযোগ ওঠে এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তিরস্কার করেন। তখন নাকি উত্তেজিত হকসাহেব প্রধানমন্ত্রীকে বাংলায় বলেন, 'বাপের বয়সি লোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, তা তুমি ভুলে গিয়েছ। অন্তত এটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল যে তোমার কাকা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন।' তাঁর বিদায় তখনই নিশ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান তাঁকে বরখাস্ত করতে রাজি হননি। তখন তাঁকে সরিয়ে প্রতিরক্ষা সচিব জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে গভর্নর করা হয়। ইনিও বাঙালি এবং মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের সন্তান। যাহোক, বাঙালি গভর্নরের হাতে বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী কেবল বরখাস্তই হলেন না, দেশদ্রোহিতার দায়ে গৃহবন্দি হলেন, তাঁর মন্ত্রীসভাও ভেঙে দেওয়া হল। এরপরে আবার রাজনীতির চাকা ঘুরে গেলে ইস্কান্দার মির্জা

পাকিস্তানের ডেপুটি গভর্নর জেনারেল হলেন, তারপর প্রথম রাষ্ট্রপতি (১৯৫৬-৫৮)। হকসাহেব দেশদ্রোহিতার দায় থেকে মুক্তি তো পেলেনই, তাঁকে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করা হল। অনেকেরই ধারণা যে শেখ মুজিবর রহমানই প্রথম বাঙালি যিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইতিহাস বলে যে আয়ুব খাঁ জমানার আগে তিন-তিনজন বাঙালি প্রধানমন্ত্রী পেয়েছিল পাকিস্তান—খাজা নাজিমুদ্দিন, বগুড়ার মহম্মদ আলি আর সুরাবর্দিসাহেব, অবশ্য কেউই দু'বছরের বেশি টেকেননি। বাঙালি গভর্নর-জেনারেল বা রাষ্ট্রপতি অবশ্য ওই একজনই—ইস্কান্দার মির্জা। বাঙালি রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও সুরাবর্দিসাহেব প্রধানমন্ত্রী হলেন ১৯৫৬ সালে, ১৩ মাস রাজত্ব করলেন আর পাকিস্তানকে উপহার দিলেন তাদের প্রথম সংবিধান। সুরাবর্দি এবং হকসাহেব অবশ্য বরাবরই পরস্পরের বিরোধী ছিলেন। তবে কেউই বা বেশিদিন রাজত্ব করার সুযোগ পেলেন কই? আর এর ঠিক পরে পরেই আওয়ামি লিগ ভেঙে গিয়ে মৌলানা ভাসানির ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি গঠিত হয়।

সুরাবর্দিদের নিয়েও অনেক ধন্দ আছে আমাদের মনে। ছোট ভাই হুসেন শহিদ সুরাবর্দিকেই (১৮৯২-১৯৬৩) আমরা বেশি চিনি। ইনিই Direct Action-এর সময়ে বাংলার 'প্রিমিয়ার' ছিলেন, আবার পরে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। ইনি ১৯২৪ সাল থেকে সাংসদ, ১৯৩৭ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটিমেয়র আর ১৯৪৬ সাল থেকে মন্ত্রী। ইনিও কিন্তু এঁর দাদার মতনই অক্সফোর্ডের স্নাতক, পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা আর মেদিনীপুরের লাখাম গ্রামের লোক বলে করাচিতে বাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'লাখাম হাউস'। এঁর দাদা হাসান শাহেদ সুরাবর্দিই (১৮৯০-১৯৬৫) এ বইতে বেশি আলোচিত, তবে দু'টি নাম খুব কাছাকাছি হওয়ায় গুলিয়ে ফেলার ভয়। ইনি ছিলেন বাগ্মী, অক্সফোর্ডের তুখোড় ছাত্র, নেহরুর ব্যক্তিগত বন্ধু, দীর্ঘদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগীশ্বরী অধ্যাপক, পরে পি এস সি'র সদস্য। দেশভাগের পর তিনি নাকি কলকাতা ছাড়তে চাননি, একরকম জোর করেই তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। পরে স্পেনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতও হয়েছিলেন। দুই ভাইয়ে কত না পার্থক্য। দিলীপ রায়ের সঙ্গে এই শাহেদ সুরাবর্দির সম্পর্ক নিয়ে এ বইয়ের শেষাংশে অনেক তথ্য আছে।

রাজনীতিবিদদের খোঁজখবর রাখতেই হয় সাংবাদিকদের, কিন্তু অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের? সুখরঞ্জনদা বলেছেন দীর্ঘদিন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট মিটিং-এর রিপোর্ট করেছেন বলে খুব কাছ থেকে দেখেছেন অধ্যাপক জে পি নিয়োগী, সত্যেন বসু আর সতীশ ঘোষকে। এঁদের সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যাবে বইটিতে। এঁরা আবার ছিলেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জে পি নিয়োগী ছিলেন অর্থনীতির ডাকসাইটে অধ্যাপক আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ দ্য ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস, সবশেষে পি এস সি'র সদস্য। অবসর গ্রহণের পর তিনি গাড়ি বিক্রি করে দেন, কারণ 'গাড়ি থাকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে ইচ্ছা করবে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া মানে সতীশের সঙ্গে আড্ডা, কিছুটা পরচর্চা, কিছুটা রাজনীতি। আবার তা নিয়ে অন্যদের সমালোচনা। এসব থেকে দূরে থাকতেই গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি।' মৃত্যুর আগে তাঁর সমস্ত স্থাবর সম্পত্তিও দান করে দেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়কেই। আবার সতীশ ঘোষ ছিলেন গণিতের দুর্ধর্ষ ছাত্র, কাঠবাঙাল অথচ মোহনবাগানের গোঁড়া সমর্থক, মনটা দারুণ নরম কিন্তু চট করে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। দীর্ঘদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশন্‌স বা রেজিস্ট্রার ছিলেন। আবার মেয়র নির্মল চন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁকে মেয়রের দায়িত্বও সামলাতে হয়েছে। সত্যেন বসুর বিষয়ে অনেক কথা আমাদের জানা, তবে এখানেও কয়েকটি নতুন কৌতূহলোদ্দীপক খবর আছে। সত্যেন বসুর সায়েন্স কলেজে বক্তৃতার নোট নিতে গিয়ে এক গোয়েন্দা পুলিশের ওয়াচার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্বীকার করেন যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু নামে প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সহ-সভাপতির বক্তৃতার ওপর নজর রাখতে গিয়ে তার এই অবস্থা! দ্বিতীয় গল্পটি এরকম : সত্যেন বসু যখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিযুক্ত হন, তখন শান্তিনিকেতনের কট্টরপন্থীরা তা পছন্দ করেননি। শান্তিনিকেতনের কাণ্ড-কারখানা দেখে তিনি নাকি বলেন, 'একটা এতটুকু ছোট জায়গায় কী করে অতগুলো দুষ্ট লোক একত্রে বাস করতে পারে, তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি'। তৃতীয় সংবাদটি আমাকে স্তম্ভিত করে দেয় : অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁর কাছে ফিজিক্স পড়েছেন এবং ভাল ছাত্র ছিলেন। ওই বিষয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমরাও গর্ব করতে পারি।

আরও অনেক অধ্যাপক-প্রসঙ্গ এসেছে তাঁর লেখায়। উপাচার্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সত্যেন বসুর হৃদ্যতা, আরেক উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা এবং মহানুভবতা, আরেক অধ্যাপক নির্মল বসুর 'Days with Gandhi' বই নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি। অনেক কথা তিনি বলেছেন যা একেবারেই

অজানা। ফজলুল হকসাহেবের উদ্যোগে সৈয়দ বদরুদ্দোজাসাহেবকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করার সিদ্ধান্ত হয়। সুখরঞ্জনদার ভাষায় তিনি 'প্রবীণ রাজনীতিবিদ, প্রথিতযশা বাগ্মী ও পণ্ডিত' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে নির্বান্ধব'—কিন্তু এ নিয়ে ঝড় উঠল কারণ তিনি ভারতীয় এবং শেষ পর্যন্ত সেই ঝড়ে হকসাহেব গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত হন এবং বদরুদ্দোজাসাহেব আরও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদে ফিরে যান। তিনি বলেছেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাদ-প্রতিম ইংরাজির অধ্যাপক অমরনাথ ঝা'র কথা এবং সেই প্রসঙ্গে আল্লামা মাশরিকির কথা। আল্লামা মাশরিকি ছিলেন খাকসার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু কেম্ব্রিজে গণিতে তাঁর ফল ছিল বিস্ময়কর। শুধু গণিতে নয়, তিনি গণিত ছাড়াও ন্যাচারাল সায়েন্সেস, মেকানিকাল সায়েন্সেস এবং ওরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজেস এই চারটি বিষয়ে ডিস্টিংশনসহ ট্রাইপস লাভ করেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় অধ্যাপনা ও গবেষণার জীবন থেকে সরে আসেন। সবচেয়ে মর্মস্পর্শী আচার্য যদুনাথ সরকারের কথা। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে যদুনাথকে সাম্মানিক ডিলিট দেবার সিদ্ধান্ত হয়। এর ত্রিশ বছর আগে যদুনাথ যখন উপাচার্য তখন সেনেট-সিন্ডিকেটের এক প্রভাবশালী মহল তাঁকে অপমান করে, প্রতিবাদে যদুনাথ ইস্তফা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে চলে যান। এই অপমান তিনি ভোলেননি, উপাচার্য নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের বহু অনুরোধেও তিনি এই শতবার্ষিকী সম্মান প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। যদুনাথ ও তাঁর ছাত্রদের অনেক কথা এ বইতে আছে, আছে নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' বইয়ের ভূমিকাও। এই শতবার্ষিকীর এক বছরের মধ্যেই আচার্য যদুনাথ চিরবিদায় নেন।

বইয়ের শেষ অংশটিতে বাংলাদেশ গঠনের আগে থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ইতিহাস ধরা আছে। কার্জনসাহেবের 'Two Nation Theory' থেকে দেশভাগ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ভোট, মুজিবের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ডাক এবং মুক্তিযুদ্ধ—এসব ঐতিহাসিক ঘটনারই পরিচিতি আছে এখানে। স্বাধীন বাংলাদেশে দু'বছরের সাংবাদিকতায় তাঁর বড় প্রাপ্য আব্বাসউদ্দিনের পরিবারের সঙ্গে পরিচয় আর সৈয়দ মুজতবা আলিকে পুনরাবিষ্কার। আব্বাসউদ্দিনের পুত্রবধূ আসমা যে মুজতবা আলির ভাগ্নি এ তাঁর জানা ছিল না। ঢাকার জীবনের সঙ্গে এমন জড়িয়ে পড়েছিলেন যে ১৯৭৩ সালে ঢাকা ছাড়লেও প্রায় ৩০ বছর বাদেও লিখেছেন 'প্রায় ত্রিশ বছর আগের ওই জীবনপ্রবাহের জন্মমুহূর্তের ঢাকা—সেই সেগুন বাগিচা, সেই রমনা, সেই নীলখেতের ঠাস বুনোন শিরিষ গাছগুলির প্রখর দ্বিপ্রহরের স্নিগ্ধ উদাসী হাওয়া আমাকে ডাকে'। পাঠককেও কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

এর বাইরেও এ বইতে অনেকের কথা আছে, সব বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। কিন্তু সন্ধানী পাঠক আচার্য ও সুচেতা কৃপালনি, রফি আহমেদ কিদোয়াই, বিধানচন্দ্র, জওহরলাল, ফকরুদ্দিন আলি আমেদ, বিমলাপ্রসাদ চালিহা, বিজু পটনায়েক, মালতি ও নবকৃষ্ণ চৌধুরী প্রমুখ সম্বন্ধে বহু অজানা কাহিনি ও তথ্য জানতে পারবেন। বিদেশিদের মধ্যে তেমনই স্থান পেয়েছেন মোসাদেক, রাজা ফারুক, আইনস্টাইন, কসিগিন, ভিসিনিস্কি, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো এবং আরও অনেকে। দীর্ঘ পথটি ভাঙা এবং ধূলিতে আকীর্ণ সন্দেহ নেই, সে পথে যাঁদের চরণচিহ্ন আঁকা আছে তাঁরা নিজ মহিমায় ভাস্বর।

সমালোচককে কিছু মন্দ কথা বলতেই হয়—এত বড় বইয়ের শেষে indexing অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, সে জায়গায় 'এই গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ' বলে একটি তালিকা আছে—তা বর্ণানুক্রমেও সাজানো নেই এবং একান্ত অসম্পূর্ণ। কিছু বানান ভুল থাকতেই পারে, কিন্তু এই মানের বইতে Stella Kramrisch, Victoria Ocampo, Von Ribbentrop প্রভৃতি বানান ভুল এবং পানিক্করের বইয়ের নাম ভুল (In Two Chinas হবে) বড় চোখে লাগে। এ কথাগুলো বললাম এই জন্যই যে আমি জানি লেখক চোখ নিয়ে কী দারুণ সমস্যায় আছেন এবং এ বইয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে তাঁকে কত কষ্ট করতে হয়েছে। বই প্রকাশে যাঁরা তাঁর সহায়তা করেছেন তাঁরা আর একটু উদ্যোগ নিলে এসব ভুল-ভ্রান্তি থাকত না। এসব সত্ত্বেও সমালোচককে বলতেই হয় যে এটি বারবার পড়বার মতো বই, সযত্নে সংগ্রহে রাখবার বই, এরকম বই রোজ রোজ লেখা হয় না। সুখরঞ্জনদার আগের দু'টি বই (বঙ্গসংহার এবং Curzon's Partition of Bengal)-কেও ছাপিয়ে গেছে বিষয়বৈচিত্র্যে এবং পরিবেশনের গুণে।

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়—সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত/পুনশ্চ, কলকাতা-১০/২৫০.০০

বাংলার সমাজেতিহাসের ধারা

সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত

২০০৯ সাল ছিল হুগলি জেলার ইতিহাসকার সুধীরকুমার মিত্রের জন্মশতবর্ষ। বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনের কালপর্বে বাঙালির স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস, জেলা ও অঞ্চল চর্চার মাধ্যমে নিজের দেশ ও জনসমাজকে জানার প্রয়াসে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার যে বিপুল ঢেউ ওঠে তার শেষতম তরঙ্গটি ছিল সুধীরকুমার মিত্রের '*হুগলী জেলার ইতিহাস*'। প্রথম জীবনের সক্রিয় রাজনীতিচর্চা, নানা সামাজিক সংগঠনে সক্রিয়তা, বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা, পত্রিকা সম্পাদনা, অজস্র প্রবন্ধ ও বেশ কিছু গ্রন্থের লেখক—সব পরিচয় ছাপিয়ে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার এই অবদানটির জন্য তিনি চিরস্মরণীয়।

১৯৯৩ সালে জীবনাবসান হয় সুধীরকুমারের। ১৯৯৪ সাল থেকে আয়োজিত হচ্ছে সুধীরকুমার মিত্র স্মারক বক্তৃতা। এযাবৎ প্রদত্ত আটটি স্মারক বক্তৃতার পাঁচটি সংকলিত হয়েছে '*ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি*' নামের একটি গ্রন্থে। প্রকাশকাল শ্রীমিত্রের জন্মশতবর্ষ। সে অর্থে এটি প্রয়াত ইতিহাসবিদের প্রতি এক সময়োচিত শ্রদ্ধার্ঘ্য।

স্মারক বক্তৃতার সংকলনে যে-ক্রম অনুযায়ী বক্তৃতা-নিবন্ধগুলি বিন্যস্ত, আমাদের আলোচনার ক্রম ভিন্নতর। চতুর্থ বক্তৃতা-নিবন্ধটি রজতকান্ত রায়ের ইতিহাসে পুরুষার্থ। এখানে ইতিহাসের পুরুষার্থভিত্তিক কালবিভাজনে প্রয়াসী শ্রীরায়। প্রাচীন ভারতে পুরুষার্থ ছিল ত্রিবর্গ—ধর্ম, অর্থ ও কাম। এ ধারণা মনুর সমসময়ে উদ্ভিন্ন। তারও আগে, সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছিলেন নির্বাণের সন্ধানে। তখনও ত্রিবর্গের ধারণার জন্ম হয়নি। বুদ্ধের প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরে মনু সংহিতায় প্রথম ত্রিবর্গের উল্লেখ পাওয়া গেল। ধর্ম, অর্থ, কাম—এর সঙ্গে মোক্ষ যুক্ত হয়ে চতুর্বর্গ এল তারও অনেক পরে, যখন নির্বাণের বিরুদ্ধে মোক্ষকে খাড়া করে বৌদ্ধ শ্রমণ ও জৈন যতিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল ব্রাহ্মণেরা। অর্থাৎ পুরুষার্থ তিনের পরিবর্তে চারটি বর্গে ধৃত হল বুদ্ধ পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থায়। তুর্কি অধিকারের পরে শুধু সমাজব্যবস্থায় নয়, মানসিক জগতেও পরিবর্তন এল। এই সামাজিক-মানসিক পরিবর্তন রূপ নিল পঞ্চম পুরুষার্থের—ভক্তের কাছে সেই পঞ্চম পুরুষার্থ হল প্রেম—চৈতন্য সাহিত্যের বিপুল ধারা যে পুরুষার্থ কীর্তনে সৃজিত। রজতকান্ত বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কখনও ভাগ করা হয় রাষ্ট্রব্যবস্থা দিয়ে, কখনও আর্থিক ব্যবস্থা দিয়ে। মানসিক দিক দিয়ে যদি ইতিহাসের পর্ব বিভাজন করতে হয়, তবে পুরুষার্থের বিবর্তন একটি উপায় হতে পারে।

শহর কলকাতার বিবর্তনের মানস ও মননগত দিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সেকালের কলকাতায় সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির প্রসঙ্গ ছিল প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের স্মারক বক্তৃতার বিষয়। রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থে সেকালের সীমারেখা টেনেছিলেন ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের বক্তৃতা নিবন্ধে কলকাতার সেকালের সীমা ১৯১১-১২, যখন ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়া হল। শাসনকেন্দ্র দিল্লি, অর্থনৈতিক কেন্দ্র বোম্বাই; আর কলকাতা—সাংস্কৃতিক রাজধানী, গরিমা বা সান্ত্বনা, যে অর্থেই নেওয়া হোক না কেন।

গ্রাম্য সংস্কৃতির সবটুকু শরীরে নিয়ে যে-কলকাতার উত্থান, গ্রাম্যতা দোষ, অশ্লীলতা, আদিরসের প্রাধান্য তার সঙ্গী হবে, তা বলা বাহুল্য। উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক জাগরণের সময় এর সংশোধন হয়; যদিও সম্পূর্ণ নিরসন হয়নি। তবে দেশের অন্য শহর-নগরের তুলনায় সেকালের কলকাতায় অনেক বেশি শান্তি ছিল, আর ছিল সহিষ্ণুতার চরমোৎকর্ষ। আমাদের দেশের নানা প্রান্তের তো বটেই, বিশ্বের বহু জাতির মানুষ সেকালের কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিল। বিবিধ সংস্কৃতির আদানপ্রদানে পুরাতন সংস্কৃতির পরিবর্তন হচ্ছিল, মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল, যা ছিল সহিষ্ণুতার সংস্কৃতির শক্তি।

নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে যে সদর্থক ঘটনাগুলি ঘটে তার কয়েকটি প্রতাপচন্দ্র তাঁর ভাষণে সূত্রাকারে উল্লেখ করেছেন। প্রথম, মুদ্রণ প্রকৌশলের সূচনা ও সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র প্রকাশ। দ্বিতীয়, ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সঙ্গে বিতর্কে হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা হ্রাস, ব্রাহ্মধর্মের উত্থান ('জাতের দফা শেষ করল তিন সেনে/উইলসেন, কেশব সেন আর ইস্টিসেনে')। তৃতীয়, আধুনিক শিক্ষার প্রসার; ফারসি ভাষার বিদায় ও ইংরাজির প্রসার। চতুর্থ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জয়যাত্রা; কেরি, মার্সম্যান, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারে যার সূচনা শতাব্দী পূর্ণ হবার আগে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথে যার শক্তিময়

পরিণতি। পঞ্চম, বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ; যাত্রা, কবির লড়াই, পাঁচালির কাল পার করে লেবেদফ থেকে রবীন্দ্রনাথ যার বিপুল বৈভবমণ্ডিত যাত্রাপথ। ষষ্ঠ, শিল্পকলায় নবযুগের উত্থান। সপ্তম, জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত।

এর পাশাপাশি জব চার্নক থেকে রাজধানী স্থানান্তর, এই দু'শো বছরের নগরজীবনের না-বাচক দিকগুলির উল্লেখ করেছেন প্রতাপচন্দ্র। প্রথমাবধি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাদের নীতিজ্ঞানহীন, যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা রোজগারের প্রবণতা। দ্বিতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব। বিপুল দরিদ্রজনের অবস্থার কিন্তু কোনও পরিবর্তন হল না। (১৭৮০ সালের মার্চ মাসে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১৫০০০ খোড়ো বাড়ি পুড়ে যায়, মৃত্যু হয় ২৫ জনের)। তৃতীয় ও চতুর্থ, ইংরাজ ও ইওরোপীয়দের নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতার অসংখ্য উদাহরণ যেমন সেকালেও কলকাতায় পাওয়া যায়, মধ্য ও উচ্চবিত্ত হিন্দুর নৈতিক অবক্ষয়ের চরম নিদর্শন, বাবুবিলাস, প্রত্যক্ষ করে কলকাতা। হেস্টিংস এক জার্মান চিত্রকরের সুন্দরী পত্নীর প্রণয়াসক্ত হয়ে তাঁকে বাধ্য করেন বিবাহবিচ্ছেদে, কাউন্সিলের দ্বিতীয় ব্যক্তি ফিলিপ ফ্রান্সিস পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে ধরা পড়ে অপদস্থ হন। হিন্দু উচ্চবিত্তের জীবনচর্যার অনপনেয় অঙ্গ ছিল পানদোষ, বেশ্যাগমন এবং জমিদারি বা ব্যবসালব্ধ অর্থের বিপুল অপচয়।

তপন রায়চৌধুরীর ভাষণের লিখিত রূপটি প্রকাশিত হয়েছে 'বাঙালনামার পরিপ্রেক্ষিত' নামে। একটি পাক্ষিক বাংলা সাহিত্যপত্রে প্রায় দু'বছর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশকালে অধ্যাপক রায়চৌধুরীর আত্মজৈবনিক 'বাঙালনামা' প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। যে-সময়কাল বাঙালনামার উপজীব্য, সেই সময়কালের ঘটনা ও চরিত্রাবলি কীভাবে বাংলা ও বাঙালির বিবর্তনের স্থান-কাল-পাত্র হয়ে ওঠে ঐতিহাসিকের চোখে, কীভাবে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হয়ে ওঠে আরও এক আত্মজৈবনিক পরিক্রমা, তার দৃষ্টান্ত 'বাঙালনামার পরিপ্রেক্ষিত'। তাঁর নিজের জীবনসীমায় অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ সাত দশক এবং একবিংশ শতকের প্রথম দশকের বাঙালি সংস্কৃতি ও তার পশ্চাৎপটে যে মনোভঙ্গি সে সম্পর্কে এক চিন্তাভিত্তিক খসড়া শ্রীরায়চৌধুরী উপস্থিত করেছেন। তাঁর পরিক্রমায় এসেছে ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারের সুযোগ ব্যবহার প্রশ্নে কংগ্রেসের বিভাজন, স্বরাজ্য দল গঠন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্যদের মতো সংসদে অংশগ্রহণ করে ভিতর থেকে ব্যবস্থাটার অসারতা প্রমাণের প্রয়াস এবং সে-প্রয়াস ব্যর্থ করতে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের শ্বেতাঙ্গ-ষড়যন্ত্র। সোহরাবর্দি ও ফজলুল হকের মতো তরুণ মুসলিম নেতাদের সহায়তায় চিত্তরঞ্জন সে প্রয়াস ব্যর্থ করতে সক্ষম হলেও ওই সহাবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই কালপর্বে বিদেশি শাসনের প্রতি কণামাত্র অনুরাগ ছিল না বাংলার মানুষের। একে অনুসরণ করে ঘটে একদিকে সুভাষচন্দ্রের উত্থান, অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। একই সঙ্গে, যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বরাবর ভারতবর্ষের ঘোষিত সর্বজনীন কাম্য রূপ, তা সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হল। তবু এই সাম্প্রদায়িকতা আর আজকের গৈরিক সাম্প্রদায়িকতার রূপ এক নয়। 'ত্রিশ-চল্লিশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি মুসলমানদের ওপর আক্রমণের পরামর্শ দেয়নি। শুধু বিপন্ন হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।' এমনকী ছেচল্লিশের দাঙ্গার পরেও, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা যে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কারসাজি, বাঙালি মধ্যবিত্তের এ বিশ্বাস খুব বেশি টলেনি।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের স্তরে লক্ষণীয় একটি বৈশিষ্ট্য হল নিজের ও নিজ পরিবারের মর্যাদা বিষয়ে স্পর্শকাতরতা। এর অন্য পিঠে আছে পরশ্রীকাতরতা। প্রথমটির উৎসে যদি থাকে জীবন থেকে যা প্রাপ্য তা না পাওয়া, দ্বিতীয়টির উৎসে হয়ত ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতির জাত-কুল-মান সচেতনতা। বিদেশের প্রশংসা ও পুরস্কারে উদ্বেলিত হওয়ার মানসিকতাও আর এক চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, তীব্র গণআন্দোলন, স্বাধীনতা, দেশভাগ—উত্তাল চল্লিশের এই দিনলিপির অনিবার্য সংযোজন বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের উত্থান। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দ্রুত স্বদেশপ্রেমের আদর্শ বাতিল হয়ে যাওয়া, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন লাইসেন্স-পারমিট-রাজের উত্থান, জাতীয়তাবাদী আদর্শের বাহক কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানটির দ্রুত বিশ্বাসযোগ্যতা ও শ্রদ্ধা হারানো এবং দু'দশকের মধ্যে বাংলাতে একটি অকংগ্রেসি বামপন্থী সরকারের প্রতিষ্ঠার ঘটনা সর্বজনবিদিত। চিত্তরঞ্জনের সময়ে বাঙালি মানসে যে কেন্দ্রবিরূপতার সূচনা, সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস ত্যাগের ঘটনায় যা শক্তিশালী হয়েছিল, এসময় থেকে তা স্থায়ী রূপ পায়।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে জাতীয়তাবাদের দুর্বল প্রভাবের প্রকাশ ঘটেছে বিচিত্ররূপে। ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়, পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, বঙ্গসংস্কৃতি থেকে তরুণ সম্প্রদায়ের দূরত্ব—এর প্রভাব সর্বত্র। রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতীয় তথা কংগ্রেস রাজনীতি ও কেন্দ্র বিরূপতার প্রতিক্রিয়ায় বামপন্থী জোট শহর ও গ্রামে প্রবল প্রাতিষ্ঠানিক

ভিত্তি, গ্রামীণ জনগণের বিপুল সমর্থনকে হাতিয়ার করে বারবার নির্বাচনে জিতে রাজ্যাধিকার লাভ করেছে। প্রসঙ্গত, এই বক্তৃতাদানের সময় যে-সমর্থনকে স্থায়ী বলে মনে হয়েছিল, এ রাজ্যে দ্রুত ঘটনাপর্বের মধ্য দিয়ে তীব্র প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাব ও শক্তির উত্থান হয়েছে। শাসক দল শিল্পমুখী সংস্কারের পথে হাঁটায়, গ্রামীণ সমর্থনকে অনপনেয় বিবেচনা করে গ্রামজনতার দুর্দশাকে লঘু জ্ঞান করায় সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থন শক্তিশালী হয়ে রাজ্যের প্রান্তীয় অঞ্চলকে বিপন্ন করেছে, বুদ্ধিজীবীদের একাংশের সমর্থনও পাচ্ছে। কিন্তু মাওবাদী কার্যকলাপের থেকেও অসহনীয় হল এলিট শ্রেণির একাংশে এবং সমাজের প্রায় সর্বস্তরে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ। বাঙালি মানসে এর আগে যে সাম্প্রদায়িকতা কাজ করেছে তার তুলনায় এ তীব্রতর, বস্তুত, গৈরিক সাম্প্রদায়িকতার অমানুষতার বীজ এমন জমিতেই রসসিঞ্চিত হয়।

শ্রীরায়চৌধুরীর প্রায় আট দশকব্যাপী বঙ্গেতিহাস অনুসন্ধানের পাশে এই ক্ষুদ্র সংকলনটিতে আছে দু'টি বক্তৃতানিবন্ধ, যাদের অন্বেষণ অঞ্চলচর্চা ও আঞ্চলিক ইতিহাস। সুধীরকুমার মিত্রের কর্ম ও সৃজনের সঙ্গেও এ দু'টি বিষয় ওতপ্রোত। বাংলায় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা প্রসঙ্গে স্মারক বক্তৃতাদান করেছিলেন রমাকান্ত চক্রবর্তী, উনিশ শতকের আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন স্বপন বসু। যা এখানে সংকলিত হয়েছে।

বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার উৎসে রমাকান্ত চক্রবর্তী নির্দেশ করেছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ ভারত সরকারের বিবিধ তথ্যানুসন্ধানপ্রয়াস এবং বাঙালির আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার প্রেরণার উৎসে, যথারীতি, তিনি উদ্ধৃত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে—'সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয় কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।' এই উৎস নির্দেশে কিন্তু এই প্রসঙ্গ অব্যাখ্যাতই থেকে যায়, কালিকমল সার্বভৌমের 'সেতিহাস বগুড়ার বৃত্তান্ত' (১৮৬১), শ্যামধন মুখোপাধ্যায়ের 'মুরশিদাবাদের ইতিহাস' (১৮৬৪) কিংবা তত্ত্ববোধিনীর ইতিহাস সংগ্রহের প্রয়াসে 'হিজলীর বৃত্তান্ত' (১৮৬২) কেন লেখা হয়েছিল। বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ধরন-গড়নের নির্মাতা হিসাবে শ্রীচক্রবর্তী নির্দেশিত উৎসগুলোকেই সচরাচর চিহ্নিত করা হয়। ফলে এ প্রশ্নটা থেকেই যায়, তারও আগে, বাংলা দেশের ছোট ছোট অঞ্চল, নগর বা জেলা নিয়ে এই যে লেখালেখি, এর কারণ কী? যাই হোক বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ধারার একটি সংক্ষিপ্ত, আনুপূর্বিক আলোচনা করেছেন শ্রীচক্রবর্তী। অধুনা আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার যে ধারাগুলি বহমান সেগুলি সূত্রবদ্ধ করেছেন তিনি, এইভাবে—১। সর্বাত্মক বিবরণ, যা গেজেটিয়ারধর্মী; ২। জেলার পুরাকীর্তির বিবরণ; ৩। স্বাধীনতা সংগ্রাম বা কৃষক আন্দোলনের বিবরণ, সাধারণত গবেষণাধর্মী এবং ৪। জেলার ঔপনিবেশিক ভূমিব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিবরণ, যা পূর্ণতই গবেষণাধর্মী।

স্বপন বসুর আলোচনার বিষয় উনিশ শতকের আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা। যে-পত্রিকাগুলি বাংলার একেকটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, সেখানকার মানুষের অভাব অভিযোগ, অঞ্চলের সংবাদ যা হয়ত উচ্চতর স্তরে প্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইত্যাদি তুলে ধরে, তা চিহ্নিত হয় আঞ্চলিক পত্রিকা হিসাবে। এখানে অঞ্চল অর্থে শহর, মহকুমা বা জেলা হতে পারে। বাংলা পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৮১৮। সমাচার দর্পণ। কিন্তু সেটি আঞ্চলিক পত্রিকা ছিল না। বাংলার প্রথম আঞ্চলিক পত্রিকাটি গুরুদয়াল চৌধুরী সম্পাদিত 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'। প্রকাশকাল ১৮৪০, স্থান কাশিমবাজার। মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সমালোচনার কারণে রাজরোষে পত্রিকাটি দীর্ঘকাল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। একই পরিণতি হয়েছিল 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' পত্রিকার (১৮৪৭)। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় পত্রিকাটির কণ্ঠরোধ করা হয়। স্বপন বসুর আলোচনাটি তথ্যবহুল ও আকর্ষণীয়। উনিশ শতকে ঢাকা থেকে ১০টি আঞ্চলিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; অন্যদিকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বীরভূম ও ২৪ পরগণা থেকে একটিও পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। 'সিটি অব্ পেপারস' কলকাতার নিজের কথা বলার জন্যও শতাব্দীকাল ছিল না কোনও পত্রিকা। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ছিল ঈর্ষণীয়, ৫০০০। পত্রিকাটি চলে ৯৬ বছর। রাজরোষের শিকার হওয়া, বিজ্ঞাপনলাভে বঞ্চিত হওয়া এমনকী পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া—এ দুর্ভোগ হয়েছে বহু আঞ্চলিক পত্রিকার।

'ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি' ১৯৯৪-২০০৭ কালপর্বে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার সংকলন। পাঁচটি স্মারক বক্তৃতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্যতম সম্পাদক ও সুধীরকুমার পুত্র পল্লব মিত্রের সংক্ষিপ্ত পিতৃজীবনী। বিষয়গত ভিন্নতা সত্ত্বেও সংকলনটির একটি মূলসুর অনুভব করা যায়, তা হল বাংলার সমাজেতিহাসের ধারা। রজতকান্ত রায়ের বক্তৃতা কিছুটা তাত্ত্বিক ও দৃঢ়তর হলেও পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেম'-এর আলোচনার মধ্য দিয়ে তা প্রবেশ করে বাঙালি সংস্কৃতির কেন্দ্রে। চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের মূলে ছিল 'প্রেম'। প্রসঙ্গত, সুধীরকুমারের সৃজনের বিচিত্র জগতের অনেকটা পরিসর জুড়ে ছিল চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের ইতিহাস ও ভাবনা। এরই

পরিপূরক কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি সংস্কৃতির ভিন্নরূপের অন্বেষণ, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের ভাবনায়। বাঙালি সংস্কৃতির বিবর্তনের প্রায় শতাব্দীকাল পরিক্রমা করেছেন তপন রায়চৌধুরী। আর তত্ত্বের কাঠামো ছেড়ে বাংলার ছোট ছোট অঞ্চলের দৈনন্দিনতার পরিসরে প্রবেশ করেছেন রমাকান্ত চক্রবর্তী ও স্বপন বসু—যে পরিসরের রূপ ও রহস্য উন্মোচন ছিল সুধীরকুমারের জীবনব্যাপী সাধনা।

সুখপাঠ্য বইটির দুর্বলতার দিক এর সম্পাদনা, কিংবা বলা ভাল সম্পাদনার অনুপস্থিতি। তপন রায়চৌধুরীর অসামান্য ভাষণটির বহু বাক্যের অর্থোদ্ধার করাও কষ্টসাধ্য। বোঝা যায়, লিখিত আকারে রূপান্তরণের সময় প্রমাদ ঘটেছে। তার নিরসনে কোনও সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ ঘটেনি। স্বয়ং সুধীরকুমারের বহুপরিচিত গ্রন্থনাম উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে একটি লেখায় মুদ্রিত হয়েছে 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (পৃ: ৫৮), অন্যত্র 'হুগলীর ইতিহাস (পৃ: ৩৭)। দু'টিই ভ্রান্ত। বক্তারা যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা মেলানো সম্ভব না-ও হতে পারে, কিন্তু পড়তে গিয়ে সাধারণভাবে যে ভুল ধরা পড়ে, সংশোধন করা হয়নি তা-ও। বহুক্ষেত্রে বক্তার উল্লেখ করা গ্রন্থনামে ভুল রয়ে গেছে, সাধারণ ভুল, যা বক্তৃতায় চলতে পারে, কিন্তু লিখিত রূপ সতর্কসংশোধন দাবি করে। সে দাবি পূরণে সম্পাদকরা উদ্যোগ নেননি। বলা বাহুল্য, মুদ্রণপ্রমাদও সহ্যসীমার অতিরিক্ত।

তবু, সুধীরকুমারের জন্মশতবর্ষে এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ এক মলাটের মধ্যে অন্তত সাজিয়ে দেবার ধন্যবাদটুকু সম্পাদকদের প্রাপ্য।

ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি—সম্পাদনা : দেবপ্রসাদ জানা ও পল্লব মিত্র/দীপ প্রকাশন, কলকাতা/৭০.০০

আবিশ্ব উদ্ভাসিত করে শতবর্ষে 'জগজ্জ্যোতি'

শান্তি সিংহ

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের (১৯০৬) 'মন্দির' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন। ...বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতি মুহূর্তের সুখ দুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব হিন্দু ধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল।' [রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩ দশ খণ্ড, প.ব.স. (১৯৯০), ১৭২ পৃষ্ঠা।]

'পূজারিণী' কবিতার কবি একদা ভারতে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী তরঙ্গ তথা বৈদান্তিক আচার্য শঙ্করের মহাপ্রতাপ বিলক্ষণ অনুধাবন করেও প্রাগুক্ত মন্তব্য সুচিন্তিতভাবেই করেছেন।

আচার্য শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের হৃদয়ের সমন্বয় ঘটেছে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। এরকম একটা কথা অনেক মনীষীর মুখেই শোনা যায়। শিকাগো-বিশ্বধর্ম মহাসভায়, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর, ষোড়শ দিবসের অধিবেশনে, বিবেকানন্দ বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের সম্বন্ধ বিষয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে আমি বৌদ্ধ। ...হে বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া হিন্দু ধর্ম বাঁচিতে পারে না, হিন্দু ধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধ ধর্মও বাঁচিতে পারে না।... বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। [উদ্বোধন প্রকাশিত স্বামীজির বাণী ও রচনা ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০-৩২]

আবহমান বিশ্বজীবনে বুদ্ধ ও খ্রিস্ট দুই উজ্জ্বল নাম। বলা বাহুল্য, বুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিস্টের অনেক বছর আগে। শাক্যসিংহের অহিংসা, করুণা, মৈত্রী, জীবপ্রেম বাণীই ভারতের অন্তর্নিহিত আদর্শ। বৌদ্ধ ধর্ম উত্তর ভারত থেকে পূর্ব ভারত এবং ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, শ্রীলঙ্কা, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের জনজীবনে বাঁচার নতুন আশা-ভালবাসা জাগিয়েছে। আফগানিস্তানের বামিয়ানে সুবিশাল বুদ্ধমূর্তি তালিবানি আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদে একদা সারা বিশ্ব প্রতিবাদে মুখর হয়েছে, নেপাল, সিকিম, তিব্বত, মায়নমার প্রভৃতি স্থানেও বৌদ্ধ ধর্মের সহজ গভীর প্রভাব বিদ্যমান।

বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুশীলন ও প্রসার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষকদের বৌদ্ধ সভ্যতা-বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন এবং বাঙালি-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীর বুকে বৌদ্ধ ধর্মের মহিমাকে উজ্জ্বলতর করার অভিপ্রায়ে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কর্মযোগী কৃপাশরণের

অভিভাবকত্বে 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ গুণালঙ্কার মহাস্থবির (১৮৭৪-১৯৯৬) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার অধ্যাপক সমণ পুণ্ণানন্দ (১৮৭০-১৯২৮) 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকা-সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

এই 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি সংকলনটি হাতে পেয়ে ভাল লাগল। বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন'। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পত্রিকাটির প্রকাশকাল মাত্র দু'বছর। রাজা রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্মণসেবধি', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' বা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ হয়নি। সেই নিরিখে 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি সংবাদ অবশ্যই আনন্দসঞ্চারী।

গবেষকের মনস্কতায় লক্ষণীয়—এই 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকার প্রকাশ নিরবচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিক নয়। ১৯০৮ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ 'জগজ্জ্যোতি' প্রকাশনার প্রথম পর্যায়। কৃপাশরণ মহাস্থবিরের মৃত্যু এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ কারণে পত্রিকাটির প্রকাশ তিন দশক রুদ্ধ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে 'জগজ্জ্যোতি'র পুনঃপ্রকাশ ঘটে। এই পর্যায়ের সম্পাদনায় বৃত হন বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (১৯০৭-২০০২)। ১৯৫৯ অবধি ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি প্রায় এক যুগ স্তব্ধ থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বার্ষিক বুদ্ধজয়ন্তী সংখ্যা হিসাবে 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকার সম্পাদনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার অধ্যাপক ড. দীপককুমার বড়ুয়া। ১৯৭৭ অবধি পত্রিকা প্রকাশ অক্ষুণ্ণ থাকে। চতুর্থ পর্যায়ে ১৯৮০ থেকে বাংলা ও ইংরাজি দ্বিভাষিক 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব নেন কবি-প্রাবন্ধিক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী। এই শতবার্ষিকী সংখ্যার সম্পাদন কর্মেও তাঁর শ্রম-নিষ্ঠা-যোগ্যতা ধারাবাহিকভাবে প্রমাণিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের পত্রিকার ইতিহাসে, ধারাবাহিক-নিরবচ্ছিন্নভাবে একমাত্র প্রকাশিত পত্রিকা হল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন'। স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্তনায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১ মাঘ (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি) 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। রামকৃষ্ণ মিশন অদ্বৈত আশ্রমের ইংরাজি মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' শতবর্ষ অতিক্রমী।

কোনও ধর্মীয় মুখপত্রের শতবার্ষিকী সংকলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই সংকলন সাধারণত দু'ভাবে ঋদ্ধ হয়—(১) শতবর্ষব্যাপী প্রকাশিত অসংখ্য রচনা থেকে প্রতিনিধিমূলক সুনির্বাচিত কিছু রচনার সংকলন, অথবা (২) সেই ধর্মীয় পত্রিকাটির ভাব ও আদর্শ স্থানিক গণ্ডি ছাপিয়ে বিশ্বমনীষার কাছে কীভাবে সমাদৃত—তার ঐতিহাসিক তথা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী বহুমাত্রিক ভাবনার প্রতিনিধি স্থানীয় নানা লেখার সংকলন।

আলোচ্য JAGAJJYOTI (1908-2008) Centenary Volume-এর দু'টি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে ইংরাজি প্রবন্ধের সংকলন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা প্রবন্ধ কয়েকটি মাত্র। সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী।

ইংরাজি বিভাগে Lord Buddha—The Pathfinder, Respect & Tolerance, Buddhist Approach to conflict—An Asokan Retrospection on Peace and Security, In Quest of a Buddhist Identity, Buddhism and Eco-harmony, Contribution of Buddhist Women প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুলিখিত। লেখকরা বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাবন্ধিক-শিক্ষাবিদ। পাশাপাশি আরও কয়েকটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। যথা—Buddhism in Korea—its contribution to the World Culture, History of Vietnamese Buddhism, Buddhism in Myanmar, Hundred Years ইত্যাদি। 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকার বাংলা বিভাগটি ইংরাজি বিভাগের তুলনায় নিষ্প্রভ। বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী এবং 'জগজ্জ্যোতি' পত্রিকার অন্তরঙ্গ কয়েকজন লিখেছেন। বাংলা সংস্কৃতির অগ্রগণ্য গবেষক প্রাবন্ধিকদের কি লেখার আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি পত্রিকা-সম্পাদক! অথচ বুদ্ধজয়ন্তী স্মারক সংকলন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশতবর্ষ সংখ্যা প্রভৃতি সুধীজনমান্য সংকলন-সম্পাদনা করেছেন হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী। আলোচ্য বাংলা বিভাগে 'জগজ্জ্যোতি বনাম হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' লেখাটি মূলত পৃষ্ঠকণ্ডূয়নধর্মী। দ্বিতীয়ত, শিরোনামে জগজ্জ্যোতি এবং হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীর মাঝে 'বনাম' শব্দটি কি প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভাব আনে না? এই ধরনের শব্দপ্রয়োগ রুচিকর নয়। এই প্রবন্ধটিতে সম্পাদকের মহিমা প্রচারের উগ্রতায় সংকলনের মর্যাদাহানি করেছে।

উন্নত মানের বাঁধাই এবং অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত মহার্ঘ সংকলনে মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্টিকটু। গ্রন্থের ২৯৩ পৃষ্ঠায় ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩৯) লেখা হয়েছে। অথচ ডিরোজিওর মৃত্যু ১৮৩১-এ। ৩০৫ পৃষ্ঠায় কালিদাস রায় এবং ৩০৬ পৃষ্ঠায় শশিভূষণ দাশগুপ্ত নামদুটির মুদ্রণপ্রমাদ কাঙ্ক্ষিত নয়।

পরিশেষে নিবেদন, সারা বিশ্বে Buddhism একটা Religious movement এবং অবশ্যই Religious Cult;

অথচ এই সংকলনের বাংলা বিভাগের লেখক নির্বাচনে যেন Sectarian দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকট।

আমাদের প্রত্যয়ঋদ্ধ ভাবনা—সারা বিশ্ব স্নায়ুযুদ্ধে কিংবা প্রকাশ্য যুদ্ধের মাঝে কাতর-অসহায় চিত্তে অহিংস-শান্তির ধ্রুবতারাতুল্য তথাগত বুদ্ধের করুণাঘন মূর্তির কাছে গভীর প্রশান্তির আশায় শরণাগত! তাই তথাকথিত 'আস্তিক' বা 'নাস্তিক' কথা দুটি দিয়ে কোনও শ্রেণিবিভাজন নয়; বিশ্বশান্তির অবিনশ্বর ভাবমূর্তি বুদ্ধ! বিশাল বিশ্বের মানবসমাজের যাবতীয় নিরানন্দ ও অমঙ্গল ভাবনা প্রশমিত বা দূর করে, তিনি আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে সত্যসুন্দররূপে নিত্য বিরাজিত! 'জগজ্জ্যোতি' এক সত্যবিন্দু, তা থেকেই আবিশ্ব উদ্ভাসিত! অথচ সেই বিশ্বব্যাপ্ত শুভবোধের উদ্ভাসনে আরও বাঙালি মনীষী এবং বিশ্বমনীষীর ব্যাপ্ত গভীর বোধযুক্ত প্রাসঙ্গিক আরও নতুন লেখার প্রত্যাশা জেগে রয় যে!

Jagajjyoti Centenary Tribute to Chitracharya Upendra Maharathi বইটি মহার্ঘ শিল্পসংকলন। উড়িষ্যায়, পুরী জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে শিল্পী উপেন্দ্র মহারথীর জন্ম। কলকাতা আর্ট স্কুলে ১৯২৫-৩১ শিল্পকলাচর্চার সুযোগ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-নন্দলাল বসুর শিল্পঘরানায় নিজেকে তৈরি করেন শিল্পী। বিহারে শিল্পী হিসাবে খ্যাতিমান এই চিত্রশিল্পী রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আচার্য কে. পি. জয়সয়ালের সাহচর্যে আসেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। বুদ্ধগয়া মন্দির কমিটির সদস্য এই শিল্পী তথাগত বুদ্ধের অনুধ্যানে খুঁজে পেয়েছেন মনের আরাম, প্রাণের আনন্দ, আত্মার শান্তি। ১৯৮১-তে তাঁর মৃত্যু। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার (কলকাতা) পক্ষে হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী এই নয়নশোভন শিল্পসংকলনটি সম্পাদনা করেছেন। গ্রন্থপ্রারম্ভে মহাশ্বেতা মহারথী এবং সম্পাদকের শিল্পী-পরিচিতি আমাদের প্রাণিত করে।

তথাগত বুদ্ধের জীবনালেখ্য নানারূপে চিত্রিত। *Prince* Siddhartha in contemplative mood, Lamentation of Yashodhara after *Prince* Siddhartha's renunciation of home and hearth, Sujata offering sweet pudding to the ascetic Gautama, Buddha delivering a discourse to his disciples, Buddha in Vaishali, Buddha in Salvation around the burning world, Padmasambhava প্রভৃতি কালজয়ী চিত্রের পাশাপাশি Amrapali, Asoka the Great, Sanghamitra going to Sri Lanka, Parvati in penance in Mt. Kailash, Ganga travelling to Shiva, Alexander, Meeting of two Saints, Buddha, Christ and Gandhi, Rabindranath Tagore, Albert Einstein, Birsa Munda, Pencil sketch of a Japanese girl, Pencil sketch of a Kashmiri girl, A village belle, Two Adivasi girls, Agony of a victim a partition of India and Pakistan, A scene of rural India, Mount Kanchanjunga, Mount Fuji, Starvation of four generations during the great Bengal Famine, Moonlit night প্রভৃতি চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল বসুর শিল্পঘরানা স্পষ্ট।

কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতির সঙ্গে এই ধরনের সাহিত্য সংকলন ও আর্ট অ্যালবাম প্রকাশ করার জন্য সাধুবাদ পাবেন নিশ্চিত।

JAGAJJYOTI (1908-2008), Centenary volume—Editor, Hemendu Bikash Chowdhury/Bauddha Dharmankur Sabha, Kolkata–12/Rs. 300, US $ 20

Jagajjyoti, Centenary Tribute to Chitracharya Upendra Maharathi—Editor, Hemendu Bikash Chowdhury/Baudha Dharmankur Sabha, Kolkata–12/Rs. 300, US $ 20

ছোটখাটো ভালবাসাগুলো

রাহুল পুরকায়স্থ

দু'টি বই, কবিতার। লেখক একজন, নীলাঞ্জন হাজরা। নীলাঞ্জনের কবিতা আগে খুব একটা পড়িনি। যা পড়েছি, যতটুকু পড়েছি সেটা নীলাঞ্জনের করা অনুবাদ, কবিতার অনুবাদ, মূলত পাকিস্তানি কবিতার অনুবাদ। বলা যেতে পারে, পাকিস্তানে অতি সম্প্রতি কী লেখালেখি হচ্ছে আমাদের তার খোঁজ দিতে নীলাঞ্জন নিরলস। অনুবাদক হিসাবেও নীলাঞ্জন বেশ সাবলীল। পাকিস্তানি কবিতা, যার শিরায় শিরায় বহে চলেছে প্রতিবাদ, বেঁচে থাকার বিদ্রোহ। সেই প্রতিবাদের আঁচ নীলাঞ্জনের অনুবাদ মারফত আমাকে স্পর্শ করে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে নীলাঞ্জনের একটি অনুবাদ গ্রন্থও, কেড়ে নেওয়ার ইতিহাস। অফজাল আহমেদ সৈয়দের কাব্যগ্রন্থের অনবদ্য অনুবাদ। সেই অনুবাদের দু'টি পংক্তিতে আপাতত আমি আশিরনখ ডুবে আছি—

ভালোবাসা চোখে পড়ার মতো কোনও চিহ্ন নয়
যা দিয়ে সহজেই লাশ শনাক্ত করা যায়

বলা বাহুল্য, পাকিস্তানের কবিতার সঙ্গে নীলাঞ্জনের এই অভ্র-আবির সম্পর্কহেতু তার কবিতার অবয়বে ও আত্মায় পাকিস্তানি কবিতার ছায়া পড়ে আছে।

কাব্যের তথাকথিত কোনও আভরণ ব্যতিরেকে একেবারে ভূমিকাহীন প্রত্যয়ে কথা লেখেন নীলাঞ্জন। এই প্রত্যক্ষতায় কখনও কখনও খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে আমাদের প্রিয় কবি ভাস্কর চক্রবর্তীকে। আর এখানেই টের পাই যে নীলাঞ্জন বাংলা কবিতার দুনিয়ায় ভুঁইফোঁড় নন। তিনি বহন করে চলেছেন এক উল্লেখযোগ্য উত্তরাধিকার।

নীলাঞ্জনের প্রায় প্রতিটি কবিতাই একজন মানুষের, একজন একা মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নহত্যার ধারাবিবরণী। আর আলোড়ন। আলোড়ন আনন্দের দাস। গোপন উল্লাসের সহোদর।

নীলাঞ্জনের প্রথম বই : আমি সেই মুখোশ ফেরিওয়ালা। প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০৯।

দ্বিতীয় বই : হৃদয়ে পানীয় জল নেই। প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০।

প্রথম বইটিতে কবিতাসংখ্যা ৫০, দ্বিতীয়টিতে ৪৮। অধিকাংশ কবিতাই নামহীন। আমার মনে হয় দু'টি নয়, আসলে একটিই বই। কেননা ভাষাব্যবহারে, আঙ্গিকে, শব্দচেতনায় দু'টি বইয়ের রচনারা বড়ই কাছাকাছি।

প্রথম বইটি উৎসর্গ করেছেন ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে। উৎসর্গপত্রে রয়েছে শঙ্খ ঘোষের কবিতার দু'টি পংক্তি—

আমি কি তোমার দৃষ্টি চেয়েছি?
চেয়েছি কি কোনো জীবনছবি?

দ্বিতীয় বইটি উৎসর্গ করেছেন শঙ্খ ঘোষকে। উৎসর্গপত্রে রয়েছে মোমিনের দু'টি পংক্তি—

তুম মেরে পাস হোতে হো গোয়া
যব দুসরা কোয়ি নহি হোতা

এই দু'টি উৎসর্গপত্রই আমাকে নীলাঞ্জনের দর্শন ও ইন্দ্রিয়গতি সম্পর্কে সচেতন করে। দু'টি উৎসর্গেই রয়ে গেছে সমর্পণের সংকেত। সংকেতসচেতন আমি নীলাঞ্জনের কবিতায় প্রবেশ করি।

বন্দরবিহীন
ভুতুড়ে জাহাজ

ভয়ানক ঝড়ে ডোবে না
চোরা পাহাড়ে ফাঁদে না
হিমবাহের আঘাতে দু'টুকরো হয় না

জাদুবাস্তবতার জাহাজ। যে-জাহাজে আমি লক্ষ করি, একজন কাব্যকারের পরিভ্রমণ। যে-বাস্তবতা আমাকে নিয়ে যায় এক আপাত অস্থির ঘটনাপ্রবাহে, একটি নাছোড় অনুসন্ধানে, ইন্দ্রিয় অতীত সম্মোহনে, বাঁশিওয়ালা মানুষটির খোঁজে।

আমরা একে অপরকে এস. এম. এস. পাঠাতে থাকলাম

বাঁশিওয়ালা মানুষটা আসছে

আসছে। অনাগতের অপেক্ষায়। অনাগতে সমর্পণের অপেক্ষায় সময় সমাজকে জরিপ করবার অকূল বিস্তার আমাকে আশ্চর্য কাব্যঅভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে

ভাবতে চাই তোমার কথা
ঝিরঝিরে বৃষ্টিদিন পথে রঙিন ছাতার মতো—নাগরিক
ভেবে উঠি দলছুট ডানা ভাঙা কানা কাক
যাকে আর
বাঁচানো যাবে না কোনওদিন...

এই লেখাটি পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে গেল কবি অমিতাভ কাঞ্জিলালের মুখ। একজন প্রয়াত বন্ধুর মুখ।

অমিতাভ, আমি এই মুহূর্তে ভাবতে চাইছি তোমাকেই। কবিতা বারেবারে নিয়ে যায় তবে সম্পর্কস্মৃতির মহাদেশে! হলুদ নদীর এক দেশ, চাঁদ ভাসে পাহাড়চুড়োয়। অমিতাভর শেষ কাব্যপুস্তিকাটির নাম ঃ একা মানুষের জন্য।

মৃত্যুর কোনও মুহূর্তে
কেন
দেখতে পাইনি তোমার মুখ?

আমার এই মুহূর্তের বন্ধুবিচ্ছেদস্মৃতিকে স্পর্শ করলেন নীলাঞ্জন। তিনি আমার কবি হয়ে উঠলেন।

কিছু বলো
কিছু বলো
কিছু বলো
নইলে যে অব্যবহারে
বাতাসের ডানা খসে যেতে পারে...

মোট ৯৮টি কবিতা। আপাত সহজ সরল গতিপথ। অথচ কত অবলীলায় রচনা করে চলেছে এক রহস্যঘূর্ণি। যেন মনে হয় একটি, মাত্র একটিই কবিতাসূত্র আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে আত্মপীড়নের রন্ধনশালায়। কী সেই সূত্র? উত্তর জানা নেই। জানলে পাঠকজন্মের নিশ্চিত মৃত্যু। কিছু কিছু অজানাকে আমৃত্যু সঙ্গে নিয়ে চলার নামই তো জীবন।

যে নীলাঞ্জন স্থির করছেন রক্ত আর ধর্ষণের রাতে ভালবাসার কবিতা পাঠাবেন। সেই নীলাঞ্জনই লিখছেন

বাঁচিয়ে রাখা দরকার

আমাদের মতো ছোটখাট মানুষদের

ছোটখাট ভালোবাসাগুলো

ভালবাসা, তোমাকেও সম্যক জানা গেল কি?

আমি সেই মুখোশ ফেরিওয়ালা—নীলাঞ্জন হাজরা/ কবিতীর্থ, কলকাতা/৪০.০০
হৃদয়ে পানীয় জল নেই—নীলাঞ্জন হাজরা/উর্বী প্রকাশন, কলকাতা/৬০.০০

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'বাংলা কবিতার বিস্তৃত প্রবাহ উদ্ধৃত করার চেষ্টা' করেছেন গৌতম ঘোষদস্তিদার তাঁর 'কবিতার মায়াপাশ' গ্রন্থে। ইতিপূর্বে সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা বিচ্ছিন্নভাবে কাব্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। 'তাঁদের আলোচিত সময়রেখা বিস্তৃত' করতেই লেখকের এই প্রয়াস। স্বভাবতই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক হয়ে একেবারে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বাংলা কবিতার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু থেকে শঙ্খ-সুনীল-শক্তি হয়ে একেবারে হাল আমলের জয়, সুবোধ সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, যশোধরা রায়চৌধুরী, হিন্দোল ভট্টাচার্য ঘুরেফিরে এসেছেন সবাই। নিঃসন্দেহে পরিশ্রমসাধ্য কাজ।

কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস রচনা তাঁর লক্ষ্য নয়, বিশেষ সময় বা দশকওয়ারি 'সুচিহ্নিত' কবিরাই তাঁর আলোচ্য— ভূমিকায় এমনই বলেছেন লেখক। নির্বাচনেও তাঁর পছন্দই শেষকথা। এমনটাই স্বাভাবিকও বটে। তবু আবছা প্রশ্ন তো জাগেই কবিতা সিংহের মতো কবিরা কি বেমালুম নিশ্চিহ্নই হয়ে গেলেন!

কবিতার মায়াপাশ—গৌতম ঘোষদস্তিদার/রক্তমাংস, হাওড়া/৮০.০০

শুধু কবিতার আলোচনা নিয়ে ৩৫২ পৃষ্ঠার একটি বই। মগ্ন করে রাখার মতো আয়োজন। জীবনানন্দ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত নির্বাচিত কয়েকজন কবির এক একটি কবিতা ধরে বিশদ, পুঙ্খানুপুঙ্খ, বহুমাত্রিক পাঠ। রামায়ণ-মহাভারত-উপনিষদ-সংস্কৃত সাহিত্য-গ্রিক পুরাণ-রবীন্দ্রনাথ-বিশ্বকবিতার ঐতিহ্য-ইতিহাস-আধুনিকতা-উত্তর আধুনিকতা—নানা উপাদানের সাহায্য নিয়ে এক-একটি কবিতাকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এর ৭৫ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা বিস্ময় জাগায়। প্রতিবাদ আর সমাজ পরিবর্তনকামী কবিতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন লেখক। অতিরেক কি নেই? আলোচনার বহর কখনও পরিমিতিবোধ হারিয়েছে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে গিয়ে মূলের খেই হারিয়েছে। তবুও কবিতা বিষয়ে যাঁরা জানতে চান, ভাবতে চান তাঁদের পক্ষে সংগ্রহযোগ্য একটি গদ্যগ্রন্থ।

মানব সম্পর্কের কবিতা—শম্ভু ভট্টাচার্য/মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-৭৩/২০০.০০

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পুরোধা কবি দেবী রায়ের প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ 'গদ্য সংগ্রহ'।

আলোচ্য বইটিতে উঠে এসেছে সাহিত্যের নানা বিষয়, তেমনই নানা দিক থেকে আলোচনা করেছেন বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টির বৈচিত্র এবং বৈশিষ্ট্য। প্রবন্ধগুলির আলোচনার ধরন কখনও নৈর্ব্যক্তিক, কখনও আত্মমগ্ন। কতকটা যেন আত্মকথন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'সতীনাথ : প্রসঙ্গ প্রসঙ্গান্তরে' প্রবন্ধটির কথা। সতীনাথ কেন তাঁর প্রিয় লেখক বোঝাতে দেশ-বিদেশের দর্শন এমনকী রামায়ণের প্রসঙ্গও নিয়ে এসেছেন। সতীনাথ, বুদ্ধদেব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি কথা বলেছেন কবি কবিরুল ইসলাম, শামসুর রাহমান, পণ্ডিত-দার্শনিক শিবনারায়ণ রায়কে নিয়ে। এ বাংলা ও বাংলার কবিতার গতিপ্রকৃতি, বাংলা প্রবাদ—এমনই বহুতর বিষয় নিয়ে ঋদ্ধ এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য লোকসখা প্রকাশন নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

গদ্য সংগ্রহ—দেবী রায়/লোকসখা প্রকাশন, কলকাতা-১৪/১২০.০০

জল সংরক্ষণ নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে গোটা বিশ্বজুড়ে। তার কারণ জল প্রকৃতির অকৃপণ দান হলেও, তার ভাঁড়ার অফুরান নয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে বিশ্ব যত এগিয়ে যাচ্ছে, ততই প্রযুক্তির যদৃচ্ছ ব্যবহারে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাচ্ছে। চাষাবাদের জন্য এখন কেবল পুকুর বা নদীর ওপর নির্ভর না করে নলকূপের সাহায্যে মাটির তলার জলকে টেনে তোলা হচ্ছে। ফলে একদিকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নামছে, অন্যদিকে ফসলের কীটনাশকের বিষ গিয়ে মিশছে মাটির তলার জলে। জলস্তর নামা এবং কীটনাশক মেশায় ভূগর্ভস্থ বিশুদ্ধ জলই আজ হয়ে উঠেছে বিষাক্ত। দেখা দিচ্ছে নানা জটিল অসুখ।

জল নিয়ে এমনই নানা ভাবনার কথা সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরেছেন জয়া মিত্র তাঁর 'ভূমিজল' বইয়ে। কৃত্রিম পদ্ধতি এবং সার দিয়ে চাষ করার বিপদ সম্পর্কে দেরিতে হলেও সচেতনতা বেড়েছে আজ অনেকের মধ্যেই।

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উপায়ে চাষবাসের কিছু কিছু নজিরও তুলে ধরেছেন লেখিকা। প্রসঙ্গত কৃত্রিমভাবে বাঁধ তৈরিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যে বিপদ ঘনিয়ে আসে বিভিন্ন বাঁধের উল্লেখ করে সে কথা জানিয়েছেন লেখিকা। আহর পইন, জোহড় বাঁধ, চৌকরি নালা ইত্যাদি।

সহজ বাংলায় এহেন ঝরঝরে বই আর ঝকঝকে প্রচ্ছদ উৎসাহী পাঠকের আগ্রহ উস্কে দেবে।

ভূমিজল—জয়া মিত্র/পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা-৭৩/৬০.০০

পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে সমীরকুমার রায়ের উপন্যাস 'জীবন যে রকম'। উপন্যাসের নায়ক জমিদার রিতেন্দ্রনারায়ণ রায়কে কেন্দ্র করে এসেছে অনেক চরিত্র। বিপ্রবালার মতো বালবিধবার পাশাপাশি আছে জমিদারি প্রথার বিরোধী বামপন্থী চন্দ্রনাথের মতো চরিত্র; কীর্তিনারায়ণের মতো মধ্যপন্থার মানুষ। জিতেন্দ্রনারায়ণের মতো উন্মার্গগামী যুবক। শৈলবালা, মহাশ্বেতা, সুভদ্রার মতো একাধিক নারী চরিত্রও কাহিনির টানে ঘুরেফিরে এসেছে কখনও অতীত, কখনও বর্তমানের কোলাজে। মাত্র ৮০ পৃষ্ঠার পরিসরে এতগুলি চরিত্রের প্রতি যথাযথ সুবিচার স্বভাবতই কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলির বদলে-যাওয়া, পালটে-যাওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলে না। তবে কেন্দ্রীয় চরিত্র রিতেন্দ্রনারায়ণের চরিত্রচিত্রণে লেখক মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন।

জীবন যে রকম—সমীরকুমার রায়/সাহিত্য রং বেরং, কলকাতা-৩৫/৭০.০০

'সুন্দর মৃত্যু বা ইউথেনেজিয়া' একটি উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক ব্যর্থ প্রেমিক অমিতাভ। ব্যর্থতা থেকে মুক্তি পেতে সে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নেয়। বলাবাহুল্য নায়ক তথা লেখক বিপ্লব মাজী একে আত্মহত্যা বলতে নারাজ। বহু বিতর্কিত 'ইউথ্যানেসিয়া' বা স্বেচ্ছায় 'সুন্দর মৃত্যু'ই এ টেক্সটের আলোচ্য বিষয়, বকলমে আসল নায়ক সেই। উপন্যাসের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে বন্ধু অগ্নিভকে মৃত্যু তথা স্বেচ্ছামৃত্যু নিয়ে লেখা অমিতাভর একাধিক দীর্ঘ চিঠি। বইটির ব্লার্বে উপন্যাসটিকে মৃত্যু নিয়ে 'পোস্ট-মডার্ন পৃথিবীর সন্দর্ভ' বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। এ বইয়ের পাঠকেরা পোস্ট-মডার্ন পৃথিবীর পরিচয় কতটা পাবেন না জানা গেলেও মৃত্যু নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের বিশ্বাস সংস্কারের পরিচয় পাবেন নিশ্চিত। আক্ষেপ একটাই, তথ্যসূত্র নেই।

সুন্দর মৃত্যু বা ইউথেনেজিয়া—বিপ্লব মাজী/ অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর/৬০.০০

বিষয় বৈচিত্র এবং অলংকরণ পারিপাট্যে 'এবং পরব'-এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি নজর কাড়ে। ইতালির কবি ওভিদ আর 'বীরাঙ্গনা'র কবি মধুসূদনের মানস-নৈকট্য নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন দীপ্তি ত্রিপাঠি। আছে শান্তনু কায়সার, সালাহউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ আলোচকদের ভাবনা-জাগানো প্রবন্ধ। রয়েছে কবিতা, ছোটগল্প এবং অনুবাদ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, 'ফিরে পড়ি' অংশের ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা দু'টি। লেখা দু'টির উৎসের উল্লেখ না থাকায় কিঞ্চিৎ আক্ষেপ রয়ে গেল। তবে সব মিলিয়ে মননশীল একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্য সম্পাদক বুলবুল আহমেদ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

এবং পরব, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা—সম্পা: বুলবুল আহমেদ/কলকাতা/৭০.০০

তিরপূর্ণি (মাঘ, ১৪১৩) সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ প্রয়াত কবি সিদ্ধেশ্বর সেনকে নিয়ে তাঁর অনুজ কবি-সাহিত্যিকদের আলোচনা। অনন্য স্বকীয় ঢঙে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন আত্মউদাসীন এই কবির কথা, অন্যদিকে দেবেশ রায়ের কাল্পনিক বর্ণনাও কৌতূহলোদ্দীপক।

বাংলা কবিতার প্রেক্ষিতে সিদ্ধেশ্বর সেনকে নিয়ে জহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাটিও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অন্যান্য কবিতা ও গল্প তো আছেই। সিদ্ধেশ্বর সেনকে নিয়ে তেমন আলোচনা তো হয় না, আগ্রহী পাঠকদের কিছুটা কৌতূহল মেটাবে এই পত্রিকা।

তিরপূর্ণি (মাঘ ১৪১৩)—সম্পা: সুদেব বক্সি/ কলকাতা-৮/৩৫.০০

'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' পড়ে মনে এল

অলকনন্দা দাশগুপ্ত প্যাটেল

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রচুর গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে, চিঠিপত্র, ইতিহাস, উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা অনেক লেখা হয়েছে, তবে প্রায় বছরব্যাপী একটি সমাজের বা একটি শহরের যেমন ঢাকার, ছোটবড় খুঁটিনাটি ঘটনা ঘিরে লেখা বিরল। সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর (চতুরঙ্গ, বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ১ ও ২) বাংলাদেশ পরিচ্ছেদ শুধু রাজনীতি, নৃশংসতা, দেশভক্তি, মুক্তিযুদ্ধর রোজনামচা নয়; যুদ্ধ, জয়-পরাজয়, আশা-নিরাশা, আনন্দ, শোক-দুঃখের মাঝে ঢাকা শহরের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি এই কাহিনিতে আমরা পাই। সাংবাদিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বা সংবাদের প্রতি লেখকের প্রবল ঘ্রাণশক্তির সঙ্গে সঙ্গে গভীর সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা, আন্তরিক সম্প্রীতি ও সম্মান জনিয়ে তিনি এক প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা লিখেছেন। আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয়, 'রেডিমেড জামা'র দোকান, লেখার কাগজের অভাব থেকে ঘোর অসুবিধা বা অতিথিপরায়ণ বাঙালির ভাঙা বাতাসা, বিস্কুটের টুকরো বা শুধু 'পানি' দিয়ে আপ্যায়ন করার শূন্যতা ও দুঃখ, মুক্তিযুদ্ধের বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে চট করে মনে আসতে পারে না।

আব্বাসউদ্দিনের স্ত্রীর তুলসীতলায় জল দেবার ঘটনা (সংখ্যা ২, পৃ: ১৩২) পড়ে আমার পারিবারিক কিছু অভিজ্ঞতা মনে এল। আমার মায়ের জন্ম হয়েছিল ১৯১২ সালে ঢাকার গেন্ডারিয়া পাড়ায়, সতীশ সরকার রোডের 'উমা কুটিরে'। এই বাড়িতেই তিনি বড় হয়েছেন, এবং ঢাকা থাকাকালীন এই ছিল তাঁর বাপের বাড়ি ও আমাদের প্রিয় মামাবাড়ি। ১৯৪৬ সালে এই বাড়ি থেকেই দাঙ্গার মধ্যে চিরকালের মতো আমরা ঢাকা ছেড়েছিলাম। এরপর প্রথম ১৯৭৫-এর প্রথমভাগে আমার বাবা-মা ঢাকা যান এবং মা তাঁর স্মৃতিঘেরা গেন্ডারিয়ার বাড়ি দেখতে যান। তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁরই ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত করছি।

'উমা কুটির' ফলকটি গেটের ওপর আজও আছে। চার শরিকে বাড়ি বিভক্ত—চার বাড়িতেই আপ্যায়ন করে ঘরে বসালেন ও চা খাবার অনুরোধ করলেন। গাছপালা, ফুল, বাগান—কিছুই নেই, চতুর্দিকে আগাছা। বাড়িতে ঢুকবার সেই সুন্দর লাল সুরকির রাস্তার জায়গায় আছে এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা পাথরে ভরা হোঁচট খাওয়ানো পথ। বাড়ির সামনে বাগানের বাঁদিকে যেখানে কোমর উঁচু তুলসীমঞ্চ ছিল, যে তুলসীগাছে রোজ জল দিয়েছি, প্রদীপ জ্বালিয়েছি, সেটা নেই। ভেঙে ঠিক সেই জায়গায় বানানো হয়েছে একটি শৌচালয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল এমন শ্রী-হীন বাড়ি যেন আর কখনও দেখিনি।'

২০১০-এ 'উমা কুটির' ফলকটি নেই। ভাঙা কাঁচ লাগানো উঁচু দেয়াল বা লোহার গেটও নেই। শৌচালয় তার জায়গা মতো। পুরো বাড়ি ঘিরে জানলা দরজা বারান্দাতে লোহার শিক। সামনের উঠোনে মনে হয় একটি ভাঙা গাড়ির গ্যারেজ। বাড়ির পেছনের বিরাট উঠোন, জমি, বিশাল গাছের সারি যার শুকনো পাতার ঢিবির ভেতরে আমার দিদিমার সাহায্যে ১৯৩০ দশকের সন্ত্রাসবাদীরা রিভলভার লুকিয়ে রেখেছেন, তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। সেই জমিতে এখন আধুনিক ধরনের ফ্ল্যাটবাড়ি। এটা অপ্রত্যাশিত নয়। আপ্যায়নের প্রশ্ন ওঠে না, গেটের ভেতর ঢোকার অনুমতিও এখন পাওয়া যায় না।

সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি পাই ২০০৩-এ আমার অগ্রজসম এক বন্ধুর চিঠিতে। ইনি ধর্মে মুসলমান ও হাজি। আমার চিঠির উত্তরে ইনি লিখছেন :

'আপনার চিঠি প'ড়ে বারবার কানে বেজেছে আমার ছোটবেলার সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা আর শাঁখের শব্দ। চোখে এখনও ভাসে তুলসীমঞ্চের ছোট গাছটি যার প্রতি ঘরনীর যত্ন ঘরের শিশুটির চেয়ে কিছু কম নয়।

জন্ম যদিও ঢাকা শহরে বাবার কল্যাণে পূর্ববাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশের সঙ্গে আমার পরিচয় জ্ঞান হওয়া অবধি। পরিবারে মুসলিম ঐতিহের পাশাপাশি আমার শৈশব ও বাল্যের হিন্দু প্রতিবেশী ও সহপাঠী বন্ধুদের জীবন-আচার আমাকে বাঙালি করে তুলেছে—একজন পূর্ববাংলার

বাঙালি—যাকে বোধহয় আহমেদাবাদ ও খুলনা বাগেরহাটের নরমেধ যজ্ঞকারীরা কোনও দিনও জানবে না, বুঝবে না।'

নববর্ষ ১৪১৭-তে গৈলা গ্রামের সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের (হিন্দু ও মুক্তিযোদ্ধা) চিঠি ঢাকা থেকে, 'শুভ নববর্ষ। প্রতি নববর্ষে মনে হয় এমন দেশটি কোথাও আর নাই রে'।

হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি বা বিদ্বেষ, একের অন্যের প্রতি সম্মান বা তাচ্ছিল্য কোনও এক কুঠুরিতে বেঁধে রাখা যায় না।

হাবিব তনবির স্মরণে

হাবিব তনবিরের স্মরণে লেখাটি (চতুরঙ্গ, বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ১, ১৪১৬, পৃ: ৯৫-৯৬) প'ড়ে ১৯৬৯ সনে দিল্লিতে গালিবের মৃত্যু শতবার্ষিকীর নানা অনুষ্ঠান মনে এল। এরমধ্যে অন্যতম ছিল হাবিব তনবিরের নাটক, 'গালিব'। গালিবের জীবন ও তাঁর লেখার, বিশেষ করে চিঠিপত্র, অনুশীলন করে এত তথ্যপূর্ণ নাটক আরও থাকার সম্ভাবনা কম। নাটক শুরু হওয়া অবধি তনবির নাটক লিখেই চলছিলেন। নিজে গালিবের ভূমিকা করেন—পাঠ মুখস্থ ছিল না, স্টেজেও হাতের কাগজ দেখে অনেক সময় অভিনয় করছিলেন। নাট্যকার হিসাবে হাবিব তনবিরের স্থান এত উঁচু ছিল যে সেই দিনের দর্শক বিনা দ্বিধায় এটা মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু নাটকটি জনপ্রিয় হয়নি। এর আগের সন্ধেয় ছিল গীতিনাট্য 'গালিব কওন হ্যায়'। হাফিজ আহ্‌মেদ খানের সুরে মদনবালা সিন্ধুর মন মাতানো আওয়াজে গালিবের গজল শোনার পর তনবিরের উচ্চমান উর্দুপ্রধান চিন্তাশীল কঠিন নাটক দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারেনি। এটি পরে কখনও অভিনীত হয়েছে কি না জানি না, তবে হাবিব তনবিরের কাজের মধ্যে এই নাটকের একটি বিশিষ্ট স্থান হওয়া উচিত।

১৯৭১ বা ১৯৭২-এ ছত্তিশগড়ে তনবির আবিষ্কার করলেন পুনারামকে। পুনারাম ছিলেন বংশপরম্পরাগত মহাভারতের কথাকার। নিজের দেশ-গ্রামে এঁরা মুক্তঅঙ্গনে, খোলা আকাশের নীচে, দরাজ গলায় বাইশ দিন ধরে গ্রামবাসীদের মহাভারতের কাহিনি শোনাতেন—কখনও গানের সুরে, কখনও অভিনয়ে, মাঝে মাঝে একটু রসিকতার সঙ্গে। পেছনে দু' থেকে চার দোহার, ঢোলক জাতীয় একটি তালের সঙ্গত, পুনারামের হাতে একতারা জাতীয় একটি বাজনা। শুধু বাইশ দিনের নয়, পুনারাম আলাদা করে এক একটি পালাও পেশ করতেন। তনবিরের বন্ধুরা বলতেন, 'ছত্তিশগড়ে পুনারামের গলার 'আকার' ধ্বনি শুনেই হাবিব তাঁকে দলবলসহ নিয়ে দিল্লি চলে এলেন। প্রোগ্রাম বা এতজনের ভরণ-পোষণের চিন্তা পরে'।

দিল্লিতে AIFACS হলে মহাভারতের চারটি পালা হল। এরপর পুনারাম কয়েকটি বাড়িতেও মহাভারতের নানা কাহিনি পেশ করলেন। আমাদের বাড়িতে হয়েছিল 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'। পুনারামের অভিনয়ে ও গানে মহাভারতের কথা শোনা ছিল একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছি। হাবিব তনবিরের নানা অবদানের মধ্যে এটিও একটি বড় অবদান।

অলকনন্দা দাশগুপ্ত প্যাটেল

ওমানের অভিজ্ঞতা

মীনাক্ষী

পুলিশ চোরকে হাতকড়ি লাগাবার আগে বলতে ভোলে না—'আস্‌সালাম 'আলেইক্যুম', এবং পরম সংকট মুহূর্তেও চোরটি ঠিকই সৌজন্য রক্ষা করে—'ওয়া আলেইক্যুম আস্‌সালাম'। এমন দেশও আছে! অভদ্র ব্যবহারে আজন্ম অভ্যস্ত বলে চমকে উঠেছিলাম—'অ্যাঁ? এত ভদ্র? তাও আবার মুসলমান!' অভিজাত মুসলমানদের বাদ দিয়ে নিজের দেশের মুসলমান-জনতা সম্পর্কে আমার মতনই ধারণা অন্যদের। অতএব ওমান-প্রবাসী হিন্দুরা প্রায়ই আলোচনা করেন—'মুসলমানরা এত শান্ত! এত ভদ্র!' ...'কিরকম নির্ঝঞ্ঝাট এখানকার লোকজন দেখেছ?' ...'আমাদের দেশের মুসলমানরা বেশিরভাগই ভীষণ অ্যারোগেন্ট টাইপ অথচ এদের দেখ। ওমানে না এলে জানতেই পারতাম না মুসলমানরা এত মার্জিত আর শান্তিপ্রিয়। আমাদের দেশের মুসলমানগুলোর এই দেশে এসে ভদ্রতা শেখা উচিত।' এক হিন্দু একটি নারীঘটিত ক্রাইমের খবর শোনালেন অবশ্য। সাবধানও করে দিলেন—'They are only faithful to their own people। খুব বেশি মেলামেশা করবেন না যেন ওদের সঙ্গে।'

অজ্ঞাতকুলশীলের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে নেই—স্কুলের প্রথম সংস্কৃত বই 'হিতোপদেশ'-এ কাক-হরিণ-শেয়াল-এর গল্পে ছিল এই উপদেশ। কিন্তু সেখানে কোনও জাতপাতের কথা ছিল না। ও বিষয়ে সব সময়ই সাবধানে থাকতে হয়। ক্রাইম কোন দেশে, কোন জাতে না আছে? এক আধটি ঘটনা দিয়ে একটি দেশ বা জাতিকে বিচার করা যায় না। বিশেষত চারপাশে যখন ক্রমাগত দেখে চলেছি অতি ভদ্র, অতি বিনয়ী, সহৃদয়, সৎ স্বভাবের নরনারীদের। এদের দেখে আমাদের কি কিছুই শিখবার নেই? ওমান দেশে চার মাস বাস করে কেবলই মনে হয়েছে—আমরা, ভারতীয়রা এত অভদ্র! এত অসৎ! এমন সাংঘাতিক ঝগড়ুটে!

বাস্তবিক, এত ঝগড়ুটে আমরা যে, দেশের মহাকাব্যগুলোকে পর্যন্ত ঝগড়ার বিষয়বস্তু করে ফেলেছি। দেশের সম্পদ, দেশের ইতিহাস—যা তাবৎ মানবগোষ্ঠীকে মঙ্গলের পথ দেখাতে পারে, তা হয়েছে হিন্দু নামক সংকীর্ণ ধর্মগোষ্ঠীর বিশেষ সম্পত্তি। পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী-র মধ্যে অপূর্ব বন্ধন, প্রীতি-ভক্তির সম্পর্ক যে রামায়ণে এতটা বড় করে তোলা হয়েছে সেই মহাকাব্যের পুরুষোত্তম রাম দেবমূর্তির বন্ধনে সংকুচিত হয়ে হিন্দু মন্দিরের কারাগারে সংরক্ষিত। তাঁকে নিয়ে মন্দির-মসজিদ ভাঙার নীচতম ঝগড়া, নিষ্ঠুর হত্যা ইত্যাদি। দেশের পক্ষে, মানুষজাতির পক্ষে কী ক্ষতি, কী ক্ষতি।

জীবনযুদ্ধে মোকাবেলা করার উপায় এবং উপদেশ নিয়ে তৈরি হয়েছে গীতা। উপদেশ দিচ্ছেন এক রাজা আর এক রাজাকে। উপদেশের জায়গাটিও মন্দির বা তপোবন নয়, উত্তাল যুদ্ধক্ষেত্র। ঘোরতর জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাবার শাস্ত্র কালক্রমে এমন হিন্দুত্ব লাভ করেছে যে হিন্দু শবটিকেও তা শুনতে (?) হয়। গীতার এমন বুদ্ধিমান, নিরাসক্ত দার্শনিক, যুগান্তকারী রাজা শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে চাপা পড়ে গেলেন হিন্দু-মন্দিরের বাঁশি-বাজিয়ের মূর্তিতে। লোকধর্মের এমন প্রতাপ যে আধ্যাত্মিকতাকে এক কোনায়, একঘরে করে রাখে। আত্ম-বিজ্ঞান পাত্তা পায় না মসজিদ-মন্দির-চার্চ নির্ভর (temple oriented) পূজাপাঠের ভিড়ে। ফলে আত্ম-সাধনায় এগিয়ে যাবার বদলে পিছিয়ে পড়তে থাকি আত্ম-ধ্বংসে।

সিন্ধু নদের তীরে সুদূর অতীতে একটি অতি উন্নত মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু নদের কারণে সেখানের প্রত্যেক মানুষেরই পরিচয় ছিল হিন্দু। ক্রমে চিকিৎসা, শরীর-গঠন, জ্যোতিষ, রাজনীতি, সমাজনীতি, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, অস্ত্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি সবদিক দিয়ে মানুষের জ্ঞান যে তুঙ্গে উঠেছিল তার প্রমাণ প্রাচীন শাস্ত্রগুলি। সুদীর্ঘ পরাধীনতায় প্রাচীন ভাষা এবং গবেষণা কবরস্থ হয়ে যায়। সম্প্রতি চিকিৎসাক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ, শরীর গঠনে যোগ-ব্যায়াম, প্রাণায়াম (পতঞ্জলি শাস্ত্র), মন গঠনে এবং আত্ম অনুসন্ধানে উপনিষদ ও গীতার প্রচার শুরু হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধাজনক তথ্য হল, সুদীর্ঘকালের অবসরে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারটি হিন্দু নামক এক গোষ্ঠী-বিশেষের সম্পত্তি বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

সমাজের উন্নতিমূলক এবং কল্যাণকর বিদ্যা যদি ধর্মগোষ্ঠীর সংকীর্ণ মুঠোয় চলে যায় তবে মনুষ্যত্বের

ক্রমবিকাশে বাধা আসতে বাধ্য। এখন বেদ উদ্ভূত যা কিছু সব হিন্দুর সম্পত্তি, কোরান মুসলমানের সম্পত্তি, ধম্মপদর নাম গুটিকয়েক লোকই শুনেছে। আমরা অতএব আর ভারতীয় নই, হিন্দু বা মুসলমান বা অন্য কিছু। যার ভিত্তি লোকধর্ম মাত্র; লোকধর্ম কেন্দ্রিক অহঙ্কার মাত্র।

ধর্ম নিয়ে ওমানি মুসলমানেরা কিছু কম গর্বিত নয়। পার্ক, সমুদ্রতীর, বাজার—যেখানে মানুষ যেতে পারে সেখানেই নমাজ পাঠের ঘর। অত্যন্ত কেজো মানুষেরাও ঠিক সময়ে জরুরি কাজ ফেলে বসে পড়ে আসনে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনও রকম কনসেপ্টের প্রতি ওরা শ্রদ্ধাশীলও নয়। কিন্তু নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ওদের করেছে সহিষ্ণু ও মার্জিত। আলোচনা উঠলে খুবই ভদ্রভাবে বলে—'তোমাদের তো তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী।' দোষ দেওয়া যায় না। দেব-দেবীর ঘোর সমারোহে হিন্দু লোকধর্ম এত বিস্তৃত এবং এমন প্রকট যে হিন্দুরাই ভুলে গেছে আধ্যাত্মিকতার চর্চাকে। ভুলে গেছে যে, রিলিজিয়ন এবং স্পিরিচুয়ালিজম্ সমার্থক শব্দ নয়। আধ্যাত্মিক শব্দটি ভাঙলে হয় অধি আত্মিক। অধি উপসর্গ উত্তরণের ইঙ্গিত দেয়। আত্মিক হল আত্ম-বিষয়ক। অর্থাৎ নিজেকে জানার সাধনাটি হল আধ্যাত্মিকতা; এই জানার দ্বারা মানুষের ক্রমউত্তরণ হবে। এ কোনও তথাকথিত স্বর্গের দুর্গে ঢোকার সিঁড়িতে চড়া নয়, নয় কোনও দেব-দেবীর কাছে টাকা-পয়সা, সুখ-সুবিধা লাভের তুকতাক। আত্মসাধনায় ভারতবর্ষ গোড়া থেকেই একের কনসেপ্টে প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞান বলে সমস্ত রকম সৃষ্টির আদিতে এক রকম অস্তিত্ব। রসগোল্লা বা করলা—যাকেই ভাঙতে থাকা যাক, অণু পরমাণুর গণ্ডি পেরিয়ে অবশেষে একই জিনিস পাওয়া যাবে; যেখানে রসগোল্লা বা করলার কোনও পৃথক পরিচয় নেই।

বেদ-বেদান্তও একই অন্তিম সত্যের কথা বলে। একই ব্রহ্ম অসংখ্য রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। যেমন সমুদ্র অসংখ্য ঢেউ হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রত্যেক ঢেউ এবং সমুদ্রের যে কোনও অংশে রয়েছে একই রকম জল। সদাপরিবর্তনশীল সৃষ্টির গোড়ায় রয়েছে এক এবং অপরিবর্তনীয় অস্তি। বেদ উপনিষদের মতো সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানও নাকি হিন্দু ধর্মের সম্পত্তি অথচ ক'জন হিন্দুই বা শেষ সত্য (ultimate truth) সম্পর্কে মাথা ঘামায়। যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরাও সকলেই এ তত্ত্বে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেন, এমনটা আশা করা যায় না। শঙ্কর, বুদ্ধ, হজরত মহম্মদ, যিশু খ্রিস্ট-আদি অতি মহানুভব মানুষের অনুভবের স্তরেও পার্থক্য থাকতে বাধ্য। কিন্তু সেই পার্থক্য নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে কালক্রমে মানুষের সমাজকে যদি সাংঘাতিকভাবে পৃথক করতে থাকে তাহলে ধর্ম ধ্বংসের হাতিয়ার হতে বাধ্য।

রায়ট সত্ত্বেও ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে আমরা ছোটবেলায় শুনেছি একটি শ্লোগান—'হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই।' মা-র মুখে শুনতাম 'ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই'। তখন একান্নবর্তী পরিবারে প্রায়ই ভায়ে ভায়ে লড়াই, ঝগড়া, মামলা ইত্যাদি দেখা যেত এবং অবশেষে ভাইরা আলাদা হয়ে যেত। তখন ঠাঁই-ঠাঁই শব্দের অর্থ আমার কাছে ছিল বিবাদমূলক দূরত্ব। 'ঠাঁই'-এর অর্থ তো স্থান। এর মধ্যে বিবাদ থাকতেই হবে কেন? সৌজন্যমূলক দূরত্ব রক্ষার মধ্যেই তো 'ঠাঁই-ঠাঁই' শব্দের মহত্ত্ব। অতীতে লাঠালাঠি করে পরিবার ভাঙত বটে কিন্তু এখন তো ছোট্ট ছোট্ট ফ্ল্যাটে একক পরিবারের ছবিই স্বাভাবিক। যে যার নিজের ঘরে থেকে দিব্যি আত্মীয়তা রক্ষা করে চলেছে পরস্পরের মধ্যে। আলাদা থেকে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব রাখা যদি পারিবারিক ক্ষেত্রে এতখানি সফল হয়েছে তবে তা সামাজিক এবং সমাজনির্ভর লোকধর্মের ক্ষেত্রেই বা সম্ভব নয় কেন? যে যার জায়গায়, যে যার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান যে সম্ভব তা দেখে এলাম ওমান দেশে।

শোহার শহরের একটি প্রাচীন বাজার এলাকায় ছিল আমার বাস। পুরো চার মাস কাটিয়ে বুঝলাম 'বাজারে হল্লা' কথাটি নিরেট ভারতীয়। মারামারি, ঝগড়া, বন্ধ দূরস্থান; কখনও উঁচু গলার কথা পর্যন্ত কানে আসে না। মুসলমান নারীরা বোরখা পরেন, যদিও তাঁরা দোকান করা থেকে গাড়ি চালানো সব রকম কাজেই বেরিয়ে পড়েছেন। অন্য দেশের মানুষের পোশাক-স্বাধীনতা অপার। বোরখা-ঢাকা মুসলিম মেয়ের পাশে স্বল্পতম পোশাক পরা বিদেশিনি বাজার করছে। ইভটিজম্ চোখে পড়েনি। নিজেরা ধর্মীয় রীতিনীতি খুব মেনে চলে কিন্তু অপরের ধর্মকে আঘাত করে না। দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা সবই হতে দেখলাম ঈদ, বকরি ঈদের পাশাপাশি।

ওদেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখে মনে হল ইসলাম ধর্ম এ দেশকে ধারণ করতে পেরেছে। এরা শুধু মুসলমান নয়, এরা ভদ্রলোক। এ অভিজ্ঞতাকে দেশের কাজে লাগাতে পারার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু লোককে জানাতে পারার আনন্দটুকুই বা কম কী?

বাতাস জল আকাশ আলো

মেঘ মুখোপাধ্যায়

কত রকমের রবীন্দ্রনাথ। বহুমুখী এক শিল্পী, বিচিত্রকর্মা এক মানুষ। মূলত কবি-শিল্পী হয়েও সারাজীবনব্যাপী জীবন আর জগৎসংসারের কত দিকেই না তাঁর কৌতূহল জাগ্রত করে রেখেছিলেন; কত ব্যাপারেই না ভেবেছেন, চিন্তা করেছেন, মাথা ঘামিয়েছেন, বিচারবিশ্লেষণ করেছেন, অভিমত দিয়েছেন; তাঁর জীবনসাধনার মূল কবিত্ব বা সুরসৃষ্টির সীমার মধ্যে কোনও ভাবেই পড়ে না এমন কত ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়েছেন, মেতে উঠেছেন, ব্যথা পেয়েছেন, সহজ জীবনস্রোতে বিঘ্ন ঘটেছে, নিন্দা জুটেছে। সমাজের বহমান স্রোত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেননি কখনও। সাধারণভাবে একটা ধারণা আজও প্রকট যে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের কবি, অমৃতের কবি, সুন্দরের উপাসক, বেদ-উপনিষদের আনন্দ-অমৃতের তত্ত্বদর্শনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত; তা সত্য বই কি, কিন্তু এরকম বলার ভিতর দিয়ে যে-অভিযোগটা প্রকাশ পায় অর্থাৎ তিনি সাধারণজনের থেকে দূরবর্তী, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র-অভাব-অনটন-ক্লেশ-কষ্ট-সমস্যা-সংকটের খবর তিনি জানতেন না, যেন তা নিয়ে আদৌ বিচলিত ছিলেন না, কেবল আনন্দ-অমৃত-ভূমা নিয়েই নিরত ছিলেন, আনন্দের রসসমুদ্রে যোগধ্যানে মগ্ন ছিলেন—তা যে মোটেও সত্যি নয় তাঁর জীবনীকারেরা আর প্রথিতযশা রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচকেরা তথ্য আর দৃষ্টান্ত সহযোগে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি যে কত সচেতন ছিলেন সে প্রসঙ্গে জানতে একটি উদ্ধৃতি দিই : 'বুদ্ধকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, কোথার থেকে এই সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব; তখন তিনি বললেন, 'তোমার ও-সব কথায় কাজ কী? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড়ো দুঃখে পড়েছ, তুমি যা চাও তা পাও না, যা পাও তা রাখতে পারো না, যা রাখো তাতে তোমার আশা মেটে না। এই নিয়ে তোমার দুঃখের অবধি নেই। সেইটে মেটাবার উপায় করে তবে অন্য কথা।' এই বলে দুঃখনিবৃত্তিকেই তিনি পরম লক্ষ্য বলে, তার থেকে মুক্তির পথে আমাদের ডাক দিলেন।' (শান্তিনিকেতন : ভূমা)

বাস্তবের কঠিন পৃথিবীর সঙ্গে দীর্ঘায়ু জীবনে বারংবার তাঁর নিষ্ঠুর পরিচয় হয়েছিল। তিনি এই মাটি-পাথরে গড়া পৃথিবীর বাস্তবতা বিষয়ে ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন, সাধারণ মানুষের মতোই। এই বাস্তব জীবন তাঁকে মহাকবি-মহাশিল্পী বলে ছেড়ে দেয়নি, বিশেষ সুবিধা দেয়নি; জীবনের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের যেসব দুঃখ-ক্লেশ-আঘাত পাওনা থাকে, রবীন্দ্রনাথকেও সেসব পেতে হয়েছিল; যথেষ্ট পরিমাণেই পেতে হয়েছিল জীবনের নানা পর্যায়ে, নানা বয়সে, নানা অবস্থায়।

দারিদ্রের অভিশাপ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সজাগ আর বেদনার্ত ছিলেন, তা যে দেশকে-বিশ্বকে দগ্ধ করে দিতে সক্ষম তা তিনি মর্মে মর্মে জানতেন, না-হলে জীবনের অন্তিম বেলায় দাঁড়িয়ে এমন কথা বলতে পারতেন না—

> মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
> অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
> শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
> দেহে নাই শীতের সম্বল,
> অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
> নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
> শোষণ করিছে দিনরাত
> রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত—
> সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
> হয় মহা দায়।
>
> ... ...
>
> অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
> দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।
>
> (জন্মদিনে : ২২ : ২৪ জানুয়ারি ১৯৪১)

ধনীগৃহে, শিক্ষাসংস্কৃতির দিক দিয়ে এক উচ্চবংশে এবং অগ্রসর সমাজে জন্মানোর সুবাদে স্বাভাবিকভাবেই কিছু সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁকেও দস্তুরমতো জীবনসংগ্রাম করেই বড় হতে হয়েছিল, নিজের পথ কেটে নিজের জীবনটিকে তিলে তিলে গড়ে নিতে হয়েছিল। বিলাসী, আয়াসহীন ধনীদের মতো তিনি নিজেকে আরামের মধ্যে পরিবৃত রাখেননি। তাঁর এক সদাজাগ্রত চেতনা ছিল নিজের জীবনবিষয়ে, এই নশ্বর মানবজন্মকে, এই জীবনকে তিনি হেলাফেলার মনে করেননি আর ছিল জীবনকে আর পরিপার্শ্বকে গড়ে তোলার অক্লান্ত উদ্যম। তবেই তো আমরা

পেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর জীবনব্যাপী বিপুল বিচিত্র সৃষ্টি আর কর্মপ্রয়াস, নব নব প্রকল্প-প্রচেষ্টা আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের শুধু নয়, দেশ-বিদেশের অসাধারণ মানুষদেরও যারপরনাই বিস্মিত করেছে। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সামান্য সীমায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার শ্রমে-সংগ্রামে নাজেহাল হতে হতে যখন রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাই, তাঁর সৃষ্টি আর অগণন কর্মপ্রয়াসের, নিরন্তর উদ্যমের কথা ভাবি তখন সোজা কথায় হকচকিয়ে যাই। এ-ও কী সম্ভব! অনেকগুলো অক্লান্ত পরিশ্রমী, অনলস উদ্যমী মানুষের সমাহারকে কি আমরা বোঝার সুবিধার জন্য নাম দিয়েছি রবীন্দ্রনাথ? আর এই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের থেকে তো কেবল আনন্দ আর মঙ্গলের মন্ত্রই আহরণ করেননি, বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সন্ধান বা ভূমার শিক্ষাই লাভ করেননি বারবার উচ্চারিত এইসব শ্লোক থেকে—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম।
(যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করছে; যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে, তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম।)

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।
(ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।)

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে।
(যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।)

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য-ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।
(যিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।)

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু।
(আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ করেননি, আমি যেন তাঁকে ত্যাগ না করি, যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়।)

যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
(যখন এই দেবতাকে, এই পরমাত্মাকে, এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখতে পান তখন তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না।)

কর্মের, উদ্যোগের, অনলস তৎপরতার প্রেরণাও পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল ক্রিয়া; সক্রিয়তা; তিনি ছিলেন নিষ্ক্রিয়তার ঘোর বিরোধী। তিনি বলেছিলেন :

'এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতেই হতে পারে না। এইজন্য তিনি পুনশ্চ বলেছেন যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে। এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীরত্বা বিদ্যয়ামৃমশ্নুতে।
কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাদ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা।'
(কর্ম—শান্তিনিকেতন)

২

শৈশব থেকে যতই কেননা আমরা রবীন্দ্রনাথকে বেদ-উপনিষদের শিক্ষায় লালিত হতে দেখি, উপনিষদ তাঁর জীবনদর্শন গড়ে তুলতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিলেও, জগৎ আর জীবনকে বুঝতে সারাজীবনব্যাপী তাঁর মুখ্য অবলম্বন হলেও মানুষটি কিন্তু প্রাচীনপন্থী ছিলেন না কোনও মতেই। প্রাচীনতার বা প্রাচীন ধ্যানধারণার নিগড়ে বদ্ধ হয়ে থাকতে চাননি; নব আবিষ্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধান করেছেন, নতুন সাহিত্য আর নতুন পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত হতে চেয়েছেন। সাহিত্য-শিল্পের সব নতুনত্ব সমান উদ্দীপনায় গ্রহণ করতে পারেননি একথা আমরা জানি কিন্তু কখনওই উদাসীন হয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। নতুন তরঙ্গ তাঁর হৃদয় এবং মস্তিষ্কে অনুরণন জাগিয়ে গেছে—কম্পাঙ্কের হেরফের হলেও। কিন্তু কয়েকটি মূল উদ্দীপনা থেকে তিনি কখনও সরে আসেননি। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় অত্যন্ত উন্নত পশ্চিমের কত দেশে প্রথম যৌবন থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেছেন বারবার। কত-না নগর, রাজধানী দেখেছেন, সেখানে থেকেছেন, প্রত্যক্ষ নিবিড় অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার; পাশ্চাত্যের কবি-শিল্পী-বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের সঙ্গে মেলামেশা আর আলাপ-আলোচনা করেছেন কিন্তু সভ্যতার বস্তুগত অকল্পনীয় উন্নতি তাঁকে তাঁর ভিত্তিভূমি থেকে টলাতে পারেনি।

তাঁর ভিত্তিভূমি রচনায়, তাঁকে গড়ে তোলায় প্রকৃতির ভূমিকা ছিল অসীম। ভারতবর্ষের অসীম উদার নিসর্গ, এ-দেশের বাতাস জল আকাশ আলো কবির মনোভূমি নির্মাণে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতির এই উপাদানগুলিকে তিনি মানুষের জীবনে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। এরাই

প্রাণশক্তির আকর। তাঁর কাছে বাতাস জল আকাশ আলো ছিল সপ্রাণ, সংবেদনময়। জীবনের বিকাশে অফুরন্ত শক্তির আধার। তাঁর কবিতায়-গানে-গল্পে-চিঠিপত্রে-ভাষণে-নিবন্ধে ঘুরে ফিরে আসে এরা। মেঘ-রৌদ্র বর্ষা-বসন্ত নদী-পর্বত-অরণ্য প্রভাত-সন্ধ্যা গ্রহ-তারা—এদের কথা বলতে তিনি খুব ভালবাসেন। নিছক কাব্যরসের জন্য নয়, এরা উঠে আসে কবির গহন চেতনা থেকে। প্রগাঢ় অনুভূতি দিয়ে এদের তিনি লালন করেছিলেন তাঁর চিত্তে, বাইরের বস্তু হিসাবে নয়, আর তাই এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপ পেয়েছে তাঁর সাহিত্যে। ঝরনার মতো সাবলীল ধারায় উঠে এসেছে কবিতায়-গানে। গীতাঞ্জলির গানে শুনতে পাই—

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

(গীতাঞ্জলি : ১৫)

কবির মর্ম থেকে উঠে আসে এরকম কত প্রকাশ—

আজ মনের মধ্যে ছেয়ে
সুনীল আকাশ্র-ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে
সকল শিকল টুটেছি।

(গীতিমাল্য : ২)

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে?
এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায়
ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।

(গীতালি : ৪৫)

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।

(জন্মদিনে : ১৪ : ২৫.৯.১৯৪০)

খুঁজে দেখলে পেয়ে যাব এরকম কত রোমাঞ্চিত-করা পঙ্‌ক্তিমালা ছড়িয়ে আছে তাঁর কাব্যসমগ্রে। মাটি-ঘাস-পথের ধুলা-অমলিন বাতাস দিয়ে ভরা এক ধরণীতে তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন। ধুলা-মাটির পৃথিবীর কথা বলেছেন নিবিড় আবেগে। এক একটি প্রভাত, কিংবা কোনও একটি সন্ধ্যা তাঁর কাছে জীবন্ত সত্তা। নগরজীবনের সুযোগসুবিধা, আড়ম্বর তাঁর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। নীল আকাশের তলে রবিকরে স্নাত ফসল খেতে, ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় তিনি নিজেকে সহজ করে, সম্পূর্ণ করে পেতেন।

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা।—
ওইখানে মোর বাসা
যে-মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস,
যার 'পরে ওই মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস।
চিরদিনের আলোক-জ্বালা নীল আকাশের নীচে
যাত্রা আমার নৃত্যপাগল নটরাজের পিছে।

(সেঁজুতি : অমর্ত : ১১/৩/৩৭)

অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে উঠে এসেছিল আমাদের প্রতি তাঁর এই বার্তা—

যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

(সেঁজুতি : স্মরণ : ২৫ চৈত্র ১৩৪৩)

সূর্য-আলো আর গ্রহনক্ষত্রময় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁকে সারাজীবন মুগ্ধ করে রেখেছিল। তাঁর চেতনাকে সংহতি দান করেছিল। আমরা এইসব থেকে দিন দিন যত দূরে সরে যাচ্ছি, প্রকৃতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে বাঁচার নেশায় আমাদের যত পেয়ে বসছে, দু'চারদিন বা একপক্ষের বনে-পর্বতে শৌখিন পূজার ভ্রমণের কথা বাদ দিলে, প্রকৃতির এই প্রাণদায়ী উপাদানগুলিকে যখন আমরা জীবনে আর অপরিহার্য মনে করছি না, একান্ত আপন ভাবছি না, তখন, ততই আমাদের মনে না হয়ে উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথ কেন এমন করে তাদের কথা বলে গেছেন! আমরা কি ভেবে দেখব না, কেন? বহু দেশ ঘুরে, জীবনে বহু পথ পেরিয়ে তবে কি তিনি অনাধুনিক ছিলেন? তেমন তো মনে হয় না। তবে?

উপনিষদের কয়েকটি মন্ত্র তিনি বারবার স্মরণ করতেন, আলোচনা করতে আনন্দ পেতেন। তেমন একটি হল—

যো দেবহগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

মন্ত্রটির তিনি এই অর্থ দিয়েছেন : যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলছেন :

'হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষ হয়ে গেছে—তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন। তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওষধি বনস্পতির নাম করা হল!

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, এ কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে-ঋষি বলেছেন তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন, সে-ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের দ্বারা পাননি, দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান, তিনি যে-ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল, তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর গম্ভীর কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্যোদয়—সে কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না—কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন, এই বনস্পতিতে আছেন।'

(শান্তিনিকেতন : বিশ্বব্যাপী)

রবীন্দ্রনাথের মতো আমরাও যদি আজ বলতে পারতাম 'সে কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়'!

কবির জন্মের সার্ধশতবর্ষে তাঁর চেতনার এই প্রধান দিকটি সম্বন্ধে আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে বদ্ধ আমরা যদি আরও বেশি করে সচেতন হই আর আমাদের জীবনকে সেই চেতনা দিয়ে গড়ে তুলি তবে একটা কাজের কাজ হয়। বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থেকে জীবনকে রচনা করে তোলার তাঁর এই চিন্তাটিকে একবার বিশদ করে বুঝিয়ে বলেছিলেন গদ্যের অপূর্ব ভাষায়, একটু বড় হলেও, আমরা এখানে তা উদ্ধৃত করছি :

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠসংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড়-উদ্ভিদ-চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজবটুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন—

যো দেবঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

অগ্নি বায়ু জলস্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানাঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

কিন্তু এখনকার দিনের কাজের লোকেরা এ-সকল কথা মিস্টিসিজম বা ভাবকুহেলিকা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, অতএব ইহা লইয়া সমস্ত আলোচনাটাকে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি, খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধনির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথমযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্নবর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে; এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল নানাবর্ণে

বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই; তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইনস্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারি দিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান।

(শিক্ষা : শিক্ষা সমস্যা : ১৩১৩)

সবিনয় নিবেদন

এই সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হল 'চতুরঙ্গে'র ৬৮ বর্ষ। যে-গ্রাহকদের ৬৮ বর্ষ পর্যন্ত চাঁদা দেওয়া আছে, এই সংখ্যার সঙ্গে তাঁদের গ্রাহক চাঁদার মেয়াদও সম্পূর্ণ হল। গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে নবীকরণের জন্য তাঁরা যেন কোনও টাকা/চেক চতুরঙ্গের দপ্তরে এখন না পাঠান।

সম্পাদক
চতুরঙ্গ

কুমার রায়—এক সজ্জন নাট্য-অভিভাবক

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

১৯৬৪ সালের শেষদিকে, কিংবা ১৯৬৫ সালের প্রথমদিকে সিঁথির পেয়ারাবাগান মাঠে তিনদিনের এক নাট্যমেলা হয়েছিল। সেই নাট্যমেলায় দ্বিতীয় দিনে দেখেছিলাম 'রক্তকরবী'। বছর বারোর এক বালকের চোখে অপার বিস্ময়ে ধরা পড়েছিল কিংবদন্তি নাট্য-অভিনয়। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, শোভেন মজুমদার, অমর গঙ্গোপাধ্যায়দের মতো বিশাল মাপের অভিনেতাদের শ্রদ্ধা স্মরণে রেখেই স্বীকার করছি ওই দিনের রক্তকরবী অভিনয় দেখার পর দীর্ঘ দিন আমি গজু পালোয়ানের কাতর ধ্বনি, আর গোঁসাইয়ের 'বাবা ৪৯'র ঘ'-র মিষ্টি মুখের শয়তানি ভুলতে পারিনি। বিশেষকরে, কিশোর বয়সে কোনও খারাপ লোকের কথা মনে হলেই রক্তকরবীর গোঁসাইয়ের কথা মনে হত। সেই গোঁসাইয়ের নাম একটু বড় হয়ে জেনেছি, কুমার রায়। এরপরেই ৭০ দশকের গোড়ায় অ্যাকাডেমি মঞ্চে রাজা নাটকের ঠাকুরদা চরিত্রে সেই গোঁসাইকে দেখলাম বৈরী রাজাদের ছাউনির সবুজ পর্দার ফাঁক দিয়ে মঞ্চে ঢুকলেন। কাঞ্চী রাজ বিদ্রূপের সঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তার সেনাপতি'। স্পষ্ট উচ্চারণে ঠাকুরদা বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ আমিই তার সেনাপতি'। অমনই তৈরি হয়ে গেল চরম নাট্য মুহূর্ত। তার একটু আগেই এই প্রবীণ অথচ নবীন সেনাপতি, শঙ্খ ঘোষের 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক' বইয়ের কভার পেজ থেকে সোজা মঞ্চে উঠে বাউলের বেশে গেয়ে উঠেছেন, 'আমার সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই।' তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।'

নাটক দেখার শুরুর লগ্ন থেকেই তাই কুমার রায়ের অভিনয়ের ভক্ত হয়ে উঠেছি। কলেজে ছাত্রাবস্থায় জেনেছি কুমারেন্দু নারায়ণ রায়চৌধুরীর (অসম্পাদিত পিতৃদত্ত নাম) জন্ম ১৯২৬ সালে। ১৬ বছর বয়সে তিনি ৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন এবং জেলবন্দি অবস্থায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। দেশবিভাগের পর বন্ধু ঋত্বিক ঘটকের সহায়তায় ১৯৪৯ সালে শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বাধীন বহুরূপীতে যোগদান করেন। এরপর দীর্ঘ ৬১ বছর বহুরূপী নাট্যদলের সঙ্গে শ্বাসবায়ুর মতো জড়িয়ে ছিলেন ২০১০-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তারপর ইতিহাস। বহুরূপী নাট্যদলে কুমার রায় এসেছিলেন অভিনেতা হিসাবে। 'পথিক' নাটকে মংলার চরিত্রেই তাঁর প্রথম অভিনয় (১৬.১০.১৯৪৯)। পরবর্তীতে শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্রের বিদায় গ্রহণের পরে তিনিই বহুরূপীর নাট্যসৃজনের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন. শুধু তাই নয়, বহুরূপীর কার্যকরী নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। নাট্যসৃজনের দিক থেকে তাঁর সৃজিত 'মৃচ্ছকটিক' (১৯৭৯), 'গালিলেও' (১৯৮০), 'রাজদর্শন' (১৯৮২), 'আগুনের পাখি' (১৯৮৪), 'মালিনী' (১৯৮৬), 'মিস্টার কাকাতুয়া' (১৯৮৭) 'কিনুকাহারের থেটার' (১৯৮৮) এবং 'নিন্দাপঙ্কে' (১৯৯১), 'কালসন্ধ্যা' বাংলা নাটকের অহঙ্কার। তাঁর নাট্যদর্শনে সমাজ সময় এবং সংস্কৃতি একান্তই জীবন্ত। তিনি মনে করতেন সমাজদেহের সম্পূর্ণ রূপ হল সংস্কৃতি, তাই সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের আগে সংস্কৃতির আন্দোলন জরুরি। সেই আন্দোলনের শরিক হয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিয়েছেন, এবং দেশজ নাট্য-পরিকাঠামোর মধ্যে বিশ্বসংকটকে প্রত্যক্ষ করাতে চেয়েছেন। নাট্যকর্মী হিসাবে তিনি পরিশ্রম করে নাট্যতত্ত্ব এবং নন্দনতত্ত্ব আয়ত্ত করেছেন এবং উদ্ভাবনী শক্তির অনন্যতায় নাট্যনির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। বহুরূপীর দুই সঙ্গী তাপস সেন ও খালেদ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে তিনি মঞ্চসজ্জা, সাজসরঞ্জাম, আলোক প্রক্ষেপণ, শব্দনিয়ন্ত্রণ, রূপসজ্জাসহ নাট্যশিল্পের প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যিক সকল বিষয়ে হাতেকলমে কাজ শিখেছেন এবং তার দক্ষ রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। তাঁর নাট্যতত্ত্ব ভাবনার সাক্ষ্য বহন করেছে তাঁর রচিত 'তিলোত্তমা শিল্প', 'থিয়েটারে কবিতা', 'নাট্যভবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ', 'শম্ভু মিত্র : নির্মাণ ও সৃজন', 'রবীন্দ্র নাটক : আলোকিত উদ্ভাবন' প্রভৃতি গ্রন্থ।

১৯৭১ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগে যোগদান করার পর অসংখ্য নাট্যমনস্ক ছাত্র তিনি প্রস্তুত করেছেন। উৎপল দত্তের পরেই নাট্যপ্রশিক্ষক রূপে তাঁর স্থান সবার আগে। হাতেকলমে নাটকের কাজ করতে করতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাসবোধ নিয়ে আলো-মঞ্চ-সঙ্গীত-

অভিনয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি নাটককে সত্যিকারের তিলোত্তমা শিল্পে পরিণত করেছিলেন। বিভিন্ন 'Art form'-এর 'amalgamation'-ই যে নাটক, তা তিনি বিশ্বাস করতেন এবং সেই বিশ্বাস তাঁর নাট্যছাত্রদের অন্তরে সঞ্চারিত করতেন। তিনি মনে করতেন, একজন অভিনয়শিল্পীকে অভিনীত চরিত্রটি আবিষ্কার করতে হয়। একজন ভাল চিত্রকর যেমন তুলির টানে, আলতো ছোঁয়ায় ছবির একটা আদল তৈরি করে ফেলেন, একজন অভিনেতাও তেমনই অব্যক্ত বাণীর নীরব ব্যঞ্জনায়, কখনও স্পষ্ট উচ্চারণে, কখনও চোখের ভ্রূকুটিতে একটি নাট্যচরিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। এই কাজে কুমার রায় ছিলেন এক আত্মনিমগ্ন নাট্যশিল্পী, যার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে গোঁসাই, ঠাকুরদা, গালিলেও, লম্বোদর এবং নিন্দাপঙ্কের চরিত্রাভিনয়ে।

চলচ্চিত্রে বা টেলিভিশনে তাঁর কোনও আসক্তি ছিল না। তবু সাকুল্যে দশটি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের একটি ('তিনকন্যা'-র মণিহারা) ও তপন সিংহের চারটি ছবি (সাগিনা মাহাতো, এখনই, হারমোনিয়াম, এক যে ছিল দেশ) উল্লেখযোগ্য। সংগঠক হিসাবে কুমার রায় ছিলেন একজন দক্ষ নেতা। শম্ভু মিত্র বহুরূপী ত্যাগ করার পর দলে যে সংকট তৈরি হয়েছিল, তা খুব দক্ষভাবে overcome করেছিল বহুরূপী কুমার রায়ের উপযুক্ত নেতৃত্বে। সংগঠক হিসাবে তিনি ছিলেন স্থিতধী। নানা ধরনের, নানা মেজাজ-মর্জির মানুষকে চালনা করা, যেটা খুব জ্ঞানী ও ঠান্ডা মাথার মানুষ ছাড়া সম্ভব নয়, তাই ছিলেন কুমার রায়। সমালোচনা, বিরুদ্ধ মতামত অতি ধৈর্যসহকারে শুনতেন এবং কখনও উত্তেজিত হতেন না, বা সমালোচকদের কোনও কটূক্তি করতেও দেখেনি বা শোনেনি কেউ। তরুণ নাট্যকর্মীরা অনেকেই কুমার রায়ের কণ্ঠে 'জয় হোক' বাণী শুনে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা' চরিত্র রূপেই প্রত্যক্ষ করেছে।

সাম্প্রতিক অতীতে রাজনীতিতে পক্ষ নেওয়ার প্রশ্নে যখন নাট্যকর্মী, নাট্যব্যক্তিত্বরা দ্বিধাবিভক্ত, তখন তিনি হাসপাতালে শুয়ে। কিন্তু সেই অবস্থাতেও অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে তিনি এসে পৌঁছেছেন তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত সভায়। নাট্যসংস্কৃতির বিপন্নতায় তিনি নিজেও বিপন্ন বোধ করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জেনেছি তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ি, গঙ্গাপদ বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, বাদল সরকার, উৎপল দত্তের প্রতি যেমন ছিলেন শ্রদ্ধাবান, তেমনই তরুণ মেঘনাদ, কৌশিক, সৌমিত্র, রমাপ্রসাদ, দেবশঙ্কর এঁদের প্রতিও ছিলেন স্নেহময়। শেখার ব্যাপারে তিনি কোনও বয়সের গণ্ডি মানতেন না। উত্তর ২৪ পরগণার দুর্গানগর অঞ্চলে একটি আলোচনা সভায় এই আলোচকের শ্রদ্ধেয় শিশির সেন ও কুমার রায়ের সঙ্গে বক্তৃতা মঞ্চে অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেখানে এই অধমের আলোচনার পরে কুমার রায় বললেন, 'সিসৃক্ষু'র মতো কুন্তলের কথা শুনলাম।' এই উক্তিতে তিনি এই আলোচককে কতটা মহিমান্বিত করলেন, অন্তত তাঁর দু'ডবল শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করলেন, এক তরুণ নাট্যকর্মীর কাছ থেকে। ঔদার্যের নিখাদ প্রতিমূর্তি কুমার রায়ের মৃত্যুতে বাংলা নাট্যজগত, তরুণ বাংলা নাট্যকর্মীসকল এক সজ্জন অভিভাবককে হারাল। তাঁর দেখানো পথে হাঁটাই হবে এখন তাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মান জ্ঞাপন।

সুইট রাশ

মৃত্যুতাড়িত এক মধ্যবয়সিনী রমণীর জীবন নিয়ে অশীতিপর আঁদ্রে ওয়াইদার শেষতম (২০০৮) চলচ্চিত্র 'সুইট রাশ'। ছবিটি আসলে ভালবাসা আর মৃত্যুর কাব্য। কাব্য, না দার্শনিকতা? চলচ্চিত্রের এক প্রবীণ প্রাজ্ঞ পরিচালক-শিল্পী তাঁর পরিণত জ্ঞান-জীবনচেতনা দিয়ে যেন পরীক্ষা করে দেখেছেন মৃত্যুকে, ভালবাসাকে কিংবা ভালবাসা আর মৃত্যুর মধ্যেকার দ্বন্দ্ববিধুর সম্পর্কটিকে। এজন্য তিনি একটা কাহিনি বেছে নিয়েছেন। চমৎকার করে এ ছবির মধ্যবয়সিনী নায়িকার জীবনের বিপর্যয়ের গল্পটা আমাদের বলেছেন। কিন্তু ছবিটা নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি গল্প বলার যে কৌশল বা আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন তাতে স্পষ্ট যে তিনি এক জীবনসংকটের তথা জীবনদর্শনের ধারণা দিতে চেয়েছেন। ছবিটি আমরা দেখেছি পঞ্চদশ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে।

দুই পুত্রের মৃত্যুর পর বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত এক রমণী মার্তা এক মফস্‌সল শহরে বাস করেন তাঁর ডাক্তার স্বামীর সঙ্গে। মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত। স্বামী নিয়মিত তাঁর চিকিৎসা করছেন কিন্তু স্ত্রীর কাছে গোপন রেখেছেন রোগটার ভয়াবহতা। তিনি যেন বেঁচে থাকার তাৎপর্য হারিয়েছেন। জীবন তাঁর কাছে আকর্ষণের বস্তু নয়। হঠাৎ এই অবস্থাটার পরিবর্তন ঘটল। এক প্রাণোচ্ছল পুত্রের বয়সি তরুণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল ঘটনাচক্রে। তিনি এই তরুণ যুবাটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। অনুরাগ আর কিছুই নয়, গল্প করা, কথা বলা আর শহর ছাড়িয়ে পথে প্রান্তরে উদ্দেশ্যহীন বেড়ানো। এভাবে বেড়াতে বেড়াতে একদিন তাঁরা দু'জনে চলে এলেন এক নদীর তীরে। নদীর এক জায়গায় দহ তৈরি হয়েছে। ওপরের জল স্থির। এই দহে নেমে স্নান করার, সাঁতার কাটার বেজায় শখ হল তাঁর। তাঁরা নেমে পড়লেন জলে। এই জলক্রীড়ার সময় মার্তার জন্য এক জাতের জলজ ঘাস তুলে আনতে গিয়ে হঠাৎ ছেলেটির পা গেল জলজ ঘাসের ভিতর আটকে। শত চেষ্টা করেও সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে আসতে পারল না। উদ্দাম প্রাণবন্ত যুবকটি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে তলিয়ে গেল দহের গভীরে। বিহ্বল, হতবুদ্ধি রমণী পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখল তাঁর তরুণ প্রণয়ীর অসহায় মৃত্যু। চেঁচামিচি করে লোক ডেকে যখন ছেলেটিকে উদ্ধার করা হল, তুলে আনা হল পাড়ে তখন সে একটা প্রাণহীন দেহমাত্র। জড়পদার্থ। নিঃস্ব হয়ে যাওয়া রমণীর তখন নিদারুণ দশা।

একটি তরুণকে আশ্রয় করে নতুন করে বেঁচে উঠতে গিয়ে, তাঁর জীবনের অবসাদ আর বিষাদের ভার ঝেড়ে ফেলে আনন্দে-ফূর্তিতে উজ্জ্বল আকাশের তলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তিনি তরুণটির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। কোথার থেকে কী হয়ে গেল! আবার অতর্কিতে অপ্রত্যাশিত মৃত্যু হানা দিল নারীটির জীবনে। একটা স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। ছেলেটির সঙ্গে তাঁর কয়েকদিনের বন্ধুতা মেলামেশা হইচই যেন বাস্তব নয়, বাস্তব ছিল না কখনও। স্বপ্নের পরিণতি ঘটল দুঃস্বপ্নে। স্বাভাবিক সহজ জীবনধারার মধ্যে ফিরে আসতে গিয়ে সব গোলমাল পাকিয়ে গেল। আরও একটি মৃত্যু জাঁকিয়ে বসল তাঁর মনের ওপর।

বেড়াতে বেড়াতে ক্রমশ শহর ছাড়িয়ে, মূল রাস্তা ছেড়ে দু'জন যখন নদীর উঁচু পাড় থেকে ঝোপঝাড় ভেঙে নীচের নদীস্রোত আর দহটি লক্ষ করে নেমে যাচ্ছে আর চারদিকের বিশাল অপার নির্জনতার মধ্যে দহের জলে নেমে স্নান করার, সাঁতার কাটার আয়োজন করছে, এই দৃশ্যটির মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি হয় যাতে আমাদের ভয় করে, কেমন একটা অমঙ্গলবোধ জন্মাতে থাকে, মনে একটা অস্বস্তি ঘটতে থাকে। এই দৃশ্যটির প্রসার, আকাশ-মাটি-নদী-ধূ ধূ নির্জনতা আমাদের মুগ্ধ করে দেয় অথচ একটা আশংকাও জন্ম নেয়। নারীটির জীবনকাহিনি বলতে বলতে ওয়াইদা সুনিপুণভাবে এই চূড়ান্ত দৃশ্যটিতে এসে পৌঁছন যার অভিঘাত সামলানো দর্শকের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে।

'সুইট রাশ' হল চলচ্চিত্রের ভিতরে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের কাহিনির মধ্যে সেটি নির্মাণ করার দৃশ্যাবলিও অন্তর্ভুক্ত। আর এই নির্মাণের দৃশ্যাবলি কিন্তু চলচ্চিত্রের আঙ্গিকের প্রয়োজনে বানানো নয়। ওয়াইদা কীভাবে এক রমণীর জীবনের কাহিনিটি শুটিং করছেন, আমাদের তা দেখানো হয়। চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে পরিচালকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, এমন কোনও অভিনেতা এখানে নেই, এটা আসল

পরিচালকের সাজানো কোনও শৈল্পিক ব্যাপার নয়, ছবিটির নানা জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে ওয়াইদা তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রী-কলাকুশলীর দল নিয়ে লোকেশনে স্বয়ং শুটিং করছেন। প্রকৃত শুটিঙের দৃশ্য মিশে যাচ্ছে অভিনীত অংশের সঙ্গে। অভিনীত অংশ কাট করে আমাদের দেখানো হয় ওয়াইদা এখানটায় শুটিং করছিলেন। তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন, বোঝাচ্ছেন, লক্ষ রাখছেন ছবি তোলার সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডের ওপর। এক জায়গায় দেখি তিনি 'সুইট রাশ' অর্থাৎ একজাতের জলজ ঘাস বা আগাছা, যেটা এই ছবিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা আসলে কী তা একগোছা 'সুইট রাশ'-সহ বোঝাচ্ছেন তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের।

ছবিটির সম্পদ মধ্যবয়সিনী রমণীর প্রধান চরিত্রে ক্রিস্টিনা জান্ডার অভিনয়। এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ওয়াইদার অতি প্রিয়। তাঁর বহু ছবিতে ইনি অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিজীবনের গভীর সংকটের মধ্যে 'সুইট রাশ'-এ অভিনয়ের ডাক পেয়েছিলেন তিনি। তখন তাঁর স্বামী মৃত্যুপথযাত্রী, ক্যানসারের সঙ্গে শেষ লড়াই করছেন। এই রকম মুহূর্তে কীভাবে তিনি এই ছবিতে অভিনয় করবেন, সে আরেক সংকট। তিনি পড়েন মহাদ্বন্দ্বে। কিন্তু তাঁকে ছাড়া ওয়াইদার চলবে না, ছবিটা তাহলে হবে না, ব্যক্তি ক্রিস্টিনা জান্ডার জীবনের এই বাস্তবসংকটকেও ওয়াইদা ছবিটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন, জড়িয়ে নিয়েছেন।

ছবিটি শুরু হচ্ছে একটি স্নিগ্ধ স্বল্পালোকিত কক্ষে ক্রিস্টিনা জান্ডার আত্মকথন দিয়ে, যেখানে এক দীর্ঘ স্বগতসংলাপে তিনি ব্যক্তি হিসাবে তাঁর সংকটের কথা বলে যাচ্ছেন। ক্যামেরা স্থির। এক ঘননিবিড় দৃশ্য। ছবিটিতে জান্ডা কখনও বাস্তবের ব্যক্তিবিশেষ, আবার কখনও ওয়াইদার অভিনেত্রী। কখনও মার্তা 'চরিত্র' হয়ে অভিনয় করছেন, কখনও অভিনেত্রী হিসাবে চরিত্রটি নিয়ে ভাবছেন, কখনও আবার ব্যক্তিজীবনে ফিরে আসছেন। নানা স্তরে তিনি এই ছবিটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ওয়াইদার ভাবনাকে প্রসারিত করছেন। জীবন-মৃত্যু, ভালবাসা, বেঁচে থাকা-মরে যাওয়ার রহস্যে দর্শকদের জড়িয়ে নিয়েছেন ওয়াইদা আর জান্ডা। চলচ্চিত্রশিল্পের এক নতুন অভিজ্ঞতা।

মে. মু.

WITH BEST COMPLIMENTS

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M OFFERS A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS

Registered Office :

59B, CHOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)
CALCUTTA-700 020
PHONE : 2283 2538
TELE FAX : 22832545

35 Years' Dedicated Service to the Nation

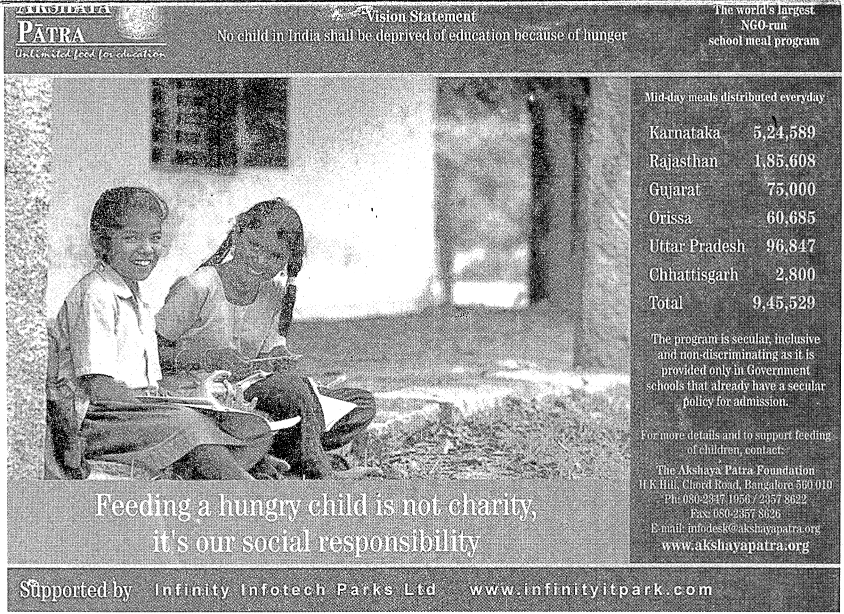
PĀTRA
Unlimited food for education
Vision Statement
No child in India shall be deprived of education because of hunger
The world's largest
NGO-run
school meal program
Mid-day meals distributed everyday
Karnataka 5,24,589
Rajasthan 1,85,608
Gujarat 75,000
Orissa 60,685
Uttar Pradesh 96,847
Chhattisgarh 2,800
Total 9,45,529
The program is secular, inclusive and non-discriminating as it is provided only in Government schools that already have a secular policy for admission.
For more details and to support feeding of children, contact:
The Akshaya Patra Foundation
H K Hill, Chord Road, Bangalore 560 010
Ph: 080-2347 1956 / 2357 8622
Fax: 080-2357 8626
E-mail: infodesk@akshayapatra.org
www.akshayapatra.org
Feeding a hungry child is not charity,
it's our social responsibility
Supported by Infinity Infotech Parks Ltd www.infinityitpark.com

JUNE 2010 Vol. 68 Jt. Issue 3-4 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R.N. No. 5480/57 যুগ্ম সংখ্যা ডাকযোগে